# শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এম. এ, ডি. ফিল., ডি. লিট.
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান
এবং
'বাংলা নাটকের ইতিহাস', 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা',
'নাটকের কথা', 'নাট্যতত্ত্ব পরিচয়'
প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা

প্রকাশক : শিল্পীসংস্থা
কলিকাতা-৫
পরিবেশক : পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১ বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শিল্পীসংস্থার পক্ষে
যুগ্মসম্পাদক
শ্রীসুধীর ঘোষ,
শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায়
১৬৩, আহিরীটোলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীচারু খান

মুদ্রাকর :
শ্রীসতীশচন্দ্র সিকদার
বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য : আটটাকা

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য
অগ্রজপ্রতিমেষু

# ভূমিকা

'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' শরৎ-অনুরাগী পাঠক সমাজের হাতে সমর্পণ করিলাম। শরৎচন্দ্রের প্রতি চিরকাল অন্তরের সুগভীর প্রীতি ও ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিয়াছি, সেই প্রীতি ও ভক্তির সামান্য অর্ঘ্য স্বরূপ এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। কয়েক বছর ধরিয়া এই গ্রন্থ রচনায় গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রায় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, এ-পর্যন্ত তাঁহার উপরে যত আলোচনা বাহির হইয়াছে সবই পড়িয়াছি। জানি, জীবনীকার ও সমালোচকের কাজ অতি কঠিন দায়িত্বপূর্ণ। জীবনী রচনার সময় প্রাপ্ত তথ্য ও বিবরণগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হয়। যে-সব তথ্য ও বিবরণ অকাট্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে, সেগুলি বর্জন করিতে হয়, আবার অনেক অন্ধকার স্তরে যুক্তিনির্ভর অনুমানের আলোকপাত করিতে হয়। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখিত কোন কোন জীবনীগ্রন্থে এমন সব ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যেগুলি খুবই সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা সত্য হইতেও পারে, কিন্তু সংশয়ের অতীত নহে বলিয়া সেগুলি গ্রহণ করি নাই। যে-সব ঘটনা দুই তিন জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলিই নিঃসংশয়িত ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। অনেক স্থলে শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকবৃন্দ সন তারিখ ও একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়াছেন। সেইসব স্থলে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অধিকতর নির্ভরযোগ্য লেখকের বিবরণই ব্যবহার করিয়াছি। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক অনেক ব্যক্তির সঙ্গে নানাপ্রকার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সব সময়ে তাঁহাদের কথা অভ্রান্ত মনে হয় নাই। স্মৃতি হইতে বলিবার সময় অনেক তথ্য বিকৃত হইয়া পড়ে, অনেক ঘটনা উল্টাপাল্টা হইয়া যায়। এ-সব জায়গাতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া নির্ভরযোগ্য সংবাদগুলিই শুধু গ্রহণ করিয়াছি। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িককালে লিখিত বিবরণের উপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। শরৎচন্দ্রের রচনাবলী সমালোচনা করিবার সময়েও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচক-সত্তা বজায় রাখিয়াছি, ভক্তির উচ্ছ্বাস যাহাতে সমালোচকের বিচারদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে সেদিকে সচেতন রহিয়াছি এবং কোন স্থানে অহংবোধ যাহাতে প্রাধান্য না পায় সেদিকেও কড়া নজর রাখিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শরৎচন্দ্রের রহস্যাচ্ছন্ন ও চমকপ্রদ জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রহিয়াছে এবং তাঁহার প্রতিটি রচনার অতি বিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের জীবনের প্রতিটি বছর ধরিয়া তাঁহার জীবনগতি ও সাহিত্যধারা পাশাপাশি রাখিয়া উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতিটি গ্রন্থ সম্পর্কে চিঠিপত্র ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা হইতে যে সব তথ্যও সমালোচনা পাওয়া যায় সেগুলি উল্লেখ করিয়াছি এবং তারপর আমার নিজস্ব সমালোচনার অবতারণা করিয়াছি। ভাগলপুর হইতে সামতাবেড়-কলিকাতা পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ সাহিত্যসাধনার ইতিহাস কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করিয়াছি এবং শরৎচন্দ্রের সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতা ও মানবচেতনার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া প্রতিটি পর্বের সাহিত্য সাধনার স্বরূপ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শরৎ-প্রতিভার ক্রমবিবর্তন ধারাটি বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন পর্বের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। হয়তো আমার বিচার ও সিদ্ধান্ত সকলের গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু শরৎ-প্রতিভার সমগ্র রূপটি এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, সবিনয়ে নিজের পক্ষে এ-টুকু দাবী বোধ হয় করিতে পারি। 'পরিশিষ্টে' শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎ-সাহিত্যের স্থায়ী মূল্য ও প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থরচনার ইতিহাসটি এবার বলা যাক। কলিকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান শিল্পী-সংস্থা বহুদিন হইতেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে। শরৎচন্দ্রের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য এই সংস্থা কয়েকটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেগুলির অন্যতম হইল বাংলা ও ইংরেজীতে শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবনী প্রকাশ। এই পরিকল্পনায় সংস্থা ভারত সরকারের কাছে আর্থিক আনুকূল্যও লাভ করে। সংস্থার কার্যকরী সমিতির একটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরৎজীবনী রচনার ভার বন্ধুবর ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও আমার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু ডঃ রায়ের আকস্মিক অসুস্থতার ফলে সংস্থা সমগ্র গ্রন্থটি রচনার ভার একমাত্র আমাকে অর্পণ করে। সংস্থার অনুরোধে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করিলাম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার দায়িত্ব পালন করিলাম। এ-সুযোগে শিল্পী সংস্থার সভ্যবৃন্দকে, বিশেষ করিয়া ইহার সভাপতি শ্রদ্ধেয় মনোজদা ও প্রীতিভাজন সম্পাদকদ্বয় শ্রীকেশব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধীর ঘোষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

করিতেছি। তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাতেই এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি,- সুতরাং এই গ্রন্থ যদি কিছু প্রশংসা পায় তবে সে-প্রশংসা তাঁহাদেরই প্রাপ্য।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য লইয়া আমার পূর্বে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমার শ্রদ্ধা জানাইতেছি। ছাত্রজীবনে বি. এ. পড়িবার সময় ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শরৎচন্দ্র' নামক সমালোচনা-গ্রন্থ পড়িয়া শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম নূতন আলোক লাভ করিয়াছিলাম। তারপর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-গ্রন্থ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনবদ্য আলোচনা পড়িয়া শরৎসাহিত্য সমালোচনায় দীক্ষিত হইলাম। শরৎসাহিত্য সমালোচনার এ-দুইজন পথিকৃৎ আচার্যকে আজ সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম জানাইতেছি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহকর্মী বন্ধুগণ এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে যে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন সেজন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্রা-আসরে এ-গ্রন্থের কয়েকটি অংশ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। আসরের সভ্যবৃন্দ নানাপ্রকার মতামত প্রকাশ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিও ঋণ স্বীকার করিতেছি। পরিশেষে আমার যে সব প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এ-গ্রন্থ রচনায় আমাকে নিরন্তর তাগিদ দিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আমার প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি--

বিনীত নিবেদক

**অজিতকুমার ঘোষ**

# প্রকাশকের নিবেদন

শিল্পীসংস্থা ইতিমধ্যে একটি বিশিষ্ট সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করিয়াছে। শিল্পীসংস্থার নানান কর্মসূচীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকে চির জাগরূক করিয়া রাখা এবং তাঁহার সাহিত্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশ বিদেশের পাঠকের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া অন্যতম।

শরৎ সাহিত্যের অনুবাদ পর্যায়ের কাজে সংস্থা পথের দাবী, গৃহদাহ এবং দত্তার ইংরাজী এবং পথের দাবীর ওড়িয়া অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ইহা ছাড়া শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী, টুকরো কথা এবং ইংরাজীতে Sarat Chandra Chatterjee প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলি শরৎ-অনুরাগী পাঠকসমাজের কাছে সমাদৃত হইয়াছে—ইহাই আমাদের পরম তৃপ্তি।

শিল্পীসংস্থা কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নহে। সংস্থা শরৎ-সাহিত্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানন্দপুরে শরৎ ইনষ্টিটিউট্ স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে। শিল্পীসংস্থার সদস্যদের উদ্যম যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং শরৎ-অনুরাগী পাঠক সমাজের অকৃপণ সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত হইতে থাকে তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পীসংস্থার শরৎ ইনষ্টিটিউটের সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত হইবেই—এ বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নাই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিল্পীসংস্থা একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে। নাম শরৎ সাহিত্য সংগ্রহশালা। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত আলোচনাগ্রন্থ, অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাস, সামান্য কিছু পাণ্ডুলিপি—সংগ্রহশালার আপাতঃ সম্পদ।

প্রতি বছর ভাদ্রমাসে সংস্থা আয়োজিত শরৎসাহিত্য সম্মেলনে আগত সুধীবৃন্দ এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এবং বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীনরেন দেব, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিল্পীসংস্থাকে পরামর্শ দেন।

শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্যাবৃত। তাঁহার জীবনের বহুলাংশ কাটিয়াছে বাঙলার বাহিরে সুদূর বার্মায়। তাঁর প্রবাস জীবনের অনেক কথাই বাঙলার পাঠক কুলের কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। শিল্পীসংস্থার প্রকাশনী তালিকায় ছিল শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবনী রচনা করা।

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ সমকালীন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ সমালোচক। ডক্টর ঘোষ সাহিত্যভারতীর একজন একনিষ্ঠ সেবক এবং শরৎচন্দ্রের অনুরাগী হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত। এই সুবাদে "শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার" গ্রন্থটি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমরা ডক্টর ঘোষকে অনুরোধ করি। আমাদের অনুরোধে তিনি সানন্দে এই বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

অন্যান্য বিখ্যাত মনীষীদের মতন শরৎচন্দ্র কোনও রোজনামচা লিখিয়া যান নাই কিংবা কোনও আত্মস্মৃতিও রচনা করেন নাই। স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের প্রামাণ্য জীবনী রচনা করিতে গিয়া গত কয়েক বৎসর যাবত ডক্টর ঘোষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার এতদিনের নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার'। বাংলাদেশের পাঠক সমাজের কাছে এই গ্রন্থ আদৃত হইলে লেখকের শ্রমের সার্থকতা এবং শিল্পীসংস্থার পরিতৃপ্তি।

# সূচীপত্র

## প্রথম পর্ব

### দেবানন্দপুর-ভাগলপুর



## দ্বিতীয় পর্ব

### ব্রহ্মদেশ

## তৃতীয় পর্ব

### হাওড়া-শিবপুর



## চতুর্থ পর্ব

### সামতাবেড়-কলিকাতা



### পরিশিষ্ট

# শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার

হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র (ইং ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর) শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবানন্দপুর প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম ছিল।[1] এই দেবানন্দপুর গ্রামেই ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর, রামরাম দত্ত মুন্সীর বাড়িতে অবস্থান করিয়া পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র এই গ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতের নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥

দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের মাত্র অল্প কয়েকটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই গ্রামের সঙ্গে তাঁহার আর কোন যোগ ছিল না। কিন্তু তবুও এই গ্রাম ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলের বহু স্থান, নদনদী, পথঘাট ও প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। 'বিরাজ বৌ'-এর নীলাম্বর ও পীতাম্বরের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে। দেবানন্দপুর গ্রামের সরস্বতী নদীর বর্ণনা রহিয়াছে এই উপন্যাসে, যথা, 'আজ একবার এই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ, ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদু

---

১। 'হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম বর্তমানে একটি নগণ্য স্থান হইলেও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান সহর এবং একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। সুদূর অতীতকালে বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামারপাড়া, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর ও ত্রিশবিঘা এই সাতটি স্থানে সপ্তঋষি তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহা সপ্তগ্রাম বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ইহা হিন্দুগণের নিকট একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া যে পরিচিত হয় তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; দেবানন্দপুর সেই সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম।'

হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র (১ম সং), পৃঃ ৩১৮

প্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে।' 'বিরাজ বৌ' লিখিবার সময় শরৎচন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মদেশে। সুদূর ব্রহ্মদেশে থাকিয়াও তিনি সপ্তগ্রাম ও সরস্বতী নদীর কথা ভোলেন নাই! এই সরস্বতী নদীর পুনরায় উল্লেখ দেখি 'দত্তা' উপন্যাসে। নরেন ইহারই তীরে বসিয়া পুঁটিমাছ ধরিয়াছিল।[১]

শরৎচন্দ্র ভাগলপুর হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের উল্লেখ রহিয়াছে 'দত্তা' উপন্যাসে, গ্রাম হইতে বাহির হইয়া স্কুলে যাইবার পথে সকলে মুড়া অশথতলা নামে একটি জায়গায় সমবেত হইতেন। এই জায়গাটিই 'দত্তা' উপন্যাসে ন্যাড়া বটতলা নামে অভিহিত হইয়াছে। ছেলেবেলায় নদী পার হইয়া তিনি কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ায় প্রায়ই যাইতেন। এই আখড়াই 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে মুরারিপুরের আখড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে। শুধু কেবল নিজের গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নহে, হুগলী জেলার নানা স্থান শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবদাসের বাড়ি ছিল হুগলী জেলায়, পার্বতীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সে ঐ জেলার পাণ্ডুয়া স্টেশনে নামিয়া পড়িয়াছিল। ভাগলপুরে থাকিয়া 'দেবদাস' লিখিবার সময় শরৎচন্দ্রের নিজের গ্রামের কথাই বেশি মনে পড়িয়াছিল। হুগলীর হাসপাতালের উল্লেখ রহিয়াছে 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে। কাঠাগোড়ের বসু-মল্লিক পরিবারের উল্লেখ রহিয়াছে 'শ্রীকান্ত' (৩য় পর্ব) উপন্যাসে, যথা, 'এমনই বসু-মল্লিকদের গোপাল-মন্দির হইতে আরতির কাঁসর-ঘণ্টার রব অস্পষ্ট হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।' 'বিরাজ বৌ' ও 'দত্তা'র মধ্যে তারকেশ্বরের কাহিনীর কিছুটা অংশ বর্ণিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র একমাত্র বিরূপ ছিলেন বোধহয় হরিপাল গ্রামের উপর। 'অরক্ষণীয়া' গল্পে অতুলের মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন, 'সকালে মেজমাসিমা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করবেন। আর শেষ দেখাটা একবার দেখতে আসব না? হরিপাল! অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার ডিপো।'

১। এই সরস্বতী নদী সম্বন্ধে 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' রহিয়াছে 'পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান স্রোত সরস্বতী নদী দিয়া প্রবাহিত হইত, সেইজন্য এই নদী খুব বিপুলকায়া ও বেগবতী ছিল। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের পর ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, সরস্বতীর জলপ্রবাহ ভাগীরথীকে আশ্রয় করিল এবং তাহার ফল স্বরূপ এই নদী ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল।'

—পৃঃ ৫২

শরৎচন্দ্রের জন্ম দেবানন্দপুরে হইলেও এই গ্রামটি কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল না। তাঁহার পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় পৈতৃক বাসভূমি কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্তী মামুদপুর হইতে দেবানন্দপুরে আসিয়া মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। মতিলালের পিতা অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদারের সঙ্গে বিরোধ করিয়া তিনি গৃহত্যাগী হইতে বাধ্য হন। অবশেষে একদিন তাঁহার ক্ষতবিক্ষত দেহ স্নানের ঘাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মতিলালের বিধবা মাতার পক্ষে ছেলেকে মানুষ করিয়া তোলার কোনই সাধ্য ছিল না।

মতিলালের মাতা নিরুপায় হইয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দেবানন্দপুরে চলিয়া আসেন। মতিলাল ছেলেবেলায় এই মামাবাড়িতেই মানুষ হইয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার পিতৃভূমি মামুদপুরে আর ফিরিয়া যান নাই। মামারা তাঁহাদের বাড়ির সংলগ্ন চার কাঠা জমি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সেই জমিতে তিনি দুইটি ঘরবিশিষ্ট দক্ষিণদ্বারী একতলা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মতিলাল অল্প বয়সে হালিসহরনিবাসী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। রামধনের পাঁচ পুত্র, কেদারনাথ, দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথ। কেদারনাথের দুই পুত্র, ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। দীননাথের দুই পুত্র, তারাপ্রসন্ন ও নবীনচন্দ্র। মহেন্দ্রনাথের তিন পুত্র, লালমোহন, রমণীমোহন ও উপেন্দ্রনাথ। অমরনাথের এক পুত্র, দেবেন্দ্রনাথ এবং অঘোরনাথের ছয় পুত্র, মণীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের নিজের মামা দুইজন, ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। সম্পর্কীয় মামাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কেদারনাথ পড়াশুনার জন্য জামাতা মতিলালকে দেবানন্দপুর হইতে ভাগলপুরে লইয়া আসিলেন। কেদারনাথের পিতা রামধন ইংরেজী ১৮১৭-১৮ সালে হালিসহর হইতে ভাগলপুর গিয়াছিলেন।

সেকালে ভাগলপুর বাঙালীদের পক্ষে পরম আকর্ষণীয় স্থান ছিল। সেখানকার জলবায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর ছিল, প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল রমণীয়। ভোজনবিলাসী বাঙালীদের পক্ষে ঐ জায়গায় অতিশয় সস্তা ও পর্যাপ্ত ভোজ্যবস্তু রুচিকর ও লোভনীয় ছিল। এ-সব কারণে যে সব বাঙালী একবার ভাগলপুরে

আসিতেন তাঁহারা আর দেশে ফিরিতে পারিতেন না। গাঙ্গুলীরাও বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও আর রোগজীর্ণ, অভাবপীড়িত হালিসহরে ফিরিতে পারেন নাই। ভাগলপুরেই স্থায়ীভাবে রহিয়া গেলেন।

গাঙ্গুলী পরিবার যেমন একদিকে পারিবারিক একান্নবর্তিতার আদর্শ স্থান ছিল অন্যদিকে তেমনি বহু বিধিনিষেধ ও কঠোর শাসনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার পীঠস্থান ছিল এখানে। মতিলাল ছিলেন মুক্ত, আত্মভোলা ও বাঁধনছেড়া মানুষ। গাঙ্গুলীবাড়ির কঠোর নিয়মকানুনের পিঞ্জরের মধ্যে তিনি নিরুপায় পোষমানা পাখীর মত ছিলেন, কিন্তু সেই পাখীর অশান্ত ডানা দুইটি মুক্তির আকাশে উড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। গাঙ্গুলীবাড়ির কড়া শাসনের মূর্তিমান প্রতিবাদ ছিলেন মতিলাল। সেজন্য বাড়ির ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার কাছে অবাধ প্রশ্রয় ও অপরিমিত আদর লাভ করিত। পিতার এই অফুরন্ত স্নেহরসে শরৎচন্দ্রের হৃদয় সঞ্জীবিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'এখন বুঝিতে পারি, শাসনের প্রচণ্ড উত্তাপে শরতের হৃদয়রসটুকু নিঃশেষে শুকাইয়া যায় নাই কেন। পিতার অপরিসীম স্নেহের গোমুখী তাহার জীবনধারার প্রারম্ভে লোকচক্ষুর অন্তরালে মৃতসঞ্জীবনীর মতই কাজ করিয়াছিল।'[১]

মতিলাল জীবনের গুরুত্ব ও গভীরতা এড়াইয়া চলিয়া চাহিতেন। লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতই বাস্তব মাটির স্পর্শ হইতে ঊর্ধ্বে কাব্য ও কল্পনালোকেই তিনি উড়িয়া যাইতে চাহিতেন। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, 'মতিলাল সৌখীন ছিলেন। তাঁর মনে কাব্য ছিল, কল্পনা ছিল, কিন্তু সবার চেয়ে বড় ছিল নিষ্ক্রিয় নিশ্চিন্ততায় জীবনটাকে অনায়াসে বয়ে যেতে দেওয়ার মরিয়া সাহস আর ঢালাও আমিরি। যেসব খেয়ালী স্বপ্নের কুঁড়িগুলি অভাব আর টানাটানির প্রতিকূলতায় ফুটে উঠতে পায়নি সেদিন, চিরদিনের জন্যে তারা কিন্তু নষ্টও হয়ে যায়নি। একদিনের অতৃপ্তি অন্য দিনের সুবর্ণ সুযোগের প্রতীক্ষা-ধ্যান—নিদ্রায় দিন কাটানো মাত্র।'[২]

দুঃখ ও লাঞ্ছনার উষ্ণ শ্বাসেও মতিলালের স্বপ্ন ও কল্পনার ফুলগুলি ঝরিয়া যায় নাই। সেগুলি লইয়া তিনি তাঁহার সাহিত্যের উদ্যানটি সাজাইতে বসিতেন। সেই সাজাইবার কাজে কোন সযত্ন কৌশল ও নিরবচ্ছিন্ন

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক—পৃঃ ৪৬
২। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ২৯-৩০

প্রয়াসের সাক্ষ্য মিলিত না, শুধু কেবল খেয়ালখুশি ও শিথিল হাতের ছাপই তাহাতে ফুটিয়া উঠিত। পুনরায় সুরেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত হইল—'কর্মে শিথিল স্বপ্নবিলাসী মতিলালের মত মানুষের স্থানই যে সংসারের সকল কিছু উর্ধ্বে এই প্রতীতিই ছিল দৃঢ়বদ্ধমূল। ভাব-রাজ্যে বিচরণ করতে করতে দৈনন্দিন খেইগুলো এলোমেলো হয়ে যেত। আবার কোথাও-বা গিঁট বেঁধে জোট পাকিয়ে যেত। দুঃখদৈন্য ছিল তাঁর আজীবন সহচর। তাদের হয়ত পছন্দও করতেন না কোনদিন। কিন্তু তাদের ভয় করে ভালো ছেলে হয়ে যাবার মত ভীতুও ছিলেন না মতিলাল। এসব ভুলে যাবার জন্য মন ছুটতো বইয়ের দিকে, আবার নেশার আঁদাড় পাঁদাড়েও। দিনের বেশি সময় কেটে যেত বই নিয়ে। লেখকের অক্ষমতায় ব্যথিত হয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন নিজের বই লেখার সংকল্পে। তখন কালি-কলমের খোঁজ হত; হয়তো কাগজ আছে তো কালি গেছে শুকিয়ে—আবার দুই থাকলেও মনের মধ্যে উঁকি মেরে গেল একটা জুৎমত ক'রে তামাক খেয়ে নিয়ে কাজটি সুরু করে দেওয়ার খেয়াল। কোথায় চাকর, কোথায় গড়গড়া। পকেট বাজিয়ে দেখলেন। কিছু রেস্ত আছে কি না; থাকলে তখনি চল্লেন তামাক কিনতে; আবার তামাকের দোকানে বসেই দিনটা বুঝি-বা কেটেই গেল।'[১]

শরৎচন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে অস্থির ও উদাসীন প্রকৃতি এবং সাহিত্যানুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদের টমসন-লিখিত ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের আত্মবিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, '**From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost, but I remember pouring over those incomplete mss.**

১। ঐ, পৃঃ ২৮-২৯

over and over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion, if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen.'

মতিলাল ভাগলপুরে স্থানীয় এইচ. ই. স্কুলে এনট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে তিনি তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি পাটনা কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেদারনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথ মতিলালের সমবয়সী ও সতীর্থ ছিলেন। তিনিও পাটনা কলেজে পড়িতেন। পাটনায় পড়িবার সময় উভয়ে একই মেসে থাকিতেন। অঘোরনাথ সত্যনিষ্ঠ, মুক্তহৃদয় এবং অতিশয় স্পষ্টভাষী ছিলেন। মতিলাল অঘোরনাথের সমবয়সী ও সতীর্থ হওয়া সত্ত্বেও সেজন্য তাঁহার নিকট সান্নিধ্যে আসিতে সাহস করেন নাই, যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখিয়াই চলিতেন।

মতিলালের খেয়ালী ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবন নোঙরহীন নৌকার মতই অকূলে ভাসিয়া যাইত, যদি না তাঁহার সহধর্মিণী ভুবনমোহিনী প্রেম ও মাধুর্যের রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে সংসারের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'হয়তো মতিলাল দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে পারতেন না, যদি না ভুবনমোহিনীর মত সঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী পেতেন। সরস কোমল হৃদয়ের অসীম মাধুর্যরসের উত্তপ্ত ভালবাসার উর্বর ভূমির উপর তাঁর পতিভক্তির মহাক্রমটি ছিল হিঁদুয়ানির আদর্শের নিগড়ে একান্ত দৃঢ়বিধৃত। তার মেদুর ছায়ার তলে এই যাযাবর মানুষটি গেড়েছিলেন তাঁর আসন। মতিলালের ছন্নছাড়া জীবনটিকে ভুবনমোহিনী আমরণ কেমন করে তাঁর প্রেমভক্তির অঞ্চলে আবদ্ধ রেখেছিলেন সে কথাও পরে আপনিই এসে পড়বে।'[১]

শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনীর রূপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ ও বশীভূত ছিল। দক্ষরাজকন্যা সতীর মতই তিনি তাঁহার রিক্ত ও ভোলানাথ স্বামীর প্রতি অবিচল প্রেম ও শ্রদ্ধায় অনুগত ছিলেন। কখনও তাঁহার মুখে অভিমান ও অভিযোগের লেশমাত্র ছাপ ছিল না। সংসারের সকলের সেবা ও যত্নে তিনি নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, নিজের কথা ভাবিবার

১। শরৎ পরিচয়

সময় তাঁহার মোটেই ছিল না। তাঁহার কর্মকুশলতায় সুবৃহৎ সংসারটি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারিত। যেখানে কোনো অভাব হইত সেখানে তাঁহার প্রসন্ন দাক্ষিণ্য বর্ষিত হইত, যেখানে কোনো প্রয়োজন হইত সেখানেই তাঁহার সাহায্যরত হস্তটি প্রসারিত হইত। নিজের গুণে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়, সকলের একমাত্র নির্ভরস্থল। তিনি সত্যই ছিলেন ভুবনমোহিনী।

ভুবনমোহিনী তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী এবং দুর্দান্ত পুত্রকে সামলাইতে যে কতখানি বেগ পাইতেন তাহা একমাত্র তিনিই জানিতেন। তিনি শাসন জানিতেন না, তাঁহার সম্বল ছিল স্নেহের বাঁধন। সেই বাঁধন যেদিন ছিঁড়িল সেদিন পিতা ও পুত্র কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে মতিলাল তাঁহার চিরজীবনের পরম শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, তবে বেশিদিন তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর বিরহ বেদনা সহ্য করিতে হয় নাই। কিছুকাল পরেই মতিলাল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্যই বোধহয় পরলোক যাত্রা করেন। শরৎচন্দ্র মাকে হারাইয়া ছন্নছাড়া জীবনের পথে নিজেকে চালিত করিলেন বটে, কিন্তু মাকে তিনি ভুলিলেন না। এই স্নেহময়ী, কোমলহৃদয়া জননীর স্মৃতি তাঁহার মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি বহুতর মাতৃচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তখন এই স্মৃতির আলোকস্পর্শে সেই চরিত্রগুলি এত উজ্জ্বল ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা হইলেন অনিলা দেবী। হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইহার বিবাহ হইয়াছিল। এই অনিলা দেবীর ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র তাঁহার কয়েকটি লেখা প্রকাশ করেন, সেজন্য শরৎসাহিত্যে এই নামটি স্মরণীয় হইয়া আছে। অনিলাদেবীর পরে ভুবনমোহিনীর একটি পুত্রসন্তান হইয়া মারা যায়, সে কারণে সংস্কারবশে তাঁহাকে দেবানন্দপুরে পাঠান হয়। সেখানেই শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন। শরৎচন্দ্রের পরে ভুবনমোহিনীর আর একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়া মারা যায়। ভুবনমোহিনীর চতুর্থপুত্র প্রভাসচন্দ্র শরৎচন্দ্রের প্রায় বার বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রভাসচন্দ্র পরে রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হইয়া যোগ দিয়াছিল। তখন তাহার নাম হইল স্বামী বেদানন্দ। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের প্রায় কুড়ি বছরের ছোট ছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্র

মুঙ্গেরের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কন্যা কনকলতার সহিত প্রকাশচন্দ্রের বিবাহ দেন। শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম ছিল সুশীলা, ওরফে মুনিয়া। আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ী রামকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মুনিয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন।

## দেবানন্দপুরে শৈশবলীলা

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার ডাক নাম ছিল ন্যাড়া অথবা ল্যাড়া। শৈশবে একবার তাঁহার মাথায় ফোড়া ও ঘা হয়। ফলে তাঁহার মাথার অনেক চুল উঠিয়া যায়। পিতামহী তাঁহাকে আদর করিয়া ন্যাড়া বলিয়া ডাকিতেন। বন্ধুবান্ধব অনেকের কাছেই তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিবার পর মায়ের কথায় তিনি একবার তারকেশ্বরে যাইয়া ন্যাড়া হইয়া আসেন। এই নাম সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন, 'জন্মকালে বোধ হয় তার মাথায় চুল খুব কম ছিল বলে ঐ নামে ডাকা হ'ত। কিন্তু দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়ি আসার পর তার ন্যাড়া নাম খুব বেশি চলেনি। শরতের পিতা মতিদাদা আর মাতা আমাদের সেজদিদি শরৎকে ন্যাড়া ব'লে ডাকতেন ; কিন্তু কখনো-সখনো। কতকটা সখ ক'রে এক-আধজন ছাড়া আর বড় কেউ ও-নামে ডাকত না। এমনকি শেষাশেষি মতিদাদা এবং সেজদিদিও ন্যাড়া ও শরৎ দুই নামেই মিলিয়ে মিশিয়ে ডাকা আরম্ভ করেছিলেন, তা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু কি জানি কেন, মতিদাদার মুখে শুনেই বোধকরি, আদমপুর ক্লাবে শরতের ন্যাড়া নাম প্রায় ষোল আনা চলিত হয়ে গিয়েছিল।'[১] আদমপুর ক্লাবের সদস্যরা শরৎচন্দ্রকে ন্যাড়ার পরিবর্তে ল্যাড়া বলিয়া ডাকিতেন। এই ল্যাড়া শব্দটিকেই শরৎচন্দ্র ইউরোপীয় ছাঁচে Lara-য় দাঁড় করাইয়াছিলেন। 'তখনকার দিনের অনেক কাগজপত্রে, অনেক খাতায়, বইয়ে শরৎচন্দ্র নিজের নাম সই করতেন, St. C. Lara। আমরা বুঝতাম তার অর্থ, শরৎচন্দ্র ল্যাড়া ; কিন্তু কোনো অজানা লোক আচমকা দেখে যদি মনে করত, হল্যাণ্ড কিংবা বেলজিয়াম দেশীয় সেন্ট ক্রিস্টোফার জাত

১। স্মৃতিকথা (খ)—পৃঃ ৪৪

নামক কোনো সাধু মহাপুরুষ ঐভাবে নিজের নাম দস্তখৎ করেছেন, তাহ'লে তাকে দোষ দেওয়া চলত না।'[১]

শরৎচন্দ্রের বাল্যকাল কোথায় কতদিন অতিক্রান্ত হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক ও ঘনিষ্ঠ লোকেদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র জন্মের দুই-তিন বৎসর পরেই ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন এবং নয় বৎসর সেখানে ছিলেন। ভাগলপুরেই তাঁহার লেখাপড়া শুরু হয়, তারপর তিনি দেবানন্দপুর যাইয়া তিন বৎসর ছিলেন এবং তারপর পুনরায় ভাগলপুরে ফিরিয়া রেঙ্গুনে যাইবার আগে পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ে সেখানেই ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, 'ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া আরম্ভ হয়। বিদ্যাসাগর মশাইএর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ থেকে, হাতের দেখে লেখার একখানি খাতা তাঁর এখনও আছে। অঘোরনাথ নিজে না গাইতে পারলেও তাঁর গানের সখ ছিল এবং তাঁর গানের সংগ্রহের খাতাও আজ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। সেই খাতাখানির পাতায় শরৎচন্দ্র লেখা মকস করতেন।···এই লেখাটি অনুমান, শরতের পাঁচ বছর বয়সের। সেই সময় ছোট গিন্নীর ঘরখানি, এবাড়ির শিশু-বিদ্যালয়ের মতই ছিল। তিনি নিজে অবসর সময়ে পড়াশুনা করতেন এবং দুপুরে বাড়ির ছেলেমেয়েদের তাঁর ঘরে গাঁদি লাগত। মণিশরতের পড়াশুনোর আদিপর্ব কুসুম কামিনীর কাছেই সুরু হয়। পড়া শুধু বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ বোধোদয়ে শেষ হয়নি ··· ।[২]

সুরেন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত লেখা হইতে জানিতে পারা যায় যে, শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া ভাগলপুরেই আরম্ভ হয় এবং অন্তত পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ভাগলপুরেই ছিলেন। কিন্তু দেবানন্দপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সীর উক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৩] তিনি লিখিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষালাভ হইয়াছিল দেবানন্দপুরে। তিনি কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাও দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্র দেবও তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের শিক্ষালাভের কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন, ভাগলপুরে তাঁহার শিক্ষারম্ভের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবু

১। ঐ—পৃঃ ৫৭
২। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৪২-৪৩
৩। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

বলিয়াছেন যে, মতিলাল যখন ডিহরীতে কাজ পাইয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার পরিবারের সকলকে ডিহরীতে লইয়া যান (শরৎচন্দ্রের বয়স তখন আট বছর) এবং ডিহরী হইতে দুই বছর পরে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্র দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলে ভর্তি হন। আট বছর বয়স পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কোথায় কত দিন ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা কোথায় আরম্ভ হইয়াছিল এ-সব বিষয়ে যে নির্ভরযোগ্য লোকেদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে তাহা দেখা গেল। আমার মনে হয়, সুরেন্দ্রনাথ যে রকম প্রমাণ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হয় যে, শরৎচন্দ্র জন্মের কয়েক বছর পরেই (২।৩ বছর?) ভাগলপুরে গিয়াছিলেন, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করিবার পর (৫।৬ বছর বয়সে?) পুনরায় দেবানন্দপুর যান। সেখানে প্যারী পণ্ডিত ও সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পর আট বছব বয়সে ডিহরীতে যান এবং দুই বছর পরে ডিহরী হইতে ভাগলপুরে যাইয়া ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী জীবন ও শিক্ষাধারা লইয়া আর কোন মতভেদ হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির; তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্তী প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে; একটি প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটি বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্রছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র 'কাশীনাথ' তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য মাষ্টার মহাশয়ের বাঙ্‌লা স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল পড়েন।'[১]

পাঠশালায় পড়িবার সময় ঐ পাঠশালারই একটি ছাত্রীর সহিত শরৎচন্দ্রের গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সেই প্রিয় বাল্যসঙ্গিনীর কথা উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখিয়াছেন, 'দেবানন্দপুরের আর একটি কায়স্থ

১। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র—ভারতবর্ষ, ১৩৪৪

পরিবারের সহিত তিনি প্রায়ই দাবা খেলিতেন। এই ছেলেটির কনিষ্ঠা ভগিনী —শরৎচন্দ্র যে-সময়ে পাঠশালায় পড়িতেন, সেই সময়ে—ঐ পাঠশালায়ই ছাত্রী ছিলেন এবং তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্বদাই সঙ্গিনীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন—দুইজনের ভাবও ছিল যত, ঝগড়াও হইত তত। নদীর বা পুকুরের ধারে ছিপ লইয়া মাছধরা, ডোঙা বা নৌকা নিয়া নদীবক্ষে বেড়ানো, বৈঁচিফুল পাড়িয়া মালা গাঁথা, বাগান থেকে গোপনে ফল সংগ্রহ করা, ঘুড়ির সুতা মাঞ্জা দেওয়া ও ঘুড়ি তৈরী করা, বনজঙ্গলে বেড়ানো প্রভৃতি সকল রকম বালক সুলভ চাপল্যের কাজে এই মেয়েটিই ছিল শরৎচন্দ্রের সহচারিণী। এ-কারণেই বোধহয় শৈশব সঙ্গিনীর প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নারী-চরিত্রে চিত্রিত হইয়াছিল।'[১] এই বাল্যসঙ্গিনী সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব লিখিয়াছেন, 'দেবানন্দপুর ছেড়ে চ'লে আসবার পর তাঁর এই শৈশবসঙ্গিনীর সঙ্গে জীবনে আর কখনো সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা জানা যায় নি। তবে, উত্তরকালে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট একাধিক নারী-চরিত্রের উপর এই ছোট্ট মেয়েটির অদ্ভুত চরিত্রের সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছিল দেখা যায়। শরৎচন্দ্র এই মেয়েটিকে জীবনে ভুলতে পারেন নি। কে জানে এই মেয়েটিই পরে দেবদাসের পার্বতী বা পারু, অথবা শ্রীকান্তের পিয়ারী বাঈজী বা রাজলক্ষ্মী হ'য়ে উঠেছিল কিনা!'[২]

ছোটবেলায় শরৎচন্দ্র অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে গ্রামের অধিবাসী ও পাঠশালার গুরুমহাশয় ও ছাত্ররা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। একদিন পাঠশালার গুরুমহাশয় ধূমপানের আগে কলকেয় তামাক ও টিকা সাজাইয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে যান। শরৎচন্দ্র সেই ফাঁকে কলকের তামাক ফেলিয়া তামাকের বদলে ছোট ছোট ইটের টুকরা রাখিয়া দেন। গুরুমহাশয় ফিরিয়া আসিয়া টিকা ধরাইয়া কলকে হুঁকায় বসাইয়া খুব টানিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধোঁয়া বাহির হইল না। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তিনি কলকে উপুড় করিয়া ঢালিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, তামাকের বদলে ইটের টুকরা। গুরুমহাশয় রাগে অগ্নিশর্মামূর্তি ধারণ করিলেন। একজন ছাত্র তখন ভয়ে ভয়ে ন্যাড়ার নাম বলিয়া দেন। গুরুমহাশয় বেতহাতে তাড়া করিয়া আসিলেন, কিন্তু ন্যাড়া ততক্ষণে ঐ ছাত্রটিকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া

১। ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৪৪
২। শরৎচন্দ্র—পৃঃ ৮

গুরুমহাশয়ের নাগালের অনেক বাহিরে। শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখিয়াছেন, 'দেশে থাকতে অর্থাৎ দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র যখন পাঠশালায় এক একদিন এক এক কাণ্ড বাধিয়ে আসতেন, তাঁর জননী হতাশ হ'য়ে পড়তেন। তাঁর মনে সংশয় আসতো যে, এ ছেলে কি আর মানুষ হবে? তাঁর শাশুড়ী, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের পিতামহী, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—বৌমা, আমি বলছি, তুমি দেখো, তোমার এ ছেলের মতিগতি একদিন ফিরবে, ও দশের মধ্যে একজন বলে গণ্য হবে।'[১]

ছোটবেলায় শরৎচন্দ্র একবার ঠ্যাঙাড়ের হাতে পড়িয়াছিলেন। প্রতিবেশী লাঠিয়াল নয়ন সর্দার বসন্তপুরে গরু কিনিতে যাইতেছিল, শরৎচন্দ্র চুপি চুপি তাহার সঙ্গ লইলেন। নয়ন তাহাকে দেখিয়া প্রথমে রাগ করিল বটে কিন্তু অবশেষে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইল। ফিরিবার সময় রাত হইয়া গেল। নয়ন যে ভয় করিতেছিল তাহাই ঘটিল, তাহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়িল। অবশ্য নয়ন সে-যাত্রা সাহস ও শক্তির জোরে শরৎচন্দ্রকে বাঁচাইয়া আনিল।[২]

মতিলাল শোণের উপর ডিহরীতে একটি কাজ পাইলেন। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন আটবছর। ডিহরীতে মতিলালের চাকরী দুই বছর স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তিনি পুনরায় সপরিবারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলেন। বালক বয়সে মাত্র দুই বছর ডিহরীতে ছিলেন বটে, কিন্তু তবুও শরৎচন্দ্র এই জায়গাটির স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের শেষ পর্ব এই ডিহরীতেই ঘটিয়াছে। ১৪. ৮ ১৯ তারিখে বাজে শিবপুর হইতে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 'ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি তখন আমি ওই ডিহরীতে ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ফাঁস ক'রে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কত কালের কথা। তখন রেল হয়নি, ছোট ষ্টিমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ডান হাতি সূর্য ওঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতী চওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেছি। কি জানি সে-ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কিনা।'

১। শরৎচন্দ্র—পৃঃ ১৩
২। ঐ—পৃঃ ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য।

## ভাগলপুরে বিদ্যাশিক্ষা ও খেলাধুলা

ডিহরী হইতে ভাগলপুর আসিবার পর শরৎচন্দ্রকে স্থানীয় দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুলের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার সমবয়সী সতীর্থ ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মামা সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্রনাথ। তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার সরস চিত্র আঁকিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ, 'মামা ভাগ্নেকে তালিম দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত হ'লেন অক্ষয় পণ্ডিত মশাই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রণাম নিবেদন ক'রে বলতেই হচ্ছে যে পণ্ডিত মশাইটি ছিলেন যমরাজের দোসরকল্প। চোখ দুটি বৃত্তাকার, আলুচেরা। মুখে এক মুখ দাড়ি-গোঁফ। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। এবং মেঘ গর্জনের মত কণ্ঠস্বর। জলদ গাম্ভীর্যের বদলে, বাঁশ ফাড়ার কর্কশতা। পণ্ডিত মশাই নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর খুব বড় রকমের আস্থা রাখতেন না। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল নিজের বাহুবলের ওপর। আর শিশুসূদন বিদ্যায়।......

'পণ্ডিত মশাইয়ের হাতযশ ছিল। তিনি ছেলেদের বুদ্ধির ফলার ধার তোলার ওস্তাদ ছিলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করতেন অবাধ এবং দুর্বিবহ ধনঞ্জয়ের সাহায্যে! তাঁর 'রামচিমটির' ভয়ে ছাত্র সম্প্রদায় কম্পমান হ'ত। পাঁজরার উপরের চামড়া খামচে ধরে তিনি ছাত্রবেচারীকে মাথার উপর তুলে দেখিয়ে দিতেন যে পরপারের পথ বড় বেশি দূরে নয়। সে দেখায় সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা বলে যে পর-পারের পথের দুধারের মাঠে সরষে ফুল ফুটে থাকে আর তার উপর কালো ভোমরা ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়ে!

'চিক ঘেরা বারান্দার কুটুরির মধ্যে মামা-ভাগ্নের অগ্নি-পরীক্ষা চলতো। বাইরে সঙ্গীর দল উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। মধ্যে মধ্যে সিংহ গর্জনের সঙ্গে করুণ কান্নার আওয়াজ যে শুনতে পাওয়া যেতো না, তা' নয়!

'সে যাইহোক—পণ্ডিত মশাই এর হাতযশে দু'জনেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।'[১]

যে স্কুলটিতে শরৎচন্দ্র ভর্তি হইয়াছিলেন তাহা স্বনামধন্য রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্কুলের

১। শরৎ-পরিচয়,

হেড পণ্ডিত ছিলেন অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য পণ্ডিতরা হইলেন শিবচন্দ্রের শ্যালক কান্তি পণ্ডিত, অক্ষয় পণ্ডিত ও হরি পণ্ডিত। স্কুলে একটি বড় ক্লকঘড়ি ছিল, সেটির দম দিবার ভার ছিল অক্ষয় পণ্ডিতের উপরে। চারটা বাজিবার বহু আগেই সেই ঘড়িতে চারটা বাজিয়া যাইত। একদিন ছেলেদের কারসাজি ধরা পড়িল। কিন্তু সকল নাটের গুরু যে ছিল সেই ক্লাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালোমানুষ সাজিয়া বসিয়া রহিল। বলাবাহুল্য, সেই তথাকথিত ভালোমানুষ ছাত্রটি স্বয়ং শরৎচন্দ্র। নির্দোষিতার নিখুঁত অভিনয় করিয়া সে বলিল, 'আমি এক মনে অঙ্ক কষছিলাম পণ্ডিত মশাই, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি কিচ্ছু জানিনে।'

তখনকার দিনে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করা ছিল সুকঠিন। পাটিগণিত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, শরীর পালন এবং সংস্কৃত ভাষা সব কিছুই শিখিতে হইত। ইংরেজীর অভাব অন্যান্য বহু বিষয়ের তত্ত্ববিস্তার দ্বারা বহুগুণে পূরণ করা হইত। 'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে সর্ববিদ্যাবিশারদ হ'য়ে শরৎচন্দ্রের যখন ইংরেজি স্কুলের তুচ্ছ রয়েল রিডার নম্বর দুই ছাড়া আর কিছুই পাঠ্য রইল না, তখনই হরিদাসের গুপ্তকথা জাতীয় অমূল্য সাহিত্য গ্রন্থগুলি অবশ্যপাঠ্য হয়ে দাঁড়াল সেদিনের নিতান্ত বেকার অবস্থায়।......আর মতিলালের কল্যাণে বটতলার বইগুলি আনাগোনা করতই এই বাড়িতে এবং সেগুলি চুরি ক'রে পড়ে নেওয়ার অবসর এবং চতুরতা যে শরৎচন্দ্রের ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।'[১]

ইংরেজি স্কুলে শরৎচন্দ্র পড়াশুনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। বছরের শেষে তিনি ক্লাসে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইলেন। ফলে তাঁহার চেলাচামুণ্ডার দল উল্লসিত হইল, বন্ধুবান্ধবরা তাঁহাকে সমীহ করিতে লাগিল এবং বড়রাও তাঁহার সম্বন্ধে বেশ আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। ক্লাসে বিশ্বেশ্বরবাবু নামে একজন মাষ্টার মহাশয় ছিলেন। তিনি এক ভয়ঙ্কর চাত্রদলন মাষ্টার ছিলেন, তাঁহার নামে ছাত্রদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইত। শরৎচন্দ্র তাঁহার মন ভিজাইবার জন্য ক্লাসে শান্ত শিষ্ট ভালোমানুষটি হইয়া থাকিতেন। অবসর সময়ে গোপনে সাহিত্যচর্চা শুরু করিলেও অধ্যয়নে তাঁহার যত্ন বিন্দুমাত্র শিথিল ছিল না। রবিবার দ্বিপ্রহরে ম্যাপ আঁকার খুব তোড়জোড় লাগিয়া যাইত, ছোটরা উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতা করিত।

১। ঐ, পৃঃ ৮৬-৮৭

হলুদ, শিম-পাতা, সিঁদুর, মাজেন্টা, নীলবড়ি আর বেগুনি রং প্রভৃতি জোগাড় হইত। অঘোরনাথের নক্সা আঁকার সাজসরঞ্জামও কিছু গোপনে সরাইয়া আনা হইত। 'মোটা পুরু কাগজের উপর সোমবারের সকালে যে ম্যাপখানি তৈরী হ'ত তা' দেখে ছেলের দল তো বিমুগ্ধ হতই এবং বিকেলে বিশ্বেশ্বররামের তেড়াবেঁকা হরপের লাল পেন্সিলে 'ভেরিগুড' দাগ হয়ে তা দেয়ালের গায়ে জায়গা পেয়ে শরতের কৃতিত্ব সে সপ্তাহের বিজয় ঘোষণা করত। এমনি করে বালক শরৎ সেই সময় ক্লাসের সর্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতি অটুট রেখেই পড়াশুনার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছিল।'[১]

গৃহে মামাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা অমর হইয়া আছে 'শ্রীকান্ত' ( ১ম পর্ব ) উপন্যাসে। সকালে কর্তাদের সম্মুখে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া তারস্বরে দোলায়িত দেহে পড়া চলিত। পরীক্ষার আগে ছাড়া গৃহশিক্ষক থাকিত না, অপেক্ষাকৃত বড়রাই মাঝে মাঝে শক্ত জায়গায় বলিয়া দিত। অবশ্য ইহাতে মাঝে মাঝে অজ্ঞতা বশত বড়রা যে কিছু কিছু ভুল শিখাইয়া দিত তাহাও সত্য। কেদারনাথ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেন। একের পর এক লোক আসিত, গল্পগুজব করিত। ছেলেদের মন পড়িয়া থাকিত সেদিকেই, পড়াশুনা কার্যত বেশি হইয়া উঠিত না। ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরের পড়াশুনার ভার থাকিত একজনের উপরে। শরৎচন্দ্র তাহাকে শ্রীকান্ত উপন্যাসে 'মেজদা' রূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

রাত্রিবেলায় চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে ফরাস বিছানায় শাদা চাদরের উপর বসিয়া ছেলেরা লেখাপড়া করিত। পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বলিত। বারান্দায় খাটিয়ার উপরে শুইয়া থাকিতেন কেদারনাথ। ছেলেদের পড়ার দিকে তিনি কান খাড়া করিয়া রাখিতেন। দাদামহাশয় কখনও বাহির হইয়া গেলে শরৎচন্দ্রের মুখে ইংরেজি ছড়া শুনা যাইত :

ক্যাট ইজ আউট,—
লেট মাইস প্লে·····

তখন সমবেত স্বরে শুরু হইয়া যাইত—

ডান্স লিটল বেবি ডান্স আপ হাই
নেভার মাইনড বেবি, মাদার ইজ নাই।

১। শরৎ-পরিচয়, পৃ. ৯৮

ক্রো এণ্ড কেপার কেপার এণ্ড ক্রো,—
দেয়ার লিটল বেবি দেয়ার ইউ গো
আপ টু দি সিলিং, ডাউন টু দি গ্রাউণ্ড
ব্যাকওয়ার্ডস এণ্ড ফরওয়ার্ডস
রাউণ্ড এণ্ড রাউণ্ড ॥
ডান্স লিটল বেবি, এণ্ড মাদার উইল সিং
মেরিলি মেরিলি ডিং ডিং ডিং ॥

একদিনকার ঘটনা। রাত্রি সাড়ে আটটা-নয়টা হইবে। কেদারনাথ বারান্দায় খাটিয়ার উপরে নিদ্রিত। ছেলেদের পড়ার ঘরে একটা চামচিকা ঢুকিতেই সোরগোল পড়িয়া গেল, শরৎ ও তাহার মণীন্দ্র মামা দুইটি বাকারি লইয়া চামচিকার পিছনে লাগিয়া গেল। চামচিকার কিছুই হইল না, কিন্তু বাকারির ঘায়ে রেড়ির তেলের প্রদীপ উলটাইল, আসল আসামী দুইজন নিমেষের মধ্যেই পলাতক, কিন্তু যত দোষ গিয়া পড়িল বেচারা দেবেন্দ্রের উপরে। সে এতক্ষণ তন্দ্রামগ্ন ছিল, কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন কি দুর্ভোগই না তাহার ঘটিল। কেদারনাথ নিষ্ঠুর হাতে এই নির্দোষ বালকটির কান মলিয়া তাহাকে আস্তাবলে পাঠাইয়া দিলেন। শরৎ ও মণীন্দ্র তখন শান্তশিষ্ট সাজিয়া খাইতে বসিয়াছে।

কিশোর শরতের চেহারা ছিল রোগা প্যাকাটে ধরনের। পা দুইটি ছিল সরু এবং ক্ষিপ্রগতি। তাঁহার বুদ্ধি ছিল শাণিত ও উজ্জ্বল কিন্তু তাহা নিত্যনূতন দুষ্টামি ও দৌরাত্ম্যের পথেই চালিত হইত। যেখানে কড়াকড়ির বাঁধন সেখানেই যেন তাঁহার উদ্ধত বিদ্রোহ ঘোষিত হইত। তিনি ছিলেন দুরন্ত ছেলেদের সর্দার। সদর হইতে অন্দরমহলে যাইবার দরজার সিঁড়িতে কোন অভিভাবকের খড়মের শব্দ হইলেই নিমেষের মধ্যে এই দলটি অদৃশ্য হইয়া যাইত। গলির দরজার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি পেয়ারা গাছ ছিল। গাছের পুষ্ট ও পক্ক পেয়ারাগুলি ছেলেদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল।

গোয়াল ঘরের পশ্চিম পাশে ছিল একটি ভাঁড়ার ঘর। তাহাতে নানা জিনিসপত্র থাকিত। আর ছিল বিড়াল, বেজি, ইঁদুর ও সাপের আড্ডা। চাকর মুশাইয়ের কোমর হইতে চাবি চুরি করিয়া ছেলের দল এই ঘরটিতে ঢুকিত। তখন তাহাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকিত না।

পাশেই ছিল একটি তুঁতের গাছ। শরৎ ও তাঁহার মণিমামা গোলাঘরের

ঢালু চালে বসিয়া তুঁত সংগ্রহ করিতেন। মাঝে মাঝে পা হড়কাইত। দুই একখানা খাপরা খসিয়া নীচে আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ ছেলেদের মুখে ও মাথায় পড়িত। তাহাতে রক্তপাত হইলেও ছেলেরা বিচলিত হইত না। ঘাস চিবাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দেওয়া কিংবা পেয়ারাবাঁধা ন্যাকড়া পুড়াইয়া গুঁজিয়া দেওয়া—এগুলি ছিল অব্যর্থ ঔষধ।

শরৎচন্দ্রের ছেলের দলের সঙ্গে মেয়েদের সহযোগিতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের উপর ফড়িং, পাখি, বিড়াল, বেজি, লাল-নীল মাছ প্রভৃতি পোষার ভার ছিল। ফড়িং পোষায় অঘোরনাথের বড় মেয়ে ছুনী শরৎচন্দ্রের কাছে খুব প্রশংসা পাইত। মামাবাড়িতে একটা বৃদ্ধ ও বিরস কোকিল ছিল, কুহুধ্বনিতে তাহার নিতান্তই আপত্তি ছিল। শরৎচন্দ্র কচি আমের পাতার ফরমায়েস দিলেন। চক্ষের পলকে আজ্ঞাবাহী ছেলের দল আমের পাতা জোগাড় করিয়া আনিল। কিন্তু কোকিলের পঞ্চম তান তবুও শোনা গেল না। ছেলেদের সর্দারটি আবার হুকুম দিলেন, কচি আম পাতার রস মরিচের গুঁড়া দিয়া পাখীটির গলায় ঢালিয়া দিতে। তাহাই করা হইল। পরদিন সকালে ছেলের দল পিকবরের মধুর কণ্ঠ শুনিবার জন্য খাঁচার কাছে ভিড় করিয়া আসিল। দেখা গেল, কোকিলটি বোধ হয় পরলোকের গান শুনাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছে। সর্দারজী তাঁহার 'ধন্বন্তরি রসায়ন' ব্যর্থ হইল দেখিয়া একেবারে চম্পট।

গঙ্গার জল কমিয়া গেলে অনেকখানি পাড় বাহির হইয়া পড়িত। সেখানে গাঙ্‌শালিখেরা গর্ত করিয়া বাসা বাঁধিত। গাঙ্‌শালিখের একটি ছানা ছেলেমেয়েরা ধরিয়া আনিয়া বাড়িতে পুষিতে আরম্ভ করিল। পাখীর ছানাটির উপর শরতের খুবই মায়া পড়িয়া গেল। কিন্তু একদিন কি করিয়া হুলো বিড়ালটি পাখীটিকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। বিষম রাগ করিয়া সর্দারজী বিড়ালমেধযজ্ঞের হুকুম দিয়া বসিলেন। কিন্তু শাস্তির ভার বোধ হয় স্বয়ং বিধাতাই নিলেন। ছোট কর্তার (অঘোরনাথ) হাতে দরজার একখানা কপাট চাপা পড়িয়া হুলো বিড়ালের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল।

বাড়িতে ছিল 'সংসার-কোষ' নামে বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের গ্রন্থ। সেই গ্রন্থ হইতে শরৎ ও তাহার মণিমামা অদ্ভুত অদ্ভুত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া ছেলেমেয়েদের তাক লাগাইয়া দিতেন। এই দুইজনের অনুসন্ধিৎসার কথা রহস্যচ্ছলে উল্লেখ করিয়া কুড়েমশাই লিখিয়াছেন, [illegible] নাকি [illegible]

ছিল বিজ্ঞান-মুখী, আর, তাঁর মণিমামার দর্শনমুখী সমন্বয়ের মধ্যে! তার মনের গতি ছিল ধীর, স্থির, গভীর বিশ্বাস-মন্থর ধ্যান তন্ময়তায় শান্ত সমাহিত। একজনের মধ্যে জ্ঞানের সুতীব্র ক্ষুধা আর অন্যজনের যেন সব পেয়ে যাওয়ার পরম পবিতৃপ্তি!'

'সংসার-কোষে' শরৎ দেখিলেন, বেলের শিকড় ফণাধরা সাপের মুখের কাছে ধরিলে সে নাকি মাথা নীচু করিয়া হীনবল হইয়া যায়। এই তথ্যটি পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সাপের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। একদিন সাপের দেখাও মিলিল। সাপ সতেজ মাথা তুলিয়া ফণা ধরিল। শরৎ তাহার মুখের কাছে বেলের শিকড়টি ধরিতেই ক্রুদ্ধ সর্পরাজ পর পর তিনবার ছোবল দিয়া আশে পাশে যাহাকে পায় তাহাকেই দংশন করিতে উদ্যত হইল। বেগতিক দেখিয়া উপর হইতে মণিমামা লাঠি চালাইয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিলেন।

মামাবাড়ির অভিভাবকরা শরৎচন্দ্রকে একটি শান্ত, নিয়মনিষ্ঠ মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বপ্রকার শাসনের বিরুদ্ধে তাহার ছিল এক উদ্ধত বিদ্রোহ। তাহার বেপরোয়া, শাসনছেঁড়া প্রকৃতি নিয়ত স্বাধীন খেয়াল খুশির পথেই চলিতে চাহিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, 'গাঙ্গুলিদের সাধু চেষ্টা ছিল শরৎকে একটি পোষমানা মানুষ তৈরী করে তোলা; কিন্তু শরতের মধ্যে তার নিজের বড় হবার মাল মসলা, উপকরণগুলো কিছুতেই ছোট হ'যে যেতে দিতে চায় নি তাকে। এবং সেই না-চাওয়ার পিছনে একটা নির্ভীক নির্বিকার বেপরওয়া অন্ধশক্তি ছিল যে কোন শাসনেই মুষড়ে পড়ত না।'

কুসঙ্গে পড়িয়া পাছে নষ্ট হইয়া যায় এই ভয়ে গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলেদের বাহিরের কাহারও সঙ্গে খেলা করিতে দেওয়া হইত না। ছেলেরা উঠানের মধ্যে গর্ত খুঁড়িয়া মার্বেল খেলিত। মার্বেলের জিৎ-গুল্লি খেলাতেই শরতের আসক্তি ছিল বেশি, যদিও এই খেলা বড়দের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। এই খেলা খেলিবার জন্য তিনি বাড়ি হইতে উধাও হইয়া যাইতেন। খিড়কি পথে গোপনে ফিরিয়া তিনি তাঁহার দলবলকে জেতা গুলিগুলো দান করিয়া দিতেন। কর্তাদের কথা না শোনাই ছিল একটা বাহাদুরি, নিজের দলের ছেলেদের কাছে সেই বাহাদুরি দেখাইবার লোভও একটা ছিল। একটা লিকপিকে ছেলে কর্তাদের কোর্ড়ও শাসন উপেক্ষা করিতেছে, ইহা দেখিয়া ছেলের দল তাহাদের সর্দারের প্রতি সম্ভ্রমে ভক্তিতে বিগলিত হইয়া পড়িত।

শনিবারের বিকালটা খেলার রঙেরসে ভরপুর ছিল। গঙ্গার শুষ্ক খাত যমুনীয়ায় গেরুয়া রঙের জলের ঢল নামিত। একদিন শরৎ ও তাঁহার মণিমামা গঙ্গার কাঁকরের পাড় হইতে যমুনীয়ার লাল জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সেদিন অঘোরনাথ সফব হইতে হঠাৎ বাড়ি ফিরিলেন। শরৎ ও তাঁহার মণিমামার বীরত্বকাহিনী কে একজন তাঁহার কানে তুলিয়া দিল। রাগে ফুলিয়া তিনি বীরদ্বয়ের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিভৃত পথে চুপি চুপি যখন তাঁহাবা বাড়িতে ঢুকিলেন তখন অঘোরনাথ বাঘেব মত তাঁহাদেব উপর লাফাইয়া পড়িলেন। মণিমামা একচোট খড়মপেটা খাইল, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া শরৎ চম্পট। সাবা ববিবারটা নিরুদ্দেশে কাটিল। সোমবার অঘোরনাথ বাড়ি হইতে চলিয়া গেলে দেখা গেল গোয়ালেব চালে বসিয়া শরৎ নিশ্চিন্ত মনে পেয়ারা চিবাইতেছেন। বিস্মিত ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায ছিলি ?' শরৎ উত্তব দিলেন, 'গোয়ালঘবে।' প্রশ্ন হইল, 'কি খেতিস ?' উত্তব আসিল, 'কেন ভাত ডাল মাছ দুধ'··। জানা গেল বড় গিন্নীব ঘরে ছোট গিন্নীব (অঘোবনাথেব স্ত্রী) পরামর্শ ও আনুকূল্যে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল।

গাঙ্গুলী বাড়িব উত্তর দিকে একটি পোড়োবাড়ি ছিল। সেই পোড়ো-বাড়ির একটা ঘবেব পিছনে কয়েকটা নিম, গোলঞ্চ আর দাঁতবাঙা গাছে কিছুটা জায়গা নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইযাছিল। এক একদিন ছেলেদের সর্দাবটি কোথায উধাও হইয়া যাইতেন। জিজ্ঞাসা কবিলে বলিতেন, 'তপোবনে ছিলাম।' একদিন শবৎ দযাপরবশ হইয়া সুবেন্দ্রকে তপোবনটি দেখাইতে রাজি হইলেন। কিন্তু কৌতূহলী ও কৃতজ্ঞ সাকরেদটিকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে এ গোপন রহস্যময় স্থানটির কথা কাহাকেও বলা চলিবে না। শবৎ তখন সুরেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া অতি সন্তর্পণে লতার পর্দা সবাইয়া একটি পরিচ্ছন্ন জায়গায় লইয়া গেলেন। সবুজ পাতার মধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া জায়গাটিকে একটি স্বপ্নলোকে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রকাণ্ড একটি পাথরের উপরে বসিয়া শরৎ তাহার শিষ্যকে স্নেহভরে ডাক দিলেন। পাশেই গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। দূরে গঙ্গার পরপারে গাছপালার অস্পষ্ট ছবি। ঝিরঝিরে বাতাস বহিতেছে। শরৎ বলিলেন, 'এইখানে বসে আমি বড় বড় কথা ভাবি।' ফিরিবার সময় তিনি সাবধান করিয়া দিলেন, 'কোনোদিন এখানে একলা আসিসনে। না-না-ভূতটুত নয়। এখানে সাপ থাকে।'

মতিলালকে কিছুকালের জন্য সপরিবারে ভাগলপুর হইতে দেবানন্দপুরে যাইয়া বাস করিতে হইল। পারিবারিক কারণে কেদারনাথ হালিসহরে দিন কয়েকের জন্য যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের সংসারের ব্যয়সংক্ষেপ প্রয়োজন হইল। সেজন্য কেদারনাথ মতিলালকে দেবানন্দপুরে যাইয়া কিছুদিনের জন্য বাস করিতে আদেশ করিলেন।

যাওয়ার দিন স্থির হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদল আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদায়দিনের বর্ণনা সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় দেওয়া যাক, 'সেদিনের কথা পরিষ্কার মনে পড়ে ; গ্রীষ্মের প্রদীপ্ত অপরাহ্ণে শরৎ আমাকে বলিল, আজ চলে যাবো—চল্ একবার পুবোনো বাগানে যাই।

সেখানে একটি পেয়ারার নীচু ডালে বসিয়া দুইজনে নিস্তব্ধে আসন্ন বিদায়ের ব্যথা বোধ করিতে লাগিলাম। সে বলিল, তুই দুঃখ করিসনে, আবার আমাদের দেখা হবে। আমি মাঝে মাঝে আসবোই তো রে!

আসবে ?

আসবো না ? ভাগলপুব কি আমার কম ভালো লাগে ? প্রায়ই আসবো।'[১]

বিদাযেব দিন শরৎচন্দ্র তাহার শিষ্য মামাটিকে গাছে চড়িবার বিদ্যাটি শিখাইয়া দিলেন। এই বিদ্যাটির গুরুত্ব বুঝাইয়া শবৎচন্দ্র শিষ্যকে বলিলেন দেখ গাছে চড়া বড দরকারী, মনে কর, একটা বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, হঠাৎ সন্ধ্যা হ'যে এলো, চারিদিকে বাঘ-ভালুক ডাকছে, তখন যদি গাছে চড়তে না জানি তো কি বিপদ!

—কিন্তু যদি পড়ে যাই।

—পড়বি ? পড়বি ক্যান রে ?

এই কথা বলিয়া সে একটা গাছে উঠিয়া কোঁচার কাপড়টা গাছের ডালের সঙ্গে এবং কোমবে জড়াইয়া দিয়া শুইয়া রহিল। বলিল, এমনি করে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়।'[২]

## পুনরায় দেবানন্দপুরে

১৮৮৬ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে দেবানন্দপুরে চলিয়া

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃঃ ৫২

২। ঐ, পৃঃ ৫৩

আসিলেন। স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। লেখাপড়া যে তাহার অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল এবং প্রতি বছর উচ্চতর ক্লাসে যে তিনি উঠিতে পারিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। কারণ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন।

যে পাঁচটি ছেলে দেবানন্দপুর হইতে হুগলীতে পড়িতে যাইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহাদের নেতা। স্কুলের পথ ছিল আগাগোড়া কাঁচা—সে পথে ছিল গ্রীষ্মকালে ধুলা, বর্ষাকালে কাদা। সারা পথে শরৎচন্দ্র মজার মজার গল্প বলিতেন। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া সকলে এক জায়গায় মিলিত হইতেন। সে জায়গাটির নাম ছিল মুড়া অশথতলা ('দত্তা' উপন্যাসে সম্ভবত এই গাছটিকেই স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন ন্যাড়া বটতলা)। প্রবাদ, গ্রাম হইতে শহরে গঙ্গাতীরে শবদাহ করিতে নিয়া যাইবার সময় এখানে শবাধার নামানো হইত এবং পরে কয়েকটি পাকাটি জ্বালাইয়া এ-জায়গা শোধন করা হইত এবং কাছেই জমিদারবাবুদের 'গলায় দড়ি'র বাগানের ধারে ডোবায় শবের কাঁথা, মাদুর সব ফেলা হইত। এ জায়গাটি খুব ভয়ের জায়গা ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীরা কোন ভয় পাইতেন না। গ্রামেও তাহাদের একটি আড্ডার জায়গা ছিল। সরস্বতী নদীর দিকে যাইবার রাস্তাটির ধারে মুন্সীবাবুদের হেতুয়া পুকুরের গড়ের জঙ্গল ছিল। এখানে গর্ত খুঁড়িয়া শরৎচন্দ্র তাহার মধ্যে ঘরের মতো একটি আশ্রয় রচনা করিয়াছিলেন। গ্রামের নানা বাগান হইতে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, কলা প্রভৃতি ফল চুরি করিয়া আনিয়া সকলে জড়ো করিত এবং তারপর সুবিধামত সেগুলির রসাস্বাদন চলিত। ছুটির দিনে এখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা বসিত। শরৎচন্দ্রের তাম্রকূট সেবনের সরঞ্জামগুলিও এখানে লুকানো থাকিত। নরেন্দ্র দেব লিখিয়াছেন, 'রঘু ডাকাত ও রবিন হুডের অনুকরণেই তিনি গ্রামের সম্পত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুসজ্জিত বাগান ও ভরা পুকুর লুঠ করে ফলমূল তারিতরকারী এবং মাছ সংগ্রহ ক'রে গোপনে দিয়ে আসতেন দূরান্তরের দুঃস্থ পরিবারদের ঘরে যারা অভাবের তাড়নায় অনশনে ও অর্ধাশনে দিন কাটাতো, কিন্তু মানের দায়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে পারতো না'

সরস্বতী নদী তখনও মজিয়া যায় নাই। জেলেদের ডিঙিতে উঠিয়া তাহাদের সঙ্গে মাছ ধরিতে যাওয়াও তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। 'পরের পুকুরে

লুকিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরে নিয়ে আসার যে বদঅভ্যাস তাব বাল্যকালে ছিল এবাব দেবানন্দপুবে ফিরে তা আগের চেয়ে আরও বেড়ে উঠেছিল। তখন চ্যালা পুঁটিতেই সন্তুষ্ট হতেন, এখন রুই-কাতলা না হলে আর মন ওঠে না। দেবানন্দপুব ও তার আশেপাশের অধিবাসীবা অল্পদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্রেব উৎপাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁবা বীতিমত সতর্ক দৃষ্টি বাখলেন এই কিশোর দস্যুকে বামাল সমেত ধরবার জন্য, কিন্তু শরৎচন্দ্রের সতর্কতা ছিল তাদেব চেয়েও অনেক বেশী। সাহসও ছিল অসীম ও দুর্জয়। ঘোর অন্ধকাব বাত্রে, দুর্যোগময়ী নিশীথে যখন, মানুষ ত দূরের কথা, শেয়াল কুকুর পর্যন্ত বাইবে বেরুতে ভয় পেতো, নির্ভীক শবৎচন্দ্র কিন্তু সেবাত্রেও, তাব পূর্বনির্দিষ্ট বাগানে নিঃশব্দে প্রবেশ কবে তাব অভীষ্ট কার্য সমাধা করে চলে আসতেন। যে যে বাগানেব যে যে গাছেব যে যে ফল-ফুল নেবার জন্য তিনি লক্ষ্য স্থির কবতেন তা যেমন কবেই হোক সংগ্রহ তিনি করতেনই। কোনো বাধাই তাকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবা থেকে নিবস্ত করতে পারতো না।'[১]

শরৎচন্দ্র সর্বদা হাতে একখানি ছোবা নিযা ঘুবিযা বেড়াইতেন। ছোরার ভয়ে ছেলেব দল সহজেই তাহাব বশীভূত হইযা পড়িয়াছিল। সদানন্দ নামে একটি ছেলে তাহাব প্রধান সাকরেদ ছিল। সদানন্দেব উপব অভিভাবকদের কড়া হুকুম ছিল, ন্যাড়ার সঙ্গে যেন না মেশে। কিন্তু সদানন্দেব সঙ্গে দুই তিন বাজি দাবা না খেলিলে শবৎচন্দ্রের বাত্রে ঘুমই হইত না। উভয়ে গোপনে পবামর্শ করিয়া দেখাসাক্ষাতেব উপায আবিষ্কাব কবিয়া ফেলিলেন। গাছে উঠিয়া সেখান হইতে মই দিয়া শবৎচন্দ্র সদানন্দের বাড়িব ছাতে পৌছিয়া যাইতেন। দুইজনে নীববে বাজির পব বাজি দাবা খেলিয়া যাইতেন। তাবপব দুইজনে তাঁহাদের নৈশ অভিযানে চলিতেন।

দুর্জয় জেদ এবং বেপরোয়া ভাব সত্ত্বেও শবৎচন্দ্রের মন ছিল অতিশয় কোমল ও দরদী। যাহারা অক্ষম, পীড়িত ও নিগৃহীত তাহাদের প্রতি তাহার স্নেহ ও মমতা ছিল অপরিসীম। গ্রামে হয়তো কাহারও অসুখ হইয়াছে, শহর হইতে ঔষধ আনিতে হইবে, শরৎচন্দ্র এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে লণ্ঠন লইয়া গ্রাম হইতে বাহির হইতেন। ইহাতে কোন সময়ে তাহার বিন্দুমাত্র বিরক্তি ছিল না, বরং উৎসাহ ছিল প্রচুর। এজন্য তাহার

১। শরৎচন্দ্র—নরেন্দ্র দেব, পৃঃ ২৮

দুরন্তপনায় অস্থির হইয়া উঠিলেও সকলে তাহাকে খুবই ভালবাসিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখিয়াছেন, 'তাহার বালকসুলভ চাপল্যের জন্য যেমন তিনি গ্রামের কতকলোকের অপ্রিয় ছিলেন, তাহার সৎসাহস ও আর্তসেবা প্রবৃত্তির জন্য তেমনি ছিলেন অনেকের প্রিয়। স্থানীয় জমিদার ৺নবগোপাল দত্ত মুন্সী মহাশয় তাহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং কেহ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অভিযোগকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। নবগোপালবাবুর পুত্র স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অতুলচন্দ্রও (যিনি তখন বি. এ. পড়িতেন ও পরে কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন) শরৎচন্দ্রকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাঁহার প্রতি অতুলচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের অন্তঃপুরেও শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল এবং মহিলাগণও তাহাকে বাড়ীর ছেলের ন্যায়ই আদর যত্ন করিতেন।'[১]

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের পরিবারকে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দাদামহাশয় কেদারনাথ হালিসহরে পরলোক গমন করিলে দারিদ্র্য-দুর্দশা চরমে উপস্থিত হয়।'[২] নিদারুণ অর্থাভাবের জন্য শরৎচন্দ্রের পড়াশুনায় বিস্তর ব্যাঘাত হইল। প্রায়ই তিনি ঘর ছাড়িয়া নিরুদ্দেশযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতেন। একবার ব্যাণ্ডেল স্টেশনে আসিয়া তিনি কলিকাতাগামী ট্রেনের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পড়েন। ঐ কামরায় কলিকাতার বৌবাজারনিবাসী অ্যাটর্নি গণেশচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন। ময়লা কাপড় জামা পরা একটি ছেলেকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিতে দেখিয়া তিনি কৌতূহলী হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি জানিতে পারিলেন, ছেলেটি তাঁহার বন্ধু অক্ষয় নাথ গাঙ্গুলীর নাতি। অক্ষয়নাথ ছিলেন কেদারনাথের খুড়তুতো ভাই। গণেশবাবু শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া অক্ষয়বাবুর কাছে দিয়া আসিলেন। অক্ষয়বাবু পরদিন শরৎচন্দ্রকে দেবানন্দপুর পাঠাইয়া দিলেন।

শরৎচন্দ্র পায়ে হাঁটিয়া একবার পুরী পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। পুরীতে

১। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

২। শরৎ-পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৯১ দ্রষ্টব্য

নাকি তিনি গণিতবিদ্ কে. পি. বসুর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। পুরী যাওয়ার গল্প শরৎচন্দ্র নিজেও বহুবার করিয়াছিলেন।

দেবানন্দপুরে থাকিবার সময়ে যাত্রা থিয়েটারের-প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রবল নেশা জন্মিযা গিয়াছিল। তাঁহার গ্রামের অতুলচন্দ্র দত্ত মুন্সী প্রায়ই তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া থিয়েটার দেখাইতেন। একবার এক যাত্রার দলে তিনি ভিডিযা পড়িয়াছিলেন। এই দলের সঙ্গে তিনি কিছুকাল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়াছিলেন। যাত্রাথিয়েটারের গানগুলি একবার শুনিলেই তিনি সেগুলি শিখিয়া লইতে পারিতেন। অভিনয়-বিদ্যায় তাঁহার প্রবল অনুরাগের ফলে তিনি অল্পদিনেই অভিনয়ে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। 'পল্লীর অবৈতনিক নাট্য সমিতিতে যোগ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভাবের দিনই নিপুণ অভিনযের দ্বারা দর্শকবৃন্দকে একেবারে বিস্মিত ও চমৎকৃত ক'রে দিযেছিলেন। স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ ও অতুলনীয়। তাঁর সুকণ্ঠের আবৃত্তি ও সঙ্গীত ছিল দর্শকবৃন্দের একান্ত উপভোগ্য বস্তু।'[১]

দেবানন্দপুরে থাকিতেই তিনি সাহিত্যসাধনার পথে প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে কি কি বই পড়িতে তিনি ভালোবাসিতেন তাহা নিজেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার বোধোদয় নয়। বাবাব ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম হবিদাসের গুপ্তকথা। আর বেরোলো ভবানীপাঠক। গুরুজনদের দোস দিতে পাবিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পডবার ঠাঁই ক'রে নিতে হলো আবার বাড়ির গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, আর তারা শোনে।'[২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু দুইজন বলিলেন যে, যখন শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখনই তিনি কাশীনাথ ও কাকবাসা নামক দুইটি গল্পের আখ্যানভাগ (plot) লিখিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন।…তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে 'কাশীনাথ গল্পের নায়কের নাম তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই তাঁহাদের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নামানুযায়ী রাখা হয়।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'কোরেল গ্রাম' নামে গল্পটি ( পরে পরিবর্তিত আকারে 'ছবি' ) একই সময়ে

১। শরৎচন্দ্র—নরেন্দ্রদেব, পৃঃ ২৬-২৭

২। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে পঠিত

লেখা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার আরম্ভকাল ২৯শে আগষ্ট, ১৮৯৩; সমাপ্তিকাল ৩রা আগষ্ট, ১৯০০।'[১] সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' ভাগলপুরে রচিত হইয়াছিল। এই দুইরকম উক্তিই হয়তো আংশিক সত্য। 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' সম্ভবত দেবানন্দপুরেই আরম্ভ হয়, কিন্তু শেষ হয় বোধহয় ভাগলপুরে। এ-সম্পর্কে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'কাশীনাথ সম্বন্ধে আমি শুনেছি শরৎচন্দ্রের মুখে-এ-গল্পটি খুব ক্ষুদ্র আকারে তিনি লেখেন প্রথম দেবানন্দপুরে থাকবার সময়··· তারপর ভাগলপুরে এটি পল্লবিত ক'রে লেখা হয়।'[২]

কেদারনাথের মৃত্যুর পর ভুবনমোহিনী দেবানন্দপুরে বড়ই দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলেন।[৩] ভাগলপুরে না আসিলে আর চলে না। মতিলাল সপরিবারে ভাগলপুর যাইবার অনুমতি চাহিয়া মালদহে অঘোরনাথকে পত্র দিলেন। অঘোবনাথ তাঁহাকে ভাগলপুরে যাইবার কথা লিখিয়া দিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মতিলাল সপরিবাবে পুনরায ভাগলপুরে গেলেন।

## ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন—ছাত্রজীবনের সমাপ্তি

যৌবনের উন্মেষবেলায় পুনরায় শরৎচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভাগলপুরে ফিরিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলেজে পড়িতেছে। দেবানন্দপুরে পড়াশুনার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, এখন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না

১। শরৎ পরিচয়, পৃঃ ৮

২। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ১৩৮

৩। দেবানন্দপুরের দুরবস্থার চিত্র সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে কিছুটা পাই, 'ভুবনমোহিনীর তাগিদের ভয়ে মতিলাল বেশীর ভাগ সময় বাড়ি ছাড়া হ'য়ে থাকতেন। মনের দুঃখকে চাপা দেওয়ার যে-সব অবিধির বিধি তাকেই আশ্রয় করা ছাড়া এই অকর্মা মানুষটি আর পথই খুঁজে পেলেন না।

শুধু ভরসা, বাড়ির বুড়ো ঠাকুরমাটি। তিনি নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করে প্রতিবেশীর কাছে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে, অবশেষে চক্ষু মুদিত করলেন।

আজ দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি ব'লে দৃপ্ত। সেই জন্মভূমিই একদিন এই পরিবারের রক্ত এবং অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল।'

শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৯২-৯৩

হইলে চলে না। কিন্তু কি উপায়ে তা সম্ভব? দেবানন্দপুরে থাকিতে যে স্কুলে পড়িতেন সেখান হইতে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনিতে অনেক টাকা লাগে, সে টাকা জোগাড় করা তাহার সাধ্য নহে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, বাধা যত কঠিন হউক না কেন তাহা অতিক্রম করা সম্ভব।

জেলাস্কুল বাড়ির কাছে ছিল বটে, কিন্তু সেখানে যাওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার পিতা বেণীমাধব কেদারনাথের বন্ধু ছিলেন। শরৎচন্দ্র পাঁচকড়িকে মামা বলিয়া ডাকিতেন। স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র পাঁচকড়ির কাছে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চারুচন্দ্র বসু। তিনি ছাত্রদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। শরৎচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। তিন বছরের অনধীত বিদ্যা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

মাতামহ কেদারনাথের বাহিরের পূজার ঘরটিতে শরৎচন্দ্র বাসা বাঁধিলেন। একটা দেবদারু কাঠের বাক্স বই রাখার শেলফ হইল। আর ছিল একটা অল্প-পরিসর তে-ঠেঙ্গা চেয়ার আর ছোট একটা টেবিল। শোবার জন্যে ছিল একটা ছেঁড়া দড়ির খাট, বিছানার দৈন্য ঢাকা থাকিত একখানি উড়ুনি চাদরে। খাটের তলায় থাকিত তাঁহার প্রিয় গুড়গুড়ি, তামাক দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিত বাল্যবন্ধু নীলা। বই কিনিবার সঙ্গতি ছিল না, কিন্তু সহপাঠীদের সহযোগিতায় বইয়ের অভাব ঘটিত না। ভুবনমোহিনী সারারাত প্রদীপ জ্বালাইবার তেল জোগাইতে পারিতেন না। বন্ধুবান্ধবেরা মোমবাতি দিয়া যাইত। এককোণে থাকিত একটি ছোট স্টোভ, একটি ছোট টিনের কেৎলি, একটি জলের কুঁজা আর গেলাস। শেলফের উপর তাকে থাকিত কফির টিন। রাত্রি জাগরণের সব পাকাপাকি বন্দোবস্ত ছিল।

শরৎচন্দ্রের পরণে থাকিত ছেঁড়া জামা আর ময়লা গায়ের কাপড়। চারিদিকেই দৈন্য প্রকটিত ছিল, কিন্তু দৈন্যের স্পর্শ ছিল না তাঁহার মনে। নীলা নিঃশব্দে গায়ের কাপড়ের তলায় তামাক ও টিকা লুকাইয়া আনিত। সযত্নে তামাক সাজিয়া নিজে বার কয়েক টান দিয়া শরতের হাতে নলটি তুলিয়া দিয়া বলিত, 'নে, খা। শরতের একটি কথা বলিবার ফুরসত নাই।

দরজার বাহিরে খুঁটিতে একটি বেজি বাঁধা থাকিত। সেটিকে শরৎ মাছের টুকরা, দুধভাত প্রভৃতি যত্নের সঙ্গে খাওয়াইয়া আনন্দ পাইতেন। সেই মাটির ঘরটিতে ইঁদুরের খুব উৎপাত ছিল। শুইবার আগে শরৎ বেজিটিকে ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া রাখিতেন। একদিন অনেকরাত্রি পযন্ত পড়াশুনা করিয়া শরৎ শুইয়াছেন। সকালবেলায় নীলা জানলার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিল, শরতের গায়ের কাপড়খানা রক্তাক্ত। শরৎ দরজা খুলিলেই দেখা গেল বেজিটি একটি গোখরো সাপ মারিয়া রাখিয়াছে। আতঙ্কিত হইয়া নীলা তার বন্ধুটিকে ঘব ছাড়িবার জন্য মিনতি জানাইল। কিন্তু বন্ধুটি সম্পূর্ণ নির্বিকার, 'সাপ কোথায় নেই শুনি?'—তাহার ভ্রূক্ষেপহীন উত্তর আসিল। দুই বন্ধুতে পরম তৃপ্তিতে তাম্রকূট সেবনের পর নীলা চলিয়া গেল, শরৎ অঙ্কের বই টানিয়া পড়ায় মন দিলেন।

বাহিরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে! বাড়ির পুরনো চাকর মুশাই মৃত সর্পের দাহ শুরু করিয়াছে। শরৎ নিষেধ করিলেন, কিন্তু মশাই তাহা গ্রাহ্যই করিল না। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই মিটিল না। ভুবনমোহিনী মুশাইকে দিয়া মনসার পূজা পাঠাইয়া দিয়া প্রসাদের অপেক্ষায় উপবাসী হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রসাদ আসিলে ভুবনমোহিনী নীলার মারফৎ শরতের টেবিলে পাঠাইযা দিলেন। নীলা প্রসাদ পাইযা মাথায় ঠেকাইল।

শুধু উদাসীন রহিলেন মতিলাল। মনসার প্রসাদ দেখিযা বলিলেন, 'এতোও জানো বাবা। গাঙ্গুলি বাড়ির মেযেদের ভাটপাড়ায় বিয়ে হওয়া উচিত, সর্বশাস্ত্র বিশারদ।'…

শরৎ আসিয়া মায়ের কাছে অনুযোগ করিলেন, সকলেই মনসার প্রসাদ পাইল, আর বাদ গেল সেই, যে সত্যকার কাজ করিল। শরৎ তাঁহার প্রিয় বেজিটির কথাই বলিতেছিলেন। মা ভুবনমোহিনী হাসিয়া ছেলের কথামত বেজিটির জন্য মাছ দিয়া দিলেন।

পরের দিন সকালে নীলা বন্ধুর জন্য একটি টাইমপিস ঘড়ি জোগাড় করিয়া আনিল। বাড়ির কাহাকেও না বলিয়া চুপি চুপি সেটি লইয়া আসিয়াছিল। নীলা তাহার বন্ধুকে এমনি নিবিড়ভাবে ভালোবাসিত। বাড়ি হইতে কিসমিস, পেস্তা, আখরোট লুকাইয়া আনিয়া শরতের ঘরে রাখিয়া দিত। তাহার মধ্যে একটা মেয়েলি লাবণ্য ছিল যা শরৎকে মুগ্ধ করিত। তাহার

একটা এস্রাজ ছিল। পরীক্ষার পর সে শরতের অনুরোধে বিনা দ্বিধায় তাহাকে দিল। চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরটি ছিল কেদারনাথের আমের ভাঁড়ার। ঘরটি শরতের সঙ্গীতশালা হইয়া উঠিল। একদিন সকালে সেই ঘর হইতে এসরাজের সঙ্গে মিষ্ট কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী।' ছেলেরা গান শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। অনেক আবেদন নিবেদনের পর তবে সঙ্গীতশালার দরজা খুলিল! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নীলা বেশিদিন বাঁচে নাই। একদিন কলেরায় সে হঠাৎ মরিয়া গেল। বন্ধুর শোকে সেদিন শরৎ অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এসরাজটি ফিরাইয়া দিবার সময় তিনি চোখের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্র টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। পরীক্ষার ফি-এর টাকা জোগাড় করা সমস্যা হইয়া উঠিল। পিতা নাই, ভুবনমোহিনী ভাই বিপ্রদাসকে কথাটি জানাইলেন। বিপ্রদাস খশুরপুরে চলিলেন কুসীদজীবী গুলজারিলালের কাছে টাকা ধার করিতে। চড়া সুদে গুলজারিলাল টাকা দিলেন। বিপ্রদাস তখন অল্প বেতনে সরকারী কাজ করিতেন, বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। বিপ্রদাসকেই শরৎচন্দ্রের পরীক্ষার ফি-এর টাকা জোগাড় করিতে হইল, মতিলাল ছিলেন সম্পূর্ণ অক্ষম, ছেলের ফি-এর টাকা জোগাড় করা তাঁহার সাধ্য ছিলনা। তবে এত কষ্টের টাকা সার্থক হইল। এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া শরৎচন্দ্র কলেজে ভর্তি হইলেন। তখন পরীক্ষায় পাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল! পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে মাস কয়েক বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। শরৎচন্দ্রকেও পরীক্ষার আগে এরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল তখন শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন না, যখন আসিলেন তখন তাঁহার মস্তক ছিল মুণ্ডিত। তারকনাথের মানত রক্ষা করিতে তাঁহার মস্তক মুণ্ডনের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 'নেড়া' বলিয়া ডাকিত।

গ্রীষ্মের অবকাশের পর কলেজ খুলিলে শরৎচন্দ্র তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। শরৎচন্দ্রের ন্যায় মণীন্দ্রনাথও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজে ভর্তি হইলেন। এই সময় শরৎচন্দ্র মণীন্দ্রনাথের দুই ছোট ভাই গিরীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিলেন। তখনকার পড়াশুনার বর্ণনা দিয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

'সন্ধ্যার পর আমরা দুই ভাই (গিরীন ভায়া এবং আমি) আমাদের ঘরের মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া পড়িতে বসিতাম। শরৎ আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিয়া দুইজনকে ঘণ্টা খানেকের জন্য সাহায্য করিত। তাহার কাছে আমরা ইংরাজী এবং অঙ্কের পাঠ লইতাম। এক একদিন আমাদের পড়ার সময় আমাদের মাও আসিয়া কাছে বসিতেন। পড়ার পর সেই দিনগুলিতে প্রায়ই নানারূপ অদ্ভুত গল্প হইত।'

সুরেন্দ্র ও গিরীন্দ্রকে পড়ান শেষ করিয়া শরৎচন্দ্র নিজের পড়ায় মন দেবার জন্য উপরের ঘরে চলিয়া যাইতেন। রাত্রি একটা পর্যন্ত পড়িয়া তারপর তিনি ঘুমাইতেন। সকালে তাঁহার কাছে গেলে দেখা যাইত, তিনি একমনে লিখিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই সময়ে শরৎচন্দ্র 'কাকবাসা'র তৃতীয় খাতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি উপরের ঘর ছাড়িয়া বাহিরের ঘরে বাসা লইলেন। 'এই সময়ে তাহাকে ইংরেজী উপন্যাস এবং গ্যানোর ফিজিক্স খুব মন দিয়া পড়িতে দেখিতাম। তাহাকে স্কট পাড়িতে বড় একটা দেখি নাই, কিন্তু ডিকেন্সের সুখ্যাতি সে শতমুখে করিত। মিসেস হেনরি উডের পুস্তকও এই সময়ে সে পড়িতে আরম্ভ করে।'

কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিয়া বিকালে সে বাহির হইয়া যাইত। রাজুর সঙ্গে ডিঙ্গি করিয়া কোথাও উধাও হইত। কোন কোন দিন বাড়ী ফিরিতে রাত হইয়া যাইত। এইরূপ ঘটিলে পরদিন সকালে বিছানায় শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে তাঁহার ছাত্রদিগকে পড়াইতেন।

একদিনকার ঘটনা। বিজ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হইবে। আগের দিন শরৎচন্দ্র একখানা মোটা বই লইয়া পড়িতে বসিয়া গেলেন। সুরেন্দ্র ও গিরীন্দ্রকে পরদিন সকালে পড়িতে আসিবার জন্য বলিয়া দিলেন। পরদিন তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, শরৎচন্দ্র দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া পড়িতেছেন। রাত যে কাবার হইয়া গিয়াছে সেদিকে খেয়ালই নাই। সারারাত জাগিয়া তিনি মোটা বইখানা পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরীক্ষার ফলে অধ্যাপক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল, শরৎচন্দ্র বুঝি নকল করিয়াছেন। সম্মুখে বসাইয়া লিখিতে বলিবার পরেও যখন উত্তর একই রকম হইল তখন অধ্যাপকের বিস্ময়

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক—পৃঃ ৭২

অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। শরৎচন্দ্রের একাগ্রতা ছিল অসাধারণ এবং তাহারই ফলে তাঁহার স্মৃতিশক্তিও ছিল অসামান্য।

কলেজজীবনে শরৎচন্দ্র এতখানি মেধা ও অধ্যয়ন-নিষ্ঠা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের মতে, 'প্রধান কারণ, পরীক্ষার ফি জুটে নাই। অপর কারণ, মেজদিদির মৃত্যু।'[১]

টাকার অভাবে যে তিনি পরীক্ষার ফি জোটাতে পারেন নাই তাহা শরৎচন্দ্র স্বয়ং একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'বড দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্য একজামিন দিতে পাইনি। এমন 'দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছুদিনের জন্য জ্বর করে দাও, তাহ'লে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবেনা, উপবাস ক'রেই দিন কাটবে।'

শরৎচন্দ্র টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, এ-কথা কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৫৭ সালের 'শরৎ স্মরণিকা'য় লিখিয়াছিলেন, 'তৎকালীন এফ. এ. পরীক্ষার প্রবেশমূল্য মাত্র পনেরটি টাকা জোগাড় না হ'তে পারার দরুণ শরৎচন্দ্র ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এই মর্মে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, সেই কাহিনীর সৃষ্টি যত বড় লোকের দ্বারাই হয়ে থাকুক না কেন, তথাপি সত্য নয়।'

টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, একথা যদি ভিত্তিহীন হয়, তবে শরৎচন্দ্র কেন পরীক্ষা দিতে পারেন নাই, এ-প্রশ্ন শ্রীগোপালচন্দ্র রায় একদিন উপেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'টেষ্ট পরীক্ষার সময় হলে শরৎচন্দ্র যখন লুকিয়ে বই দেখে নকল করেছিলেন তখন গার্ডের হাতে ধরা পড়ে যান। ফলে তাঁকে এফ. এ. পরীক্ষায় অনুমতি দেওয়া হয়নি।'[২] উপেন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎ পরিচয়' নামক গ্রন্থে। তিনি বলিয়াছেন, 'পর-বৎসর টেষ্ট পরীক্ষা দান কালে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে অনুমতি

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃঃ ৭২

২। শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১৬-১৭

দেন নাই। ১৫ টাকা ফী সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই এ-কাহিনী ভিত্তিহীন।[১]

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায়, পরীক্ষা দিতে না পারা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দুই মাতুলের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে-সময়কার ঘটনা বলা হইতেছে সে-সময়ে সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেজন্য তাঁহার উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় একদিন সুরেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা না দেওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, 'অর্থাভাবের কথাটাই সত্য। তবে টেষ্ট পরীক্ষার সময় একটা গণ্ডগোলও অবশ্য হয়েছিল।' সুরেন্দ্রনাথ ঘটনাটির যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে আগে টেস্ট পরীক্ষা দিতে হইত না। শরৎচন্দ্রের সময়েই এই নিয়মটি প্রথম প্রবর্তিত হইল। ছাত্ররা প্রথমে আপত্তি করিলেও শেষ পর্যন্ত টেস্ট পরীক্ষা দিতেই হইল।

গোলমালটি হইল বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন। শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানে খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। অর্ধেক সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞানের সমস্ত উত্তর লিখিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, কয়েকজন বন্ধু ভালো লিখিতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি কলেজসংলগ্ন হোস্টেল হইতে দারোয়ানের হাত দিয়া উত্তর লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। দারোয়ানের ঘন ঘন যাতায়াত দেখিয়া পরীক্ষাহলের গার্ড বিজ্ঞানের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্যের মনে সন্দেহ হইল। তিনি দারোয়ানকে অনুসরণ করিয়া হোস্টেলে আসিয়া দেখিলেন, শরৎচন্দ্র কাগজের শ্লিপে উত্তর জোগাইয়া চলিয়াছেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে প্রিন্সিপালের কাছে ধরিয়া লইয়া গেলেন। প্রিন্সিপাল হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন কড়া নীতিবাগীশ লোক। তিনি টেস্ট পরীক্ষায় শরৎচন্দ্রকে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিবেন না, স্থির করিলেন। শরৎচন্দ্র নিরুপায় হইয়া তাঁহার এই দুর্ভাগ্য মানিয়া লইলেন। হরিপ্রসন্নবাবু পরে এই কঠোর শাস্তিদানের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পরীক্ষার ফি জমা দিবার আগের দিন শরৎচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া ফি জমা দিতে অনুমতি দিলেন। শরৎচন্দ্র পিতাকে টাকার কথা বলিলেন। কিন্তু মতিলাল তখন নিদারুণ অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতেছেন, টাকা জোগাড়

১। শরৎ পরিচয়, পৃঃ ৬

করা তখন তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। শরৎচন্দ্রের নিজের মামাদের পক্ষেও তখন টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে পরীক্ষায় ফি দেওয়া আর হইয়া উঠিল না।'[১]

শরৎচন্দ্র যখন কলেজে পড়িতেছিলেন সেই সময়েই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হইল। ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর মতিলালের পক্ষে আর শ্বশুরগৃহে থাকা সম্ভব হইল না। তিনি খঞ্জরপুর পল্লীতে একটি খোলার বাড়ী ভাড়া করিয়া পুত্রকন্যাদের লইয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর মতিলালের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 'যতদিন ভুবনমোহিনী বেঁচে ছিলেন ততদিন মতিলাল নিরাশ্রয় হননি। তাঁর মৃত্যুর পরই মতিলাল ছেলেপুলের হাত ধরে গাঙ্গুলি বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনও কিন্তু গাঙ্গুলি বাড়িতে স্থানাভাব হয়নি। মতিলালের পক্ষে সেখানে আর কিছুতেই থাকা যায় না। ভুবনমোহিনীর অভাব তাঁকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। মতিলালের জীবনে সকল সরসতার আদিভূত কারণ ছিলেন তিনি। তারপর কতদিন দেখা গেছে, মতিলাল পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ছেঁড়া চটীর উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় কোমর পর্যন্ত ধূসর। মাথার চুলগুলোয় জটা বাঁধতে শুরু করেছে। পেটে নেই ভাত, হাতে নেই পয়সা। হাত পা নেড়ে বিড় বিড় করে কার সঙ্গে কথা কয়ে কয়লাঘাটের পথে অশ্বত্থতলায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।[২]

নিদারুণ অর্থকষ্টের ফলে মতিলালকে বাধ্য হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (৯ই নভেম্বর) দেবানন্দপুরের বসতবাটীটি বিক্রয় করিতে হইল। এ-সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখিয়াছেন, 'নানা প্রকার অভাবের ভিতর দিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইত বলিয়া মতিলাল ক্রমশই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং এই গ্রামেরই শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী তাঁহার বিরুদ্ধে হুগলীর প্রথম মুনসেফী আদালত হইতে এক ডিক্রী পাইয়া এই বসতবাটী ক্রোক করেন। ঐ ডিক্রীর টাকা মিটাইবার জন্যেই মতিলাল ২২৫ মূল্যে বসতবাটী খানি তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাং ১৩০৩ সালের ২৩শে কার্তিক সাফ কোবালায় বিক্রয় করেন।'[৩]

১। শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ১৭-১৮ দ্রষ্টব্য
২। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৩৮-৩৯
৩। ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র প্রথম দিকে সাংসারিক অভাবঅনটন সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার ছিলেন। পরে লেখাপড়া ছাড়ার পর কিছুদিনের জন্য বনেলী এস্টেটে সামান্য বেতনে একটি চাকরী নিয়াছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কিছুদিন বনেলী স্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলছে। স্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্মচারী সেই কাজে স্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। ডাক্তার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হত। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন ক'রে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েকজন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও খুব নির্জন।'[১]

বনেলী স্টেটে শরৎচন্দ্র যখন কাজ করিতেছিলেন তখনকার কথা সুরেন্দ্রনাথ একস্থানে লিখিয়াছেন, 'শরৎ তখন বনেলীরাজের এস্টেটে কাজ করছেন। ম্যানেজার শিবশঙ্কর সহায়ের টুর ক্লার্ক। দিন কতক সহরে থাকতে হয়, আবার দিন কতক ঘুরতে হয় মফঃস্বলে।'[২]

## দুঃসাহসী জীবনসঙ্গী রাজেন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবনে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সঙ্গী ছিলেন রাজু, ওরফে রাজেন্দ্রনাথ। এই রাজেন্দ্রনাথের স্মৃতি তিনি অমর করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার অবিস্মরণীয় চরিত্র ইন্দ্রনাথের মধ্যে। রাজেন্দ্রর সঙ্গে তাঁহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল দেবানন্দপুর হইতে আসিবার পর। কিন্তু বহুপূর্বেই অর্থাৎ দেবানন্দপুরে যাইবার পূর্ব হইতেই দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাজুর বাবা রামরতন মজুমদার ছিলেন পাবনা জিলার অধিবাসী বারেন্দ্র

১। ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

২। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক

ব্রাহ্মণ। ভাগলপুরে তিনি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে তিনি কাজে ইস্তফা দেন। গঙ্গার তীরে পরিত্যক্ত নীলকুঠি কিনিয়া রামরতন সাত ছেলের জন্য সাতখানি বাড়ি তৈরি করেন। ভাগলপুরের এই অংশের নাম ছিল আদমপুর।

আদমপুর ও বাঙ্গালীটোলার মাঝখানে ছিল জঙ্গল, পুকুর ও বাবলাবন। 'এই বাবলাবনের দুর্গম জলস্থল ডোবা ঢিবিময় ভূখণ্ডে সেদিনের বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো দুঃসাহসিক ছেলের দল অভিভাবকদের কঠোর শাসনের গণ্ডী পেরিয়ে এসে মনের আনন্দে জীবনের পাঠ গ্রহণ করত। এইখানে রাজু মহিষের দুধ চুরি করে খেয়ে শরীর বানিয়ে তুলতো। এইখানে ধূমপান বিদ্যে কুমড়োর ডাঁটার হাতেখড়ি থেকে আরম্ভ করে গঞ্জিকা চরসের পরিণতি এবং চরম সিদ্ধিলাভ করতে। এইটিই ছিল শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ, পুনু-নীলাম্বরের আদি বিচরণভূমি এবং তাদের কিশোর জীবনের লীলাক্ষেত্র। আজও সেই পাকুড় গাছটি বিরাট বিস্তৃত মাথা আকাশে উঁচু করে সেই সেদিনের স্বপ্ন দেখে কিনা কে বলবে।'[১]

রামরতন ও কেদারনাথের পরিবারের মধ্যে বৈষয়িক কারণে মনোমালিন্য ছিল। দুই পরিবারের গরমিলের আরও কারণ, উহাদের পৃথক পৃথক জীবনাদর্শ। রামরতন আচারে-ব্যবহারে অনেকখানি প্রগতিশীল ছিলেন, কিন্তু কেদারনাথ ছিলেন গোঁড়া ও রক্ষণশীল। কাজেই উভয়ের পরিবারের মধ্যে ব্যবধান ছিল বিরাট।

রামরতনের সাত ছেলের অন্যতম ছিলেন সাহিত্য ও সঙ্গীতে পারদর্শী রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁহার আর দুই ছেলেও কৃতবিদ্য ছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র লেখাপড়ায় বাঁধাপথে চলিতে আসে নাই। বাবলাবনে ও গঙ্গার ঘাটে সে তাহার একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল।

রাজেন্দ্র ও শরতের পরিচয় ঘটিল প্রতিযোগিতা ও শত্রুতার মধ্য দিয়া। দুইজনের মধ্যে খুব রেষারেষি ছিল ঘুড়ির লড়াইকে কেন্দ্র করিয়া। রাজুর পয়সার জোর ছিল, তাহার লাটাই ও সুতা সব শক্ত ও মজবুত। কিন্তু শরৎও তাঁহার নিজস্ব প্রণালীতে লাটাই ও সুতা লড়াইয়ের উপযোগী করিয়া তৈরি করিতেন। শনিবারের বিকালে লড়াই খুব জমিয়া উঠিত। একদিন শরতের

১। শরৎ-পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৪

জয় ঘটিল। রাজুর ঘুড়িখানা ছিঁড়িয়া নিরুদ্দেশের পথে ভাসিয়া গেল। রাগ করিয়া রাজু লাটাই ও সূতা গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। দুই বন্ধুর প্রকৃতি একটু বিভিন্ন ধরনের ছিল। শরতের ছিল ধীর, স্থির, শান্ত-সমাহিত বুদ্ধি আর রাজুর ছিল অমিত সাহস, প্রদীপ্ত তেজ এবং অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। রাজু বয়সে কিছু বড় ছিল এবং প্রবলতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। সেজন্য কিশোর শরতের অনুরাগ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা-মিশ্রিত অন্তরটি এই অসামান্য বালকটির অন্তরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল।

নিত্যানন্দ যেমন নিমাইকে সযত্ন স্নেহ-আচ্ছাদনে সকল দুঃখকষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া রাখিতেন রাজুও তেমনি শরৎকে তাহার উদার হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-ভালোবাসা দিয়া সবসময়ে ঘিরিয়া রাখিতে চাহিত। ছেলেবেলায় শরৎকে একবার সাপে কামড়াইয়াছিল। বাড়ির সকলে যখন দিশাহারা হইয়া কান্নাকাটি করিতেছেন তখন বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিবার জন্য রাজু কিরকম তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সুরেন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন,—'এমন সময় সেই ঘনঘটার মধ্যে একটি কালো বিদ্যুৎ গেল চমকে—আজানুলম্বিত হাত দু'খানি নেড়ে রাজু মতিলালকে জিজ্ঞেস করলে—মায়াগঞ্জে আছে খুব ভালো রোজা—নিয়ে আসবো তাকে ডেকে ?

—যাও তো। লক্ষ্মী আমার, কিসে যাবে ?

আমার ডিঙি আছে—যাবার সময় স্রোত পাব, আসার সময় পাল।

রাজু ঝড়ের মতোই এসেছিল, ঝড়ের মতোই বার হয়ে গেল।'[১]

রাজেন্দ্র ও শরতের নানা দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হইল শরতের প্রবেশিকা পরীক্ষার পর। রাজেন্দ্র তখন লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের কাঠের কারখানায় ছুতার মিস্ত্রীর কাজে মন দিয়াছিল। শরতেরও হাতে তখন অখণ্ড অবসর। তিনি রাজেন্দ্রর কাঠের কারখানায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। রাজেন্দ্রর দোর্দণ্ড প্রতাপ ও অমিত পরাক্রম তখন ভাগলপুরের বাঙালী সমাজের মধ্যে সুবিদিত ছিল। তাহার কয়েকটি কাহিনী বর্ণিত হইল।

বাঙালীটোলার মাণিক সরকার ঘাটে মেয়েরা গঙ্গাস্নান করিতে আসিত। মাঝে মাঝে সেখানে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আগমন ঘটিত। রাজুর শাসনপ্রণালী

---

১। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৮৩

ছিল সংক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্র ও একান্ত সহজ। একদিন এরূপ একটি ব্যক্তির কাঁধ হইতে গামছাখানা লইয়াই তাহার গলায় পাকাইয়া ধরে। কোন কথা বলিবার আগেই তাহাকে ডুবজলে দুইশ'বার ডুবাইয়া তারপর তুলিয়া ধরিয়া রাজু জিজ্ঞাসা করিল, 'আওর কুছ মাঙ্গতে হো?'

—নহী।

—তব সিধা রাস্তা ধরো, ঘর যাও। দুসরা রোজ ওহি ঘাটমে মৎ যানা।'

অপরাধীর চিরতরে শিক্ষা হইয়া গেল।

আর এক সাহেব অপরাধীকেও রাজু একবার সায়েস্তা করিয়াছিল। বাবারির জমিদারের স্কুলের একজন নিরীহ শিক্ষক একদিন অন্ধকারপথে একা ঘরে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ এক সাহেব টমটম হাঁকাইয়া তাঁহার পিছনে আসিয়া সপাং করিয়া তাঁহার পিঠে চাবুকের বাড়ি মারিয়া নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। শিক্ষকটি বুঝিতে পারিল না, তাঁহার অপরাধটি কোথায়। বাড়ি যাওয়ার আগে তিনি তাঁহার পিঠের রক্তাক্ত দাগটি শুধু রাজুকে দেখাইয়া গেলেন। রাজু বলিল, 'আপনি বাড়ি যান। কালকে ছুটি নেবেন। পরশু কি হয় তা' শুনতে পাবেন।'

স্টিমার বাঁধার মোটা একটি কাছি লইয়া রাজু সদলবলে সন্ধ্যার পরে সাহেবের যাত্রাপথে ওঁত পাতিয়া রহিল। সাহেব ঐ পথ দিয়া রোজ ক্লাবে যাইত। রাত নয়টার পরে ফিরিত। দূরে সাহেবের গাড়ির আলো দেখা যাইতেই দুইধারের দুইটি গাছে শক্ত করিয়া কাছি বাঁধিয়া রাজুর দল অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঘোড়া আসিয়া কাছিতে বাঁধিয়া গেল এবং সাহেব একেবারে পথের মধ্যে চিৎপাৎ হইয়া পড়িল। রাজেন্দ্র ক্ষিপ্ত বাঘের মত সাহেবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বেশ কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আওর কভি বেকসুর মুসাফির কো মারোগে?'

—নেভার।

—বোলো, মাপ করো।

—মাপ করো।

—ঘর যাও।

সাহেব আচ্ছা শিক্ষা লাভ করিয়া ঘরে গেল।

মাঘমাসের প্রচণ্ড শীতের রাত্রে বাংলা স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগ

ঘটিল। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিবেলায় কয়েকজন বর্ষীয়ান লোকের সঙ্গে রাজুর দল মড়া লইয়া শ্মশানে চলিল। পথে একস্থানে প্রবল বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল। আশ্রয়ের সন্ধানে সকলে তখন মড়া ফেলিয়া দৌড় দিল। একমাত্র রাজেন্দ্র মড়া আগলাইয়া সেখানে বসিয়া রহিল। শেষ রাতে ঝড়-বৃষ্টি থামিলে সকলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শুধু মড়া পড়িয়া আছে, আর কেহ নাই। সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মড়াটা যেন ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। যেন একটু নড়াচড়াও শুরু করিয়াছে। সকলে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তারস্বরে 'রাম রাম' বলিতে আরম্ভ করিল। তখন মড়াঢাকা লেপের ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে রাজেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। তাহার অদ্ভুত সাহস দেখিয়া সকলে 'সাবাস' বলিয়া উঠিল।

রাজু ফুটবল খেলায় খুব দক্ষ ছিল। তাহার নিজস্ব একটি দলও গড়িয়া উঠিয়াছিল। দলের খেলোয়াড়দের প্রতি তাহার ব্যবহার যেমন মধুর, তেমনি কঠোর ছিল, মনপ্রাণ দিয়া না খেলিলে এই খেলায় উন্নতি করা যায় না, ইহা সে সকলকে বুঝাইয়া দিত। কাহারও কোন ত্রুটি হইলে সে নির্মমভাবে তাহাকে দল হইতে তাড়াইয়া দিত। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে একটি ফুটবল ম্যাচের পর মারামারির কথা রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ (যিনি মারামারির সময় উপস্থিত ছিলেন) লিখিয়াছেন, 'ভাগলপুর টয়েন বি স্পোর্টসের একটি খেলার শেষে এ-ব্যাপারটি ঘটে এবং ইন্দ্রনাথের (রাজুর) দল লাঠির জোরে বিপক্ষ পক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।'

সুরেন্দ্রনাথ রাজুর যে অতি সুন্দর চরিত্রচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা হইতে একটু তুলিয়া ধরা হইল—

'রাজু যে কোন কাজই করিত তাহা এমন সুন্দর করিয়া করিত যে, তাহাকে গুরু রূপে স্বীকার করিতেই হইবে। গুণ্ডামিতে সে ছিল সবার সেরা—সাঁতারে, জিমনাস্টিকে। ঘুড়ি উড়ানোতে তাহার জোড়া ছিল না। কিন্তু লেখাপড়াতে তাই বলিয়া সে কাহারো অপেক্ষা কম নহে, হাতের লেখা মুক্তার মত, ড্রয়িং-এর হাত পাকা। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজেও তাহার অসামান্য দক্ষতা। বাঁশী হারমোনিয়াম ক্ল্যারিনেট ভালই বাজাইত। কণ্ঠধ্বনি ছিল সুমধুর। তাহার অভিনয় করিবার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। গভীর রাতে আম বাগান হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিত, সবাই জানিত রাজুর অগম্য স্থান নাই, সে সাপের ভয় করিত না—বোধ করি তাহার মৃত্যুভয়ও ছিল না।

কিন্তু একদিন তাহার প্রচণ্ড জীবনরসতৃষ্ণা শান্ত বৈরাগ্যে সমাহিত হইয়া আসিল। উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্য মৌন অধ্যাত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িল। গঙ্গার তীরে শ্মশানের কাছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছেব গায়ে নিজের হাতে কাঠের ঘব বাঁধিয়া সে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া রহিল। সেই ঘবে সাধারণের প্রবেশ অধিকাব ছিল না, প্রবেশপথও ছিল দুর্গম। সেই ঘরের মধ্যে সে নাকি ঈশ্বরের জ্যোতি দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িত। তাহার ঈশ্বরদর্শনের অভিজ্ঞতা সে লিখিয়া রাখিত। বন্ধুবান্ধবের সংস্রব সে ত্যাগ করিল, কেবল শিশুদের দেখিলে বুকে জড়াইয়া ধরিত। একদিন সে সংসার ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইযা গেল। আর কোন দিন কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই।'

রাজেন্দ্র সংসার হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাহাকে চিরকালের জন্য ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির মধ্যে ধরিয়া রাখিযাছেন। বাস্তব চরিত্রকে সাহিত্যিক রূপদান করিবার জন্য যতখানি কল্পনার আশ্রয় লওয়া দরকার, শরৎচন্দ্র হয়ত তাহা লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার চরিত্রের বাস্তব ভিত্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'চিত্রের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন দূরে সরিয়া যাইতে হয়—তাহাতে অনেক বাস্তব প্রচ্ছন্ন হয়—অনেক শূন্যতা কল্পনার স্নিগ্ধালোকে পূর্ণ হইয়া উঠে, ইন্দ্রনাথকে উদ্ঘাটিত করিতে শরৎচন্দ্র যথাযথ ভাবে ওইটুকুই মাত্র করিয়াছেন। তাহাতে পরিচিত চরিত্রটি আরো সম্পূর্ণ হইযা উঠিয়াছে মাত্র, কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এইখানেই লেখকের অসামান্য কৃতিত্ব। যাঁহাদের রাজুকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল—একথা তাঁহাবা নিশ্চযই স্বীকার করিবেন।'[১]

ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপে রাজেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু শরৎসাহিত্যে এরূপ আরও কয়েকটি চরিত্র দেখা যায় যাহাদের উপর রাজেন্দ্রর পরোক্ষ প্রভাব রহিয়াছে। দুঃসাহসিক ও বিপ্লবী চরিত্র-পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্র বারবার তাঁহার কিশোর বয়সের এই অসাধারণ বন্ধুটির স্মৃতি দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের একই নামধারী চরিত্র রাজেনের কথা উল্লেখ করা যায়। রাজেনের চরিত্র-পরিচয় শরৎচন্দ্র এইভাবে দিয়েছেন, 'এতবড় কর্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধুচিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি।...ও যেমন অবলীলায় পাঙ্ক

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃঃ ৫৯

তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য মানুষ!' রাজেনের মধ্যে রাজেন্দ্র যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শরৎসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় বিপ্লবী চরিত্র 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর পরিকল্পনাতেও রাজেন্দ্রর সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। এ-সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'বোধকরি, শরৎচন্দ্রের মনে কিশোর বয়সেই সব্যসাচীর পরিকল্পনাটি রাজেন্দ্রনাথকে নিয়েই দানা বাঁধতে শুরু করে। যাদের তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে তারাই শুধু জানে, যে রাজেন্দ্র মানুষটি আগাগোড়া অসাধারণের উপকরণে গড়া! সব্যসাচীর অদ্ভুত তৎপরতা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে কোথাও আঘাতে গল্পের বাস্তবহীনতা দোষ রসহানি ঘটায়নি। তার কারণ সব্যসাচীর আদর্শের আসলটি ছিল শরৎচন্দ্রের মনে নিত্য বিরাজমান ঐ মনের মানুষটির প্রাণময় সক্রিয় জীবন্ত প্রতিকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সম্বন্ধ।'[১]

## গানবাজনা ও অভিনয়

ছোটবেলা হইতেই শরৎচন্দ্রের গানবাজনা ও অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। ভাগলপুর আসিবার পূর্বে তিনি কিছুদিনের জন্য একটি যাত্রার দলে ভর্তি হইয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিবার পর গানবাজনার দিকে তাঁহার অনুরাগ খুব বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গীতের আকর্ষণেই তিনি রাজুর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। 'রাজু বাঁশী বাজাতে পারতো, হার্মোনিয়ম বাজাতে পারতো। রাজুর কাছে শরৎচন্দ্র বাঁশী বাজাতে শেখেন। গঙ্গার ধারে, নিরালা নির্জন জায়গায় বসে শরৎচন্দ্র বাঁশী বাজানো শিখতেন। বাড়ির কেউ জানতে পারলে কড়া শাসন···বলবে, বখে যাবার ব্যবস্থা। তখন ছেলে বয়সে বাঁশী বাজানো গান গাওয়া এগুলো ছিল বখে যাবার পথ তৈরী করা।

··রাজু ছিল শরৎচন্দ্রের গানবাজনার গুরু। বাড়ীতে গানবাজনার চর্চা চলে না···বাড়ীর বাইরে কোথায় কার নিরালা বাগান, শরৎচন্দ্র বাড়ী থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে রাজুর সঙ্গে সেই বাগানে গিয়ে গানবাজনার চর্চা করতেন।'[২]

১। শরৎপরিচয়, পৃঃ ৭৮

২। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫

শরৎচন্দ্র কোথায় বসিয়া বাঁশীর সাধনা করিতেন তাহা সুরেন্দ্রনাথের উক্তি হইতে জানা যায়,—'বাড়ীতে বাঁশী চর্চার সুবিধা হইত না! তাই সে সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীর পাশের পোড়ো বাড়ীর দোতলার ছাদে বসিয়া প্রায়ই বাঁশী বাজাইত।

এই সময় ওই বাড়ী কিছুদিন ফাঁকা পড়িয়া থাকার পর মানুষ তাহাতে ভূত দেখিতে পাইত। এই ভূতের কাহিনী এমন সব গুরুগম্ভীর প্রকৃতির লোকের মুখে শুনিতাম যে, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না। শরৎকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া বলিত,ভূত যে মানে, তাকেই ভূতে দেখা দেয়। আমি ভূত টুত মানিনে।'[১]

খঞ্জরপুরে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বিভূতিভূষণ ভট্ট শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত সাধনার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমাদের খঞ্জরপুরের পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলো কবর আছে। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবর স্থানের মধ্যেই কাটিয়াছে। শরৎদার বাঁশী চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি।[২]

নিরুপমা দেবীর স্মৃতিকথাতেও শরৎচন্দ্রের এই সঙ্গীতসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়, 'কোন গভীর রাত্রে সেই মসজিদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ চত্বর হইতে গানের শব্দ। কখনো যমানিয়া নদীর তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন, এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।'[৩]

ভাগলপুরের আদমপুর অঞ্চলের ধনকুবের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা ছিল। শিবচন্দ্রের বাড়িতে শাসন-শৃঙ্খলার কড়াকড়ি ছিল না। সেখানে আমোদপ্রমোদের বন্যা উচ্ছ্বসিত বেগে বহিয়া যাইত, কিন্তু কেদারনাথের বাড়িতে শাসনের নিগড় ছিল অতিমাত্রায় কঠোর। আমোদপ্রমোদ নিষিদ্ধ বস্তু ছিল। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে একটি যাত্রার দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাত্রার আসরের সম্মিলিত বাদ্যধ্বনি কেদারনাথের বাড়ির অবরুদ্ধ ছেলেদের মন চঞ্চল করিয়া তুলিত। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'সন্ধ্যার পর সখের

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, ৬৮

২। আমার শরৎদা—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

৩। আমাদের শরৎদা—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

যাত্রাদলের ঢোলের চাঁটির শব্দে আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শাসনের লৌহপিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা সেই আনন্দমেলার প্রতি যে কি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতাম, আজ তাহা বর্ণনা করা কঠিন।'[১]

এই সখের যাত্রাদলের নাম হইয়াছিল 'নব হুল্লোড়'। 'এই নব হুল্লোড়ে দিবারাত্রি চলিত উৎসবের মাতামাতি। কেহ বেহালা শিখিতেছে—তাহার ক্যাঁচ কোঁচের অবিশ্রান্ত ধ্বনি। কেহ বা ডুগগি তবলায় বেদম চাঁটি দিয়া—মুখে কথতে তাধিন তাধিন সাধিতেছে। আবার কেহ বা নেশা করিয়া আগাগোড়া মুড়ি দিয়া একপাশে লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। আবার অন্যদিকে লম্বা নল গুড়গুড়ি লইয়া তাম্রকূট-সেবন-শিক্ষার্থী মুখ হইতে অবিরাম ধূমোদ্গীরণ করিয়া কাসিতেছে—এবং অধিনায়ক সেই সঙ্গে শ্লোক আওড়াইয়া বলিতেছেন :

তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং স্বেচ্ছয়া পিয়তে যদি
টানে টানে মহাফলং : মর্ত্যে দিব্য মহৎ সুখম্।[২]

এই সখের যাত্রাদল শরৎচন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে একেবারে মাতাইয়া তুলিতে পারে নাই। যাত্রার অভিনয়ের মধ্যে একটা স্থূলত্ব ছিল এবং সেখানে হৈ-হুল্লোড, মাতামাতি একটু বেশি হইত, সেজন্য সূক্ষ্ম রসবোধ যাত্রার পরিবেশে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িত। শিক্ষিত ও রুচিমান লোকেদের কাছে যখন যাত্রার আবেদন শিথিল হইয়া আসিল তখন এক নবতর অভিনয়ের আসর জমিয়া উঠিল। এই অভিনয়ের আসর হইল ভাগলপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত থিয়েটার। এই থিয়েটারের নাম হইল আর্য থিয়েটার। এই থিয়েটারে শরৎচন্দ্র অভিনয় করেন নাই, কিন্তু ইহার সহিত তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। কলেজে প্রবেশ করিবার পর রাজু-শরতের দল একটি সখের থিয়েটার গড়িয়া তোলে। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী প্রথম অভিনীত হয় এবং শরৎচন্দ্র একটি স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া গানে ও অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। রাজু কিন্তু এই দুই বিষয়েই শরতের অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এই দলটি কিন্তু অভিভাবকদের চক্ষুশূল হইল এবং তাঁহাদের প্রবল বিরোধিতার ফলে ইহা ভাঙিয়া গেল। এই দলের একদিনকার অভিনয়ের কথা বলা যাইতে পারে।

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃঃ ১০১
২। শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৫

একজন যুবক একটি স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দর্শকদের ভিতর হইতে হঠাৎ তাঁহার পিতাঠাকুর লম্ফ দিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী-বেশী পুত্রকে খড়মপেটা শুরু করিলেন। লম্ফঝম্পের ফলে ফুট-লাইটের মোমবাতি উল্টাইয়া সালুতে আগুন ধরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, রঙ্গমঞ্চে এই বাস্তব নাটক অভিনয়ের পর আর কোন নাটকই জমিল না।

বয়স্কদের আর্য থিয়েটার কিন্তু যুবকদের উপযোগী হয় নাই। আর্য থিয়েটার যাঁহার আগ্রহে ও চেষ্টায় চালিত অভিনয়ে তাঁহার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি তাঁহার প্রতি বড়ই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চলিত। অগত্যা তাঁহাকে অভিনয়ের আগে কিংবা পরে মঙ্গলাচরণ অথবা স্বস্তিবচনের মতই হরপার্বতীর হর সাজিয়া বাহির হইতে হইত। হরের মুখে শুধু একটি বাক্য দেওয়া হইল, 'হরিবল, প্রমথ মণ্ডল।' তিন মাস প্রচণ্ড বিহার্সেলের পর যখন তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন তখন চার পাঁচ মিনিট স্তব্ধ থাকিবার পর বাক্যটি মুখ হইতে নির্গত হইল, কিন্তু হায়রে, তবুও তিনি শুদ্ধভাবে বাক্যটি বলিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া ফেলিলেন 'হরিবল, প্রথম।' প্রম্পটারের বার বার সনির্বন্ধ চীৎকার সত্ত্বেও তাঁহার মুখ হইতে 'প্রথমে'র স্থলে 'প্রমথ' বাহির হইল না। শেষকালে উত্তেজিত হইয়া হর তাণ্ডব নাচ শুরু করিলেন। নন্দী হাত ধরিয়া তাঁহাকে মঞ্চের বাহিরে লইয়া গেল। দুষ্ট ছেলেদের সহর্ষ করতালিতে প্রেক্ষাগৃহ ফাটিয়া পড়িল। এই ধরণের থিয়েটারের অভিজ্ঞতা হইতেই শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'মেঘনাদবধ' পালার প্রেরণা পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

রাজু ও শরতের দলের থিয়েটারের নেশা কিন্তু কমে নাই। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা আর একটি দল গড়িয়া তোলেন। শরৎচন্দ্র এই দলের অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন। আদমপুর পাড়ার নাম অনুসারে দলটির নাম হইল আদমপুর ক্লাব। রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন এই ক্লাবের প্রাণস্বরূপ। সঙ্গীত ও থিয়েটারে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। অভিনয়ের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি সদলে কলিকাতায় যাইয়া রাতের পর রাত অভিনয় দেখিয়া আসিতেন এবং ভাগলপুরে ফিরিয়া প্রচণ্ড উৎসাহে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেন।

আদমপুর ক্লাবের আবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিল—'দি বেঙ্গলী

টোলা থিয়েট্রিক্যাল ক্লাব।' আর্য থিয়েটার ভাঙিয়াই এই ক্লাবটির উদ্ভব হইল। ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও কুৎসিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া এই দুইটি দল নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিল। আদমপুর ক্লাবকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবটি নাম রাখিল 'A dam poor club.' আদমপুর ক্লাবের স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন ললিত আর রাজু, শরৎ, নরু, শশীরু, মহেন, উপীলা প্রভৃতি ছিলেন উৎসাহী সভ্য। রাজুর ছোড়দা শরৎ মজুমদার ইহার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

আদমপুর ক্লাবে শরৎচন্দ্রের অভিনয় সম্বন্ধে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কিছু কিছু বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের জনার অভিনয়। জনার পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর (তিনকড়ি কি?) অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। অন্তত শরৎচন্দ্রের অভিনয়ে যে গম্ভীর সংযত তেজস্বিতা ও শোকপ্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম কলিকাতার প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা পাই নাই বলিয়াই স্মরণ হয়।' [১]

আদমপুর ক্লাবে অভিনয় সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের আর একজন বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'এই সময়ে আদমপুর ক্লাবে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। এ-অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন রাজা৺শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিবাবার অভিনয় হয়েছিল! শরৎচন্দ্র সে অভিনয়ে নেমেছিলেন—কি ভূমিকায়, আমার তা মনে নেই। পুঁটুকে আর আমাকে বলেছিলেন, থিয়েটার করবো।

তখনকার দিনে এ্যামেচার অভিনয় করতে গেলে কিশোরদের জাত যেতো—বওয়াটে নাম হতো। সেজন্য ভয়ে ভয়ে আমরা বলেছিলুম থিয়েটার করলে সকলে নিন্দে করবে না? হেসে শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন—বয়ে গিয়েছে!

সে-অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি—কারণ গ্রীষ্মের ছুটিতে

১। আমার শরৎদা—ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

কলেজ ছিল বন্ধ এবং সে-বন্ধে আমি গিয়েছিলুম পূর্ণিয়ায়। তবে ফিরে এসে বিভূতির (পুঁটু) কাছে শুনলাম—শরৎদা খাসা অভিনয় করেছিল হে, পেশাদারী থিয়েটারের চেয়ে ঢের ভালো।'

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের প্রতিবেশী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা—শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণরূপে বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতেই শরৎচন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি আদমপুর ক্লাব নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেকশন ছিল এবং সর্বাঙ্গসুন্দর বাংলা নাটক অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। মৃণালিনী, জনা, বিল্বমঙ্গল নাটকের অভিনয়ে শরৎচন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, জনা এবং চিন্তামণির ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়ের সুনাম বর্ধিত করেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অবিচ্ছিন্ন বলিয়া রাজুর (রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার) উল্লেখ করা হয়, তিনি ঐ সব অভিনয়ে মৃণালিনীতে গিরিজায়া, এবং বিল্বমঙ্গলে পাগলিনীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গলের অভিনয় রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ এবং এই পর্যন্ত (ফাল্গুন, ১৩৪৫) তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।'

শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুরে থাকিবার সময় সেখানেও একটি থিয়েটারী দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বিভূতিভূষণ ভট্ট বলিয়াছেন, 'আমরা সে সময় যে পাড়ায় থাকিতাম তাহার নাম খঞ্জরপুর। সেই পাড়ার প্রতিবাসী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া ছোট একটা থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিলেন। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক ও শিক্ষক।

এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত—নদীর ধার হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান, কোন স্থানই বাদ যাইত না। Shakespeare এর Midsummer Night's Dream এর গ্রাম্য অভিনয় চেষ্টার সমস্ত হাস্য ও করুণ রসটা প্রত্যক্ষভাবেই তখন অনুভব করিয়াছিলাম। তখন অবশ্য Shakespeare পড়িবার বয়স নয়, কিন্তু বিশ্বকবি যাহা হয়ত

কল্পনা করিয়াছিলেন আমাদের বেপরোয়া শরৎচন্দ্রের উৎসাহে তাহা বর্তমান কালে স্কুলেই ঘটিয়াছিল।'১

গান ও অভিনয় এই দুইটির চর্চা শরৎচন্দ্র সমানভাবে করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিনয় অপেক্ষা গানেই তাঁহার পটুতা অধিক ছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তীকালে অভিনয়-সাধনার সুযোগ তিনি আর বেশী পান নাই। কিন্তু সঙ্গীতসাধনায় তিনি পরে আরও বেশি কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে তিনি বাঙালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সৌখীন মঞ্চের সহিত যুক্ত ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম জীবনের অভিনেতা শেষ জীবনে নাট্যকাররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হয়তো এই অভিনেতা ও নাট্যকারের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। সেজন্য তাঁহার নাটকগুলি অভিনেয় গুণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চে এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

## সাহিত্য-সাধনা

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্বে পারিপার্শ্বিক যে সমাজ হইতে তিনি সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইংরেজ আমলে চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক বাঙালী আসিয়া ভাগলপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। যে অঞ্চলে তাঁহারা বাস করিতেন তাহা বাঙালীটোলা নামে পরিচিত। তাঁহারা স্কুল, হরিসভা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা ঘটা করিয়া বারোয়ারী পূজার অনুষ্ঠান করিতেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে নানা আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইত।

ক্রমে বাঙালী সমাজের দলাদলি, বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হইল। ১৮৮৪-৮৫ সালে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহার পরিণাম অতি বিষময় হইয়া পড়িল। ভাগলপুরে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রভূত ধন উপার্জন করেন এবং সরকারের

১। আমার শরৎদা—ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। আচার ব্যবহারে তিনি অনেকখানি সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল ছিলেন। তিনি একবার বিলাত গিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পর ভাগলপুরের রক্ষণশীল সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিল। সমাজে পুনঃপ্রবেশের জন্য তিনি প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং তাহারই ফলে পারস্পরিক বিরোধ ও বিবাদে ভাগলপুরের বাঙালী সমাজ দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িল।

রক্ষণশীল সমাজের নেতা ছিলেন গাঙ্গুলী বাড়ির কর্তা কেদারনাথ। কেদারনাথ ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। হিন্দুধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। ধর্মসংস্কার ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন তিনি অন্ধভাবে অনুসরণ করিতেন। শিবচন্দ্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনি। অবশ্য শিবচন্দ্রের সমর্থক যে ছিল না তাহা নহে। নিজেদের প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী কেহ বা কেদারনাথের পক্ষে, আবার কেহ বা শিবচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিত।

শরৎচন্দ্র গোঁড়ামির ভয়ে দমন করিতেন বটে কিন্তু সকল গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ তাঁহার মনে বাসা বাঁধিয়াছিল এবং সুযোগ পাইলেই সেই প্রতিবাদ রক্ত নিশান উড়াইয়া দিত। শিবচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় শ্যালক ছিলেন বাংলা স্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিত কান্তিচন্দ্র। শরৎচন্দ্র কান্তিচন্দ্রের কাছে স্কুলে পড়িয়াছিলেন। কান্তি পণ্ডিতের মৃত্যু ঘটিলে একদল যুবকের সঙ্গে শরৎচন্দ্র শ্মশানে তাঁহার সৎকার করিয়া আসেন। ইহাতে গোঁড়ার দল এই যুবকদের প্রতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজার সময় শরৎচন্দ্র লুচির চ্যাঙারি হাতে ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে পরিবেশন করিতে দেখিয়া একজন গোঁড়া দলপতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শরৎচন্দ্রের সেজদাদা মহাশয় মহেন্দ্রনাথ (উপেন্দ্রনাথের পিতা) ছুটিয়া আসিলেন। দলপতি তখন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'ঐ শরতা হারামজাদা, কান্তিকে পুড়িয়েছিল। ও এসেছে আমাদের জাত মারতে—পাজি, হারামজাদা—'। পরিবেষণের পাত্র রাখিয়া শরৎচন্দ্র বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইংরেজী ১৯০০ সালের কথা। মহেন্দ্রনাথ পীড়িত। সামান্য জ্বর। একদিন একটু রক্ত উঠিয়াছিল। গোঁড়াদলের দলপতিরা খবর পাঠাইলেন,

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা না হইলে শব-সৎকারের সময় গোল হইতে পারে। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইল কয়েকদিন পরে। অষ্টমী তিথিতে তিনি নাকি মারা গিয়াছিলেন, ঐদিন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই, সেজন্য মড়া বাসী হইবেই। শবদাহের জন্য লোক জুটিল না। অথচ শব বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল দূরে বারারির মণ্ট ঘাটে। ছোট কর্তা অঘোরনাথ উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু দমিলেন না। তিনি বলিলেন, হিন্দুশাস্ত্র কামধেনু, যে-ব্যবস্থা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। অবশেষে ব্যবস্থাও মিলিল। প্রায়শ্চিত্ত হইল এবং শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু এই গোলমালের জের চলিল কয়েক বছর ধরিয়া।

সমাজের এইসব নীচতা ও নিষ্ঠুরতা শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শরৎসাহিত্যের সামাজিক চিত্রগুলি লেখকের প্রত্যক্ষ ও বেদনাময় অভিজ্ঞতা হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'অতএব এ-কথা মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হবে না যে উপন্যাসের উপকরণগুলি এমনি করেই সংগৃহীত হ'ত। বাস্তব জীবন থেকে সংগ্রহ করা উপকরণগুলি রূপান্তরিত হ'ত তাঁর লেখায়, এবং এই রূপান্তর অনায়াসে সেগুলিকে সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করে নিত।···

এই দলাদলির কালে এমনি নানা ব্যাপার ঘটেছিল যা শরৎচন্দ্রের লিপিকুশলতায় তাঁর বইগুলির মধ্যে নানা ভাবে, নানা রূপে প্রকাশিত আছে।'

ভাগলপুরে থাকিতে শরৎচন্দ্র যে গল্প ও উপন্যাসগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সমাজের ক্ষুদ্রতা ও হৃদয়হীনতার অনেক চিত্র আঁকিয়াছেন। সম্ভবত ভাগলপুরের এই বাস্তব সমাজকে ভিত্তি করিয়াই 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের মধ্যে এমন একটি সমাজের চিত্র তুলিয়া ধরিলেন যেখানে সমাজের চাপে পড়িয়াই চন্দ্রনাথকে নিরপরাধা স্ত্রী সরযূকে ত্যাগ করিতে হইল। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে লেখক একস্থানে মণিশঙ্করের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, 'সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই, যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পারো। সমাজের জন্য ভেবনা।' সমাজ সম্বন্ধে এই কঠোর শ্লেষ লেখকের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহার লেখনীর মুখে সঞ্চারিত হইয়াছে।

'বড়দিদি' উপন্যাসে তিনি এমন এক সমাজের চিত্র তুলিয়া ধরিলেন যেখানে বিধবা নারী হৃদয়হীন সমাজের বিধান মাথায় লইয়া তাহার নারী জীবনের সমস্ত বাসনা-কামনাকে কঠিন নিষেধের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 'দেবদাসে'র মধ্যে এই সমাজের আর একটি রূপ তিনি উদ্‌ঘাটন করিলেন যেখানে দুইটি অনুরাগে উদ্বেলিত হৃদয় পরস্পরের অত কাছাকাছি আসিয়াও পরস্পরকে পায় না, পার্বতীকে সারাজীবন এক অবাঞ্ছিত স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে হইল এবং দেবদাস কক্ষচ্যুত গ্রহের মত মহাশূন্যতার মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িল।

দেবানন্দপুর হইতে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিবার পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার আগেই শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনা শুরু করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, দেবানন্দপুরে থাকিবার সময়েই তিনি 'কাশীনাথ' ও 'কাকবাসা' উপন্যাস লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাকবাসা' উপন্যাস সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'উপন্যাস লেখার এই বোধকরি আদি-চেষ্টা। এখানি পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে এই বইখানি লিখিতে তাহাকে বহু সময় ব্যয় করিতে দেখিয়াছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত—সে মহানিবিষ্ট মনে লিখিয়া চলিয়াছে। বর্মা যাইবার কয়েকদিন পূর্বে সে তাহার লেখাগুলি আমাদের জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিল। লেখা পছন্দ হয় নাই বলিয়া সে এই বইখানি ফেলিয়া দিয়াছিল।'

সুরেন্দ্রনাথের লেখা হইতেই জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র অন্তত তিনখানা খাতায় এই উপন্যাসটি লিখিয়াছিলেন।

কলেজে পড়িবার সময় শরৎচন্দ্র লেখার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, 'এই সময়ে তাহাকে ইংরেজী উপন্যাস এবং গ্যানোর ফিজিক্স খুব মনোযোগ দিয়া পড়িতে দেখিতাম। তাহাকে স্কট পড়িতে বড় একটা দেখি নাই, কিন্তু ডিকেন্সের সুখ্যাতি সে শতমুখে করিত। মিসেস হেনরি উডের পুস্তকও এই সময়ে সে পড়িতে আরম্ভ করে।'

শরৎচন্দ্রের পড়াশুনা সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'এই সঙ্গে বাংলা ইংরেজী নভেল পেলেই পড়তেন···পড়তেন অভিভাবকদের নজর বাঁচিয়ে। তখন কখানাই বা বাংলা উপন্যাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়ে শেষ করেন। তারপর বাড়ীতে ছিল হরিদাসের গুপ্তকথা···সেখানিও পড়া

হয় বার বার। ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডিকেন্সের লেখা তাঁর খুব ভালো লাগতো। তারপর হেনরী উডের উপন্যাস। তখনকার দিনে হেনরী উড ও মেরী করেলির খুব পসার। মেরী করেলির উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি বলতেন —লেখায় flourish বড় বেশী· সে হিসাবে বস্তু কম। হেনরী উডের উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছিলেন—ঘরোয়া ব্যাপার লেখায় চমৎকার হাত··কিন্তু সব উপন্যাসেই একটা ক'রে খুন-খারাপি চালান সেটুকু ভালো লাগে না। ইস্টলীন এবং মিসেস হ্যালিবার্টন্‌স্ ট্রবলস-এর খুব সুখ্যাতি করতেন। মেরী করেলির Mighty Atom উপন্যাস পড়ে তার প্লটের ছায়ায় তিনি লিখেছিলেন 'পাষাণ' উপন্যাস। ছায়া শুধু নামে—কঠিনহৃদয় পিতা, স্নেহশীলা মা এবং তাঁদের বালকপুত্র। ছেলেকে মানুষ করবার জন্য বাপ এমন গণ্ডী রচনা করে বালকপুত্রকে রেখেছিলেন যে, মা আর ছেলে·· কেউ কারো নাগাল পেতো না। Mighty Atom এর সঙ্গে পাষাণের theme সম্বন্ধে এইটুকুই যা মিল। 'পাষাণে'র ব্যঞ্জনা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিশিষ্ট ছাপ পেয়ে 'পাষাণ' সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে গড়ে উঠেছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর লেখা 'পাষাণ' উপন্যাসের কাপি হারিয়ে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না।'

শরৎচন্দ্র গল্প-উপন্যাস ছাড়া বিজ্ঞানের বইও যে পড়িতেন তাহাও সৌরীন্দ্রমোহনের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়, 'বই পড়তেন—মোটা মোটা ইংরেজী বই। একবার সে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়েছিলুম— ইংরেজী ফিজিওলজির বই, বায়োলজির বই—এই সব বই পড়তেন, বটানি পর্যন্ত বাদ ছিল না।'

তাঁহার অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র সে সময় যে সকল ইংরেজী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়িতেন তাহা এখনও আমার মনে আছে। মিসেস হেনরী উড এবং ম্যারি করেলির উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং লর্ড লিটনের প্রতিও যে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল তাহারই প্রমাণ তিনি দিয়া গিয়াছেন লিটনের My Novel এর ধরণে শ্রীকান্তের পর্বের পর পর্ব চালাইয়া।…

বাল্যজীবনে শরৎদাদা যে-সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশি করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস ডিকেন্স বোধ হয় তাঁহার কাছে বেশি আদর

পাইয়াছিলেন। অনেকদিন ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে সেখানে এবাড়ী ওবাড়ী পর্যন্ত করিতে দেখিয়াছি। মিসেস হেনরী উডের ইস্টলীন খানিও প্রায় তদ্রূপ আদরই পাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখার মধ্যে ডিকেন্স বা উডের লেখার তেমন প্রভাব দেখা গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। বোধ হয় মধ্য বয়সে কলিকাতা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারই ফল তাহার লিখিত উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।'[১]

শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের লেখা উদ্ধৃত করিয়া তিনি যে সব বিদেশী গ্রন্থ পড়িতে ভালোবাসিতেন তাহার বিবরণ উপরে দেওয়া হইল। সকলেই বলিয়াছেন যে, হেনরী উড, ম্যারি করেলি ও চার্লস ডিকেন্স তাঁহার প্রিয় লেখক। শরৎচন্দ্রের উপরে এই তিনজন লেখকের প্রভাব যে ভাগলপুরেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, ব্রহ্মদেশে অবস্থান কালেও যে ইঁহারা শরৎচন্দ্রের কাছে সমান প্রিয় ছিলেন তাহা আমরা পরে দেখাইব। হেনরী উডের East Lynne (তিন খণ্ড), Mrs Halliburton's Troubles প্রভৃতি উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভাগলপুরে লেখা 'অভিমান' এবং পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশে রচিত 'বিরাজ বৌ'-এর উপরে East Lynne এর প্রভাব সুস্পষ্ট। ম্যারী করেলির The Mighty Atom ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। শরৎচন্দ্র এ বইয়ের প্রকাশের দুই এক বছরের মধ্যেই ইহা পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার অনুবাদ করিয়াও শেষ করিয়াছিলেন ইহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ডিকেন্সের প্রভাব শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর ও ব্রহ্মদেশে লিখিত গল্প-উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইবে। 'দেবদাস' চরিত্রের মধ্যে A Tale of Two Cities উপন্যাসের সিডনি কার্টন চরিত্রের ছায়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ডিকেন্সের গভীর সহানুভূতিশীল জীবনদৃষ্টি এবং হাস্য ও করুণরসের প্রতি সমপ্রবণতা—এ-সব দিক দিয়াও শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে।

বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই শরৎচন্দ্রকে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের নিজের কথাই উদ্ধৃত করা যাক, 'আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি

১। আমার শরৎদা, ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৪৪

এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি, বাড়ীর মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতিশোধ। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এল। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়।· · এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো বঙ্গদর্শনের যুগ। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নতুন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। একদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ঐ ক'খানা বইয়ের পাতা, তার মধ্যে দিয়ে এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া তাহার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা তিনি কথাপ্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন—'বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল প'ড়ে কলেজে পড়বার সময় সেই বয়সে তার যা মনে হয়েছিল ·· বলেছিলেন, রোহিণীকে গুলি করে মারা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বেচারী রোহিণী· তার কি অপরাধ হয়েছিল গোবিন্দলালকে ভালোবাসার জন্য। গোবিন্দলাল যদি তাকে না ভোলাতো তা হলে রোহিণীর এ-ভালোবাসা রোহিণীর মনে গোপন থাকতো। আর বেচারী কুন্দনন্দিনী। নগেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রিতা· অতি

নিরীহ ভালোমানুষ—তাকে বিয়ে করলে যদি তো নগেন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে-চকিতে অমন নির্বিকার হলেন কেন? এটা কি মানুষের কাজ?'

সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ কি ছিল তাহাও সৌরীন্দ্রমোহনের উক্তি হইতে জানিতে পাবা যায়, 'তিনি বলতেন শুধু শাস্ত্র আর উপদেশ দিয়ে মানুষকে মানুষ করা যায় না·· ···দরদ নিয়ে মানুষকে বোঝা চাই। তা ছাড়া নভেলিষ্ট আর মরাল প্রীচার—দুজনের কাজ এক নয়। নভেলিষ্ট শুধু সকলের সামনে ধরবেন—সমাজ বলো, ধর্মাচার বলো, নীতি বলো· এসবের দোষত্রুটির জন্য মানুষ কতখানি ব্যথা-বেদনা নিগ্রহ ভোগ করছে। তাই পড়ে যাঁরা সমাজতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা চিন্তা করুন· সে সব দোষত্রুটি কি করে দূর ক'রে মানুষকে সুখী করা যায়, তার উপায় বাৎলে দিন।

• এ-কথা তিনি প্রায় বলতেন—যদি উপন্যাস লেখো মরালিষ্ট সেজো না। দোষেগুণে মানুষ যা, সেইভাবে তার কথা লিখো এবং উপদেষ্টার আসন নিয়ো না কখনো। উপন্যাস লেখবার সময় তাঁর এ-কথা আমি পারত পক্ষে ভুলিনি।'[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব এবং তাঁহার তৎকালীন সাহিত্যাদর্শের কথা মনে রাখিবা তাঁহার তৎকালীন সাহিত্য রচনা বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্ধ অনুকরণের কথা তিনি যাহা নিজে স্বীকার করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে 'বোঝা', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্পে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রভৃতি উপন্যাসে বিধবার ভালোবাসার যে সমস্যা আলোচিত হইয়াছে তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি' উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। বিধবাজীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই যে শরৎচন্দ্রকে অধিকতর প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা এই উপন্যাসের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র সাহিত্য সাধনা করিতেন অত্যন্ত গোপনে। নিকটতম বন্ধুবান্ধবকেও এ-সম্বন্ধে তিনি কিছু জানিতে দিতেন না। তিনি যখন সাহিত্যসাধনা শুরু করিয়াছিলেন তখনও ইংরেজী ভাষার চর্চা করাই ছিল শিক্ষিত লোকদের

১। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ৯৯

ফ্যাসান। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুরাগ বশত তিনি অবহেলিত মাতৃভাষার সেবা করিয়াই সুখ পাইতেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুরাগী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও সাহিত্যচর্চার উৎসাহ আসিয়া গেল। স্কুলে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার কোন অনুকূলতা ছিল না, বরং প্রতিকূলতা ছিল বিস্তর। তবুও বড়দের নিষেধ সত্ত্বেও ছোট ছোট কয়েকটি সাহিত্যিক কুঁড়ি সেদিন বিকাশের আশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। হাতেলেখা একটি পত্রিকা বাহির হইল। তাহার নাম হইল 'শিশু'। 'শিশু' গিরীন্দ্রনাথের অঙ্গুলীযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। শুধু তাহাই নহে, সে ছিল ইহার চিত্রকর ও সম্পাদক। কবিযশঃপ্রার্থী কয়েকটি কিশোরের কবিতা তাহাতে বাহির হইত। ভাব ও ভাষা যাহাই হউক না কেন, কবিতাগুলিতে ছন্দের ভুল ধরিবার উপায় ছিল না, যেমন—

বাঁদর—বাঁদর।
ছিঁড়লি কেন চাদর?
বাঁদর রূপী রূপী!
পরেছিস কেমন টুপি?
বাঁদর বাঁদর—কেন,
খেয়েছিস ফেন?

'শিশু'র মধ্যে যে সব গল্প-উপন্যাস বাহির হইত সেগুলির মধ্যেও বাঁধন ছেঁড়া কল্পনা উদ্দাম পাখা মেলিয়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত। 'শিশু'র সম্পাদক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট দিনে পত্রিকা বাহির করিয়া যাইত।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু সতীশচন্দ্র মিত্র 'আলো' নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বন্ধুদের কাছে লেখা চাহিলেন। সকলেই উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু 'আলো'র প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরেই সতীশচন্দ্র হঠাৎ মৃত্যু-কবলিত হইলেন। আলো চির অন্ধকারে নির্বাপিত হইয়া গেল।

মাতা ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর খড়্গপুর আসিয়া শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে সাহিত্য-আলোচনা শুরু করিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার 'বোঝা' 'বিচার', 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্পগুলি লেখা শেষ করিলেন। 'বোঝা' গল্পটি

সুরেন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'অভিমান' নাম দিয়া 'ইস্টলীনে'র অনুবাদ করিলেন। তেজনারায়ণ কলেজের ইংরেজী অধ্যাপক বইখানা পড়িয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন।

'অভিমান' সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'শুনেছি এবং নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অল্প বয়সের ধারণাগুলি মানুষের মনে এমন গভীর দাগ কেটে বসে যে, তা সহজে মুছতে চায় না। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসখানি দিয়ে হাত পাকিয়েছিলেন। অভিমানের লেখার ছাঁদ তাঁর অনেক বইতেই আছে।

মনে হয়, সে বয়সে (২১।২২ বছর) তাঁর জীবনে মান-অভিমানের খেলা চলেছিল। তাই 'ইস্টলীন' তার মনকে এমন জুড়ে বসেছিল যে, তা, অনুবাদ না ক'রে আর কিছুতেই থাকতে পারেন নি।'[১]

'অভিমান' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজে শেষজীবনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল, 'ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নেই। শুধু দু'খানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা 'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেকবন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেকদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।' এখন তিনি এক ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা। বইখানা কি করিলেন তিনিই জানেন—কিন্তু চাহিতে ভরসা হয় না—তার সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি। এখন তিনি নাগালের বাহিরে—মহাপুরুষ—ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা।'[২]

মাতুলালয় হইতে খঞ্জরপুরে চলিয়া আসিবার পর শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনধারা এবং হৃদয়ঘটিত ব্যাপারগুলি তাঁহার সাহিত্যের উপাদান জোগাইয়াছিল, ইহা মনে রাখা দরকার। যখন তিনি বনেলিরাজের এস্টেটে কাজ করিতেন তখন তাঁহাকে দিন কতক শহরে থাকিতে হইত আবার দিন কতক মফঃস্বলে টুরে যাইতে হইত। যে বাড়ীতে তাঁহারা থাকিতেন তাহার লম্বা বারান্দা ঘিরিয়া যে ঘরখানি ছিল তাহাতেই শরৎচন্দ্র বাস করিতেন। ঘরে

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃঃ ৮
২। ছোটদের মাধুকরী, আশ্বিন, ১৩৪৫

ছিল দড়ির একটি খাটিয়া আর একটি দোভাঁজ টেবিল। লেখার সময় টেবিলের যে ভাঁজটি ঝুলিয়া থাকিত তাহা সোজা করিয়া লেখার কাজ চালান হইত। টেবিলের উপরে সাজান থাকিত হেনরী উড, ম্যারী করেলি, ডিকেন্স প্রভৃতি লেখকের বই। লেখার সাজ সরঞ্জাম ছিল দোয়াত, রেড ইঙ্ক আর কুইল পেন। রাজুর হাতের তৈরী একটি তেপায়া চেয়ারও ছিল। মাটির ঘর, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বাড়িতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে থাকিতেন মতিলাল, প্রভাস, প্রকাশ ও কচি বোন মুনিয়া। সংসারের ভার ছিল দাইয়ের উপরে। সে রান্না করিত আবার বুকের স্তন্য দিয়া মুনিয়াকে মানুষও করিত। সংসারের দায়িত্ব শরৎচন্দ্র নিতে চাহিতেন না। নির্দিষ্ট টাকা দিয়াই তিনি খালাস। না কুলাইলে মতিলালকেই ধার করিতে কিংবা ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হইত।

সংসারের নিত্য অভাব অনটন শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে কোন স্পর্শ আনিত না, সেখানে রসের প্লাবন বহিয়া যাইত। শরৎচন্দ্রের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'মনে হয়, শরতের সেটি প্রেমে পড়ার যুগ চলছিল। সেই নবীন প্রেমের দয়িতা যে কে তা ঠিক করা সোজা নয়। বিশেষ করে যার পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতিটা অজানা বা নতুন। তবে সে যে প্রেমে পড়ার ব্যাপার তা বুঝে নেওয়া শক্ত ছিল না।······

বুঝলাম শরৎ ডুবে গিয়ে নীরদা বলে কোনো একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। উচ্ছ্বাস-মেশা সে যে কত গল্প আজ তা মনে করা শক্ত। একটা তেজী ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন তীর বেগে অন্ধকার সাঁওতাল পরগণার পথ দিয়ে শরৎচন্দ্র! কোনো কথা মনে নেই, শুধু এই মনে আছে যে নীরদা তাঁর জন্যে রাত জেগে প্রতীক্ষা করছে। হঠাৎ ঘোড়াশুদ্ধ নদীতে পড়ে গেলেন তিনি। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিজে কাপড়ে, ভিজে ঘোড়ায় চলেছেন নটবর নায়ক পবন গতিতে। সে দিন সবাই বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আজ বুঝি যে, বোকা বোঝান ছাড়া আর কিছুই নয়। গল্পের প্রেমে পড়ার অংশ-টুকুই বাস্তব—আর বাকি ঘোড়া, নদীর জলে লাফিয়ে পড়া, ভিজে কাপড়ে প্রিয়ার কাছে পৌছান, এসবই কথাশিল্পীর অনৃতসৃষ্টি। যাদুকরের কাছে দর্শকের চোখে ধুলো দেওয়ার আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, তেমনি বিশ্বাসী শ্রোতার কাছে কথার মায়াজাল সৃষ্টি করে কথকের আনন্দ আছে। সেদিন আমার

আগ্রহ এবং ধৈর্যের খরচে শরৎচন্দ্র সেই ধরণের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই সময়ের লেখাগুলি অভিনিবেশ সহকারে পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁর নায়িকারা কতকটা একই ছাঁচের। তাদের বুকে আগুন, মুখে দেবীপ্রতিমার মত পাষাণ কঠিনতার ছাপ। তাদের বুক ফাটে, কিন্তু মুখ ফোটে না। শরৎচন্দ্র প্রেমের তপ্ত ইক্ষু চর্বণ করেছিলেন। সে প্রেমের ক্ষুধা গড়ুরের ক্ষুধার মতই ছিল বিরাট। বাস্তব জীবনের অতৃপ্তি সাহিত্যে মধুর কূজন গান করে উঠল। মনে হয় নীরদার সঙ্গে মিলন ঘটেনি, তাই বোধ হয় প্রেমের অতৃপ্ত ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হল এবং বাংলা সাহিত্যও লাভবান হল তাঁর ব্যক্তিগত অতৃপ্ততা থেকে।'

উপরে বর্ণিত শরৎচন্দ্রের প্রেমকাহিনী যে সমসাময়িক কালে লিখিত 'বড়দিদি' ও 'দেবদাসে'র মধ্যে ছায়াপাত করিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। প্রত্যেক লেখকই নিজেকে অবিস্তর তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শরৎচন্দ্র নিজের বেদনা ও ব্যর্থতার রসে 'বড়দিদি' ও 'দেবদাসে'র কাহিনী অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঘোড়ায় চড়িয়া দয়িতার কাছে যাওয়ার যে রোমাঞ্চকর কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তব জীবনে হয়তো ঘটে নাই, কিন্তু বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথের জীবনে তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। নীরদা যে পার্বতী ও মাধবীর মধ্যে চির কালের জন্য বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ জনের উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি। বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁহার হৃদয়ের গোপন কাহিনী খুলিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামই দিলেন 'বড়দিদি'র নায়ককে। আসলে নায়ক সুরেন্দ্রনাথ অনেকখানি তিনি নিজেই, যেমন দেবদাসও অনেকটা তাঁহারই আত্মকাহিনী।[১]

খঞ্জরপুরে থাকিবার সময় বিভূতিভূষণ ভট্টের (ডাক নাম পুঁটু) পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। বিভূতিভূষণের মেজদা ইন্দুভূষণ ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী। স্বয়ং বিভূতিভূষণ ছিলেন শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু এবং এবং ভগ্নী নিরুপমা দেবী ছিলেন তাঁহার স্নেহপাত্রী সাহিত্যিক শিষ্যা। শরৎচন্দ্রের বাড়ির কাছেই বিভূতিভূষণের পিতা

---

১। সৌরীন্দ্রমোহনও লিখিয়াছেন, 'বড়দিদির সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আমি প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলুম · সুরেন্দ্রনাথ তবু বহু আদরে লালিত, শরৎচন্দ্র তার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে।' —শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ১০৫

সবজজ্জ নফরচন্দ্র ভট্টের বিরাট অট্টালিকাটি অবস্থিত ছিল। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে তিনি চুঁচুড়া হইতে বদলী হইয়া ভাগলপুরে আসেন। খঞ্জরপুরে থাকিবার সময় শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ সময় কাটিত বিভূতিভূষণের বাড়িতে। তাঁহাদের বাড়ির পাশেই ছিল একটি প্রকাণ্ড মোসোলেম বাড়ি। হয়তো সেটি কোন বড়লোকের গোরস্থান ছিল। সেই বাড়ির ছাদখানি ছিল মাঠের মত বড়। সেখানে শরৎচন্দ্র ও তাঁহার দলের আড্ডা, গান ও অভিনয়ের মহড়া চলিত।

বিভূতিভূষণের পরিবারের সঙ্গে কিভাবে শরৎচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হইলেন তাহা নিজেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন: 'কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানাশুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয় সে সব কথা আমার ভালো মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছু মাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশী যে, ইহাদের গৃহে দাবা খেলার অত পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবাখেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।'[১]

ভট্টপরিবারের বাড়ীতে শরৎচন্দ্র কিভাবে দিন কাটাইতেন তাহার একটি চিত্র দিয়াছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 'পুঁটুর বসবার ঘরে বড় টেবলের সামনে চেয়ারে বসে দেখি, এক শীর্ণকায় ভদ্রলোক। যেন বহুকাল রোগ ভোগ করেছেন এমন চেহারা। মাথার দীর্ঘ পাতলা কেশ অবিন্যস্ত—মুখে অবিন্যস্ত কতকগুলো পাতলা দাড়ি। ভদ্রলোকের সামনে টেবিলের উপর মোটা বই খোলা—তিনি নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন, মাঝে মাঝে মাথার কেশরাশির মধ্যে দু'হাতে অঙ্গুলি চালনা করে কি যেন ভাবচেন। আমাদের ছোটর দলে এ ভদ্রলোকটিকে দেখে আপনা থেকেই মনে কেমন সম্ভ্রম জাগলো।

শরৎচন্দ্রের 'বোঝা', 'কাশীনাথ,' 'অনুপমার প্রেম,' 'সুকুমারের বাল্যকথা' প্রভৃতি ১৯০০ খৃস্টাব্দের আগেই রচিত হইয়াছিল। কারণ ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে বিভূতিভূষণ সৌরীন্দ্রমোহনকে 'বাগান' নামক ঐ গল্পগুলির সংকলন খাতা পড়িতে দিয়াছিলেন।

১। বাল্যস্মৃতি—ছোটদের মাধুকরী, আশ্বিন, ১৩৪৫

ভট্টবাড়িতে সৌরীন্দ্রমোহন যখন শরৎচন্দ্রকে দেখেন তখন তিনি 'কোরেল' গল্পটি লিখিতেছিলেন।

সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'মনে পড়ে কোরেল গল্প লিখছিলেন। সে গল্পটি জন্মের মতো হারিয়ে গিয়েছে।[১] ছাপা দেখিনি। লেখবার সময় বলতেন—বিলাতী পাত্রপাত্রী নিয়ে গল্প লিখছি, বড় গল্প। ট্রানস্লেশন নয়—original.

সে গল্পটির কিছু কিছু আজো মনে আছে। ডার্বি খেলাকে কেন্দ্র করে তরুণ জকি, কিশোরী নায়িকা—ভালোবাসার গল্প—বড় সসপেন্সবিজড়িত অপূর্ব গল্প—মনস্তত্ত্বের কি সহজ সুন্দর বিশ্লেষণ। আধুনিক কোনো ইংরেজ লেখকের লেখনীতে আজ পর্যন্ত তেমন গল্প বেরুতে দেখিনি।

'কোরেল' গল্পের পর লিখিলেন ম্যারী করেলির **Mighty Atom** অবলম্বনে 'পাষাণ'। 'পাষাণ' গল্পটি সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] 'কোরেল' ও 'পাষাণে'র পর লিখিলেন প্রথম যুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ বড়গল্প—বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস'। সৌরীন্দ্রমোহন বলিয়াছেন, 'বড়দিদি'র শেষে একটি লাইন ছিল, 'পরলোকে সুরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে মাধবীকে একটু স্থান দিয়ো ভগবান।' এই লাইনটি সৌরীন্দ্রমোহনের আপত্তিতে শরৎচন্দ্র বর্জন করেন। সৌরীন্দ্রমোহনের ভাষায়, 'এই লাইনটি নিয়ে আমি মহা তর্ক তুলেছিলুম। বলেছিলুম—লেখক হয়ে তোমার এ মমত্বের আবেদন কেন? ও নিবেদনটুকু রাখো আমাদের জন্য। তুমি ও কথা কেটে দাও। তুমি এখন প্রকাশ্যভাবে কোনো পাত্রপাত্রীর পক্ষ নেবে না। প্রায় দু'মাস পরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—শুনে খুশী হবে সৌরীন, শেষের লাইনটি আমি কেটে দিয়েছি।

সে দুটি লাইন 'বড়দিদি' গল্পে কস্মিনকালে ছাপা হয় নি।'

ভাগলপুরে লেখা শরৎচন্দ্রের শেষে গ্রন্থ হইল 'শুভদা'। শরৎচন্দ্র নিজে

১। 'কোরেল গল্পটি হারাইয়া গিয়াছিল, এ-কথা ঠিক নহে। খুব সম্ভবতঃ সুরেন্দ্রনাথের কাছে 'কোরেলে'র কপি ছিল। 'কোরেল' 'বাগানে'র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৯, ৮, ১৩ তারিখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'শুনছি অমুন পত্রিকা আমার কোরেল গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে—তবে বেনামি ছাপাবে এ সর্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। সেটা নাকি ভাল গল্প। কি জানি, আমার ভাল মনেও নেই।'

২। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'মনে হয়, এ বই-এর অনুবাদকাল ইংরাজি ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে কোনো সময়।'

বলিয়াছেন, 'প্রথমযুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।'[১]

উপরে যে লেখাগুলির উল্লেখ করা হইল সেগুলি ১৯০০ হইতে ১৯০১ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ভাগলপুরের অধিকাংশ লেখা তিন খণ্ড 'বাগানে' সংকলিত ছিল। প্রথম খণ্ড—'বোঝা', 'কাশীনাথ,' 'অনুপমার প্রেম,' 'সুকুমারের বাল্যকথা'। দ্বিতীয় খণ্ডে—'কোরেল,' 'বড়দিদি' ও 'চন্দ্রনাথ'। তৃতীয় খণ্ডে 'দেবদাস।' ভাগলপুরে লেখা 'কাকবাসা,' 'অভিমান,' 'পাষাণ' ও অসমাপ্ত গ্রন্থ 'শুভদা' 'বাগানে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। 'শুভদা' ছাড়া পরবর্তীকালে অপর তিনটি গল্প আর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। 'বাগানে'র লেখাগুলি শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন তখন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার প্রাথমিক শিষ্য দুইজন হইলেন বিভূতিভূষণ ও নিরুপমা দেবী। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, 'তাই গোপনে সে ভারতীর সেবা করিতে লাগিল এবং সেই গোপন সাধনার দুই অন্তরঙ্গ সেবায়েৎ জুটল পুঁটু এবং তাহার ভগ্নী নিরুপমা।' শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ ও তঁহার ছোট ভাই গিরীন্দ্রনাথ স্কুলে পড়িবার সময় সাহিত্য-সাধনা শুরু করিয়াছিলেন এবং 'শিশু', 'আলো' প্রভৃতি হাতে লেখা পত্রিকায় তাঁহারা লিখিতেন, এ-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য-সাধনায় প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহারা সাময়িক অনুপস্থিতির পরে পুনরায় ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলেন তখনই তাঁহারা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার অনুরক্ত শিষ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, আমাদের কলিকাতায় থাকিবার সময়ে শরৎ ভাগলপুরে সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিল। আমাদের আসিয়া যোগ দেওয়াতে তাহা অনেকটা পুষ্টকলেবর হইল।'

ভাগলপুরে যে সাহিত্যসভা স্থাপিত হয় তাহার সভ্য সংখ্যা ছিল ছয়, যথা, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, যোগেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সাহিত্য-সভা কবে স্থাপিত হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত রহিয়াছে।

---

১। ছোটদের মাধুকরী—আশ্বিন, ১৩৪৫

শরৎচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন, 'ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না।' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সাহিত্য-সভা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইটি উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, ভাগলপুরে সাহিত্য-আলোচনা শরৎচন্দ্র প্রথম বিভূতিভূষণ ও নিরুপমা দেবীর সঙ্গেই শুরু করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার নিভৃত সাহিত্য-সাধনা তাহার পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তি মোটেই সত্য নহে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র ভাগলপুর গেলেন এবং তখন তিনি অতি গোপনে তাঁহার 'কাকবাসা' গল্পটি লিখিতেন। সাহিত্য-সভা স্থাপনের প্রশ্ন তখন উঠিতেই পারে না। এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়, 'অনেকে লিখেছেন, ১৮৯৪ সালে ভাগলপুরে সাহিত্য-সভার সৃষ্টি এবং হস্তলিখিত মাসিকপত্র ছায়ার আবির্ভাব। এ-কথা ঠিক নয়…কেননা ছায়া এবং সাহিত্য-সভার সৃষ্টি ১৯০১ সালে।' সুরেন্দ্রনাথও সাহিত্য-সভা স্থাপনের যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সৌরীন্দ্রমোহনের উক্তিই সমর্থন করে।

সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে বলিয়াছেন, 'আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভার গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোনকালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জন মাঠের মধ্যে বসিত। জানা আবশ্যক যে, সে সময়ে সে দেশে সাহিত্য চর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সবচেয়ে ভালো, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক পত্র ছায়ায় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, ছায়ার সম্পাদক[১] ও অঙ্গুলি যন্ত্রে অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর।'[২]

সাহিত্য-সভা সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল, 'সাহিত্য নির্মাণ করা আমাদের এই ক্ষুদ্র সভাটির কাজ কিংবা উদ্দেশ্য ছিল না। অন্তত

১। ছায়ার সম্পাদক ছিলেন যোগেশচন্দ্র মজুমদার, গিরীন্দ্রনাথ নহেন।
২। বাল্যস্মৃতি—ছোটদের মৌধুকরী—আশ্বিন, ১৩৪৫

যিনি ইহার সভাপতিরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিভা, যতদূর জানি, নির্মাণের উপযোগী নহে। এই সভাটিতে সাহিত্যস্জনের চেষ্টাই চলিয়াছিল—সাহিত্য যে কি, তাহা সত্য করিয়া উপলব্ধি এবং হৃদয়ঙ্গম করাই ছিল আমাদের কাজ। এই সভার কোন সভ্য সাহিত্যের ব্যাকরণ কি অভিধান লিখিবার দুরাকাঙ্ক্ষা রাখিত না। ইহাতে ইতিহাস কিংবা প্রত্নতত্ত্বের দুরূহ গবেষণার কোন উদ্যম একদিনের জন্যও দেখা যায় নাই। কবিতা কিংবা গল্পলেখাই ছিল সভ্যদের কাজ। সভাপতি কবিতার বিষয় ঠিক করিয়া দিলে সাতদিনের মধ্যে সভ্যদের তাহা লিখিয়া তৈয়ারী করিতে হইত এবং সভায় নিজে নিজের লেখা পড়িয়া শুনাইতে হইত। নিরুপমার লেখা শরৎ পড়িত।

সভাপতির আর এক কঠিন কাজ ছিল, লেখার বিচার করিয়া তাহাতে নম্বর দেওয়া। প্রায় সকল কবিতায় নিরুপমা হইত প্রথম। লেখার সম্বন্ধে লেখার একটা অপরিহার্য মমতা জন্মায়—তাহা যে কত বড় অন্ধতা আনিতে পারে—সে শিক্ষাও আমাদের এই সময়ে হইয়াছিল।'[১]

সাহিত্যসভার বিভিন্ন সভ্যদের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতে পারে। বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন, 'সাহিত্যসভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমজদার সমালোচক ও তেমনি।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় কিভাবে গড়িয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন। আমাদের সঙ্গে সহপাঠীরূপে দেখা হয় নাই—দেখা হইয়াছিল শাস্তা-আদেশদাতা রূপে।..

শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ-জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত ল্যাড়া নামে অভিহিত...আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা-যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।'[২]

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে; ক্ষুদ্রকায় একটি যুবক তাহার অযাচিত প্রেমের ডালি বহন করিয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি—

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃঃ ৮৫-৮৬
২। আমার শরৎদা, ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'তাহার জিহ্বাগ্রে—শরৎকালের শেফালি ফুলের মতই কবিতা ঝর ঝর করিয়া অজস্র ঝরিতেছে।..

সাহিত্য এবং শরৎকে অবলম্বন করিয়া আমাদের বন্ধুত্ব অল্পদিনের মধ্যেই প্রগাঢ় হইল। পুটু তখন শেলী, কীটস, বায়রণ, টেনিসন সব পড়িয়াছে, বেদ-ব্রহ্ম, গীতা-উপনিষদ কিছুই বাকি নাই, হার্বার্ট স্পেন্সার, মিল, হেগেল, মার্টিনোর কথাও তাহার কাছে প্রথম শিখি। যেদিন বলিল যে, সে নাস্তিক সেদিন ভয়ে আমার জিভ হইতে পেটের নাড়ি পর্যন্ত যেন শুকাইয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে যেন দেখিলাম যে, নরকের অগ্নিতে স্বয়ং যমরাজ নির্দয় গদাঘাতে তাহাকে পীড়ন করিতেছেন। তাহার সহিত তর্কে পারিয়া উঠিবার কোন উপায় ছিল না, সে জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। পরম ঈশ্বর বলিয়া যদি কিছু স্বীকার করিতে হয় তো সে প্রোটোপ্লাজম। তাহার পর, সেই তত্ত্ব লইয়া এক কঠোর প্রবন্ধ লিখিল—তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া রহিল, মুখে কথা যুটিল না।

কিন্তু মূঢ়তার এত পরিচয় পাইয়াও পুটু আমাদের ত্যাগ করিল না। আমরাও তাহাকে কিছুতেই গুরুর পদে সমাসীন হইবার মত আমল দিলাম না। তাহার অপরিসীম স্নেহপ্রবণ হৃদয় দিয়া সে নিত্যই আমাদের আপনার করিয়া লইতে লাগিল।'

বিভূতিভূষণের এই লিপু। অধ্যয়ন, চিন্তাশীলতা এবং স্বাধীন চিত্তবৃত্তির জন্য শরৎচন্দ্র তাঁহাকে শুধু স্নেহ করিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন। বেশ কয়েক বছর আগে একবার বহরমপুর কলেজে গিয়া সেখানকার অধ্যাপক বিভূতিভূষণের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। শীর্ণ ও স্বল্পভাষী লোকটিকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না যে জ্ঞানের কি উজ্জ্বল শিখা তাঁহার মধ্যে জ্বলিতেছে। শেষ-জীবনে বিভূতিভূষণ খ্যাতি ও প্রচারের প্রকাশ্য মঞ্চ হইতে বিদায় নিয়া শান্ত নেপথ্যলোকেই বাস করিতেন।

সাহিত্যসভার একমাত্র মহিলা সদস্য নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছে নিরুপমা দেবী কিভাবে পরিচিত হইলেন তাহা তিনি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, 'আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানিনা (মেজদা ইন্দুভূষণ ভট্ট বোধ

হয় তাঁহাকে আদমপুর ক্লাবেই প্রথম জানেন। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শরৎচন্দ্র (মেজদা কিন্তু ইহাকে নেড়া বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।)—তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক ও সমালোচক। ইহার অল্পদিনের মধ্যেই মেজভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর সাহিত্যচক্রে (যাহাতে তদানীন্তন বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখকদিগের গল্প উপন্যাস এবং কাব্য কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইত সেইখানে) হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম অভিমান। শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক।'

১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নিরুপমা দেবী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আর একজন যশস্বিনী লেখিকা অনুরূপা দেবীর সহিত তাঁহার 'গঙ্গাজল সই' সম্পর্ক পাতান ছিল। ভট্টপরিবারে লেখিকা হিসাবে নিরুপমা দেবীর বেশ একটু খ্যাতির ছিল। তাঁহার কবিতা পড়িয়া শরৎচন্দ্র মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, ''আরো যাও দূরে থামিও না আপনার সুরে।' সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'তাঁর এ-কথায় নিরুপমা দেবী বহু উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং ১৯০০ সালে আমি দেখেছি, অজস্র লেখা তিনি লিখছেন। শুধু কবিতা নয়, ছোট গল্পও সেই সঙ্গে। তাঁর লেখার মাধুর্য বাংলা সাহিত্যরসিকরা বিশেষরূপেই স্বীকার করেন। তাঁর গল্প লেখার মূলেও শরৎচন্দ্রের প্রেরণা। বিভূতির দাদা ইন্দুভূষণকে তিনি বলতেন—বুড়ি (নিরুপমা দেবীর ডাক নাম) যদি চেষ্টা করে তো গল্পও লিখতে পারবে।'[১]

শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীর সাহিত্যসাধনার গুরু হওয়া সত্ত্বেও দুইজনের মধ্যে কিন্তু গোড়ার দিকে মৌখিক আলাপ ছিল না। নিরুপমা দেবীর স্বামীর শ্রাদ্ধতিথি উপলক্ষে কিভাবে দুইজনের ভিতরকার লজ্জা সঙ্কোচের ব্যবধানটি অপসারিত হইল তাহা নিরুপমা দেবী বলিয়াছেন, 'আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে একটা শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে।

শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য—পৃঃ ১২৭

যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অববোধপ্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইযাছিলেন।'১

নিরুপমা দেবীকে শরৎচন্দ্র যে কতখানি স্নেহ করিতেন, তাঁহার উপরে কতখানি আশাভবসা রাখিতেন তাহা দুইখানি পত্রে তিনি লিখিযাছেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৯। ৭। ১৯ তাবিখে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদবাব অধিক একজন আছে। তাহাব নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসাবে সে আপনাব বোধ কবি অপরিচিত নয। দিদি, অন্নপূর্ণাব মন্দিব, বিধিলিপি ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ এই মেয়েটাই একদিন যখন তাহাব যোল বৎসব বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবাবে কাঠ হইযা গেল, তখন আমি তাহাকে বাব বাব কবিয়া এই কথাটাই বুঝাইযাছিলাম, 'বুড়ি, বিধবা হওযাটাই যে নাবীজন্মেব চবম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহাব কোনটাই সত্য নয। তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহাব সাহিত্যে নিযুক্ত কবিযা দিই, তাহার সমস্ত বচনা সংশোধন কবি এবং হাতে ধবিযা লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে। শুধু মেয়ে মানুষ হইয হ নাই।'

লীলাবাণীকে ৭ই ভাদ্র, ১৩২৬ সালে লিখিত আব একখানি পত্রে তিনি নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে যেন একটু হতাশা ব্যক্ত কবিযাই লিখিলেন, 'বুড়িব ওপব আমাব ভাবি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা দিদি ছাড়া আব কিছুই লিখতে পাবলে না। কেন জানো? বাব ব্রত, জপ-তপ ইত্যাদি জ্যাঠামিব আগুনে ভিতবে তাব যা' কিছু রস ছিল বয়সেব সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যেব জন্যেই। না হলে আমাদেব ঘবেব কোন মেয়ে আব এ সব ব্যাপাব কিছু কিছু না কবে?'

সাহিত্যসভাব আর একজন সভ্য যোগেশচন্দ্র মজুমদাব সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই দলেব মধ্যে এখানে একজনেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে চাই। সাহিত্যে তাহাব বসবোধের অবধি ছিল না। কিন্তু লেখক সম্প্রদায়েব মধ্যে তাহাকে টানিযা আনিতে কোন দিনই পারা গেল না। যোগেশ আমাদের ছায়া কাগজেব গুরুগম্ভীর সম্পাদক ছিল। পুঁটু তাহাব নামে একটি ছড়া বানাইয়াছিল তাহাব মাত্র একটি চরণ মনে

১। আমাদের শরৎদা—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪

পড়ে, ক্রিটিক যোগেশ ক্রুদ্ধ! যোগেশকে লেখা দিয়া সন্তুষ্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল। ছায়াতে সমালোচনা ভিন্ন সে আর কিছু লিখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

কিন্তু যোগেশ কোনদিনই অটোক্র্যাটিক সম্পাদক নহে। তাহার নিদর্শন পরের একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইতে পাওয়া যাইবে।'

নিরুপমা দেবী এই যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বোধ হয় এই ছায়ার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উপরে আক্রমণ করিয়া উক্ত কবিদলের মধ্যে কে যে এই কবিতাটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আজ মনে নাই। কিন্তু কবিতাটুকু মনে আছে—

ঐ কুঞ্চিত কেশ মার্জিত বেশ ক্রিটিক যোগেশ ক্রুদ্ধ,
বলে দীন তার ছবি যত সব কবি কারাগারে হবি রুদ্ধ।'

সাহিত্যসভার মুখপত্র ছিল 'ছায়া'। সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন,

'১৯০১ সালের মার্চ মাসে বিভূতির গৃহেই পরামর্শান্তে তাঁরা স্থির করেন, হাতে লেখা মাসিকপত্র বার করবেন ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাস থেকে··· পত্রের নাম হবে ছায়া। গল্প কবিতাদি লিখবেন প্রতি মাসে গিরীন্দ্রনাথ·· ছায়ার সম্পাদক হিসাবে নাম থাকবে যোগেশচন্দ্র মজুমদারের।'

'ছায়া'য় শরৎচন্দ্রের দুই তিনটি গল্প ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। 'আলো ও ছায়া' গল্পটি এই 'ছায়া'তেই স্থান পাইয়াছিল। 'ছায়া'র অনেক লেখা পরে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সৌরীন্দ্রমোহন ১৯০১ সালে ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া 'ছায়া'র অনুরূপ একখানি হাতে লেখা পত্রিকা বাহির করিবার প্রস্তাব করেন। পত্রিকার নাম তরণী রাখা স্থির হইল। পত্রিকা প্রকাশের ভার নিলেন সৌরীন্দ্রমোহন। সৌরীন্দ্রমোহন যতদিন ভাগলপুরে ছিলেন ততদিন তিনিও শরৎচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্তশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র বললেন—পদ্য লেখো আর গল্প লিখতে পারো না? গল্প লেখবার চেষ্টা করো। গল্প কাকে বলে, কিসে গল্প হয়, সে-জ্ঞান তোমার আছে। পুঁটুর কাছে তুমি আমার গল্পের যে সমালোচনা করেছ, পুঁটু আমায় বলেছে। সেই সমালোচনা শুনে আমি বলছি—গল্প সম্বন্ধে তোমার idea আছে। তুমি গল্প লেখো।

সহর্ষে সগর্বে আমি বললুম —লিখবো।'

তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে যখন সৌরীন্দ্রমোহন পড়িতেন তখন তাঁহার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন বিভূতিভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত ছিলেন এবং নিজেরাও কবিতা লিখিতেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে একটি Poets' Corner গঠন করেন। শরৎচন্দ্রের প্রেরণাতেই তাঁহারা কবিতা ছাড়িয়া গল্পের জগতে আসেন।

ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার পর সৌরীন্দ্রমোহন ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিলেন। ভবানীপুরে তাঁহাদের একটি সাহিত্যগোষ্ঠী ছিল। সেই গোষ্ঠীতে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায, শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, প্রমথনাথ সেন প্রভৃতি। হাতেলেখা পত্রিকা 'তরণী'তে তাঁহারা সাহিত্যসাধনা শুরু করিলেন। 'ছায়া'র সঙ্গে 'তরণী'র বিনিময় হইত। 'ছাযা' আসিত ভবানীপুরে এবং 'তরণী' পাঠান হইত ভাগলপুরে। পড়া শেষ করিযা পত্রিকা দুইটি আবার যথাস্থানে ফেরত পাঠান হইত। 'ছায়া' ও 'তরণী'র দুই দল পরস্পরের লেখা লইয়া কঠোর সমালোচনা করিত। সৌরীন্দ্রমোহনের ভাষায়, 'পারতপক্ষে কেউ কারো লেখার সুখ্যাতি করতুম না—কটুবাক্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপে কোন্ পক্ষের ওস্তাদী কত বেশী, দেখাবার কসরতি চলতো।'

এই ধরণের সমালোচনার ফল কখনই ভালো হয় না, শুধু কেবল পরস্পরের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিয়া নিজেদের গায়ের ঝাল একটু মিটান যায় মাত্র। 'ছায়া'র সম্পাদক সেজন্যই একটি সমালোচনা বোর্ড বা সমিতি গঠন করিলেন। প্রতি সভ্যকে 'তরণী' পড়িয়া তাঁহার সমালোচনা সম্পাদকের নিকট পেশ করিতে হইত। সম্পাদক সেগুলি হইতে নির্বাচন করিয়া তাঁহার পত্রিকায় বাহির করিতেন। 'তরণী' কিছুকাল পরে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার পরেও 'ছায়া' কিছুদিন চলিয়াছিল।

## নিরুদ্দেশের পথে

১৯০১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শরৎচন্দ্র কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। পিতা মতিলালের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াই তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, 'ইহা মতিলালই একদিন সুরেন্দ্রনাথের পিতা

অঘোরনাথকে বলিয়াছিলেন।[১] নিরুদ্দেশ হইবার পর তাঁহার সংবাদ প্রথম পাওয়া গেল যখন তিনি মজঃফরপুরে অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপা দেবী তাঁহার ভাই সৌরীন্দ্রমোহনকে একখানি পত্রে এই সংবাদটি জানাইয়াছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'তাঁর (অনুরূপা দেবীর) স্বামী শিখরবাবু তখন মজঃফরপুরে ওকালতি করছেন· ছুটিছাটায় তিনি আসতেন ভাগলপুরে এবং এমনি ছুটিছাটায় ভাগলপুরে এসে তিনি ছোটদিকে বলেন—তোমাদের লেখক শরৎ চাটুয্যেকে মজঃফরপুরে পেয়েছি। নিশানাথ (শিখরবাবুর cousin ভ্রাতা) কোথায় তাঁর গান শুনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। নিশানাথ ছিলেন গানপাগল—নিজেও তিনি গান গাইতে পারতেন। নিশানাথ ছিলেন আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। নিশানাথ তাঁকে নিয়ে আসেন শিখরবাবুর কাছে—শরৎচন্দ্র তখন সেখানে নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল এবং শিখরবাবু তাঁকে সমাদরে সসম্মানে আপন-গৃহে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন। বাড়ির ছেলের মত তাঁকে দেখতেন। শিখরবাবুর বিধবা পিসিমা ছিলেন তাঁর গৃহের কর্ত্রী—তিনিও শরৎচন্দ্রকে অপত্যস্নেহে গ্রহণ করেছিলেন।'

শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসী বেশে ঘুরিতে ঘুরিতে মজঃফরপুরে আসা সম্বন্ধে প্রমথনাথ ভট্টাচার্য একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। প্রমথনাথের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার গ্রন্থে এভাবে লিখিয়াছেন, 'একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা ক্লাবে জমায়েত হ'য়ে খেলা ও গল্পগুজব করছিলেন, এমন সময় একটি তরুণ সন্ন্যাসী সেখানে এসে পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় সবিনয়ে লেখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন। ক্লাবের একটি ছেলে দোয়াত কলম এনে দিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে একখানি পোষ্টকার্ড বার ক'রে ঘরের এককোণে বসে নিবিষ্ট মনে পত্র লিখিতে শুরু করলেন।

ছেলেরা স্বভাবতই কৌতূহলী। ওরই মধ্যে একজন উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে নিল সন্ন্যাসী চমৎকার বাঙ্গালা হরফে পত্র লিখছেন। ক্লাবের মধ্যে

১। শরৎ-পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯ দ্রষ্টব্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁহার 'শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাঁহার পিতার কতকগুলি সখের পাথর তাঁহার এক ধনী বন্ধুকে উপহার দিয়াছিলেন সেজন্য পিতার ভর্ৎসনার ফলেই অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ করেন।

একটা কানাঘুসো শুরু হয়ে গেল, সবাই একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠল এই তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় নেবার জন্য। প্রমথনাথ ছিলেন এসব বিষয়ে অগ্রণী; তিনি পুরোবর্তী হ'য়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় শুরু করলেন, একেবারে খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায়। সন্ন্যাসী কিন্তু প্রত্যেক কথার উত্তর হিন্দীতেই দিচ্ছে দেখে প্রমথবাবু অধৈর্য হ'য়ে বলে উঠলেন—'ছাতুখোরের ভাষা ছাড়না বাবাজী, নিজের জাতভাষা ধর না, আমরা অনেকক্ষণ জানতে পেরেছি, তুমি বাঙ্গালী।'

শরৎচন্দ্র এবার হেসে ফেললেন এবং মধুর বাংলা ভাষায় গল্প শুরু করলেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এইভাবে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়।'

শিখরবাবুর গৃহে শরৎচন্দ্র কিরূপ সাদরে গৃহীত হন তাহা বর্ণনা করিয়া অনুরূপা দেবী লিখিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত শিখরনাথবাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন।...শরৎবাবুর মধ্যে কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল। অসহায় রোগীর পরিচর্যা, মৃতের সৎকার এমনি সব কঠিন কাযের মধ্যে তিনি একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেন।'

শরৎচন্দ্র শিখরবাবুর আশ্রয় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কেন তাহা বর্ণনা করিয়া সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রকে শিখরবাবু কাছে রেখেছিলেন কিছুকাল। কিন্তু তিনি তখন নেশায় বেশ পোক্ত হয়েছেন—সুযোগ এবং তেমন দল পেলে নেশা চড়তো যাকে বলে, বমরম! এবং নেশায় বিভোর হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। একদিন গভীর রাত্রে নেশা করে এসে একটু বে-এক্তিয়ার হন—শিখরবাবুর অভিভাবিকা পিসিমার মুখে সে-কথা শুনে পিতা অনুযোগ তোলেন—তখন শিখরবাবু সতর্ক করে দেন শরৎচন্দ্রকে। ব্যাস—পরের দিন তাঁকে আর দেখা গেল না! লজ্জায় তিনি উধাও। শরৎচন্দ্র আবার নিরুদ্দেশ হলেন।'

মজঃফরপুরে থাকিবার সময় শরৎচন্দ্র মহাদেব সাহু নামক একজন জমিদারের সঙ্গে পরিচিত হন। শিখরবাবুর বাড়ি হইতে তিনি মহাদেব সাহুর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হন। এই মহাদেব সাহুই যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কুমার বাহাদুর রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'গানবাজনায় তাঁর কৃতিত্ব দেখে মহাদেব সাহু কিছুদিন শরৎবাবুকে নিজের কাছে সমাদরে রেখেছিলেন। সাহুর গৃহে

থাকবার সময় তিনি ব্রহ্মদৈত্য নামে একখানি উপন্যাস লেখেন এবং এ সময়ে হঠাৎ পিতা মতিলালের মৃত্যুসংবাদ শুনে তিনি ভাগলপুরে ছুটে আসেন। আসবার সময় সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেননি……পাণ্ডুলিপিখানি মহাদেব সাহুর কাছেই থাকে…পরে সে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।'

পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি মজঃফরপুর হইতে ভাগলপুরে চলিয়া আসেন। এতদিন তিনি ভবঘুরে-বৃত্তি লইয়া ছিলেন। সংসারের ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে ভাইবোনদের লইয়া তিনি ঘোর সঙ্কটের মধ্যে পড়িলেন। সংসারের দায়িত্ব তাঁহার উপরে চাপিয়া বসিল। তাঁহার ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যহীন জীবনকে এতদিন পরে সাংসারিক নিয়মশৃঙ্খলার সূত্রে বাঁধিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করিলেন।

## পিতৃবিয়োগ—ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আগমন

১৯০২ সালে শরৎচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। শরৎচন্দ্র তখন ছিলেন মজঃফরপুরে। পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি ভাগলপুর ফিরিয়া আসেন এবং অতি কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করেন। এতদিন তিনি ভবঘুরেবৃত্তি লইয়াই ছিলেন, সংসারের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে নাবালক ভাইবোনেদের লইয়া তিনি চোখে অন্ধকার দেখিলেন। প্রভাসচন্দ্রের বয়স তখন পনেরো বছর, ভাগলপুর স্টেশন মাস্টারের কাছে সে কাজ শিখিবার জন্য রহিল। ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের বয়স তখন সাত কি আট। সম্পর্কীয় মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে জলপাইগুড়িতে তাহাকে রাখিয়া আসিলেন। ছোট বোনটি রহিল পার্বতী ঘোষালের কাছে।[১]

ভাইবোনদের তো একরকম ব্যবস্থা হইল। কিন্তু নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত শরৎচন্দ্রের পক্ষে তখন কিছু রোজগার না করিলেই নয়। তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় থাকিতেন ৮৫নং কাঁসারিপাড়া রোডে। উপেন্দ্রনাথ তখন অগ্রজের সঙ্গে

১। শরৎ পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১৩৬

বাস করিতেন। শরৎচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লালমোহন ও উপেন্দ্রনাথ উভয়েই শরৎচন্দ্রকে পাইয়া খুশি হইলেন।

লালমোহনের অধীনে শরৎচন্দ্র একটা কাজ পাইলেন, মাহিনা মাত্র ত্রিশ টাকা। ভাগলপুর হইতে লালমোহন হাইকোর্টের যে সব অ্যাপিল কেস পাইতেন, সেই সব কেসের হিন্দী হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করাই ছিল শরৎচন্দ্রের কাজ, কিন্তু তাঁহার এই কাজ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। উপেন্দ্রনাথের কথায়, 'কিন্তু আইন-আদালতের ভাষার সহিত পরিচয়ের স্বল্পতা হেতু এই কায বেশি দিন চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।'[১] তবে একথাও ঠিক যে লালমোহনের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের মানমর্যাদা তেমন কিছু ছিল না। আত্মীয়বাড়ি হইলেও ভিতরের মহলে তাঁহার কোনো স্থান ছিল না। শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার অবস্থা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন—

লালমোহনবাবুর বাড়ীতে শরৎচন্দ্র থাকতেন যেন অত্যন্ত সঙ্কোচে অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে। বাহিরের ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই নড়াচড়া। যেন অনাত্মীয় আশ্রিতের মতো বাস। সদরের ঐ ঘরেই তাঁর বাস অন্দরে যাবার সময় গলাখাঁকারি দিয়ে তবে ঢুকতে হতো—মেয়েরা সরে যাবেন। এ-কথার উল্লেখ করে মাঝে মাঝে বলতেন, বওয়াটে ব'লে আমার এমন কুখ্যাতি হে। একবার সখেদে ছোট্ট একটু কাহিনী বলেছিলেন। একদিন বাড়ির কর্তার ব্রাশ দিয়ে মাথার চুলে চালিয়েছিলেন· ··এমন সময় বাহিরের ঘরে কর্তার প্রবেশ। শরৎচন্দ্র ব্রাশ রেখে দিলেন ভয়ে ভয়ে ··কর্তা কিন্তু তখনি সে-ব্রাশ নিয়ে জানালা গলিয়ে পথে নর্দামায় ফেলে দিয়েছিলেন। এ কাহিনীর উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন—পরঘরী হ'য়ে থাকার চেয়ে পথে থাকাও ঢের আরামের। তা ছাড়া বলতেন—কি জঘন্য কাজ করি ·· তার জন্য পাই মাসে ত্রিশটি করে টাকা। এতে ভদ্রতা থাকে না। ভালো একটা চাকরি পাই যদি তো সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলে কেন, সাহারা মরুভূমিতে পর্যন্ত যেতে পারি। শরৎচন্দ্র প্রায় বলতেন—একটা কাজ করতে হবে—মাসে একশো টাকা আয় না হ'লে কোনো ভদ্রলোকের

১। শরৎ স্মরণিকা, ইং ১৯৪৯ দ্রষ্টব্য

ভদ্রভাবে দিন চলে না। মাসে যদি আমার একশো টাকা ক'রে আয় হয়, তা হ'লে মানুষের মতো থাকতে পারি বটে !'[১]

আত্যন্তিক হীন অবস্থা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের বন্ধুবাৎসল্য এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সমানভাবে বজায় ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে নানা বিষয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা হইত, একসঙ্গে বেড়ানো এবং মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখাও চলিত। বন্ধুবৎসল শরৎচন্দ্র নিজের ঘরটুকুর মধ্যে বন্ধুদের চা-পানে আপ্যায়িত করিতে ভালোবাসিতেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন সহপাঠী। শরৎচন্দ্র তাঁহাদিগকে সাহিত্যসাধনায় অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ জোগাইতেন। নিজের সাহিত্যসাধনা তখন বন্ধ, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল খুবই গভীর। প্রধানত তাঁহারই উৎসাহে সৌরীন্দ্রমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ গল্পলেখা শুরু করিলেন।[২] সঙ্গীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের ফলেই তিনি পাথুরিয়াঘাটার সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াত করিতেন। সেখানে বহু গুণী সঙ্গীতশিল্পীর সমাবেশ হইত। সেই সঙ্গীত-আসরের রস উপভোগ করিয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন।

লালমোহনের এক ভগ্নীপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুনে অ্যাডভোকেট ছিলেন। বড়দিনের সময় তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া লালমোহনের বাড়িতে উঠিতেন। তিনি ছিলেন অমিত বলশালী এক বিরাটদেহ, বজ্রকণ্ঠ পুরুষ। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে অঘোরনাথের একটি অত্যন্ত সরস চিত্র পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'একদিনের কথা পরিষ্কার মনে পড়ে। ভবানীপুরের জগুবাবুর বাজারের পাশে একটা ময়দার দোকানের বিজ্ঞাপনটা খুব বড় বড় হরফে লেখা ছিল। গাড়ি কোরে যেতে যেতে, সেই বড় হরফের সমুচিত মূল্যদান করে তিনি শব্দব্রহ্মকে উচিত সম্মান দান ক'রে যে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন, তার কাছে চিড়িয়াখানার আধপেটা খাওয়া সিংহ-গর্জন কোথায় লাগে! আনন্দে

১। শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, পৃঃ ১৪-১৫

২। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২-১৩ দ্রষ্টব্য

উদ্বেলিত হোয়ে তিনি ময়দা লেখার আকারের অনুপাতে যে নাদ ছেড়েছিলেন তাতে কোচওয়ান কোচবাক্স থেকে নিঃশেষে কোথায় হাওয়া হোয়ে গেল!' চারিদিকে লোকারণ্য। কি হোয়েছে! কি হোয়েছে! কি হোয়েছে মোশাই?

না: হয়নি কিছু, ঐ ময়দা লেখার উচিত মূল্য দান করছিলাম মাত্র! দেখা গেল ঘোড়া দুটো রাস্তায় বহুল পরিমাণে জলত্যাগ কোরে দাঁড়িয়ে কম্পমান।

কিছু পরে কোচওয়ান ফিরলে—কোথায় গিছলে হে? প্রশ্ন। এজ্ঞে লুংগি বদলাতে। কেন, ছেঁড়া ছিল? এজ্ঞে না।

চল চল হাঁকিয়ে যাও,—দেরি কোরেছ।

চট্টোপাধ্যায় মশাই লিপিপুষ্যিযানদের 'হেট' কোরতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ব্রবডিগন্যাগ।'

অঘোরনাথ অসামান্য দেহশক্তির অধিকারী হইলেও বেশ অমায়িক ও সদালাপী ছিলেন। ব্রহ্মদেশের নানা রোমাঞ্চকর গল্প তিনি বলিতেন। তাঁহার কাছে গল্প শুনিয়া শরৎচন্দ্র মনস্থ করিলেন, তিনিও ব্রহ্মদেশে যাইয়া ওকালতি করিবেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, ইতিপূর্বেও অঘোরনাথ ভাগলপুরে থাকিবার সময় শরৎচন্দ্রকে ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহার পিতা মতিলালকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।[১]

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে যাওয়া স্থির করিলেন। কারণ তাহা ছাড়া তাঁহার আর কোনো উপায় ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ও সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যে পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে দূরে পলায়ন করা ছাড়া তাঁহার আর অন্য উপায় ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ একবার শরৎচন্দ্রকে তাঁহার ব্রহ্মদেশযাত্রার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে শরৎচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

'উত্তরে শরৎচন্দ্র বোললেন, নিতান্ত দরকার হোয়েছিল। পরম আত্মীয় হোলেও উপযাচক হোয়ে আমার সে-বয়সে কোন আত্মীয়ের

১। মতিলালকে অঘোরনাথ বলিয়াছিলেন, 'কেন মিছে এফ-এ পড়াচ্ছেন—পাঠিয়ে দিন আমার কাছে। উকিল হোলে আর আপনাদের দুঃখ থাকবেনা।

—শরৎ পরিচয়, পৃঃ ১৩৫

বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা যে উচিত হয় না, এই ধারণা আমাকে পীড়াই দিচ্ছিল। আমি তো দিদির বাড়ি চোলে যেতে পারতাম। গিয়েও ছিলাম এবং বুঝেই এসেছিলাম যে সেখানেও থাকা ঠিক হবে না। পাড়াগাঁয়ের লোকদের কালচার কম। আর ওদের বাড়িতে ভাইয়েদের মধ্যে বেশ একটু অবনিবনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুখুয্যে মশাই সেটা বুঝেই আমাকে অর্থ সাহায্য কোরেছিলেন অন্য জায়গায় চ'লে যাওয়ার জন্যে।'

উপরে উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আর্থিক দুঃখকষ্ট ছাড়াও আত্মীয়ের আশ্রয়ে বাস করিবার অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যও তিনি দূরে পলাইতে চাহিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য আত্মীয়দের প্রীতিভাজন ছিলেন না। নিজের আত্মমর্যাদা-বোধও ছিল তাঁহার খুবই প্রবল। সেজন্য আত্মীয়সংস্পর্শ বর্জনের জন্যই সম্ভবত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ-সব ছাড়াও আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটি ভবঘুরে, বন্ধন-অসহিষ্ণু, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় সত্তা চিরকাল বিরাজমান ছিল। সেজন্য নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ অভ্যস্ত জীবনযাত্রার গণ্ডির বাহিরে অজানা অনিশ্চিত জগতের হাতছানি নিত্যই তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। যে মানুষটি ভাগলপুরে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যিনি গৃহের মায়া ভুলিয়া সন্ন্যাসীবেশে আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়া পথে প্রান্তরে বাস করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষেই কলিকাতার সংকীর্ণ ও গতানুগতিক জীবনধারা হইতে মুক্তি পাইবার আগ্রহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। অঘোরনাথের মুখে ব্রহ্মদেশের চমকপ্রদ গল্প শুনিয়া তাঁহার মনে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল। উকিল হইবার আশা, আর্থিক সচ্ছলতালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই ছিল। কিন্তু আরও প্রবল ছিল বোধ হয়, ইরাবতী তীরবর্তী সেই স্বপ্নরঙীন দেশের আশ্চর্য মানুষগুলিকে জানিবার বাসনা।

ভাগ্যপরীক্ষার জন্য শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে চলিলেন। তাঁহার উপন্যাসের বহু চরিত্রকেই তিনি তাঁহার নিজের মতই ব্রহ্মদেশে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য নিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত ও 'পথের দাবী'র অপূর্ব এমনিভাবে রেঙ্গুনের পথে যাত্রা করিয়াছিল। অপূর্ব মা অপূর্বর ব্রহ্মযাত্রার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই কি ক্ষেপেচিস অপু, সে-দেশে কি মানুষে যায়! যেখানে

জাত, জন্ম, আচার-বিচার কিছুই নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে ?' ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা তখন সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে ছিল। বাংলাদেশের সামাজিক নীতি ও শাসনের বাহিরে যাহারা শৃঙ্খলমুক্ত অবাধ জীবন যাপন করিতে চাহিত ব্রহ্মদেশের দিকে তাহারাই যাত্রা করিবার সুযোগ খুঁজিত। দিবাকর-কিরণময়ী, নন্দ-টগরবোষ্টমী সেজন্যে রেঙ্গুনের পথে পাড়ি দিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সমাজের বন্ধন চিরকাল শিথিল ছিল। জাত, জন্ম, আচার-বিচার নাই এমন দেশের আকর্ষণ তাঁহার পক্ষে প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

রেঙ্গুন রওনা হইবার আগের দিন শরৎচন্দ্র একখানি পিয়ার্স সাবানের ছবি কিনিয়া সুরেন্দ্রনাথের বাসায় যান। সুরেন্দ্রনাথের একখানি জনসনের পকেট ডিকসনারী এবং তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথেরও একখানি বই তিনি নেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে নিয়া পথে বাহির হইয়া পড়েন। পথে শরৎচন্দ্র তাঁহাকে বলেন যে, কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য তিনি তাঁহার নামে মন্দির নামে একটি গল্প দিয়া আসিয়াছেন।'[১] ঐ গল্পের জন্য তিনি যদি কোন পুরস্কার পান তাহা হইলে মোহিত সেন-সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী তাঁহাকে দিবার জন্য তিনি সুরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাইয়া রাখিলেন। 'মন্দির' গল্পটি তিনি তাঁহার সাহিত্য-সুহৃদ সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির চাপে পড়িয়া লিখিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়। সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'ওটা ওরা জোর কোরে তখন লিখিয়েছিল, লিখেও ছিলাম তাই বেনামীতে।'[১] এখানে 'ওরা' বলিতে খুব সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকেই বুঝাইতেছে। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়কে আর একদিন শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'নিজের লেখার ওপর তখন মোটেই বিশ্বাস ছিল না। তাই আশা করতে পারিনি যে ওটা অন্তত লাস্ট প্রাইজেরও যোগ্য বিবেচিত হবে। আর না হওয়ার ব্যথাটা সরাসরি সোজা বুকে এসে যাতে না লাগে, সুরেনকে হোয়ে যাতে আঘাতটা আসে, তাই সুরেনের নামেই দিয়েছিলাম।'[২]

১। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার বইতে লিখিয়াছেন শরৎচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে গল্পের নাম বলেন নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ গল্পের নাম তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, ইহাই লিখিয়াছেন।

২। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯১

শরৎচন্দ্র তাঁহার গল্পের লেখক সুরেন্দ্রনাথের ঠিকানা দিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঙালীটোলা, ভাগলপুর। 'মন্দির' গল্পটি প্রথম পুরস্কার লাভ করিল। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের খ্যাতি খুব বাড়িল বটে, কিন্তু অপরের লেখার খ্যাতি লাভ করিয়া তাঁহার মানসিক অস্বস্তির আর সীমা ছিল না। আর যিনি গল্পটির প্রকৃত লেখক 'তাঁর নাম প্রচারিত হতে পারেনি বটে, কিন্তু তিনি যে আপন মনের মধ্যে কতকটা আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তদ্বিষয়েও সন্দেহ নেই।'[১] ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বড়দিদি'র প্রকাশকালের মধ্যে একমাত্র 'মন্দির' গল্প ছাড়া শরৎচন্দ্রের আর কোন রচনা প্রকাশিত হয় নাই।

কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক জলধর সেন। তিনি দেড়শত গল্পের মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পাঁচটি গল্প নির্বাচন করেন এবং উহাদের মধ্যে অবশেষে 'মন্দির' গল্পটিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন। জলধর সেনই শরৎচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্বীকৃতি দান করেন। সুতরাং শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রথম প্রকাশ্য আবির্ভাব গৌরব তিনি দাবী করিতে পারেন।

কুন্তলীন পুরস্কারের উদ্দেশ্যে গল্প লিখিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্র সুকৌশলে গল্পের মধ্যে কুন্তলীনের সুগন্ধিদ্রব্যের একটু প্রচার করিয়াছেন। এক স্থানে রহিয়াছে, 'লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটা-কত কুন্তলীনের শিশি, আরো কি কি বাহির করিতে উদ্যত হইল।' আর একস্থানে আছে, 'তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা দেলখোস শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুইটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিল।' অপর্ণা অমরনাথের দেওয়া উপহার গ্রহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু শক্তিনাথের দেওয়া উপহার প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিলেও অবশেষে সে তাহা মাথায় তুলিয়া লইল এবং পরে গভীর ভক্তিভরে দেবতার চরণে নিবেদন করিল। শক্তিনাথের ভালোবাসার প্রতীক হইল কুন্তলীনের সুগন্ধি দ্রব্য। গল্পশেষে সেই ভালোবাসার যেমন জয় হইল, তেমনি জয় হইল সেই সুগন্ধি দ্রব্যের। 'মন্দির' গল্পের নায়িকা কয়েক বৎসর আগে লিখিত 'বড়দিদি' প্রভৃতি গল্পের

১। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৬২

নায়িকাদের মতই অন্তরে প্রেমের আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াও বাহিরে সংযমের ভস্মে অনুলেপিত। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার প্রথম পর্বে গল্পগুলির নায়িকাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'তাঁর নায়িকারা কতকটা একই ছাঁচের। তাদের বুকে আগুন, মুখে দেবীপ্রতিমার মত পাষাণ কঠিনতার ছাপ। তাদের বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না।'[১] মন্দির গল্পটি চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়া ভাগলপুরের সাহিত্য-পর্বের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত এবং পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পূর্ণতর শিল্পপরিণতি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র মোটামুটি তাঁহার প্রথম জীবনের লেখার ধারাই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

'মন্দির' গল্পটি প্রকাশিত হইলে বিদগ্ধ সমালোচকও ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মন্দির গল্পটি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'আমি বহুকাল পূর্বে কুন্তলীন পুরস্কারে একটি ছোট গল্প প'ড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় মন্দির। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে, এই নূতন লেখকের নাম শরৎচন্দ্র, যে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে প্রস্তুত। মন্দির গল্পটির কথাবস্তুও সম্পূর্ণ নূতন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত।'[২]

১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাত্রা করেন। শরৎচন্দ্র গোপনে কাহাকেও না বলিয়া রেঙ্গুন গেলেন। বহুদিন পর শরৎচন্দ্র একবার কলিকাতায় আসিয়া উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসায় যান। উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভিতরে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন—

'না উপীন, ভেতরে আমি কিছুতেই যাব না। বোম মামাকে (লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়) না জানিয়ে তাঁর অনুমতি না নিয়ে এই বাড়ি থেকে একদিন রেঙ্গুন পালিয়েছিলাম। আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই।'[৩]

শরৎচন্দ্র কাহাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজঘাট পর্যন্ত নিয়া গিয়াছিলেন তাহা লইয়া বেশ একটু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার

১। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪
২। ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, চৈত্র
৩। স্মৃতিকথা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (১ম পর্ব, পৃঃ ১৯০)

শরৎ-পরিচয় নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন, 'উপেন্দ্রনাথ গোপনে তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসেন।'[১] কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র শুধু দেবীনকে (দেবেন্দ্রনাথ) স্টীমারঘাটে নিয়া গিয়াছিলেন। রেঙ্গুন হইতে লেখা শরৎচন্দ্রের একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে অনেকদিন পরে যে চিঠি দেন তাতে লেখেন যে, তোমরা পলায়নে বাধা দেবে ভয়ে তোমাদের বলিনি। শুধু দেবীনকে সঙ্গে নিয়ে রাত ৪ টের সময় ভবানীপুরের বাড়ী থেকে ষ্টীমার ঘাটে যাই। কেবল মাত্র দেবীন জানতেন আমি রেঙ্গুনে গেলাম।[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, রেঙ্গুন যাইবার সময় শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথের নিকট হইতে চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ এই ধার দিবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

'উপেন্দ্রনাথের কথা বিশ্বাস করতে পারিনে কেন না—তাঁর পক্ষে আমাদের কাছে একথা প্রকাশ করার বাধা সেদিন ছিল না। ধার হয়তো দিয়েছিলেন অন্য কোন বাবদে। এ কথা প্রকাশ করার বাধা তাঁরও ছিল না।'[৩] শরৎচন্দ্র তখন যে রকম কপর্দকহীন অবস্থায় ছিলেন তাহাতে সুদূর ব্রহ্মযাত্রার জন্য তাঁহার পক্ষে ধার করা অনিবার্য ছিল। উপেন্দ্রনাথের বাড়িতে তিনি ছিলেন সেজন্য তাঁহার নিকট হইতে ধার নেওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

## রেঙ্গুনে উপস্থিতি

### অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান

১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন রওনা হইলেন।[৪] রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৫৬ ও ৫৬।এ লিউইস স্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিলেন। অঘোরনাথ ছিলেন রেঙ্গুনের নামজাদা

১। শরৎ পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯

২। শরৎ পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৬

৩। ঐ, পৃঃ ১৩৩

৪। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাহার 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে ভুলক্রমে লিখিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র দাসের 'শরৎ প্রতিভা' নামক গ্রন্থেও কিন্তু ১৯০২ সালের কথাই উল্লেখ করা

উকিল। বাড়িটি তিনতলা এবং বেশ সুসজ্জিত। গিরীন্দ্রনাথ সরকার অঘোরনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

'অঘোরবাবু বন্ধুবৎসল, মৃদুস্বভাব, রহস্যকুশল ও বন্ধুবান্ধবদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ইনি যে পরিমাণে ব্যয়শীল, সে পরিমাণে কি তাহার অর্ধেক পরিমাণেও সঞ্চয়শীল ছিলেন না। ইনি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।'

অঘোরনাথের বড় ইচ্ছা ছিল, শরৎচন্দ্র উকিল হইবেন। সেজন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে বর্মীভাষা শিখাইবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দুই তিন মাস পরে বর্মা রেলওয়েতে শরৎচন্দ্রের জন্য তিনি পঁচাত্তর টাকা বেতনে একটি অস্থায়ী চাকরীও জুটাইয়া দেন। শরৎচন্দ্র রেল অফিসে দেড়বৎসর কাজ করিয়াছিলেন।[১] একই সঙ্গে অফিসের কাজ ও বর্মীভাষা শেখা চলিল। কিন্তু বর্মীভাষায় শরৎচন্দ্র কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। সেজন্য তাঁহার উকিল হইবার আশা আর পূর্ণ হইল না। শরৎচন্দ্রের ন্যায় মেধাবী ও তীক্ষ্ণ মননশীল লোকের পক্ষে বর্মীভাষা শেখা এমন কিছু শক্ত ছিল না। আসলে এই ভাষাশিক্ষায় তিনি যে যথোচিত গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তখন তিনি ঘোর পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য যে মানসিক অভিনিবেশ ও একাগ্রতার প্রয়োজন সেসব কিছুই তাঁহার ছিলনা। সেজন্য ভাষাশিক্ষায় কৃতকার্য হইতে তিনি পারেন নাই। অথচ আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মদেশে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের মধ্যেও জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের ন্যায় দুরূহ বিষয়েও অধ্যয়ন ও আলোচনায় তিনি নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বীর ন্যায় যিনি দিনের পর দিন গভীর জ্ঞান সাধনা করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে একটি ভাষা শিক্ষা করা কিছুই শক্ত ছিল না। কিন্তু সেই ভাষাশিক্ষায় সম্ভবত তাঁহার প্রাণের কোন সাড়া ছিল না, সেজন্য বর্মীভাষা তাঁহার অনায়ত্ত রহিয়াই গেল।

শরৎচন্দ্রের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় অঘোরনাথ হঠাৎ ডবল

---

হইয়াছেন তিনি লিখিয়াছেন, 'ইংরাজি ১৯০২ অব্দে বর্ষার আগে, এপ্রিলের শেষ কি মে মাসের প্রথমভাগে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে আসেন।'

১। অঘোরনাথ বর্মা রেলে শরৎচন্দ্রকে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য কাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের জীবনীলেখকদের মধ্যে একটু মতভেদ আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুনে স্বামীর কাছে ছিলেন না, কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতায় ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, অঘোরনাথের সেবাশুশ্রূষার ভার তিনি এবং শরৎচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের কথায়—

'পরিবারবর্গ নিকটে না থাকায় তাঁহার মৃত্যুশয্যায় সেবাশুশ্রূষার ভার শরৎচন্দ্র ও আমি লইয়াছিলাম। দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং রাত্রিজাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম।[১] অঘোরনাথকে বাঁচানো সম্ভব হইল না। ১৯০৫ সালের ৩০ শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে আসিবার ঠিক দুই বৎসর পরে অঘোরনাথের মৃত্যুর ফলে শরৎচন্দ্র নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শরৎচন্দ্র পরে অঘোরনাথ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন,—

'আমার ভুল হোয়েছিল চাটুয্যে মশাইকে বোঝার। রেঙ্গুনে গিয়ে তা বুঝেও কোনরকমে কাযসিদ্ধির জন্যে টিঁকেছিলাম, অত অল্প দিনে বর্মীভাষা আয়ত্ত করা যায় না। আর মনে করতে পারিনি যে অত বড় সার্জন মদ্দ লোকটা ধাঁ করে ম'রে যাবে। তাই যখন বুঝলাম যে, বাঁচা সম্ভব নয় তখনই সোরে গেলাম।[২]

শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তি হইতে মনে হয় তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর আগেই ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ পরিচয়ে' লিখিয়াছেন যে, অঘোরনাথ বর্মা রেলওয়ের এজেন্ট জনসাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারপতি এ, এন, সেন একটি বক্তৃতায় (বাতায়ন, ২রা মাঘ ১৩৫৮) বলিয়াছেন, অঘোরনাথ বর্মা রেলের হিসাব পরীক্ষক মিঃ কে, বসুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'মেসোমশাইয়ের মৃত্যুর তিন চার মাস পরে শরৎচন্দ্র সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া এজেন্ট অফিসের চাকরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন', কিন্তু বিচারপতি এ, এন, সেনের কথায় জানা যায় যে, তিনি দেড় বৎসর সেখানে কাজ করিয়াছিলেন এবং ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

১। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন যে, মাসাধিক কাল তিনি এবং শরৎচন্দ্র রাত্রি জাগরণ করিয়া অঘোরনাথের সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকদিন ভুগিয়াই অঘোরনাথের মৃত্যু হয়, এই উক্তিই সত্য মনে হয়।

২। শরৎপরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৯

সরকার এবং অন্যান্য বহু লেখকের উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর সময় তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই ছিলেন।[১] অঘোরনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তির মধ্যে যেন একটু শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতি অঘোরনাথের অশেষ উপকারের কথা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ না করিলে অন্যায় হইবে। রেঙ্গুন সহরের বহুলোক অঘোরনাথের কাছে নানাভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের অবজ্ঞাত, নিঃসহায় শরৎচন্দ্র তাঁহার কাছে যে উপকার পাইয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। এই বিশালদেহ মানুষটির ভিতরে একটি বিশাল প্রাণ বিরাজ করিত এবং যদি তিনি হঠাৎ মারা না যাইতেন তবে শরৎচন্দ্র অন্তত পক্ষে তাঁহার কর্মজীবনে আরো অধিক সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

## পেগুতে অবস্থান

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শরৎচন্দ্র দুই বৎসর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র নিরাশ্রয় হইয়া ছন্নছাড়া ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ পেগুতে যাইবার একটি সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। শরৎচন্দ্রের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার একজন দুঃস্থ বিধবাকে পেগুর পি, ডবলিউ, ডি, এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সি, কে, সরকারের বাড়িতে রাখিয়া আসিবার জন্য পেগু রওনা হইলেন। শরৎচন্দ্রও তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিলেন। শরৎচন্দ্র শুনিলেন, পেগুতে নানা প্রকার শিকার পাওয়া যায়। শিকারের লোভ ছিল তাঁহার প্রবল। দুই বন্ধু একসঙ্গে সেখানে যাওয়া স্থির করিলেন।[২]

পেগুতে মিঃ সি, কে, সরকারের বাড়িতে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন,

১। বিচারপতি এ. এন, সেনের উক্তিতেও ইহা সমর্থিত হয় 'অঘোরবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই বসবাস করেন।'

২। 'শরৎচন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন যে তিনি শিকারের বড় ভক্ত। সেজন্য তাহাকে যদি আমি সঙ্গে লইয়া যাই ত তিনি আনন্দ লাভ করিবেন। আমারও বন্ধুগণ সঙ্গে শিকার করিবার আগ্রহ কম নহে। স্থির হইল, উভয়ে তথায় যাইব।'

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—গিরীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৫৩

তখন মিঃ সরকার বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু সহৃদয়া মিসেস সরকারের আদরযত্নে তাঁহারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দুইদিন পরে মিঃ সরকার বাড়ি ফিরিলেন এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। মিঃ সি. কে. সরকারের বাড়িতে কয়েক দিন থাকার পর শরৎচন্দ্র পেগুর বিখ্যাত অ্যাডভোকেট মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সেখানে কিছুকাল বাস করেন।

গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরৎচন্দ্র পেগুর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাগিলেন। পেগু অসংখ্য প্যাগোডা এবং বৃহৎ বৃহৎ বুদ্ধমূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ। এগুলি দেখিয়া শরৎচন্দ্রের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা ছিল না। নূতন জায়গা ও নূতন মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দের সহিত আর একপ্রকার আনন্দও তিনি এ-সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাইলেন। সে আনন্দ হইল শিকারের আনন্দ। শিকারে ধৈর্য ও যোগ্যতা তাঁহার থাকুক কিংবা নাই-বা থাকুক, শিকারের সখ ও নেশা ছিল তাঁহার পুরামাত্রাতেই। প্রথমে আরম্ভ হইল মৎস্যশিকার। কোন দিন কিছু জুটিত, কোন দিন বা জুটিত না। একদিন মাছ ধরিবার সময় বার্মা চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ কোনসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। সেদিন শরৎচন্দ্রের ভাগ্য ছিল প্রসন্ন, খুব বড একটি মাছ তিনি পাইয়াছিলেন। মাছটি তিনি সাহেবকেই দিয়াছিলেন। এই উদারতার ফলে মিঃ ও মিসেস কোনসের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মৎস্যশিকারের পর শুরু হইল পশুশিকার। শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়া মাঝে মাঝে গুরুতর বিপদের মধ্যেও পড়িতেন। একদিন জঙ্গলে মধ্যে তিনি ও গিরীন্দ্রনাথ তো প্রকাণ্ড একটি গোখুর সাপের সম্মুখেই পড়িয়া গেলেন। সাপের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কৌতূহল চিরকালের। উদ্যত মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর সাপের সম্মুখ হইতে পলাইলেন বটে, কিন্তু নিরাপদ স্থানে আসিয়াই বলিলেন, 'সাপটি কি জাতের ভাল করে দেখলে হ'ত ত?' কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা দা-হাতে একটি বর্মী বালককে দেখিতে পাইলেন। সাপের কথা শুনিয়া সে উহা ধরিয়া আনিবার আগ্রহ দেখাইল। শরৎচন্দ্র তাহাকে পাঁচ টাকা বখশিস দিতে চাহিলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জঙ্গলের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটি গোখুর সাপ ধরিয়া আনিল। পাঁচ টাকা বখশিস দিবার সামর্থ্য কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছিল না। দুই টাকা দিয়া কোনক্রমে রক্ষা করিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শিকারে শরৎচন্দ্রের সখ ছিল খুব। কিন্তু নৈপুণ্য বেশি ছিল না। একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শিকারে যাইয়া তিনি কি কৌতুককর বিপত্তি ঘটাইয়াছিলেন তাহা গিরীন্দ্রনাথ সরকার বর্ণনা করিয়াছেন। গিরীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র একা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন। দূরে চঞ্চলনেত্র হরিণ-শিশুর নির্ভয় পদচারণ, আর দূরবর্তী সেগুন বনে দলবদ্ধ বিহঙ্গের মধুর কাকলি। এই সমস্ত মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া একটি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। আমরা হরিণের আশায় কিছুক্ষণ একটি ঝোপের মধ্যে বাসয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বন্দুকের গুড়ুম শব্দ শুনিয়া সকলে ছুটিয়া গিয়া আগ্রহের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, শরৎচন্দ্র একটি গোদা চিল শিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আহা বেচারা! জঙ্গলের একটি টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর বসিয়াছিল। ঝোপের মধ্যে বহুক্ষণ বন্দুক হাতে করিয়া জড়ভরতের মত একা বসিয়া থাকা শরৎচন্দ্রের পক্ষে অসহ্য হওয়ায় আকাশে একদল বক উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি সেইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে 'মিস' করিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই নিরীহ জীবহত্যার দোষটি তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া সকলে লজ্জা দিতে শরৎচন্দ্র চিলটির ডানা ধরিয়া ওলট-পালট করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'দেখ, এর গায়ে কোথাও গুলির চিহ্ন নাই। বন্দুকের ভয়ে বেটার হার্ট ফেল করেছে।'

পেগুতে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের হিসাব পরীক্ষক হইয়া মিঃ এম. কে. মিত্র এ-সময়ে পেগুতে আসেন। মিঃ মিত্র পেগুতে আসিয়া সপরিবারে মিঃ চ্যাটার্জীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মিঃ মিত্র ও তাঁহার পরিবারের সম্মানার্থে মিঃ চ্যাটার্জী একটি ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভোজসভায় গল্পগুজব ও হাস্যপরিহাস বেশ জমিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার মধুর কণ্ঠে কয়েকখানি সঙ্গীত পরিবেষণ করিয়া উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। মিঃ মিত্র তাঁহার গানে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মিঃ মিত্রের রেঙ্গুনের বাড়িতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। মিঃ মিত্র শরৎচন্দ্রকে বেকার জানিয়া তাঁহার নিজের অফিসে শরৎচন্দ্রকে একটি অস্থায়ী চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর শরৎচন্দ্র পেগুর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি কাজে যোগদান করেন। কিন্তু এ-চাকরীও আড়াই মাসের বেশি টিকিল না।

মিঃ চাটার্জী কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পেগু হইতে কলিকাতা চলিয়া যান। তাঁহার ওকালতী কাজকর্ম চালাইবার ভার মিঃ এম. কে. মিত্রের ভ্রাতা মিঃ নৃপেন্দ্র কুমার মিত্রকে দিয়া যান। শরৎচন্দ্র প্রায় একবৎসর কাল নৃপেন্দ্র বাবুর বাড়িতে ছিলেন। মিঃ এম. কে. মিত্রের এক সহোদর ভ্রাতা মিঃ পি. কে. মিত্র ধানের ব্যবসা করিবার জন্য পেগুতে আসেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার সহকারীরূপে কিছুদিন কাজ করেন এবং নারায়ণগ্রাবিন এ রেল স্টেশনের ধারে কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সে-সময়ে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু ধানের কাজে তাঁহার মন বসিল না, সেজন্য পুনরায় তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসেন।

## রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্তন—কর্মজীবন

রেঙ্গুনে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র মিঃ এম. কে. মিত্রের বাড়তে কিছুদিন আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন লম্বা চুল ও দাড়িতে তাঁহার চেহারাটি অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছিল।[১] ১৯০৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেকার হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মিঃ এম. কে. মিত্র ছিলেন পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস বিভাগের ডেপুটি একজামিনার। তিনি শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মিঃ মিত্র একজন কৃতী অফিসার ছিলেন, সাহেব কর্মচারীগুলি পর্যন্ত তাঁহার ভয়ে কাঁপিত।[২] তিনি ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় একটি কাজ করিয়া দিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া জুলাই মাসে পঁয়ষট্টি টাকা মাহিনা করিয়া দিলেন। এক বৎসর পরে মাহিনা বাড়িয়া আশী টাকা হইল। ১৯০৯ সালের জুলাই মাস হইতে মাহিনা নব্বই টাকায় স্থায়ী হইয়া গেল। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এই মাহিনাই তিনি পাইতেন। ১৯১০

১। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—'শরৎবাবু কোথায় যেন পেগু বা টঙ্গুতে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি লইয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চেহারায় তাঁর গায়ে একটা আলখাল্লা হইলেই ঠিক সাধুটি! কেহ কেহ ঠাট্টা করিতেও ছাড়িত না।' ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৫

২। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র। পৃঃ ১৫—১৬ দ্রষ্টব্য।

সালে স্থায়ীভাবে কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য তিনি আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর পার হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। ১৯১১-১২ সালে পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউণ্টস অফিস অ্যাকাউণ্টেন্ট জেনারেল অফিসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাওয়ার ফলে ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনের অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে চলিয়া আসিলেন।

শরৎচন্দ্র চাকরী করিতেন বটে, চাকরীতে তাঁহার কোন মন ছিল না এবং ইহাতে উন্নতিলাভের কোন ইচ্ছা ও উদ্যমও তাঁহার ছিল না। পরবশ্যতার গ্লানি, মাহিনার স্বল্পতা, উর্ধ্বতন কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার প্রভৃতির জন্য চাকরী সম্বন্ধে তাঁহার মনে নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। অন্তরঙ্গ লোকেদের সঙ্গে কথোপকথন ও চিঠিপত্রে এই বিতৃষ্ণা বারে বারে প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৯১২ সালের ৩রা মার্চ তারিখে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত একটি পত্রে নিজের চাকরী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'চাকরি করি। ৯০ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা allowanc পাই। ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এইমাত্র। সম্বল কিছুই নাই।'

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক বৎসর পরে লিখিত ( ৩১।৫।১৩ ) আর একখানি পত্রে চাকরী সম্বন্ধে তাঁহার প্রবলতর বিতৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,

'আমাদের বড় সাহেব Newmarch। ...ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরানীকে reduce করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি despatch করতে ৩ দিন দেরী হয়—আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরাণ চিঠি বার হয় এই রকম। এঁর দোরাত্ম্যে Deputy Acctt. General Charter সাহেব, Dy Acctt General শ্রীনিবাস আইয়ার, Asst. Acctt. General সুন্দরাম, Asst. Acctt General Mgset ১ মাসের মধ্যে Medical Certificate দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে আমাদের P. W. D. লোকেদের নিজের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের office hour, strictly with hardest labour from 10-30 to 6-30। নিয়ম এই যে যদি কারু কোন দিন কোন তরফ থেকে reminder আসে—৬ মাসের

জন্য ১০৲ হিসাবে ( জরিমানা ) reduction.—এই ত সুখের চাকরি। তার উপর সেদিন Local Govt কে এই বলে move করেছেন যে অফিসের কেরানী ঘুষ দিয়ে m. certificate দিয়ে পালায় তাতে অফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, সেইজন্য আফসের চিঠি না গেলে Civil Surgeon কাউকে যেন m. certificate না দেন। আমাদের এখন m. c. দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। M. C. দিলেও বলে ওব Service book-এ নোট ক'রে রাখ মিথ্যা m. c.। বর্মা ব'লেই এত জুলুম চলে যাচ্ছে। দিন ৩।২ পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা reminder আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না—এটা আমার Sub Auditor ভৌমিকবাবু ও Peria Swamy-র দোষ। অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। Explanation দিলাম আমার oversight: ইত্যবসরে resignation লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০৲ গেছেই। এ অপমান সহ্য ক'রে যে চাকরি করে সে করে; আ'ম ত কিছুতেই পারব না এই জেনেই লিখে রাখি। যা হোক কি জানি Newmarch দয়া ক'রে কোন কথাই বল্লেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না আমাব আর resignation দেওয়া হলো না। কিন্তু শরীরও আমার বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতদিন চাকরী কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দশায় কখন পড়িনি। সেদিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মিত্তিরমশাইকেও চিঠি লিখি যে যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি resign দিয়ে চলে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয়নি। তবে এও বুঝতে পাচ্ছি এই সাহেব ( ডালকুত্তা ) যদি না যান শীঘ্র, যাবার বড় আশাও দেখিনে—তা হ'লে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে application পর্যন্ত forward করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।'

তিন বৎসর পরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত আর একখানি পত্রে ( মার্চ, ১৯১৬ ) বড সাহেব সম্বন্ধে তিনি অনুরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়মকানুন সবই বড় সাহেবের মর্জি।' ঊর্ধ্বতন সাহেব কর্মচারীদের প্রতি এই ক্রোধ ও ঘৃণারই পরিণতি ঘটিল ঘুসাঘুসিতে এবং চাকরীর ইস্তফায়। যথাস্থানে সে-বিষয় আলোচিত হইবে।

ঊর্ধ্বতন সাহেব কর্মচারীদের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রায়ই বিরোধ বাধিলেও অফিসের সহকর্মীদের সহিত তাঁহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তিনি ছিলেন মজলিসী, আমোদপ্রিয়, গল্পরসিক ও নিপুণ সঙ্গীতশিল্পী, সেজন্য তিনি অল্পকালের মধ্যেই সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অফিসের বন্ধুদের মধ্যেই নাম করিতে হয় যোগেন্দ্রনাথ সরকারের। যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে অজ্ঞাতবাসের উপর কিছুটা আলোকপাত করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৯০৫ সালের শেষভাগে কিংবা ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং এ-পরিচয় ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। যোগেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যে মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ জন ব্রহ্মদেশে থাকা কালে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সম্পূর্ণ খবর রাখিতেন যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আর একজন অফিসের সহকর্মী ছিলেন সুরসিক আত্মভোলা সঙ্গীতসাধক দাদামশায়। তিনি তাঁহার দন্তবিরল মুখটি প্রসন্ন হাসির ছটায় সর্বদা উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ তাঁহার যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তাঁহার সদাপ্রফুল্ল চিত্তের প্রদীপ্ত স্পর্শে সকল প্রকার দুঃখক্ষোভের অন্ধকার নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া যাইত। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'অফিসের কার্য ব্যপদেশে দাদামশায় পূর্বে লুধিয়ানা, আম্বাল', জলন্ধর, শিয়ালকোটে প্রভৃতি অঞ্চলে চাকুরী লইবার পর স্বেচ্ছায় বর্মায় বদলি হইয়া আসেন। নানারূপ দুর্ঘটনার জন্য অফিসের কাজে গুরুতর রকম ভুল হইতে থাকে। অনেকগুলি টাকা নাকি তদ্দরুণ সরকার বাহাদুরের লোকসান পড়ে। তাহারই জন্য দাদামশায় একাউনটেণ্ট হইতে কেরাণীগিরিতে ডিগ্রেডেড হইয়া যান। দুঃখেরি কথাটা বটে। কিন্তু মিত্তির সাহেবের পূর্বতন কর্মচারীরা অফিসের কাগজপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্য লিখিয়া যান, যাহা কাটাইয়া উঠা দাদামশায়ের পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িল। সুরসিক অমায়িক দাদামশায় ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।' এই সরল ভালোমানুষ লোকটি শরৎচন্দ্র ও অফিসের অন্যান্য কর্মীদের কাছে কৌতুকরসের উৎস স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অবিশ্রান্ত গল্পবলার প্রবণতা প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট হাস্য-পরিহাস করিতেন।

শরৎচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ বসাক ওরফে

মি. টি এন বৈসাক। বসাকের চরিত্র একই সঙ্গে আমাদের মনে কৌতুক ও করুণ রসের উদ্রেক করে। বসাক একদিন জুয়ারের পোষাকে অফিসে প্রবেশ করিলেন। কি অপরূপ পোষাকই না তিনি তাঁহার অঙ্গে চড়াইলেন—'পরণে আট হাতে ধুতির প রিবর্তে খাকীর হাফপ্যাণ্ট, আর নীচে পটি জড়ানো, পায়েও বর্মাকানার স্থানে এডওয়ার্ড স্লিপার, গায়েও সনাতন কোটটার বদলে একটি কুমিলাছিটের বুকখোলা কোট। সবচেয়ে বাহার মাথায়, সেখানে একটি পাগড়ি টুপি, ঠিক হুবহু যাত্রাদলের মন্ত্রীর শিরস্ত্রাণের মত।[১] দাদামহাশয়ের মত বসাককে নিয়াও অফিসের কর্মীরাও খুব মজা করিতেন। কিন্তু বসাকের আর একটি দিক ছিল, তাহা সকলের করুণা উদ্রেক করিত। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পেষণে তাঁহার জীবন ছিল জর্জরিত। দেশে হতভাগী স্ত্রী মারা গেলেন। শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহার দেনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশের শিকড় তাঁহার মনে এমনিভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, দেশে তিনি থাকিতে পারিলেন না, পুনরায় ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসিলেন। বসাকের জীবন ছিল নীতি ও নিয়মবহির্ভূত –নিরুপায় হতাশার পঙ্কে নিমজ্জিত। শরৎচন্দ্রের দরদী অন্তর এই হতভাগ্য লোকটির প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ ছিল। যোগেন্দ্রনাথকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'যাই বল তোমরা, আমার কিন্তু দেখে ভারি কষ্ট লাগে। কি যে কদর্য খাওয়া পরা, এ-যদি একবার স্বচক্ষে দেখ ত প্রমাণ পাবে, শরৎদা সত্যি বলছে কি মিথ্যে বলছে।[২] শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া বসাকের কুশ্রী ও কদর্য জীবনযাত্রার রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই ভাগ্যহীন, অধঃপতিত লোকটিকে সুপথে আনিবার জন্য শরৎচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

একজামিনার অফিসের আর একজন সহকর্মী ছিলেন ল্যাজারো। যোগেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই ল্যাজারো সাহেব আমাদের একজামিনারের অফিসের এক অপূর্ব চিজ। বাড়ী মাদ্রাজ অঞ্চলে। পূর্বতন পুরুষ নাকি ছিল গোয়ানিজ। এই অপূর্ব কৌলীন্যের দাবীতে ল্যাজারো ইউরেশিয়ান বলিয়া পরিচিত।' সাহেবের ইংরেজী ভাষা উল্লেখ করিবার মত, যথা

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ২৫
২। ঐ, ৪৩

'হ্যালো ব্রাদার। আই সি ইউ আর অল ক্রি ট্রাবলস।' ড্যাম, ননসেন্স কচড়া ওয়ার্ক। ওঃ হেল, দেয়ার ইজ নো হেণ্ড ( এণ্ড ) অব্ ইট।' ল্যাজারোর একটি দরখাস্তে শরৎচন্দ্র একবার তিনটি লাইনে তিন গণ্ডা ভুল বাহির করিয়া সাহেবকে চমক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। ল্যাজারোর সাহেবীয়ানার অভিমানে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, সজোরে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল স্বীকার করিয়া লইলেন। আর একদিন এই বিদ্যার জাহাজ সাহেবটি একটি 'বিগসাম' কষিতে গলদঘর্ম হইয়া পড়িয়াছিল। শরৎচন্দ্র অতি সহজেই যখন উত্তরটি বাহির করিয়া দিলেন, তখন সাহেব একবারে অবাক হইয়া পড়িলেন। এই ল্যাজারো সাহেবকে লইয়া সকলেই ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতেন। এমন কি আমাদের পূর্বকথিত বসাক পর্যন্ত।

শরৎচন্দ্রের অফিসী জীবনযাত্রার যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, উর্ধ্বতন সাহেব কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক তিক্ত হইলেও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার সময় বেশ ভালোই কাটিত। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অফিসের বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 'একজামিনারের অফিস ছিল অনেকটা নিজেদের বাড়ঘরের মতন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনেক সময়ে গল্পগুজবে কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের উপরিতন কর্মচারীদের অনেকেই ছিলেন সাদা সাহেব। তাঁহাদের ব্যবহারও ছিল চেহারার মতনই সাদা। সময় মত কাজকর্ম সমাধা করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা খুসী থাকিতেন, নচেৎ আমরা কি করি, তাহা তাঁহারা আদৌ লক্ষ্য করিতেন না।'[১] যোগেন্দ্রনাথের বর্ণনায় অফিসের যে মনোরম চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের পূর্বে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে একেবারেই ভিন্ন। যাহা হউক অফিসের সহকর্মীরা সকলেই যে শরৎচন্দ্রকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গল্পগুজবে, হাস্য পরিহাসে তিনি সকলকে মাতাইয়া রাখিতেন এবং সকলের দুঃখ-বিপদে তাঁহার প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তটি সব সময়েই বাড়াইয়া দিতেন। যে অপরিসীম সহানুভূতি তাঁহার সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রচুর পরিমাণেই তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অন্তরজন লাভ করিয়াছিলেন।

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ২৩-২৪

## ব্যক্তিজীবনের পরিবেশ

পেগু হইতে রেঙ্গুনে ফিরিয়া শরৎচন্দ্র মিঃ এম. কে, মিত্রের বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন। কিন্তু একটি অনিবার্য কারণে মিঃ মিত্রের আশ্রয় তাঁহাকে ছাড়িতে হইল। যোগেন্দ্রনাথ সরকার এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তখন সহরে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। মিত্তির সাহেবের কুঠিতে হঠাৎ একদিন গুটিকতক ইঁদুর ভবলীলা সাঙ্গ করাতে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে এক মহা আতঙ্ক জন্মিয়া গেল। অগত্যা মিত্তির সাহেবকে বাধ্য হইয়া একটা ছোটখাট বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুকেও বাধ্য হইয়া একটি মেসে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল।'[১]

শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ও দরদী হৃদয়ের পরিচয় এই মেস জীবনের মধ্যেও পাওয়া গিয়াছিল। মেসে একজন পূর্ববঙ্গীয় লোক ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল বঙ্গচন্দ্র দে। বঙ্গচন্দ্র শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রসিকতায় তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই বন্ধুতে 'বাঙাল' ও 'ঘটি'র ঝগড়া জমিত ভালো। শরৎচন্দ্র মেসে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বঙ্গচন্দ্র, তোমাদের মেসে ত আনলে, এখন অষ্টগণ্ডার ঠ্যালায় রক্ত আমাশা না ধরাও।' বঙ্গচন্দ্রও যোগ্য উত্তর দিলেন, 'ওরে তুই আসবি বলে মেস থেকে আমরা লঙ্কার পাট তুলে দিয়ে হিং আর গুড় চালাতে শুরু করেছি।'

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'বটে! তা হলে তোদের উন্নতি হয়েছে বল! দেখিস এখন তোদের পেটে সইলে হয়! ওরে ত্যাখ শুটকি ফুটকি ত খাস নে মেসে?

বঙ্গচন্দ্রের মুখ দিয়াও তৎক্ষণাৎ বাহির হইল, 'রামচন্দ্র এখন থেকে শামুক কেঁচো খেতে শুরু হবে যে![২]

দুই বন্ধুর মধ্যে এ-ধরনের শ্লেষ ও বিদ্রূপের ঘাত-প্রতিঘাত চলিলেও উভয়ের মধ্যে কিন্তু নিবিড় হৃদ্যতা ছিল। একবার বঙ্গচন্দ্র অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইলে শরৎচন্দ্র বন্ধুর জন্য অপটু হস্তে জলগরম করিতে যাইয়া বিপর্যয় বাধাইয়া বসিলেন, কিন্তু তবুও দমিলেন না। বঙ্গচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় চীৎকার করিয়া যোগেন্দ্রনাথের

---

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৫১

২। ঐ, পৃঃ ২০

সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখিয়া শরৎচন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া স্নেহাত্মক তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, 'ওরে বন্ধ' তুই বেটা এবার নিজে ত মরবিই আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে মারবি। অত গলাবাজি করলে বুক ফেটে যে মারা যাবি হতভাগা।'

মেসের বাসা ছাড়িয়া শরৎচন্দ্র ১৪নং পোজুনডাঙ স্ট্রীট-এ একটি ছোট বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। পোজুনডাঙের এই বাড়িটিতে তিনি প্রায় সাত-আট বৎসর ছিলেন। এই বাড়িটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনবাসের বহু স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার আবেগপ্রবণ হৃদয়ের বহু হাসি-কান্নার সাক্ষী এই বাড়িটি এবং এখানে তাঁহার শিল্প-সঙ্গীত ও সাহিত্য-সাধনার বহু বিচিত্র ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত একখানি চিঠিতে (২২।৩।১১) শরৎচন্দ্র নিজের বাড়ি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'শহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়ীতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।' যোগেন্দ্রনাথ এই বাড়িটির বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন 'সে বাড়িটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও একলার পক্ষে যথেষ্ট। সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত সুবিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের প্রান্ত-সীমায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি পজুনডাঙের খাড়িটি রেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে জনপদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মাঠটির দৃশ্য কি সুন্দর তখন। যেদিকে তাকাও যেন সোনা গলানো।'

শরৎচন্দ্রের এই বাড়িটি যে পল্লীতে অবস্থিত ছিল তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই পল্লীর নামে ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। কারণ এখানে যাহারা ছিল তাহারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর অবজ্ঞাত মানুষ। অভাব অনটনের সঙ্গে তাহাদের নিত্যকার সংগ্রাম চলিত। তাহাদের জীবনধারাও ছিল অতিমাত্রায় নগ্ন ও কদর্য। দুর্নীতি ও দুরাচারের পঙ্কপল্বলে তাহাদের বিলাস ছিল অবাধ। সভ্যতার উন্নত ও মার্জিত পরিবেশ হইতে বিদায় নিয়া এই সব নিন্দনীয় মানুষের সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজের জীবন জড়িত করিলেন, কলুষ ও পঙ্কিলতা হইতে তিনিও মুক্ত থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন চিত্তবিকার ছিল না। এই কুৎসিত পল্লীর কদর্য মানুষগুলির প্রাত্যহিক পঙ্কমলিন জীবনযাত্রার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তাহাদের একান্ত প্রিয় ও নির্ভরযোগ্য বামুনদাদা—তাহাদের সুখ-দুঃখের নিত্য অংশীদার, সুদিনের বন্ধু ও দুর্দিনের সহায়।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের বাস-পরিবেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এখানে উধৃত হইল—

'সহর হইতে দুই মাইল দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন সে স্থানগুলির নাম 'বোটাটং ও পোজোন ডং। রেঙ্গুন সহরে যতগুলি ধানের কল, কাঠের কল, ডক ইয়ার্ড ও ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি আছে তাহাতে ফিটার বাইশ্‌ম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর সমস্ত কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের ছিল একচেটিয়া। অনেক অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানও এই কাজ শিখিয়া এখানে দৈনিক ৩।৪ টাকা রোজগার করে। ঐ সকল মিস্ত্রী একত্র দলবদ্ধ হইয়া এ-অঞ্চলে সপরিবারে কাজ করিত। ইহাদের জন্য এখানে সারি সারি অনেক কাঠের ব্যারাক বাড়ী এখনও আছে। শরৎচন্দ্র স্বল্পভাড়ায় ঐরূপ একটি ছোট বাড়ীতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ পল্লীর নাম মিস্ত্রী পল্লীর পরিবর্তে শরৎপল্লী রাখিয়াছিলাম। এ-পল্লীতে শরৎচন্দ্রের মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কেহই ছিল না। শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরীর দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান করিতেন ও বিপদে পরম আত্মীয়ের ন্যায় সাহায্য করিতেন। এই সকল সদ্‌গুণের জন্য ওখানকার স্ত্রীপুরুষ সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত ও বামুনদাদা বলিয়া ডাকিত। এই বামুনদাদার প্রতি তাহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, অনেকের টাকা-কড়ির আদান-প্রদান এই বামুনদাদার মারফতেই হইত।'[১]

শরৎচন্দ্র যে পল্লীতে বাস করিতেন সেখানে বাঙালী মিস্ত্রীদের প্রাধান্য থাকিলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ও নানা দেশের মিস্ত্রীরাও সেখানে থাকিত। গিরীন্দ্রনাথের কথায়, 'বাঙ্গালী, বার্মিজ, চীনা, মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা দেশীয় কত রকম বেরকমের ফিটার, ভাইসম্যান প্রভৃতি একত্রে এখানে পাশাপাশি বাস করে। এই বিচিত্র পল্লীটিকে এক কথায়ই Indo-Burma Chinese Trading Corporation নাম দিলেও অত্যুক্তি হয় না।'[২]

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১৭-১৮

২। ঐ, পৃঃ ৯৬

এই পল্লীর সমাজনিষিদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ জীবনযাত্রার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানকার বহু নির্যাতিতা নারীর জীবনবেদনা তিনি মর্ম দিয়া অনুভব করিয়াছেন এবং সাধ্যমত প্রতিকারেও চেষ্টাও করিয়াছেন। গিরীন্দ্র-নাথ লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও শিক্ষিত বলিয়া মিস্ত্রীগৃহিণীরা সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট সম্মান করিত এবং কেহ দুঃখ কষ্টে পড়িলে বা চরিত্রহীন মত্তপ স্বামীর হস্তে নির্যাতিত হইলে অকপটে তাঁহার কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইতে লজ্জা বোধ করিত না। এই সূত্রে দরদী শরৎচন্দ্রের অনেক নির্যাতিত ও পতিতা নারীর করুণ কাহিনী শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানেই শরৎচন্দ্রের প্রবাসজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। নারী আন্দোলনের ভাবনায়ক এইখানে বসিয়াই বিভিন্ন স্তরের বহু নারী-চরিত্রের দুর্বোধ রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার বহু চমৎপ্রদ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।'[১]

শরৎচন্দ্র এই কদর্য পল্লীর ঘৃণিত মানুষগুলির মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া সভ্য সমাজে তিনি অপাংক্তেয় হইয়াছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্রের প্রথমা পত্নী শান্তি দেবীর মৃত্যু হইলে ভদ্রসমাজের কোন লোক কোন প্রকার সাহায্য করিতে রাজি হইলেন না। কেহ বলিলেন, 'উনি আবার বিয়ে করলেন কবে?' কেহ আবার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, 'উনি তো আমাদের সমাজের লোক নন' গিরীন্দ্রনাথও হতাশ ভাবে শরৎচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'শরৎদা, যদি ভদ্রপল্লীতে তোমার বাস হত, আমাদের সমাজের সঙ্গে তোমার মেলামেশা থাকত, তা' হলে আজ ভাবতে হত না।'[২] নিষিদ্ধ মানুষগুলির হতভাগ্য জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন যুক্ত করিয়া শরৎচন্দ্র সমাজে মান-সম্ভ্রম লাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার জীবন নিষ্ফল হইয়াও যায় নাই। জীবনের সাজানো ও সুন্দর রূপ তিনি দেখেন নাই বটে, কিন্তু জীবনের সত্য ও বাস্তব রূপ তাঁহার সম্মুখে অনাবৃত হইয়া গিয়াছিল। জীবনের এই মহামূল্য অভিজ্ঞতা তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে অশেষভাবে কাজে লাগিয়াছিল। 'শ্রীকান্তের'র দ্বিতীয় পর্ব, 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি যেখানেই তিনি ব্রহ্মদেশের চিত্র আঁকিয়াছেন সেখানে

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৮৭
২। ঐ, পৃঃ ১৮০

তাঁহার চেনা সমাজের পরিচিত লোকগুলি আসিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর চিত্র তাঁহার সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায়, কারণ ঐ-সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে তিনি মেশেন নাই। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মিস্ত্রী, কারিগর, মুটে মজুর প্রভৃতির মধ্যে তিনি ছিলেন, সেজন্য উহারাই তাঁহার সাহিত্যের আঙিনায় বেশি আনাগোনা করিয়াছে। 'চরিত্রহীন'এর কিরণময়ী ও দিবাকর কামিনী বাড়িউলীর যে নোংরা পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব জীবনে একান্ত পরিচিত। 'পথের দাবী'তে এই সব ঘৃণিত হতভাগ্য লোকগুলিকে তিনি বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন। অপূর্ব ও ভারতীকে তিনি যে কদর্য পরিবেশের মধ্যে ঘুরাইয়াছেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত। ভাগ্যহীন মদ্যপায়ী মানিক, হাতভাঙ্গা নিরুপায় অবস্থায় পতিত পাঁচকড়ি, নীচাশয় কালাচাঁদ প্রভৃতি মিস্ত্রী ও মজুর চরিত্রের সঙ্গে তিনি দিনরাত বাস করিতেন বলিয়াই তো তাহাদের কথা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবতার সঙ্গে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের জীবন ছিল নীতিনিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খল ও কলুষিত। শরৎচন্দ্র যখন অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার চরিত্র কলুষপঙ্কে নিমগ্ন ছিল। তাঁহার আত্যন্তিক মদ্যাসক্তি ও অসংযমের ফলও তাঁহাকে ভুগিতে হইল। তিনি ব্রহ্মদেশে পৌঁছিবার কিছুকালের মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথের দাদা মণীন্দ্রনাথ যখন অঘোরনাথের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুনে পৌঁছিলেন তখন শরৎচন্দ্রের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'চাটুয্যে মশাইয়ের মৃত্যুর পর অনুদিদি, তাঁর স্ত্রী, আমার দাদাকে (মণীন্দ্রনাথ) সঙ্গে করে রেঙ্গুনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। লোকের মুখে শুনেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র পীড়িত হ'য়ে কোনো হাসপাতালে আছেন। তাঁর এমন কোনো অসুখ যে সকলের সঙ্গে দেখা করেন না। দাদার তখন ধর্ম-প্রমুখ মন, তাই তিনি আর দেখা করার চেষ্টাই করেন নি। শরৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মোটেই ভালো হয়নি। সেটা স্বাভাবিক।'[১]

১। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ১৭০

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে যখন পেগুতে গিয়াছিলেন তখনও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা পুরাপুরি বজায় ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছেন। শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড় একটা অপিসে পাওয়া যাইত না।'[১]

শরৎচন্দ্রের অদ্ভুত, ছন্নছাড়া জীবনের বিবরণ তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী গিরীন্দ্রনাথের বইতেও পাওয়া যায়, 'কয়েক দিন শরৎচন্দ্রের সাহচর্যে থাকিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, শরৎচন্দ্র একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। কখন কখন তিনি সহজ লোকের মত আচার-ব্যবহার করিলেও অধিকাংশ সময়ে পাগলের মত আপনার খেয়ালে আপনি মত্ত থাকিতেন। কোন প্রকার নিয়ম বা বাঁধাবাঁধির ধার ধারিতেন না। তাঁহার আচরণে বা কথাবার্তায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত যে তিনি একজন মহাভাবুক লোক। সর্বদা আপন ভাবে বিভোর থাকিতেন।[২]

ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র অতিশয় মদ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অঘোরনাথের মৃত্যুর সময়েই তাঁহার অত্যধিক পানাসক্তির কথা আত্মীয়-স্বজনদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'অঘোরনাথের পীড়ার সময় তিনি যে ঘোর পানাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সংবাদ কলিকাতায় তাঁহার মাসীমার গোচরে আসিয়াছিল।'[৩] তাঁহার মদ্যাসক্তি সম্বন্ধে অনেকে নানারকম গল্প প্রচার করিয়াছেন। সেগুলি সব কতদূর সত্য তাহা নিরূপণ করা কঠিন।[৪]

১। শরৎ-পরিচয়
২। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৩
৩। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ৩০
৪। শ্রীকানাইলাল ঘোষের 'শরৎচন্দ্র' নামক বইতে অনেক আজগুবি ও রোমাঞ্চকর গল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মদ্যাসক্তি সম্বন্ধেও একটি গল্প বর্ণিত হইয়াছে। [illegible]—

এক গোয়ানিজ সাহেব রেঙ্গুনে আসিয়া মদের প্রতিযোগিতার [illegible] করিয়া বসিল। শরৎচন্দ্র সেই চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিবার [illegible] সেই [illegible] দিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইজনে একটি ঘরে গিয়া [illegible]। বোতলের পর বোতল নিঃশেষ হইতে লাগিল, ঘড়িতে [illegible] বাজিয়া গেল। [illegible] বিলাতী ও শরৎচন্দ্র দেশী মদ লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। [illegible] পাগল হইয়া গেল। অল্পকালের মধ্যে তাহার প্রাণপক্ষী দেহ [illegible]। [illegible] জানলার কাচ ভাঙিয়া পাশের ডোবায় হাতে লাফাইয়া [illegible] পাইয়া [illegible] নামিয়া ছুটি দিলেন।

ব্রহ্মদেশে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের সময় শরৎচন্দ্র যে অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা সত্য। যে পরিবেশে যে সব লোকেদের সঙ্গে তিনি দিন কাটাইতেন তাহাতে পতিতা নারী সংসর্গ লাভ তাঁহার জীবনে অনিবার্য ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তির মধ্যে বারবনিতালয়ে শরৎচন্দ্রের নিয়মিত দিন যাপনের ইঙ্গিত রহিয়াছে, 'শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড় একটা আপিসে পাওয়া যাইত না।'

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁহার বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'বুঝিতে পারি যে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র।...জানি বিশ্বাসের কোন রাস্তা রাখি নাই। চিরপ্রবাসী, দুঃখী, কুৎসিত আচারী আমি কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না।...সাধু সাজিতেছি না ভাই—এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না।'

কানাই ঘোষের 'শরৎচন্দ্র' নামক বইতে শরৎচন্দ্রের বিচিত্র পতিতা সংসর্গের চমকপ্রদ বর্ণনা রহিয়াছে। কানাই ঘোষ লিখিয়াছেন, 'মাসের মাহিনা হাতে পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে পাড়ি দিতেন একটু আধটু আনন্দলাভের আশায়। নির্দিষ্ট স্থানের কোন স্থিরতা ছিল না—যখন যেখানে খুশী, দল বেঁধে যেতেন, হৈ-চৈ করে রাত কাটিয়ে আসতেন বাসায়।' একবার শরৎচন্দ্র নাকি বন্ধুদের সঙ্গে আকিয়াবে বাসন্তী নামে এক 'স্বনামধন্যা' পতিতার কাছে গিয়াছিলেন। এই নারীটি পরে যখন প্লেগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল শরৎচন্দ্র নাকি তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর শেষকৃত্যের আয়োজনও করিয়াছিলেন। এই কাহিনী খুবই রোমাঞ্চকর কিন্তু কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। কানাইবাবু শরৎচন্দ্রের সহিত বিজলী, কমলা, মালতী, হরিপ্রিয়া প্রভৃতি বহু বিচিত্র নারীর সম্পর্কের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সে-সব বিবরণের সত্যতা সংশয়াচ্ছন্ন।

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশীয় জীবনপর্বের সমাপ্তিকালে রচিত 'শ্রীকান্তের' প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রেরই আত্মকথা অনেকাংশে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকান্ত বলিয়াছে, 'আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটানা ছি-ছি শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।'

শরৎচন্দ্র আত্মীয়স্বজনের কাছে নিন্দা ও ঘৃণা কুড়াইয়াছিলেন এবং

তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে যে এই নিন্দা ও ঘৃণা তিনি নিজের প্রবৃত্তি ও আচরণের দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের ধূলা ও পঙ্কের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে শুধু কেবল নিন্দা ও ঘৃণার তিরস্কারই যে তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল তাহা নহে, সেই ধূলা ও পঙ্ক হইতে সাহিত্যের দুর্লভ মণিরত্নের পুরস্কারও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ১৩৩৭ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে তিনি দিলীপকুমার রায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

'জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে ?...সব চেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত।'

শরৎচন্দ্র ঘৃণিত জীবনস্তর হইতে পতিত নরনারীর চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার স্পর্শে চরিত্রগুলিকে এত জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। দেবদাস, সতীশ ও জীবানন্দের মত মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র এবং রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী প্রভৃতির মত প্রেমময়ী নিষ্ঠাবতী পতিতা নারী তাঁহার সাহিত্যে এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ, এই সব চরিত্রে তাঁহার নিজের ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের জীবনরূপই কম-বেশি প্রতিফলিত হইয়াছে।

## প্রণয়-কাহিনী

### গায়ত্রী

শরৎচন্দ্র একজায়গায় বলিয়াছেন, 'যাহার হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, সে ভালোবাসিতে জানে, সে ভালোবাসিবেই।' এই ভালোবাসার অফুরন্ত উৎস ছিল তাঁহার হৃদয়ে, সেজন্য জীবনে বহু নারীর প্রতি এই ভালোবাসা অদম্য আবেগে বর্ষিত হইয়াছিল। হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে

তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল আঘাত বেদনা ও নৈরাশ্য, কিন্তু তবুও তিনি বারে বারে নারীকে ভালো না বাসিয়া পারেন নাই। ব্রহ্মদেশে আসিবার পূর্বেও ভালোবাসার কঠিন আঘাত তিনি সহ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মদেশে আসিয়াও এই আঘাত হইতে তিনি পরিত্রাণ পান নাই। গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের ব্যর্থ প্রণয়ের কোনো কোনো কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গিরীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রের প্রণয় ভাগ্য মোটেই ভাল ছিল না। তাঁহার প্রথম জীবনের প্রণয় ঘটিত নৈরাশ্যের কথা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার আর একটি ব্যর্থ প্রণয়ের অপূর্ব কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনার মধ্য হইতে।' গিরীন্দ্রনাথের বর্ণিত কাহিনী নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইতেছে।

রেঙ্গুনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনব্যবসায়ী কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে একদিন দুইটি যুবক ও একটি তরুণী আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিল। তরুণীটির নাম গায়ত্রী, সে ছিল যেমন অপরূপ সুন্দরী, তেমনি শান্ত ও কোমলস্বভাবা। গায়ত্রী দিনরাত বিষণ্ণভাবে অশ্রু বিসর্জন করিত। কুঞ্জবাবুর দয়াশীলা স্ত্রীর কাছে স্নেহ ও সহানুভূতির স্পর্শ পাইয়া নিজের জীবনের কথা খুলিয়া বলিল। যে যুবকটি তাহার স্বামী বলিয়া পরিচিত ছিল আসলে সে তাহার স্বামী নহে, প্রতিবেশীমাত্র। তাহার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়া যুবকটি তাহাকে ফুসলাইয়া আনিয়াছিল। অপর যুবকটি ছিল তাহার বন্ধু। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী ইহাদের কাহিনী শুনিয়া আর ইহাদিগকে নিজের বাড়িতে রাখিতে ভরসা পাইলেন না। গিরীন্দ্রনাথ সব শুনিয়া শরৎচন্দ্রকে ইহাদের জন্য একটি বাড়ি খুঁজিয়া দিবার জন্য একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার নিজের বাড়ির কাছে একটি বাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইহাদের প্রকৃত সম্পর্ক বুঝিতে পারিলেন, রহস্য করিয়া স্বামী বলিয়া পরিচিত যুবকটির নাম দিলেন হাজব্যাণ্ড এবং অপর যুবকটির নাম রাখিলেন ফ্রেণ্ড।

হাজব্যাণ্ড গায়ত্রীর উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ খুঁজিত। একদিন সে সুযোগ আসিল। গায়ত্রীকে একা পাইয়া হাজব্যাণ্ড তাহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অর্গলবদ্ধ দরজার বাহির হইতে ফ্রেণ্ড ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া দ্রুত ছুটিয়া গিয়া শরৎচন্দ্রকে সব জানাইল। শরৎচন্দ্র

তাহাকে লইয়া গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছে গেলেন। তাঁহারা তিনজন এবং রেঙ্গুনের বিশিষ্ট নাগরিক বলিষ্ঠদেহ রায় সাহেব নিবারণ মুখোপাধ্যায় দ্রুতপদে হাজব্যাণ্ডের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শরৎচন্দ্র হাজব্যাণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া দুই একটি বিদ্রূপাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিতেই হাজব্যাণ্ড কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'Who the devil you are to interfere in my affair?' শরৎচন্দ্র সবলদেহ না হইলেও সবলকণ্ঠ ছিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'We have come to teach you a lesson, damned scoundrel!'

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া হাজব্যাণ্ড শরৎচন্দ্রকে দুই তিনটি ঘুসি দিতেই নিবারণবাবু উত্তেজিত হইয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া এমন প্রবল ঝাঁকানি দিলেন যে, তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। শেষকালে শরৎচন্দ্রই তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। সেবাশুশ্রূষার দ্বারা একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিয়া পরদিনকার জাহাজে সকলে মিলিয়া তাহাকে তুলিয়া দিলেন।

হাজব্যাণ্ড চলিয়া গেল, হতভাগী গায়ত্রীকে দেখাশুনার ভার পড়িল ফ্রেণ্ড ও শরৎচন্দ্রের উপর। গায়ত্রী তাহার সহায়সম্বলহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের ভার ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়া দিল। গায়ত্রীর দুঃখে একদিকে শরৎচন্দ্রের হৃদয় যেমন সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অন্যদিকে তেমনি নির্মম, ক্ষমাহীন সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে একদিন তিনি বলিলেন—

'তোমাদের স্বার্থপর সমাজের মাপকাঠিতে গায়ত্রী এখন পতিতা, আত্মীয়স্বজন কেউ তাকে স্থান দেবে না। বাড়ী ফিরলে সমাজ তাকে চোখ রাঙাবে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য দলভুক্ত ক'রে কঠোর শাস্তি দেবে। এক দুর্বল মুহূর্তের একটি সামান্য ভুলের জন্য, আহা! বেচারীর কি লাঞ্ছনা! সে কি সহজে বাপ মা, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে মাসীর বাড়ী আশ্রয় নেবার সঙ্কল্প করেছিল? কত মর্মান্তিক দুঃখকষ্ট ও অত্যাচারের বিষম তাড়নায় জর্জরিত হ'য়ে তবে সে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই উৎপীড়িতা ব্রাহ্মণকন্যার চোখের জলের হিসাব তোমার সমাজ নেবে কি?'

গায়ত্রীর প্রতি সহানুভূতির ফলেই শরৎচন্দ্রের হৃদয় তাহার দিকে আকৃষ্ট

হইল। গিরীন্দ্রনাথের ভাষায়—এই দেবীস্বরূপিণী নারী-মূর্তির অপরূপ সৌন্দর্যই শরৎচন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার সহিত আলাপে আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম। পারিয়া শঙ্কিত হইলাম। শরৎচন্দ্র গায়ত্রীর রূপের ধ্যানে তন্ময়, গায়ত্রীই এখন তাঁহার চিত্তের সর্বত্র জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। ফ্রেণ্ডের বাড়ী যতক্ষণ না যাইতে পারেন ততক্ষণ শরৎচন্দ্রের মনে শান্তি নাই।[১]

একদিন আকাশে খুব ঘনঘটা, প্রবল বর্ষণের মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে শরৎচন্দ্র গায়ত্রীদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ত্রীর অনুমতি লইয়া শরৎচন্দ্র দরদ ঢালিয়া গাহিলেন—

নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর পরে
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চিরসুখময় প্রণয় ভরে।
জগতে কিছুই নাহিক একেলা,
সকলি বিধির বিধানগুণে,
একের সহিত মিলিছে অপরে
আমি বা কেন না তোমার সনে?
ওই দেখ গিরি চুমিছে আকাশ,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে কুসবালারে কেবা না দোষিবে
অভাগারে যদি যায় সে ভুলি।
রবিকর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশীকর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম সজনী,
সে সব চুম্বনে তবে কি ফল?[২]

শরৎচন্দ্রের 'প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ উদ্দাম শক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করিল।' শরৎচন্দ্রের অপূর্ব-মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়া তাঁহার

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১১৮

২। সঙ্গীতটি শেলির Love's Philosophy নামক কবিতা অবলম্বনে রচিত বলিয়া মনে হয়।

প্রতি গায়ত্রীর শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া গেল, মাঝে মাঝে এরূপ গান শুনাইয়া যাইবার জন্য সে ফ্রেণ্ডকে দিয়া অনুরোধ জানাইল। ইহার পরে শরৎচন্দ্র নিয়মিতভাবে সেখানে আসিতে লাগিলেন। গায়ত্রীর স্নিগ্ধকোমল স্বভাব, লজ্জানম্র আচরণ এবং সরল ও মধুর ব্যবহার শরৎচন্দ্রের অন্তর মোহিত করিল। ধীরে ধীরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা অন্ধ ভালোবাসায় পরিণত হইল। গায়ত্রীর একটু স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার জন্য, তাহাকে একটু আনন্দ দিবার জন্য শরৎচন্দ্র সতত ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে যখন গায়ত্রীর মন দুঃখে দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িত তখন শরৎচন্দ্র তাঁহার অমৃতমধুর কণ্ঠে গান ধরিতেন—

কোথা ভবদারা ! দুর্গতি হরা
কতদিনে তোর করুণা হবে,
কবে দেখা দিবি কোলে তুলে নিবি
সকল যাতনা জুড়াবে।

গান শুনিয়া গায়ত্রীর ধর্মপরায়ণ চিত্ত বিগলিত হইয়া পড়িত। মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্র ও ফ্রেণ্ডের মধ্যে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইত। একদিন শরৎচন্দ্র বলিলেন, বিধবাদের জোর করিয়া ব্রহ্মচর্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা আমার অসহ্য মনে হয়। জোর করিয়া বিধবাকে বিবাহ দেওয়া যেমন অন্যায়, জোর করিয়া তাহাদের বিবাহ না দেওয়াও তেমনি অন্যায়। কেউ যদি গায়ত্রীকে ধর্মানুযায়ী পত্নী বলে গ্রহণ করিতে চায়, তাতে আমি কোন দোষ দেখি না।'

শরৎচন্দ্রের উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্যে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার নিছক নৈর্ব্যক্তিক মতবাদ ব্যক্ত হয় নাই, বিধবা গায়ত্রীকে বিবাহ করিবার তাঁহার ব্যক্তিগত গোপন ইচ্ছাও ব্যক্ত হইয়াছে। বিধবা নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার দুঃখ ও অসহায়তা অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে তাঁহার সাহিত্যে বিধবা নারী এত গভীর দরদ ও সহানুভূতির রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময় শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি রেঙ্গুনে কাঠের কারবার করিতে আসে। সে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফ্রেণ্ডকে তাঁহার অধীনে কাজে নিয়োগ করে। দৈবাৎ একদিন শশাঙ্কমোহন গায়ত্রীকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া লুব্ধ হইয়া উঠে। গায়ত্রীকে পাইবার জন্য এই ধনী

কামপিশাচ ব্যবসায়ীটি নানারকম মতলব আঁটিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার একাগ্র প্রেমের সাধনায় বিষম বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। তিনি রূপে, অর্থে, সামর্থ্যে কোন দিক দিয়া শশাঙ্কমোহনের সমকক্ষ ছিলেন না। সেজন্য নিরুপায় সন্দেহ, ঈর্ষা ও ক্রোধে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন। শরৎচন্দ্রের সম্বল তাঁহার মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত। বেদনা ও হতাশায় মগ্ন গায়ত্রীর চিত্তকে একটু প্রফুল্ল করিবার আশায় গাহিলেন—

কোলের ছেলে ধুলা ঝেড়ে তুলে নে কোলে।
ফেলিস না মা ধুলা কাদা মেখেছি ব'লে॥

গায়ত্রী স্তব্ধ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। শরৎচন্দ্র দ্বিগুণ উৎসাহে আবার গাহিলেন—

আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা!
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
কোলে তুলে নিতে আয় মা।

গান শুনিতে শুনিতে গায়ত্রী সংজ্ঞাহীন হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। ধর্ম সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মপরায়ণা গায়ত্রীর মনস্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য ধর্মসঙ্গীতের মধ্যে তাঁহার প্রাণের সকল আবেগ ও উচ্ছ্বাস মিশাইয়া দিতেন।

শরৎচন্দ্র ও শশাঙ্কমোহন উভয়েই গায়ত্রীর প্রতি অন্ধ-কামনায় আত্মবিস্মৃত, উভয়ের মনই ঈর্ষা ও ক্রোধে পুড়িয়া খাইতে লাগিল। মাঝে একদিন উভয়ের মধ্যে ছোটখাট একটা বাগ্‌যুদ্ধও ঘটিয়া গেল। এই সময় গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ফ্রেণ্ড কলিকাতায় রওনা হইল। শশাঙ্কমোহন গায়ত্রীকে আশ্রয় দিবার অছিলায় নিজের হাতের মধ্যে আনিতে উদ্যোগী হইল। শরৎচন্দ্রও মরিয়া হইয়া বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

একদিন গায়ত্রী নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় নিমগ্ন, হঠাৎ শরৎচন্দ্র প্রবল হৃদয়াবেগে বিচলিত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গায়ত্রী শরৎচন্দ্রের লালসাদীপ্ত মূর্তি দেখিয়া ভয়ে পাশের ঘরে পলাইয়া গেল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'এ সময়ে আমাকে দেখে আপনি ভারী অবাক হ'য়ে গেছেন, না? আমি কিন্তু আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই ছুটে আসছি।'

শশাঙ্কমোহন গায়ত্রীকে নিয়া যাইবার জন্য লোকজন নিয়া আসিতেছেন এ সংবাদ দিয়া শরৎচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এখন যাবেন কোথায়?'

গায়ত্রী উত্তর দিল, 'মার ইচ্ছা যা হবে, উপস্থিত ত পথে দাঁড়িয়েছি।'

শরৎচন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, 'পথে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু ঘর তৈয়ার করে নিতে কতক্ষণ?'

'সে ঘর মা'ই ঠিক করে দেবেন, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।'

শরৎচন্দ্র তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, তিনি উন্মত্তের মত বলিলেন, 'আমার জীবনের মাঝখানে যে আপনার আসন পাতা হ'য়ে গিয়েছে, গায়ত্রী দেবী। আমাকে একেবারে ঠেলে ফেলে দিয়ে কি আপনি চলে যেতে পারবেন?'

গায়ত্রী অশ্রুবিজড়িত করুণ কণ্ঠে বলিল, 'আমি সে সৌভাগ্য চাই না। আপনি আমার পিতা, আমায় ক্ষমা করুন, আমি বড় অনাথা।'

শরৎচন্দ্র নিজের ভুল বুঝিলেন, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তিনি সে-স্থান ত্যাগ করিলেন। গায়ত্রী শিহরিয়া ভাবিল, উদাসী সাধকের মনেও তাহা হইলে পাপ বাসা বাঁধিতে পারে। তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। শশাঙ্কমোহন গায়ত্রীকে নিয়া যাইবার জন্য গাড়ি ও লোকজন পাঠাইলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র শশাঙ্কমোহনের মতলব পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেজন্য তিনিও তাঁহার দলবল লইয়া বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিবার উপক্রম হইল। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথ এবং অন্য কয়েকজনের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা আর ঘটিল না। গায়ত্রী রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও সমাজনেতা কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় পাইল। তারপর দেশে তাহার আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

শরৎচন্দ্র গায়ত্রীকে ভালোবাসিয়াছিলেন, সেই ভালোবাসায় কোন খাদ ছিল না। ভালোবাসিয়া তাঁহার কল্পনাপ্রবণ চিত্ত অনেক রঙীন কল্পনার জাল বুনিয়াছিল। কিন্তু রূঢ় আঘাত পাইয়া তিনি বুঝিলেন, 'কল্পনা কোন দিনই বাস্তব হয়ে দেখা দেয় না। —দেয় না বলেই তার প্রতি আমাদের লোভ এত বেশী, তার জন্য আমরা মরি তবু তাকে জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনে।' ব্যর্থপ্রেমের বেদনা শরৎচন্দ্রের হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র

সুরেন্দ্রনাথ, রমেশ, সতীশ প্রভৃতির ন্যায় বিধবা নারীকে ভালোবাসিয়া তিনি জীবনের শুধু নিষ্ফলতা ও নৈরাশ্যই বরণ করিয়া লইলেন।

## শান্তিদেবী

গায়ত্রীকে ভালোবাসিয়া শরৎচন্দ্র যে নিদারুণ আঘাত পাইলেন তাহা তাঁহার হৃদয়কে হতাশা ও শূন্যতায় ভরিয়া তুলিল। অনুরাগে, বেদনায়, অশ্রুজলে মিশাইয়া ভালোবাসার যে অর্ঘ্য তিনি নিবেদন করিলেন তাহা ব্যর্থ হইল, কিন্তু অর্ঘ্য তো ফিরাইয়া লইবার নহে, সেজন্য তাঁহার ভগ্ন হৃদয় ব্যাকুল ভাবে আর এক নারীর সন্ধান করিল যাহাকে সেই অর্ঘ্য তিনি অর্পণ করিতে পারিলেন। সেই নারী তাঁহার জীবনে আসিল। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'নিরাশ প্রণয়ের বিষম বিষাদে শরৎচন্দ্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মানুষের সবদিন সমান যায় না। কিছু দিন পূর্বে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে যে পৃথিবী ছিল স্বপ্নে ভরা রঙীন, আজ তাহা হইয়াছে মলিন অন্ধকার। দীর্ঘ দিবসের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও নিষ্ফল প্রযাস ব্যর্থ হইল দেখিয়া শরৎচন্দ্র হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছিলেন তাহা উপশম কবিবার জন্য অল্পদিনের মধ্যেই স্বজাতীয় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ করিয়া সুখী হইযাছিলেন।'

শরৎচন্দ্র উপরিউক্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের কি প্রকার অবিচার হইতে কিরূপে রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা গিরীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেন নাই। সে বর্ণনা আমরা পাই শ্রীনরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে। শ্রীনরেন্দ্র দেবের বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হইল।

শরৎচন্দ্র যে বাড়িতে বাস করিতেন তার নীচের তলায় একজন বাঙালী চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে পেশায় ছিল মেকানিক বা কলকজার মিস্ত্রী। সংসারে একমাত্র কন্যা শান্তি ছাড়া তাহার আর কেহ ছিল না। চক্রবর্তী ছিল ঘোর মাতাল। গুণ্ডা বদমায়েস মিস্ত্রী ও কারিগরদের নিয়া সে নিজের ঘরে কুৎসিত আড্ডা জমাইত। শান্তিকে নীরবে এই সব পাষণ্ডদের ফাইফরমাস জোগাইয়া চলিতে হইত। কোন কিছু ত্রুটি হইলে বাবার শাস্তি নির্মম হইয়া উঠিত। একদিন রাত্রে শরৎচন্দ্র বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। দরজা খুলিয়া দিবার জন্য

ধাক্কা দিলে ভিতর হইতে চক্রবর্তীর বন্যা শান্তি বাহির হইয়া আসিল। সে শরৎচন্দ্রের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাতরভাবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য করুণ মিনতি জানাইল। তাহার বাবা তাহাকে এক বৃদ্ধের হাতে সঁপিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, আজ বৃদ্ধটি স্বামিত্বের দাবী লইয়া তাহার দিকে আসিয়াছিল, সেজন্য ভয়ে সে পলাইয়া আসিয়া দাদাঠাকুরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, শরৎচন্দ্র তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রে তাঁহার ঘরেই তাহাকে শুইতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পরদিন চক্রবর্তীকে তিনি অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু পিশাচ পিতাকে তিনি নিরস্ত করিতে পারিলেন না। সে যে টাকা খাইয়াছে। বৃদ্ধের হাতে মেয়েকে তুলিয়া দিতেই হইবে। শেষকালে চক্রবর্তী প্রস্তাব করিয়া বসিল, দাদাঠাকুরের এতই যদি দয়া মায়া, তবে তিনি স্বয়ং মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করুন। অগত্যা শরৎচন্দ্রকে এই প্রস্তাবেই রাজি হইতে হইল। তিনি শান্তিকে বিবাহ করিলেন এবং সুখে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি পুত্রসন্তানও জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পত্নী ও পুত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্লেগের আক্রমণে মারা গিয়াছিল।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে ও শরৎচন্দ্রের বিবাহকাহিনীর বর্ণনা করেন নাই। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে শরৎচন্দ্রের পুত্রসন্তানের কথাও গিরীন্দ্রনাথের বইতে নাই। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্রের বিবাহকাহিনী ও পুত্রসন্তানের কথা শ্রীনরেন্দ্রদেব মহাশয় গিরীন্দ্রনাথের মুখেই শুনিয়াছেন।[১]

গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন 'যৌবনে তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহা স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।' একদিন রেঙ্গুন-দুর্গাবাড়িতে গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের স্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন। স্বামীকে সঙ্গে লইয়া পতিব্রতা স্ত্রী সেদিন রক্ষাকালীর কাছে মানসিক দিতে আসিয়াছিলেন। রক্ষাকালী হয়তো তাহার প্রার্থনা আংশিক পূরণ করিলেন। স্বামীকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাকে টানিয়া লইলেন।

শরৎচন্দ্র স্ত্রীর গুরুতর রোগে অধীর ও কাতর হইয়া বন্ধু গিরীন্দ্রনাথের

১। শরৎচন্দ্রের প্রণয় কাহিনী, পৃঃ ৫৬

সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গিরীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শান্তিদেবীর শেষ বিদায় আসন্ন হইয়া আসিল। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখা যেমন হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে, তাহারও চেতনা শেষ বিলুপ্তির পূর্বে তেমনি উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামীকে তিনি বলিলেন, 'দেখ, তোমার অনেক অবাধ্য হয়েছি সে সব আমায় ক্ষমা কর।' শরৎচন্দ্র আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি অমন ক'রে কথা বললে বড় ভয় পাই যে, শান্তি।'

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া ধরা গলায় শান্তিদেবী বলিলেন, 'ছিঃ ভয় কিসের। আমাকে একটু পায়ের ধূলা দাও, আশীর্বাদ কর।'

কিছুক্ষণ পরেই শরৎচন্দ্র বুঝিলেন, আর আশীর্বাদ করিবার কিছুই নাই। কিছুতেই কিছু হইল না, শান্তিদেবী সংসারের দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্র পলকহীন দৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যু-বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।[১]

শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার অকৃতজ্ঞ প্রতিবেশীদের নিতান্ত ঘৃণ্য আচরণের বিবরণ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। যে সব প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার সমস্যার সহিত তিনি নিজেকে এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাখিয়াছিলেন, যাহাদের দুঃখবিপদে তিনি সতত তাঁহার অকৃপণ সাহায্যের হাতটি বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজনও দাদাঠাকুরের এই বিপদে আগাইয়া আসিল না। দ্বারে দ্বারে একটু সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া তিনি শুধু উপেক্ষা ও নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কুড়াইলেন মাত্র। যিনি সকলের দুঃখেই কাঁদিয়া অস্থির হইতেন তাহার এতবড় দুঃখের দিনেও একবিন্দু অশ্রু ফেলিবার জন্য কেহ কাছে আসিল না। নিরুপায় হইয়া শুধুমাত্র গিরীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রই শান্তিদেবীর মৃতদেহ অতিকষ্টে ঠেলা-গাড়িতে করিয়া শ্মশানে লইয়া গেলেন। শোকে অবসাদে শরৎচন্দ্র শ্মশানে পৌছিয়াই নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার শোকাবেগ তাঁহাকে আবার উন্মত্ত করিয়া তুলিল। গভীর নিশীথে শ্মশানের নির্জন অন্ধকারে শরৎচন্দ্রের বুকফাটা কান্না বাতাসে ভাসিতে লাগিল। 'শান্তি, প্রাণের শান্তি! আমার যে আর কেউ নেই, বুক যে একেবারে শূন্য করে চলে গেছ। শান্তিহীন জগতে থেকে লাভ কি?

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১৭৯

এ যে অসহ্য জ্বালা। হা ভগবান, তুমি না মঙ্গলময় তবে তোমার এ রাজত্বে এত অবিচার কেন? শান্তিকে হারাতে হয় কেন? কোন্ পাপে বুকে এ-শেল বিদ্ধ করলে?'

শরৎচন্দ্রের মর্মভেদী কান্না ও বিলাপের বর্ণনা পড়িয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, কি গভীর ভাবে তিনি স্ত্রী শান্তিকে ভালোবাসিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের কথায়, 'শরৎচন্দ্র স্ত্রীর জন্য অনেকদিন পর্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিলেন।' তাহার হৃদয় এত প্রেমপূর্ণ ছিল যে, যাহাকে ভালোবাসিতেন তাহাকেই তাঁহার গোটা হৃদয়খানি উজাড় করিয়া দিতেন। এই উজাড়-করা ভালোবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বেদনা ও নৈরাশ্যই বহন করিয়া আনে। শরৎচন্দ্রের জীবনেও এই বেদনা ও নৈরাশ্য বারবার আসিয়াছিল। ভালোবাসার পাত্রখানি বারবার তিনি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পাত্রের পানীয় তাঁহার বুকে শুধু কেবল অগ্নিময় জ্বালাই ধরাইয়া দিয়াছিল। সেই জ্বালাই তাঁহার অনুভূতি ও সৃষ্টিশক্তির মূলে সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং সেজন্য তাঁহার সাহিত্যে যে ভালোবাসার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেও এই জ্বালা অনিবার্যভাবে মিশিয়াছে।

## হিরণ্ময়ীদেবী

শান্তিদেবীর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দিতে যাইয়া গিরীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬ নং গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন।' শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকা কালে তিনবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, ১৯০৭, ১৯১২ ও ১৯১৪ সালে। সুতরাং গিরীন্দ্রনাথের কথা সত্য হইলে শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই ১৯০৭ সালে কলিকাতায় যাইয়া হিরন্ময়ীদেবীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ১৯১২ সালে অক্টোবর মাসে যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন হিরণ্ময়ীদেবীকে তিনি রেঙ্গুনে বাড়িওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি অস্ত্রোপচারের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং খুব সম্ভবত এই চার মাসের মধ্যেই কোনো সময়ে তিনি হিরণ্ময়ীদেবীকে বিবাহ

করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র যে রেঙ্গুন হইতে এ দেশে আসিয়া হিরণ্ময়ীদেবীকে সঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা শরৎচন্দ্রের জীবনীকার নরেন্দ্র দেবও বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য বাঙলা দেশে এসে ভাই-বোনদের খবর নিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক আসা যাওয়ার মাঝে হিরণ্ময়ীদেবী নামে একটি অসহায়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুরনিবাসী রুষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।'

শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু মণীন্দ্রনাথ রায়ও ১৩৬১ সালের আশ্বিন মাসের মাসিক বসুমতীতে হিরণ্ময়ীদেবী নামক প্রবন্ধের মধ্যে হিরণ্ময়ীদেবীর বিবাহ সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'কেন জানি না এক দুর্বল মুহূর্তে একটি অসঙ্গত প্রশ্ন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা বৌদি আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল। রেঙ্গুনে, না এখানে? 'ই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাতে চাই যে, আমি নিজে বহুদিন পূর্বে একবার দাদাকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলাম, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মেদিনীপুরে যখন তিনি ছিলেন, তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ ক'রে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছিলেন।... বৌদি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে ও দাদা তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন, তারপর তাঁকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। বললেন, আমার বাবা বড় গরীব ছিলেন, তোমার দাদা বিয়ের পর রেঙ্গুন থেকে নিয়মিত প্রতি মাসে বাবাকে মনি-অর্ডার করে সাহায্য পাঠাতেন।'

কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ীদেবীর বিবাহ মেদিনীপুরে হয় নাই, হইয়াছিল রেঙ্গুনে। গোপালচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন যে, তিনি হিরণ্ময়ীদেবী ও তাঁহার আত্মীয়দের কাছে শুনিয়াছিলেন যে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ রেঙ্গুনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হিরণ্ময়ীদেবীর মুখে শুনিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'হিরণ্ময়ীদেবীর বাপের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার শালবনীর কাছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম কৃষ্ণ চক্রবর্তী। হিরণ্ময়ীদেবীর অতি শৈশব অবস্থাতেই তাঁর মা মারা যান। কৃষ্ণবাবুর এক বন্ধু রেঙ্গুনে থাকতেন। সেই সূত্রেই স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কৃষ্ণবাবু কন্যাকে নিয়ে রেঙ্গুনে যান। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণবাবুর পরিচয় হয় এবং এই

পরিচয়ের ফলেই কৃষ্ণবাবু রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। বিয়ের সময় হিরণ্ময়ীদেবীর বয়স ছিল ১৪ বছর।'

শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'দরদী শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করিয়াছেন। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁহার সম্মুখে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তিনি একান্ত উদারতার সহিত নিরুপায় হয়ে আমাকে গ্রহণ করেন। রেঙ্গুনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়।'

শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে, হিরণ্ময়ী দেবী যখন তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়াছিলেন তখন শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর দেবর-পুত্র রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাক্ষীস্বরূপ ছিলেন। শ্রীচক্রবর্তীর গ্রন্থে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বড়দিদি রাণুবালা দেবীর একটি বিবৃতিও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই বিবৃতির মধ্যেও রহিয়াছে যে, হিরণ্ময়ী দেবী রাণুবালা দেবীর কাছে বলিয়াছিলেন যে, রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মালাবদল করিয়া তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ কোথায় হইয়াছিল, মেদিনীপুর না রেঙ্গুনে, উপরি উল্লিখিত দুই পরস্পরবিরোধী বর্ণনা হইতে তাহা নিরূপণ করা এখন শক্ত। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এবং শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্তী দুইজনই খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, রেঙ্গুনেই তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল এবং উভয়েই হিরণ্ময়ী দেবীর বিবৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার, এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজন জীবনীকার শ্রীনরেন্দ্র দেবের উক্তিও অগ্রাহ্য করা চলে না। আবার মণীন্দ্র রায়ের বক্তব্যও উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারিতেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী। আজ তাঁহারা নাই, সুতরাং আজ আর এ-প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নহে।

---

শৈলেশ দেশীর 'বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন' নামক গ্রন্থেও রেঙ্গুনের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে রহিয়াছে, 'অনেক বুঝালেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু মেয়েটি অটল ও অচল। অগত্যা শরৎচন্দ্র তাকেই বিয়ে করা স্থির করলেন। সুস্থ হয়ে উঠে তিনি তাকে শৈবমতে বিয়ে করলেন। নাম দিলেন হিরণ্ময়ী দেবী।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল 'দরদী শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী বৈষ্ণব মতে কণ্ঠিবদল করে আনুষ্ঠানিক বিবাহ-বিধি পালন করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ যে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হয় নাই তাহা অধিকাংশ জীবনীকারই স্বীকার করিয়াছেন।[১] অবশ্য আনুষ্ঠানিক বিবাহ-প্রথায় শরৎচন্দ্রের যে গভীর আস্থা ছিল তাহাও মনে হয় না। বার্ণার্ড শ তাঁহার 'Getting Married', 'Man and Superman' প্রভৃতি নাটকে বিবাহ-প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও তাঁহার সাহিত্যের বহুস্থানে তথাকথিত বিবাহ-প্রথার পবিত্রতা সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে স্বামীপরিত্যক্তা অভয়ার সহিত তাহার প্রাণের মানুষ রোহিণীদার মিলিত জীবনযাত্রার মধ্যে বিবাহিতা জীবনের বিড়ম্বনা এবং বিবাহ অপেক্ষা বড় প্রেমের মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ পাইয়াছে 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবীর ন্যায় শিবনাথ ও কমলের বিবাহও হইয়াছিল শৈবমতে। শেষকালে কমল ও অজিত যখন পরস্পরকে ভালোবাসিয়া একসঙ্গে জীবন শুরু করিবার সঙ্কল্প করিল তখনও কমল বিবাহের বন্ধনের মধ্যে ধরা পড়িতে চাহিল না। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থেও আমাদের প্রথাবদ্ধ বিবাহিত জীবনের মধ্যে যে ফাঁক ও ফাঁকি আছে তাহা চোখে আঙুল দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন। বিবাহ-প্রথার প্রতি এই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ফলেই সম্ভবত শরৎচন্দ্র নিজের জীবনেও সেই প্রথা বিশুদ্ধভাবে পালন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর যেরকম বিবাহই হউক না কেন, শরৎচন্দ্র কিন্তু হিরণ্ময়ী দেবীকে চিরকাল স্ত্রীর সম্মানই দিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করেন তাহাতে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রীই বলিয়াছেন এবং তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধর্মশীলা ও পতিপরায়ণা স্ত্রী শরৎচন্দ্রের ছিল বলিয়াই তিনি ছন্নছাড়া, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিয়াও একেবারে সর্বনাশের পথে নিশ্চিহ্ন হইয়া যান নাই। হিরণ্ময়ী দেবী সেবা দিয়া, ভালোবাসা দিয়া, ভক্তি দিয়া শরৎচন্দ্রের উদাসীন

---

১। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী 'দেশ' পত্রিকায় সম্প্রতি শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, 'উভয়ের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার কিন্তু শেষ পর্যন্তও আইনগত এই সম্পর্কটিকে বৈধ করে নেন নি।' দেশ, ৩১শে জানুয়ারী, ৭৬

পলাতক জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে নিরত রাখিতে পারিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন পত্রে হিরণ্ময়ী দেবীর উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ সব পত্র হইতে তাঁহার ব্যক্তিচরিত্রের স্বরূপ অনেকখানি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। হিরণ্ময়ীর লেখাপড়ার কথা শরৎচন্দ্র ৯।৮।১৩ তারিখে লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন—

'ইনি ত দিনরাত জপতপ পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন, একটু আধটু লেখাপড়া জানেন বটে, কিন্তু কাজে আসে না। একদিন বলেছিলাম, আমি শুয়ে শুয়ে বলে যাই, তুমি লিখে যাও—স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হ'ল না। বরং লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করেন অনুস্বারের ঐ টানটা ফোঁটার ভিতর দিয়ে দেব, না বাইরে দিয়ে দেব।'

হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রকে এত গভীরভাবে ভালোবাসিতেন যে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। ১৯১৪ সালে শরৎচন্দ্র একবার সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া চোরবাগানে ছিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে ফিরিতে হইল বলিয়া তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। হিরণ্ময়ী দেবী স্বামীর কাছে যাইবার জন্য কতখানি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা শরৎচন্দ্রের একটি পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'এঁকে ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।' এই চিরনেপথ্যবাসিনী পতিপ্রাণা মহিলাটি তাঁহার চিররুগ্ণ, অপটু স্বামীর খাওয়া দাওয়ার দিকে সতর্ক স্নেহসতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন তাহা শরৎচন্দ্রের আর একটি পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্নেহযত্ন অনেক সময় কষ্টকর পীড়া হইয়া দাঁড়ায়, শরৎচন্দ্রের পত্রে তাহারই কৌতুকরসাত্মক ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে হিরণ্ময়ী দেবীর এই সদাজাগ্রত সেবাপরায়ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ না থাকিলে তাঁহার অত্যাচারক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ দেহটি এতদিন টিঁকিয়া থাকিত কিনা সন্দেহ। তাঁহার আর একখানি পত্রে হিরণ্ময়ী দেবীর সেবাযত্নের কথা কিভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে—

'কি যে সেদিন জোর ক'রে ছাইপাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ গাইয়ে দিলে যে আজও যে তার ঢেঁকুর উঠছেন। আমি এ-দেশের

একটি বিখ্যাত কুড়ে। চিবোবার* ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাইনে,—আমার ধাতে ও অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ির লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হ'য়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবুহোসেনে লাখ কথার একটা ব'লে গিয়েছেন যে, অবলার বড় নোলা। তারা মলেও খায়। মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন। আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আসছি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘরসংসার রান্নাবান্না কিসের জন্য—যেখানে দু চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও—এযে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুললে। বাস্তবিক আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি। আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন ক'রে একজন আর একজনকে খাবার জন্য জবরদস্তি করে না। আর তা যদি হয় ত আমি যেন নরকেই যাই।'[১]

শরৎচন্দ্র জীবনে বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন। সেই দুঃখের চিরসাথী ছিলেন হিরণ্ময়ী দেবী। স্বামীর সুখ ও সৌভাগ্যে তাহার কোনো অংশ ছিল না, কিন্তু তাঁহার দেশবিখ্যাত স্বামীটি যখন সংসারে নিজেকে সামলাইতে অসহায় বোধ করিতেন, অথবা তাহার রোগাক্রান্ত দেহটি যখন বিছানায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িত তখন সযত্ন সেবাপরিচর্যার মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া তিনি পরম সুখ লাভ করিতেন। পূজা-অর্চনা, আচার-ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তিনি বোধ হয় স্বামীর একান্ত মঙ্গলবিধানের ফলটিই আকাঙ্ক্ষা করিতেন। নিরক্ষর বাঙালী নারীর স্বাভাবিক অজ্ঞতা ও কুসংস্কার হিরণ্ময়ী দেবীর মনকেও আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু স্বামীর প্রতি একাগ্র প্রেম ও নিষ্ঠার ফলে এমন দৃঢ়তা তাঁহার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল যে তাঁহার বিপ্লবী স্বামীকেও অনেক সময় তাঁহার প্রবল সংস্কারের কাছে

---

১। ১৪।৮।১৯ তারিখে বাজে শিবপুর হাওড়া হইতে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

হার মানিতে হইত।[১] শরৎচন্দ্রের গুরুতর অন্তিম পীড়ার সময় হিরণ্ময়ী দেবী যে কতখানি অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর স্বামীর স্মৃতি অন্তরের মধ্যে ধারণ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে এই প্রেমময়ী পতিব্রতা নারী তাহার পার্থিব দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া তাঁহার সাময়িক বিচ্ছেদের অবসান ঘটাইল, এবং বোধ হয় পুনরায় তিনি তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির সঙ্গে অন্য লোকে মিলিত হইলেন।

## সঙ্গীতসাধনা

রেঙ্গুনের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের মুখে শুনিয়াছি, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। ভাগলপুরে থাকিবার সময় সঙ্গীতে তাঁহার যে অশেষ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল[২] তাহারই পূর্ণ পরিণতি ঘটিল রেঙ্গুনে। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজে তিনি একজন গায়ক বলিয়াই শুধু পরিচিত ছিলেন।' শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতশিল্পীরূপে প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠা বোধ হয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সম্বর্ধনা-সভায় ঘটিয়াছিল। ১৯০৫ সালে নবীনচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে রেঙ্গুনের বাঙালী সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার আয়োজন হইয়াছিল। গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া ঐ সভায় একটি গান গাহিবার জন্য তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। তবে শরৎচন্দ্রের সর্ত ছিল। তিনি পর্দার ভিতরে আত্মগোপন

১। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থের একস্থানে লেখা আছে যে, শরৎচন্দ্র একবার একটি ছাগল কিনিয়াছিলেন। ছাগলটি নিজের দুধ নিজেই খাইয়া ফেলিত। সুরেন্দ্রনাথের কথায় 'বড়মা' আসতেই উড়ে ঠাকুর বোলছে তাঁকে যে, যে ছাগল নিজের দুধ খায় তাকে বাড়িতে রাখলে হয় কর্তা, নয় গিন্নী 'মরে'। তিনি এমন কান্না শুরু কোরলেন যে, সে ছাগল বিদায় করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

২। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত এবং অভিনয়বিদ্যার হাতেখড়ি হয়েছিল এক যাত্রার দলে।'

শরৎপরিচয়—পৃঃ ১২৭

করিয়া গান গাহিবেন। নির্দিষ্ট সময়ে শরৎচন্দ্র অন্তরালে অবস্থান করিয়া প্রাণমাতানো সুরে গান ধরিলেন—

ব্রহ্ম-ভূমি সুশোভিত বঙ্গবনে আজি হে।
এস কবিবর এস হে!
ধন্য কর ব্রহ্মদেশ হে!
সমবেত যত স্বদেশী,
তব দর্শন-অভিলাষী
লয়ে পুণ্য প্রীতিভারাশি
এস কাব্য-আকাশ-শশী হে।
এস সুন্দর, এস শোভন,
এস বঙ্গহৃদয় ভূষণ,
এস হে প্রিয়দর্শন।
প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি লহ হে॥

শরৎচন্দ্রের সুললিত কণ্ঠনিঃসৃত এই সঙ্গীত শ্রোতাদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিল তাহার বর্ণনা গিরীন্দ্রনাথ সরকার দিয়াছেন, 'সঙ্গীত শেষ হইবামাত্রই শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক আশ্চর্য সাড়া পড়িয়া গেল। গায়ক শরৎচন্দ্রকে দেখিবার এক অদম্য কৌতূহল জনতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ব্রহ্ম-প্রবাসে কে এই অজ্ঞাত সুধাকণ্ঠ গায়ক আজ কবি-সম্বর্ধনা করিয়া প্রবাসী বাঙালীর মুখ রক্ষা করিলেন। স্বয়ং কবিবর বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ধন্যবাদ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শরৎচন্দ্র সঙ্গীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্দার মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। সন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাওয়া গেল না। কবিবর নবীনচন্দ্র ক্ষুণ্ণমনে ফিরিবার সময় আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গেলেন, যেন একদিন শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ করাইয়া দেওয়া হয়। আর একদিন তিনি তাঁহার গান শুনিবেন। এমন মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত তিনি বহুদিন শুনেন নাই। সুরশিল্পী শরৎচন্দ্রের সুধাকণ্ঠ ও গানের অপূর্ব শক্তি তাঁহাকে এক রাত্রিতেই প্রবাসী বাঙালীদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিল বটে, কিন্তু এই পল্লবান্তরালের কোকিলের মত অদৃশ্য গায়কটির প্রকৃত স্বরূপটি বহু দিবস পর্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচর ছিল।'[১]

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৬০-৭

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতস্বরা কবিবর নবীনচন্দ্রকে এমনি মোহিত করিয়াছিল যে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বার বার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু লাজুক ও লোকভীরু শরৎচন্দ্র নবীনচন্দ্রের সম্মুখে আসিতে চাহিলেন না। অবশেষে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া গেল। রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম-উৎসব উপলক্ষে রেঙ্গুনে আসিয়াছিলেন। একদিন গিরীন্দ্রনাথ তাহাকে এবং শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর নবীনচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে একখানা গান গাহিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শরৎচন্দ্র ধর্গানের সম্মুখে বসিয়া প্রাণের আবেগে গাহিলেন—

আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা। বাকি কিছু নাই।
এ দাগ কাটিবার মত ভার বেশী নাহি চাই।
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি।
( তাই ) দু'হাত তুলে শূন্যপানে তোমারে খুঁজি॥
ভাবি তুমিই দিয়েছ, তুমিই নিয়েছ, তুমিই দিবে তা ফিরে।
আবার তুমিই আসিবে সুধা ল'য়ে হাতে রিক্ত আমারি তরে॥
আমি সেই পথ চাহি সময় নিরখি
যেন দাঁড়ায়ে থাকিতে পারিব।
( শুধু তোমারই আশায় )
শেষে অজানা সময় নিকটে আসিলে
যেন তোমারি চরণ পাই॥

এই গান শুনিয়া রামকৃষ্ণানন্দ ও নবীনচন্দ্র উভয়েই কতখানি ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা গিরীন্দ্রনাথের ভাষায় বর্ণিত হইল—

'এই স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনি স্বামীজীকে ভাবে মাতোয়ারা করিয়া তুলিল এবং কবিবরের হৃদয়তন্ত্রীর অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিবামাত্র তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই সঙ্গীতের রসমাধুর্য আস্বাদন করিয়া বলিলেন, 'আপনার গানের ভাব উদ্দীপনায় সেই চিরসুন্দরকে মনে করাইয়া দেয়, রেঙ্গুন শহরে রত্ন লুকান ছিল জানতাম না। আমি আজ আপনাকে রেঙ্গুনরত্ন উপাধি দিলাম।'[১]

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১৪

শরৎচন্দ্র যে সব গান গাহিতেন তাহাদের মধ্যে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব পদ ও ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ আধ্যাত্মিক গানগুলিই প্রাধান্য পাইত। তাঁহার কণ্ঠ অতিশয় সুমধুর এবং হৃদয় ভাবাবেগে প্লাবিত ছিল, সেজন্য বৈষ্ণব সঙ্গীতের মাধুর্য ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার গানে মূর্ত হইয়া উঠিত। তিনি যে-পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীর মিস্ত্রীমজুরদের লইয়া তিনি একটি কীর্তনের দল গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গিরীন্দ্রনাথের কথায়, 'ইহাদের একটা কীর্তনের দল ছিল। বামুনদাদার পরিচালনায় ছুটির দিন ইহারা খোল করতাল সংযোগে নাম সংকীর্তন করিত।' রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের অপর আর একজন সহবাসী বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস এই কীর্তনদল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'সন্ধ্যাবেলা তুলসী গাছকে বেলফুলের মালায় সজ্জিত করিয়া তিনি পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া সংকীর্তন করিতে খুবই ভালবাসিতেন। কোন সময় সন্ধ্যাবেলা। রাস্তায় দেখা হ'লে, দেখা যেত তাঁর হাতে বেলফুলের মালা, বাজার হতে কিনিয়া আনিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'ঠাকুরকে দেব হে, সন্ধ্যাবেলা। যেও, হরিনাম হবে।'[১]

শরৎচন্দ্রের কীর্তনদলের একজন দোহার, আমতার সুরেন্দ্র মান্না একটি পত্রে লিখিয়াছেন, 'আমি শরৎবাবুকে ১৯০৮ ইংরেজি হতেই জানিতাম। এমন কি এক বাড়িতেও বাস করিয়াছি, আমি ছিলাম তাঁর দোহার, যদিও তিনি কীর্তনের পদাবলী ও সুর যোজনা করিতে পারিতেন কিন্তু গাইতে চাইতেন না। যে দিনই তিনি সংকীর্তনের খবর পেতেন, এমন কি চিঠিও পেতেন, তিনি ডাকিতেন, ওহে সুরেন শীঘ্রই তৈরি হও। সংকীর্তনে যেতে হবে চিঠি এসেছে। নিজের ঘরেও কীর্তন বাদ যেত না। আমাদের দস্তুরমতন একটা সংকীর্তনের দলও ছিল। দোল চাঁচর ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার উৎসব শরৎবাবুর কাছে কিছুই বাদ যেত না।'[২]

শরৎচন্দ্রের অসামান্য সঙ্গীত-মাধুর্য সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'শরৎবাবু যে গান ধরিলেন, দেখিলাম, সে ত 'আয় না অলি কুসুম কলি'র ধার দিয়াও গেল না। প্রথমেই ধরিলেন জ্ঞানদাসের সেই বিখ্যাত পদ—তোমার গরবে গরবিণী রাই রূপসী তোমারি রূপে। মরি মরি মরি!

১। শরৎ-প্রতিভা, পৃঃ ৪৭
২ ঐ, পৃঃ ৪৭

বাংলা গানে যদি প্রাণ থাকে ত এইসব মহাজনদিগের পদেই আছে, আবার বাঙ্গালীর প্রাণেও যদি সত্যকার গান থাকে ত সেও এই বৈষ্ণবগানেই। শরৎচন্দ্র যে কি গাহিলেন, বলিতে পারি না। দেখিলাম তাঁহার চোখ দু'টি ছল ছল করিতেছে—রুগ্ন শীর্ণ কণ্ঠ যেন সঙ্গীতের ভাবে ফাটিয়া পড়িতেছে। কি সে প্রাণের বেদনা! কি সে মর্মের ক্রন্দন, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সকলের মর্মে প্রবেশ করিতেছে। গান বলিতে যদি কিছু থাকে, যাহার ভিতরে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সে এই গান, এই প্রাণ-জুড়ানো সঙ্গীত।

সেই হইতে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের ভক্ত হইয়া পড়িলাম এবং ওস্তাদদিগকে সঙ্গীতের আসর হইতে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।'[১]

শরৎচন্দ্র আর একদিন তাঁহার অফিসের বন্ধুদিগের অনুরোধে নিম্নলিখিত গানটি গাহিয়াছিলেন—

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখাবো ব'লে হে, তাই এসেছিলাম এ গোকুলে
আমায় স্থান দিয়ো রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী, তাই সেজেছি বিদেশিনী
এখন বাঁচাও রাধে কথা ক'য়ে
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
তুমি যদি না কও কথা, ফিরে যাব যমুনাকূলে।
ভাঙবো বাঁশী ত্যজবো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান,
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
চরণ নূপুর বেঁধে গলে
ঝাঁপ দিব যমুনা জলে।

এই গানটি সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'এই গানটি পূর্বে থিয়েটারে মাতাল দেবেন দত্তের অভিনয়ে যাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিও একজন অসাধারণ রঙ্গাভিনেতা ও কিন্নরকণ্ঠ গায়ক। তাঁহার মুখেও গান শুনিয়াছিলাম শরৎবাবুর মুখেও শুনিলাম। সঙ্গীতবিদ্যায় যে শরৎবাবুর অপেক্ষা তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে অধিক, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শরৎবাবুর প্রাণটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণের চাইতে বড়, এ-কথা জোর

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৩-৪

করিয়া বলা যায়। কেন না, যে গানে একদিন হাসির উদ্রেক করিয়াছিল, আজ সেই গানে হাসির পরিবর্তে অনাবিল অশ্রুর ঝরণা বহাইয়া দিয়া গেল।'[১]

শরৎচন্দ্র প্রধানত বৈষ্ণব সঙ্গীতের সাধক হইলেও অন্যপ্রকার সঙ্গীত, বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যুষে আপন মনে কত কি আবৃত্তি করিতেন এবং ধীরে ধীরে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেন। ঐ আবৃত্তি ও গানের অধিকাংশই ছিল কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে।' যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য ও সঙ্গীতের পক্ষপাতী ছিলেন।'

সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের ফলে শরৎচন্দ্র তাঁহার অঙ্কিত অনেক চরিত্রের মধ্যে এই সঙ্গীত-প্রীতি দেখাইয়াছেন। 'চরিত্রহীনে'র নায়ক সতীশ একজন পাকা সঙ্গীত-শিল্পী। শরৎচন্দ্র ঐ উপন্যাসের একস্থলে লিখিয়াছেন, 'ভগবান সতীশকে গাহিবার গলা এবং বাজাইবার হাত দিয়াছিলেন। এদিকে তিনি কৃপণতা করেন নাই। শিশুকাল হইতে সুরু করিয়া এই বিদ্যাটাই সে শিক্ষা করিয়াছিল এবং শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক তেমনি করিয়াই শিখিয়াছিল। নিজের চরিত্রের অনুরূপতা অবলম্বনে অঙ্কিত শ্রীকান্ত চরিত্রকেও তিনি সঙ্গীত-সমঝদার করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন, সেজন্যই ঐ চরিত্রটি পিয়ারী বাইজীর গানের মজলিসে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীকান্তকে সমঝদার বুঝিয়া পিয়ারী বাইজী কতখানি আবেগে আগ্রহে গান গাহিয়াছিল তাহার বর্ণনা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রহিয়াছে 'এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সেই যেন বাঁচিয়া গেল। তারপরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত যেন শুধুমাত্রই আমার জন্যই তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।' শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব-সঙ্গীত-প্রীতি আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইল 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে। মুরারিপুরের আখড়ায় কমললতার কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত ভক্তিভাবোচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহার কীর্তন গানের প্রভাব বর্ণনা করিয়া শ্রীকান্ত বলিয়াছে, 'এই সহজ ও সাধারণ গুটি কয়েক

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৭

কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম, উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া।'

শরৎচন্দ্র যেমন সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন তেমনি অনুরাগী ছিলেন অভিনয়ে। ভাগলপুরে থাকিবার সময় তিনি অনেকগুলি নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে অভিনেতা প্রযোজক ও নাট্য শিক্ষক। শরৎচন্দ্র যে সময় রেঙ্গুনে যান তখন সেখানে বাঙালী সমাজে গানবাজনা ও অভিনয়ের বিশেষ প্রচলন ছিল। সতীশচন্দ্র দাসের কথায়, 'যে সময়ে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে আসিয়াছিলেন সে সময়ে রেঙ্গুনে যাত্রা থিয়েটার ও সঙ্গীতচর্চায় বাঙ্গলার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিল।'[১] শরৎচন্দ্র একবার 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অভিনয়ে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ গায়িকা নিধুবালাও এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিবার জন্য নিয়মিত মহড়া দিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ কলিকাতায় যাইয়া সে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেজন্য এই নাটক শেষ পর্যন্ত আর মঞ্চস্থ হইল না। সতীশচন্দ্র এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, 'তখনকার দিনে রেঙ্গুনে প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিল নিধু। নিধুর বাড়ীতে গান শুনিতে সভ্যসমাজের হোমরা চোমরা অনেকে দেখা দিতেন।

নিধুর সঙ্গে থিয়েটারের বিষয় আলাপ করিয়া ঠিক করা হ'ল। নিধুও রিহার্সেলে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। শীঘ্রই থিয়েটার করা হবে, এদিকে সবাই প্রস্তুত। হঠাৎ একদিন কলিকাতা হ'তে নিধুর চিঠি পঁহুছিলো কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় যেতে হবে। থিয়েটারের মাষ্টার শরৎদা। একদিন নিধু কাঁদিয়া কাটিয়া বলিল, মাষ্টারবাবু আমাকে পনের দিনের জন্যে কলকাতায় যেতে হবে। নিধু কলিকাতায় চলিয়া গেল। পনের দিন যেতে না যেতেই হঠাৎ শরৎদা এক টেলিগ্রাম পেলেন, নিধুবালার মৃত্যু হয়েছে।'

## চিত্র-সাধনা

১৯১২ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'বছর তিনেক আগে যখন **Heart disease** এর

১। শরৎ-প্রতিভা

প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া Oil painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি Oil painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলি বাঁচিয়াছে।'

শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি আনুমানিক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই ছবি আঁকা শুরু করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র দাস তাঁহার 'শরৎ-প্রতিভা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'অনেকেই জানেন না শরৎচন্দ্র চিত্রবিদ্যা জানতেন কিনা। তিনি বর্মাতে বা-থিনের কাছেই চিত্রবিদ্যা শিখিয়া নিজ হাতে এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন, না দেখিয়া প্রত্যয় করা অসম্ভব। তাঁর ঘরে অধিকাংশই নিজের হাতের তৈরী জলচিত্র শোভা পেত। নানাপ্রকার রং-এর টিন ও নানাবিধ তুলি শরৎদার ঘরে সাজানো থাকতো।' সতীশচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'একদিন শরৎচন্দ্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া বা-থিনের বাড়িতে যাইয়া খাওয়া দাওয়া ও গল্পগুজব করিয়াছিলেন।'

শরৎচন্দ্রের 'ছবি' গল্পের নায়কও বা থিন নামে একজন বর্মী তরুণ শিল্পী। সে মা-শোয়েকে ভালবাসিত এবং তাহাকের গোপাকে আঁকিতে যাইয়া সে তন্ময় হইয়া মা শোয়ের চিত্রই আঁকিয়া ফেলিয়াছিল। তবে গল্পের নায়ক বা-থিনের সহিত সতীশচন্দ্র উল্লিখিত শরৎচন্দ্রের শিল্পী-বন্ধু বা-থিনের জীবনের কতদূর মিল ছিল তাহা বলা শক্ত।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের চিত্রাঙ্কন-পটুতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিলেন যে, এ-বিদ্যা তাঁহাকে অপর কেহ শেখায় নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে এ প্রসঙ্গে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হইল—

'এবার ঘরের ভিতরটায় ঢুকিতেই চোখে পড়িল, একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ—কোথাও কোথাও রঙের পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝতে বাকী রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ শিক্ষার গুরু কে শরৎদা? এর গুরু আমি—বলিয়া বাম হাতের তর্জনী দিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া একটুখানি হাসিলেন।'[১]

শরৎচন্দ্র এই চিত্রবিদ্যা নিজেই শিখুন কিংবা অপর কাহারও নিকট হইতে

শিক্ষা করুন, ইহা নিশ্চিত সত্য যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাপক পড়াশুনা ছিল। যোগেন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'তবে এ কথা সত্য যে তাঁহার যতটুকু চিত্রকলা বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহাতে তাঁহাকে চিত্ররসজ্ঞ বলিলে, ভুল হইবার কোনই কারণ ছিল না। এই চিত্রবিদ্যার প্রসঙ্গে আমাকে সময় সময় অদ্ভুত রকমের সব প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'আচ্ছা বল ত সরকার, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় পেণ্টার কে? উত্তর দিলাম র‍্যাফেল বড় পেণ্টার।

—উঁহুঁ—হল না। র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে, তিসিয়ান সবচেয়ে বড পেণ্টার।'

কোন্ ধরনের ছবির কতখানি মূল্য তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং-এর চেয়ে হিউম্যান পেন্টিং ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেন্টিং ভাল আঁকা যায় না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে ত ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা তা রং দিয়ে আঁচড় পাড়লেই ছবি হল না। তোমরা ত র‍্যাফেলের ম্যাডোনা দেখেছ? বাজারে ও ব্যক্তির খুব নাম হ'লেও বড় বড় সমালোচকদের কাছে ও থার্ড ক্লাস পেণ্টার বলে গণ্য হয়ে আসছে। তিসিয়ানের কাছে ও দাঁড়াতেই পারে না।'

চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান ছিল বলিয়াই এ সম্বন্ধে তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া মতামত প্রকাশ করিতেন। শরৎচন্দ্রের একখানা চিঠি হইতে এ প্রসঙ্গে কিছুটা উদ্ধৃত হইল—'এই অবনীন্দ্র ঠাকুরের ওপর আমার ভয়ানক রাগ আছে—অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা হয় খুব একচোট ঝাল ঝাড়ি—কিন্তু কোনদিন করিনি। Art painting আমিও নিজে করি। Oil painting আমিও বুঝি, ও সম্বন্ধে নিতান্ত কম বই পড়িনি—কিন্তু যমুনা ছোটো কাগজ ওতে সুবিধা হবে না।'[১]

মানুষের মূর্তি আঁকার দিকে শরৎচন্দ্রের বেশি ঝোঁক ছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার পরিচিত নারদ মুনি নামে বৃদ্ধটির ছবি আঁকিতে শুরু করিয়াছিলেন। এই ছবিটি সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'আমি

১। ১৯১৩ সালের ২৫শে জুলাই রেঙ্গুন হইতে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত

ত দেখিয়া অবাক। সত্যসত্যই যে সেই বুড়োর ছবি। গ্রাম্য-পুকুরের পাড়ে এলোমেলো গাছপালা, তারই মধ্য দিয়া আঁকা বাঁকা ভাঙ্গাচোরা রাস্তা। তারই পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া একটি বৃদ্ধ। যে একবার ওই নারদমুনিকে দেখিয়াছে সে কদাপি এমন কথা বলিবে না যে, এ আর কারও ছবি। বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর নৈরাশ্যের কেমন গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে। সেটিই দেখবার বিষয়।'

যোগেন্দ্রনাথের উক্তি হইতে জানা যায় যে শরৎচন্দ্রের আঁকা প্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী।' এই চিত্রখানা একটু অস্পষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার 'মহাশ্বেতা' চিত্রশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। এই চিত্রখানা সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথের মতামত উদ্ধৃত হইল—

'এখানা দেখা গেল সেই সব অস্পষ্টতা দোষরহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোকসম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল তাও নয়। আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্পেকটিভ এবং ব্যাক গ্রাউণ্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, একসঙ্গে নিসর্গ চিত্র ও মনুষ্যচিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপসা দেখাইতেছিল, ওপারে মেঘ-ভারাবনত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহার একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য একটুখানি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশা সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।

স্বল্পান্ধকার ক্ষুদ্র ঘরটীর এককোনে ছবিখানি এমনভাবে বসানো যে, দরজার একপাশ খুলিলে যতখানি আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারই সাহায্যে ছবিখানাকে ভালরূপ বোঝা যায়। শরৎবাবু সেই অবস্থায়ই আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। বুঝিলাম সকল উন্নত কলার মধ্যেই সেই চিরসুন্দরের আনন্দঘন রসমূর্তিরই বিকাশ সাধনের চেষ্টা। বাস্তবিকই একটুখানি উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আপাত কুৎসিত জিনিসটীও সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য শরৎবাবু যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলেন সেটি নগ্ন সৌন্দর্যের চিত্র নয়। নগ্ন হইলেও বোধ হয় কুৎসিত বলিতে পারিতাম না এই কারণে, যে তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের কেমন চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল।'[১]

এই মহাশ্বেতা ছবিখানি সম্বন্ধে তিনি একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা ( Oil painting ) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।'[২]

শরৎচন্দ্র তাঁহার সঙ্গীত ও সাহিত্যসাধনার ন্যায় চিত্রসাধনার কথাও সব সময়ে গোপন রাখিতে চাহিতেন। যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তিনিই শুধু শরৎচন্দ্রের চিত্রকলার খবর রাখিতেন এবং ঠাট্টাবিদ্রূপ হইতে শরৎচন্দ্রকে ও নিজেকে বাঁচাইবার জন্যই তিনি এ-কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যজীবনের শেষ পর্যায়ে চিত্রকলার সাধনায় মন দিয়াছিলেন, বিপরীতভাবে শরৎচন্দ্র সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ে (ভাগলপুরের সাহিত্য পর্ব বাদ দিলে) চিত্রকলা চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সাহিত্যসাধনার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও চিত্রসাধনা হইতে তিনি দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। তাহার সাহিত্যসাধনার পরিণত গৌরবমণ্ডিত যুগে লোকে বিন্দুমাত্র জানিত না যে, তিনি এককালে ললিত-কলার দুইটি প্রধান ধারায় অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

## জ্ঞানচর্চা

শরৎচন্দ্র শেষজীবনে তাঁহার গভীর জ্ঞানসাধনার কথা সযত্নে গোপন রাখিতেন। সেজন্য তাঁহার পড়াশুনা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। তিনি নিজে কোন জ্ঞানের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন না, বরং সুযোগ পাইলেই নিজেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলিয়া প্রচার করিতেন।'[৩] তাঁহার সাহিত্যের মধ্যেও ( 'চরিত্রহীন', 'শেষপ্রশ্ন'

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র পৃঃ ১৩-১৪

২। ১০. ১১, ১৩ তারিখে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

৩। প্রমথ চৌধুরীকে ১১. ১০ ১৬ তারিখে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমি লেখাপড়া শিখিনি ইংরিজি ভাল করে না পড়াশুনা থাকলে লেখার ভালমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা হয় না।'

প্রভৃতি দুই একখানা বইছাড়া) জ্ঞানের কোন প্রখর দীপ্তি কিংবা কোন বিশেষ তত্ত্বের অবিমিশ্র অবতারণা এত কম যে পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুকম্পামিশ্রিত স্বীকৃতি জানাইলেও তাঁহাকে কখনও সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। অবশ্য 'নারীর মূল্যে'র মধ্যে তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যয়নের অকাট্য সাক্ষ্য রহিয়াছে, কিন্তু 'নারীর মূল্য' যে সত্যই তাঁহার লেখা সে বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মনে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁহাদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার অধ্যয়ন কত গভীর ও ব্যাপক ছিল, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সহিত তাঁহার কিরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। প্রথম যৌবনেই যে তিনি কত বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করিতেন তাহা তাঁহার ঘনিষ্ঠ যৌবনসঙ্গী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন, 'বই পড়তেন—মোটা মোটা ইংরেজী বই। একবার সে-বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়েছিলেম—ইংরেজী ফিলজফির বই, সায়লজির বই এইসব বই পড়তেন; বটানি পর্যন্ত বাদ ছিল না।'[১] ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার এই অধ্যয়ন-স্পৃহা বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পঙ্কে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কপ্রলেপ ধৌত করিয়া শুদ্ধচিত্ত সাধকের একাগ্র নিষ্ঠা লইয়া কিভাবে বাণীর মন্দিরে অতন্দ্র সাধনায় নিরত থাকিতেন, তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের অধ্যয়ননিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রের হিন্দু দর্শনশাস্ত্র কিছু পড়া ছিল কি না জানি না, কিন্তু দেখিয়াছি, রেঙ্গুনের Bernard Free Library হইতে অনেক ইংরেজী সমাজনীতি, রাজনীতি ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত পড়িতেন।'[২] যোগেন্দ্রনাথ সরকারও লিখিয়াছেন যে, তিনি এই অধ্যয়নের জন্যই গানের মজলিস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের ঘৃণিত পরিবেশে অজ্ঞাত ও অখ্যাত জীবন যাপন করিবার সময় এইভাবে গোপনে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।[৩]

১। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য—পৃঃ ৬

২। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—১১

৩। হরিহর শেঠ একটি প্রবন্ধে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের জ্ঞানসাধনার কথা উল্লেখ করিয়া

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থপাঠে অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার নিজের উক্তি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—'পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই, গত দশ বৎসর Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।' ডারউইন, টিণ্ডল, মিল, হাক্সলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের লেখা তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সবাপেক্ষা প্রিয় বৈজ্ঞানিক ছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সার। যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'শরৎবাবু চিরদিন হারবার্ট স্পেন্সারের একনিষ্ঠ ভক্ত। ধারাবাহিকভাবে তাঁহার সিনথেটিক ফিলজফির মত সমস্ত বইগুলি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন—এখন উক্ত মনীষীর ডেসক্রিপটিভ সোসিঅলজি পড়িতেছেন এবং আবশ্যক মত নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন। হারবার্ট স্পেন্সারকে আমাদের মত পণ্ডিত লোকে কপিল কণাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াই হয়ত ক্ষান্ত হয়, পড়িবার মত দুঃসাহসের পরিচয় কদাপি দেয় বলিয়া মনে হয় না। স্পেন্সারকে আমাদের মতন একজন কেরানী হইয়া শরৎবাবু পড়িয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহা। সমগ্র দর্শনশাস্ত্রকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, আশ্চর্যের কথা বটে।' স্পেন্সারের প্রতি শরৎচন্দ্রের কতখানি অনুরাগ ছিল তাহা তিনি একদিন যোগেন্দ্রনাথকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'স্পেন্সার আমার অত ভাল লাগে কেন, যদি শুনতে চাও ত বলি, স্পেন্সার-এর সহজ সরল উক্তির জন্যে। সেটার মূলে সত্যের সহজ উপলব্ধি।' ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত একখানি পত্রে স্পেন্সার সম্বন্ধে আলোচনার আগ্রহ ব্যক্ত করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আর একটা কথা আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছি —এক একবার ইচ্ছে করে, H Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo: একটা বাঙ্গলা সমালোচনা সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রুমিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি।'

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানের বই বেশি পড়িতেন বলিয়া এ-কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, সাহিত্যের বই-এর প্রতি তাঁহার কোন আগ্রহ ছিল

বলিয়াছেন, তিনি তথায় তাঁহার স্বল্পকাল অবস্থিতিকালে এক ইংরেজের একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী আনুমানিক প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার পুস্তক, মাত্র ১২০৲ নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।'

মাসিক বসুমতী—মাঘ, ১৩৪৪

না। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের নানা গ্রন্থাদি তিনি বরাবর গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। ভাগলপুরে যখন তিনি বাস করিতেন তখনই তিনি হেনরী উড, মেরি করেলি ও ডিকেন্সের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশে আসিয়া বিদেশী লেখকদের লেখার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ঘটিল। অবশ্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় লেখক ছিলেন বোধ হয় ডিকেন্স। একদিন তিনি যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিয়াছিলেন, 'ইংরেজী নভেলের মধ্যে ডিকেন্স আমার সব চেয়ে ভালো লাগে। আর ভাল লাগে হেনরী উড।' রাস্কিন বড় না ডিকেন্স বড় এই নিয়া বন্ধু কুমুদনাথের সঙ্গে তর্কের সময় একদিন তিনি ডিকেন্সকে প্রবলভাবে সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখুন কুমুদবাবু, রাস্কিন যে একজন বড় লেখক, একথা কেউই অস্বীকার করছে না। কিন্তু তাহার হ'লেও রাস্কিন যে একজন সমালোচক (ক্রিটিক), কিন্তু ডিকেন্স যে একজন সত্যকার স্রষ্টা—ক্রিয়েটর—এ-কথা জানেন ত? রাস্কিন এর মতন হয়ত আরও কতজন রাস্কিন জন্মাতে পারে। কিন্তু বলুন ত ডিকেন্স-এর মত আরেকজন ডিকেন্স জন্মেছে, না ভবিষ্যতে জন্মাবে?'[১] শরৎচন্দ্র আর একদিন কথা প্রসঙ্গে ডিকেন্সের কথা উল্লেখ করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ হে! দিনের বেলায় যা লেখা যায়, সেটা যেমন সুন্দর হয়, রাতের লেখা তত সুন্দর হয় না—প্রায়ই সেটা কুৎসিত হয়, এমন কি তাতে ভুলও থাকে বিস্তর। ডিকেন্স দিনের বেলায় লিখতেন বলেই তাঁর লেখা অত সুন্দর—হুবহু দিনের আলোর মত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।'[২] ফরাসী সাহিত্যের প্রতিও শরৎচন্দ্রের খুব ঝোঁক ছিল। রাধারাণী দেবীকে লেখা একখানি পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'যৌবনে এককালে ফরাসি সাহিত্যের সখ ছিল।' জোলার বই যে তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়াছিলেন তাহা যোগেন্দ্রনাথ সরকার একস্থানে বলিয়াছেন, 'অতঃপর শরৎচন্দ্র কিয়দ্দিবস খুব জোরসে নভেল পড়া শুরু করিয়া দিলেন। আমাকে দিয়া এখানকার একটা বিখ্যাত ইংরাজী কেতাবের দোকান হইতে জোলার খান পাঁচ ছয় নামজাদা বই কিনিয়া লইলেন।' অষ্টিন, মেরী করেলি প্রভৃতি লেখকের লেখাও যে তাঁহাকে

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, ৫৩
২। ঐ, পৃঃ ১০০
৩। ঐ, পৃঃ ৫৩

প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহাও তাঁহার উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি। তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, 'Austin, Marie Corelli প্রভৃতি এবং Sarah Greand সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।' বঙ্গ সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যে তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তাঁহার একাধিক উক্তি হইতে জানা যায়। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন' 'কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রিসরেকশন' পড়েছ কি? His best book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে কথা সত্য।' আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, 'এ-সম্বন্ধে ঋষি Tolstoy-এর Resurrection ( the greatest book ) পড়িয়ো। অঙ্গ বিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাতে নাই জানি না।' শেক্সপীয়রের নাটক হইতে জগতের সকল লেখকের ন্যায় তিনিও যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই জানিতে পারা যায়। যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'সংসারে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই। যারা শেক্সপীয়র পড়েছে ভাল ক'রে, তারা এ-কথার প্রমাণ দিতে পারবে বেশী ক'রে। বলতে পার শেক্সপীয়রের চাইতে নরনারীর চরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জন্মেছে এ যাবৎ পৃথিবীতে?'

বিদেশী সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্য পাঠেও শরৎচন্দ্রের সমান অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি যে কতখানি আসক্ত ছিলেন তাহা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, 'আপনি আমাকে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতে দিয়াছিলেন সেগুলি আমি ফিরাইয়া দিই নাই আসিবার সময় মনেই হয় নাই তারপরে সেগুলি এখানে চলিয়া আসিয়াছে।...এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি ( এমন কি রোজই প্রায় পড়ি ) তা' বলিতে পারি না।' শরৎচন্দ্র সমসাময়িক অনেক লেখকের লেখাই পড়িতেন কিন্তু তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন শুধু রবীন্দ্রনাথের। তিনি বলিতেন, 'বাল্যায় ছেলেবেলায় বঙ্কিমবাবু ভাল লাগত, এখন বোধ হয় রবিবাবুকে সবচেয়ে ভাললাগে।' 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি' প্রকাশিত হইলে তিনি ঐ দুইখানা বই আনাইয়া গভীর আগ্রহের সহিত পড়িয়া ফেলিলেন। তিনি

বলিতেন, 'ওহে আমার মতন এমন করে রবিবাবুর বই বোধ হয় কেউ পড়েনি। আমি বলে দিতে পারি কোন কথাটার পর ঠিক কোন কথাটা আছে।' যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' এই কবিতাটি আবৃত্তি করিবার সময় একদিন 'শরৎচন্দ্রের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।' রবীন্দ্রনাথের কবিতা বোঝা শক্ত এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'শক্ত যে সে কথা ঠিক। কিন্তু সেই শক্তটুকুকে সহানুভূতির তাপে নরম করতে পারলে যে জিনিসটি দাঁড়ায়, সেটিকে মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়, নচেৎ কবিতা বুঝতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কবিতা জিনিসটি এমন হওয়া চাই, যা' পড়তে ভাল শুনতে ভাল। একবার পড়ে বা শুনে যাতে তৃপ্তি হয় না, যার ভেতরে এমন একটা উচ্চাঙ্গের ভাব রয়েছে যা সহজ ধারণার অতীত। নইলে তুমি মারলে ধাক্কা—আমি মারলাম ঠেলা একে কি কবিত্ব বলে?'

প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখায় তাহার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বহু অধ্যয়নলব্ধ মননশীলতা ও তাত্ত্বিকতা স্থান পায়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকিলে যেমন সাহিত্য পাঠকের অন্তর স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি আবার অন্য সাহিত্য অথবা শাস্ত্র হইতে অর্জিত জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্য না থাকিলেও কোন সাহিত্য পাঠকের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিয়া তাহার মনে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারেনা। শরৎচন্দ্র তাঁহার অধীত বিদ্যা সব সময় সযত্নে গোপন রাখিতে চাহিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি ও মতবাদ তাঁহার পঠিত গ্রন্থাদি দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি যে কি বিপুল জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার 'নারীর মূল্য' নামক গ্রন্থে। ঐ গ্রন্থে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন করিয়া অমূল্য রত্নরাজি পাঠককে উপহার দিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজতত্ত্ব হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি। দুঃখের বিষয়, 'নারীর মূল্য' ছাড়া পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ-গ্রন্থ তিনি আর লেখেন নাই। তাঁহার পরিকল্পিত 'মূল্য' গ্রন্থগুলি[1] যদি তিনি

১। শরৎচন্দ্র নারীর মূল্য, ধর্মের মূল্য, ঈশ্বরের মূল্য, দেশের মূল্য ইত্যাদি নাম দিয়া বারটি প্রবন্ধ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

লিখিতে পারিতেন তাহা হইলে হয়তো তাহার প্রগাঢ় জ্ঞানের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এতখানি স্বচ্ছ, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। যখন তিনি নানা তত্ত্ববিদ্যা পাঠে মগ্ন হইয়াছিলেন তখন তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতেছিলেন। কিরণময়ীর মুখ দিয়া তাঁহার অধীত বিদ্যার কিছু কিছু নিদর্শন তিনি দিয়াছিলেন। সেজন্য কিরণময়ীর কথায় ও আচরণে তীক্ষ্ণ মননের চোখঝলসানো দীপ্তি এবং প্রখর যুক্তির শাণিত ফলা আমরা দেখিতে পাই। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিকে তিনি বলিতেন 'Scientific Psychological and Ethical Novel.' বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র এই উপন্যাস রচনায় কতখানি প্রেরণা দিয়াছিল তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই বুঝা যায়। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থের মধ্যে সমাজতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, নারী কিভাবে তাহার মূল্য লাভ করিতে পারে নাই। নারীর দুঃখ-দুর্গতি তিনি বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে নারী সম্বন্ধে দেশবিদেশের সমাজ হইতে নানা তথ্য অবগত হইয়া নারীসমাজের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে তাহার মনে সহজাত সহানুভূতির সঙ্গে একটি দৃঢ়ভিত্তিক মতবাদও গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এ-কারণে যে, উভয়ের মধ্যে একটি মানসিক সাধর্ম্য ছিল। উভয়ের সাহিত্যের মধ্যেও এই সাধর্ম্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। জীবনের প্রতি এক উদার, সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি, নীচতা, শঠতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষমাহীন মনোভাব, নিরুপায়, অধঃপতিত মানুষের জন্য সীমাহীন দরদ, মানুষের হাসি ও কান্নার মিলিত রূপের অম্লমধুর আস্বাদ প্রভৃতি উভয় লেখকের লেখার মধ্যেই দেখা যায়। ডিকেন্সের মত শরৎচন্দ্র জীবনের প্রথম দিকে অনেক দুঃখকষ্ট পাইয়াছিলেন। ডিকেন্সের আত্মজীবনী যেমন ডেভিড কপারফিল্ডের মধ্যে অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে তেমনি শরৎচন্দ্রের নিজস্ব জীবনচরিতও ব্রহ্মদেশে রচিত শ্রীকান্তের ১ম মধ্যে অনেকখানি পরিস্ফুট হইয়াছে। ডিকেন্সের জীবনবাণী একটি বাক্যে বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'Never be mean, never be false, never be cruel'। শরৎচন্দ্রেরও জীবনবাণী তো ইহাই।

হেনরী উড ও মেরী করেলির প্রভাবও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। হেনরী উডের ইস্টলীনের সম্ভাব্য প্রভাব 'বিরাজ বৌ'-এর

মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্র প্রায়ই প্রকাশ করিতেন যে, 'Resurrection' টলস্টয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অবশ্য এই নিয়া তর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু ঐ বিশেষ গ্রন্থখানিকে শ্রেষ্ঠ বলিবার মধ্যে উহার শিল্পনৈপুণ্য অপেক্ষা উহার বর্ণনীয় কাহিনী ও চরিত্রের দিকেই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের অধিক দৃষ্টি ছিল। টলস্টয়ের আদর্শ তাঁহার সম্মুখে ছিল বলিয়া পতিতা নারীকে নায়িকা করিয়া উপন্যাস লিখিতে তাঁহার বাধে নাই। সমাজের ক্ষতস্থান টলস্টয় দেখাইয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রও তাহা অসঙ্কোচে দেখাইতে ভয় পান নাই।

শরৎচন্দ্র যে কতখানি রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশবাসের সময় রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চোখের বালি'ই শরৎচন্দ্রের উপরে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ বিধবা নারীর ভালোবাসা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্রকে গভীর আঘাত দিয়াছিল। বহু জায়গায় শরৎচন্দ্র কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর পরিণতি সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালিতে'ই সবপ্রথম বিধবার ভালোবাসার মনস্তত্ত্বসম্মত ও সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্লেষণ হইল। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত পথের ইঙ্গিত পাইলেন। 'চোখের বালি' প্রকাশিত হইবার পর শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন,' 'পল্লীসমাজ' ও 'শ্রীকান্ত' লিখিত হইল। বিধবা নারীর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক দরদী ও সমবেদনাকরুণ দৃষ্টি এই বইগুলির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হয় যে, 'চোখের বালি' হইতে তিনি বলিষ্ঠ প্রেরণাও নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান যখন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয় নাই তখনই তিনি উহাদের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাতে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ ও রসদৃষ্টি কতখানি সজাগ ছিল তাহাই প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আমাদের সাহিত্যে স্বচ্ছ মননশীল দৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল মনোভাব এবং সমাজনিষিদ্ধ জীবনের প্রতি উন্মুক্ত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র সেজন্য তাঁহাকেই সাহিত্যক্ষেত্রে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। তবে

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা আরও অনেকদূর অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম আভাস-ইঙ্গিতে ও মননশীল বিতর্ক ও বিচারের মৃদু আঘাতে সমাজের অবরুদ্ধ বাতায়নে একটু নাড়াচাড়া দিলেন কিন্তু শরৎচন্দ্র সুস্পষ্ট সহানুভূতি এবং বলিষ্ঠ হৃদয়াবেগের আঘাতে সেই বাতায়ন খুলিয়া দিয়া বিদ্রোহের আলো ও বাতাসে সমাজের অচলায়তনকে সচলায়তন করিয়া তুলিলেন।

## সাহিত্য-সাধনা

ভাগলপুর হইতে চলিয়া আসিবার পর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনায় বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া বিরতি ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে আসিয়া কয়েক বৎসর তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করিতেছিলেন। তখন তিনি সঙ্গীত ও চিত্রকলায় মগ্ন হইয়াছিলেন, নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনেও নিজেকে অচঞ্চল ভাবে নিরত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। ২২.৩.১২ তারিখে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই।' ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় আকস্মিক ভাবে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হইবার পরে শরৎচন্দ্র যেমন হঠাৎ কলিকাতায় ও রেঙ্গুনে সাহিত্যিক রূপে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিলেন, তেমনি নূতন করিয়া সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইবার জন্য তিনি প্রবল প্রেরণা লাভ করিলেন। 'বড়দিদি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ হইয়া আসিল এবং এই খেয়ালী ছন্নছাড়া লোকটি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়া উঠিলেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে রচিত হইয়াছিল 'বড়দিদি।' ভাগলপুরে থাকিবার সময় তিনি তাঁহার প্রথম যৌবনের দুর্দমনীয় আবেগে অনর্গল কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৯০০ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে 'বড়দিদি,' 'দেবদাস,' 'শুভদা' প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সঙ্গী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় বিভূতিভূষণ ভট্টের নিকট হইতে শরৎচন্দ্রের দুইখানি গল্পের খাতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ঐ দুইখানি খাতার একখানিতে ছিল 'বোঝা,' 'সুকুমারের বাল্যকথা,' 'কাশীনাথ,' 'অনুপমার প্রেম' প্রভৃতি গল্প; অপরখানিতে ছিল 'কোরেল,' 'চন্দ্রনাথ,' 'বড়দিদি' প্রভৃতি।

লেখার সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের ছিল যতখানি আগ্রহ, লেখার সংরক্ষণ ও প্রকাশে ছিল ঠিক ততখানি শৈথিল্য। সেজন্ত যে-গল্পগুলি তিনি লিখিয়াছিলেন সেগুলির কি পরিণতি ঘটিল তাহা জানিবার বাসনা কোনো-দিন তাঁহার ছিল না। ১৯০৭ সাল। সরলাদেবীর হাতে তখন 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের ভার। সৌরীন্দ্রমোহনের কাছে ছিল 'বড়দিদি'র কপি। তিনি তাহা সরলাদেবীকে পড়িতে দিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের নিজস্ব উক্তি উদ্ধৃত হইল—

'আমার কাছে ছিল শরৎচন্দ্রের লেখা বড়দিদির কপি। সরলাদেবীকে সেটি পড়তে দিলুম। পড়ে তিনি বিমুগ্ধ হলেন, বললেন—চমৎকার! এটি দাও ভারতীতে ছাপতে। এক সংখ্যায় শেষ না ক'রে তিন চার সংখ্যায় শেষ করো। লেখকের নাম প্রথমে চেপে রাখো—শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশ করো—Commercial stunt · বুঝলে! লোকে ভাববে রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ-লেখার জোরে আমাদের দেরির খেশারৎ হ'য়ে যাবে'খন।'[১]

শরৎচন্দ্র তখন ব্রহ্মদেশে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, সুতরাং 'বড়দিদি' প্রকাশের জন্ত তাঁহার অনুমতি আনা সম্ভব হইল না। ছাপাইবার সময় আবার কপির শেষ অংশ হারাইয়া যায়। সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ঐ অংশের কপি আনিয়া ছাপা শেষ করা হইল। 'বড়দিদি' পড়িয়া অনেকের ধারণা হইল, গল্পটি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গল্পটি পড়িয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। লেখক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহের কথা শুনিয়া সৌরীন্দ্রমোহন অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন এবং শরৎচন্দ্রের পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে বাংলাদেশের প্রকাশ্য সাহিত্যসভায় আনিবার জন্ত অনুরোধ জানাইলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়, 'রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যেমন করে পারো, তাঁকে আনাও সৌরীন···তাঁকে ধ'রে এনে লেখাও। বাঙলা দেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।'[২] সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও এই অজ্ঞাতকুলশীল সাহিত্যিকের সন্ধান পাইবার জন্ত অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। বাংলা দেশের সাহিত্য-সমাজে বিপুল

১। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ১৯

২। ঐ, পৃঃ ২৩-২৪

আলোড়ন জাগিল। কিন্তু যে লেখা শব্দভেদী বাণের ন্যায় সকলের মর্মে বিদ্ধ হইল তাহা কোন নিপুণ হস্তের দ্বারা অদৃষ্ট স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

যে-গল্পটি সাহিত্যক্ষেত্রে এতখানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল তাহার লেখক কিন্তু ছিলেন সম্পূর্ণ অচঞ্চল। সুদূর ব্রহ্মদেশের বন্ধুদের হাতে আসিল 'ভারতী' পত্রিকা। শরৎচন্দ্রকে তাঁহারা যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন। এত কাছের সাধারণ মানুষটি এত দূরের অসাধারণ লেখক। কিন্তু লেখকের বিস্ময়ও পাঠকের অপেক্ষা কম ছিল না। তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু পালন করেন নাই, সেজন্য 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁহার আবির্ভাব তিনি বিস্ময়ের চোখে না দেখিয়া পারেন নাই।

১৯১২ সালে (১৩১৯) শরৎচন্দ্র একবার কলিকাতায় আসিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের গৃহে তিনি তাঁহার প্রকাশিত 'বড়দিদি' গল্পটি একবার শুনিতে চাহিলেন। শুনিতে শুনিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার চোখ দুইটি অশ্রুতে প্লাবিত হয়। সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন—

'গল্প পড়ছি, শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে অভিভূতের মতো উঠে বসেন, বলেন—থামো, থামো। তাঁর দু'চোখে সজল আবেশ ভাব। শরৎচন্দ্র বলেন—আমার লেখা? নেহাৎ মন্দ লিখিনি তো। লেখা শুনে বুক দুলে ওঠে। এ-গল্প আমি এই আমার হাতে লিখেছি। আশ্চর্য।'[১]

নিজের লেখা সম্বন্ধে লেখকের মত কখনও একরকম থাকে না। কখনও ভালো লাগে, আবার কখনও তেমন ভালো লাগে না। 'বড়দিদি' সম্বন্ধে তাঁহার বিরূপ মন্তব্যও পরে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৯১৩ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি রেঙ্গুন হইতে 'বড়দিদি'র প্রকাশক ফণীন্দ্রনাথ পালকে লেখেন, 'তোমার প্রেরিত বড়দিদি পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা। ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।'[২] 'বড়দিদি' অপরিণত বয়সে রচিত হইয়াছিল, সেজন্য অপরিণত বয়সের রচনার ধর্ম ইহার মধ্যে অনেক দিক দিয়া পরিস্ফুট। ভাবাবেগের তারল্য, ঘটনার

১। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ২৮
২। শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত, পৃঃ ৪১

বহুবিস্তার, যথোপযুক্ত চরিত্রবিশ্লেষণের অভাব প্রভৃতি এই গল্পের মধ্যে দেখা যায়। 'বড়দিদি' যখন তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তখন তাহার শেষে দুইটি লাইন ছিল—'পরলোকে সুরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে মাধবীকে একটু স্থান দিয়ো, ভগবান।' সৌরীন্দ্রমোহনের আপত্তিতে তিনি এই দুইটি লাইন তুলিয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাথমিক পর্বে[1] রচিত দেবদাসের পরিণতিতেও লেখক এ-ধরণের তরল ভাবাপ্লুত সমবেদনা জানাইয়াছেন। কিন্তু 'বড়দিদি' গল্পের মধ্যে যত ত্রুটি ও দুর্বলতাই থাকুক না কেন, শরৎচন্দ্রের পরবর্তী পরিণত সাহিত্যসাধনার আভাস ইহাতে পরিস্ফুট। তাহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ, শিল্পরীতি ও রসচেতনা এই গল্পের মধ্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

'বড়দিদি' বইখানি ঠিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে পড়ে না, কারণ উপন্যাসের দীর্ঘতা, বিশালতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতা ইহাতে নাই। আবার ইহাকে ঠিক ছোট গল্পও বলা চলে না, কারণ ছোট গল্পের পরিমিতি, স্বল্পায়তন ও সংহতি ইহাতে নাই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে বলিয়াছেন গল্প এবং শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় বলিয়াছেন উপন্যাসিকা।[2] মনে হয় ইহাকে বড় গল্প বলিলেই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সঙ্গত হয়।

শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি'র কাহিনীর মধ্যে অনেক স্থানেই অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা ও আতিশয্য আনিয়া ফেলিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় উদাসীন, আত্মসম্মানে উপেক্ষাশীল লোকের পক্ষে বিলাত যাওয়ার জন্য জেদ প্রকাশ করা অসঙ্গত, তাহার আত্মমর্যাদাজ্ঞানও অস্বাভাবিক। সে খেয়ালের মাথায় গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোনো অসন্তোষ ও অভিযোগ মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়া সচেতন উদ্দেশ্য লইয়া গৃহত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত। বিমাতার উপর নির্ভরশীলতার অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য সে সযত্ন চেষ্টা করিয়াছে, সেই আবার কলিকাতায় আসিয়া অপর আর একজন নারীর উপর নিজের সম্পূর্ণ ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। বড়দিদির আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের চলিয়া যাওয়ার পর গল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে বহু ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখানো হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ, বিরাট জমিদারীর কর্তৃত্বলাভ,

১। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ৬-৭ দ্রষ্টব্য
২। শরৎ সাহিত্য—কালিদাস রায়, পৃঃ ৫০

এলোকেশীবৃত্তান্ত, বড়দিদির অবস্থা বিপর্যয়, শ্বশুরগৃহের অধিকারচ্যুতি প্রভৃতি ঘটনা দ্রুতগতি চলচ্চিত্রের মত যেন অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অথচ এতসব ঘটনা মাত্র পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ঘটিয়াছে। গল্পের মধ্যে ঘটনার এই বহুমুখীন বিস্তার গল্পের ঘনীভূত আবেদন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ এই ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি লইয়া বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে 'বড়দিদি' একখানি বৃহদায়তন উপন্যাসে পরিণত হইত। বড়দিদির আশ্রয়ে সুরেন্দ্রনাথের থাকা পর্যন্ত গল্পটির গতি স্বচ্ছন্দ ও কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু তাহার পর গল্পটির কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং ঔপন্যাসিক ঘটনার আক্রমণে গল্পের প্রাণ পীড়িত হইয়াছে।

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের বহু গল্প, উপন্যাসে যে সমস্যাটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সেই বিধবার ভালোবাসাই এই গল্পের মধ্যে অবতারণা করা হইয়াছে। তবে এই সমাজনিষিদ্ধ ভালোবাসার রূপ শরৎচন্দ্র এখানে তাঁহার প্রকাশভীরু, অপরিণত লেখনীর মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিলেন। সেজন্য এই ভালোবাসার জ্বালা ও আনন্দ, ইহার অন্তর্ঘাতী বিপ্লব, ইহার লেলিহান, অমৃতময় রূপ শরৎচন্দ্র এই গল্পে ভালভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। এখানে এই ভালোবাসা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত অগোচরে প্রবাহিত হইয়াছে, দূরবর্তী নক্ষত্রের মত ইহা স্নিগ্ধ কিরণ দান করিয়াছে, কিন্তু নাগালের মধ্যে কখনও সত্য ও প্রত্যক্ষ হইয়া ধরা দেয় নাই। অন্তরালবর্তিনী যে-নারী একটি উদাসীন ও পরনির্ভরশীল লোকটির প্রতি নিছক করুণায় বশীভূত হইয়া তাহার সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করিয়া চলিতেছিল, সেই আবার কিভাবে নিজের অগোচরে ঐ নিতান্ত অচল ও অকেজো লোকটির প্রতি গোপনে গোপনে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বোধ হয় সে নিজেও জানিত না। কিন্তু সংসারে ইহাই হয়। মায়ামমতা, স্নেহকরুণার নির্দোষ অনুভূতি অকস্মাৎ অনুরাগের উত্তাপে জ্বালাময়, কামনাময় হইয়া উঠে, প্রশান্ত নদীবক্ষে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়। এক জনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিবার ফলে তাহার প্রতি ধীরে ধীরে নিঃসপত্ন অধিকার বিস্তারের দাবী মনের মধ্যে জমিয়া উঠে। মাধবীর হৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এমনিভাবে অতি গোপনচারী ভালোবাসা জন্মিয়া উঠিয়াছিল। অথচ যাহার উদ্দেশ্যে এই ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছিল সে কোনো দিন তাহা জানিতে পারিল না। শুধু কেবল অন্তরঙ্গ বান্ধবী মনোরমা সেই ভালোবাসার কথা জানিতে পারিল। সুরেন্দ্রনাথ জানিল, বাড়ির সকলে

জানিল যে মাধবী তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে। কিন্তু শুধু কেবল অন্তর্যামী জানিলেন, মাধবী যাহা বলিয়াছে, যাহা আচরণ করিয়াছে তাহা তাহার সত্যকার পরিচয় নহে। হৃদয়ের আসল স্বরূপটি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই সে যাহা নহে তাহাই নিজেকে দেখাইয়াছে। তাহার গোপন মনের অবরুদ্ধ ভালোবাসা ও তাহার বেদনা চির-মৌনতার প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হইয়া রহিল। মুমূর্ষু সুরেন্দ্রনাথের অচেতন মস্তকটি কোলে তুলিয়া লইয়াও সে অধীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। সুরেন্দ্রনাথ ক্ষণেকের জন্য চৈতন্য লাভ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি বড়দিদি'? সে উত্তর দিল, 'আমি মাধবী।' এই একটি মাত্র উত্তরের মধ্যে তাহার অন্তর ধরা দিল। সুরেন্দ্রনাথের কাছে সে স্নেহশীলা বড়দিদি নহে, সে নারী, সে প্রেমময়ী মাধবী।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'বলা বাহুল্য, বড়দিদি ছাপা হতে বাঙলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিপুল আন্দোলন জেগেছিল, সেকথা সগৌরবে আজ স্বীকার করছি।'[১] 'বড়দিদি'র খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুরেশ সমাজপতি। সমাজপতি মহাশয় তাঁহার 'সাহিত্য' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশ করিতে খুবই আগ্রহ দেখাইলেন।

'যমুনা' প্রকাশিত হইবার পর শরৎচন্দ্রের 'বোঝা' নামে একটি পুরোনো দিনের গল্প ইহাতে মুদ্রিত হয় (১৩১৯—কার্তিক-পৌষ)। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শরৎচন্দ্রও তাঁহার প্রথম দিককার রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। 'বোঝা' প্রকাশ করিবার জন্য তিনি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্র পালকে অনুযোগ জানাইয়া চিঠি লেখেন।[২]

'বোঝা' গল্পটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের লজ্জিত হইবার যথার্থ কারণ ছিল, কারণ গল্পটি তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক নহে। শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাদি তিনি খুব বেশি পড়িতেন।

---

১। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃঃ ২৪

২। 'সুরেশের কাছ থেকে এসে বোঝা গল্প যমুনায় ছাপাবার জন্য শরৎচন্দ্র বহু অনুযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন ফণীন্দ্র পালকে এবং আমাকে। লেখেন, তাঁর অমতে যেন তাঁর আগেকার লেখা আমরা আর না ছাপাই।'

—শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃঃ ৩৭-৩৮

সেজন্য তাঁহার লেখায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব আসা স্বাভাবিক। অন্যান্য রচনায় তত পরিস্ফুট না হইলেও আলোচ্য গল্পটির মধ্যে সেই প্রভাব সুপরিস্ফুট। কাহিনীপরিকল্পনা, কাহিনীবিন্যাস, বর্ণনারীতি, চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার বিশালতা, কবিত্বশক্তি, চরিত্রদ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিছুই ইহাতে নাই।

'বোঝা' আয়তনে ছোটগল্পের অনুরূপ কিন্তু প্রকৃতিতে উপন্যাসধর্মী। স্বল্প পরিসরের মধ্যে বহু ঘটনাবৈচিত্র্য ও চরিত্রের গুরুতর রূপান্তর ঘটিয়াছে। ফলে ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন এবং চরিত্রগুলি অবিশ্লেষিত রহিয়াছে। সত্যেন্দ্র একটির পর একটি তিনটি বিবাহ করিয়াছে। অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্যে তিনটি নারীর সঙ্গে সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে। প্রথম স্ত্রী সরলার সহিত তাহার ভালোবাসা এবং সেই স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার বেদনার চিত্র মোটামুটি ফুটিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে। নলিনীর সহিত তাহার ভুল বোঝাবুঝি এমন একটি দুর্বল ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া দেখা দিয়াছে যে তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হয়। নলিনীর আবার ফিরিয়া না আসা এবং সত্যেন্দ্রর পুনরায় বিবাহ করা সব কিছুই বাড়াবাড়ি মনে হয়।[১]

শরৎচন্দ্রের অপর দুইটি প্রাথমিক রচনা 'বাল্যস্মৃতি' (১৩১৯, মাঘ,) ও কাশীনাথ (১৩১৯, ফাল্গুন-চৈত্র) সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ-প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'এর মধ্যে তাঁর লেখা বাল্যস্মৃতি এবং কাশীনাথ গল্প সাহিত্যে ছাপানো নিয়ে এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটলো। সাহিত্য-সম্পাদকের কৃপালাভের বাসনায় অর্থাৎ নিজের লেখা গল্প সাহিত্য ছাপাবার সুবিধা হবে ভেবে আমাদের এক বন্ধু শরৎচন্দ্রের লেখা ঐ দুটি গল্প কোনোরকমে হস্তগত করেন, ক'রে শরৎচন্দ্র এবং আমাদের সকলের অজ্ঞাতে ও দুটি লেখা চুপি চুপি সাহিত্য-সম্পাদকের হাতে তুলে দেন এবং সাহিত্যেও দুটি গল্প ছাপা হয়।'

'বাল্যস্মৃতি' গল্পটির মধ্যে যদিও কাল্পনিক চরিত্র সুকুমারের বাল্যস্মৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি এ-বাল্যস্মৃতির অনেকটাই যে লেখকের নিজস্ব,

১। 'বোঝা' গল্পটি পরবর্তীকালে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 'কাশীনাথ' নামক সংকলন পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। গল্পের নায়ক সুকুমার লেখক শরৎচন্দ্রের মতই দুরন্ত, ডানপিটে এবং তাম্রকূটে ঘোর আসক্ত। উদার পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে সুকুমারের নিত্যনূতন দুরন্তপনার চিত্র বিশেষ উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের দুরন্ত ছেলেটি কলিকাতায় আসিয়া চতুর্দিকের বাঁধনের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিল। কিন্তু গ্রামের অবারিত মুক্তির ক্ষেত্রে যাহার বহির্মুখীন জীবনটাই অবাধ প্রশ্রয়ের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল শহরের গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তাহার অন্তর্মুখীন জীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিল। আমরা তখন দেখিতে পাইলাম, সুকুমার দুর্দান্ত ডানপিটে ছেলে মাত্র নহে তাহার মধ্যে একটি স্পর্শকাতর, স্নেহকরুণ, সহানুভূতিশীল হৃদয় রহিয়াছে। সেই হৃদয়টি সরল, গোবেচারা, নিরীহ ও নিরপরাধ গদাধরের সঙ্গে দৃঢ় সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। গদাধরের প্রতি নিরতিশয় নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার ঘটনাগুলির মধ্যে লেখক করুণরসের ধারা মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লেখনীর যাদুস্পর্শে একটি মেসের ঠাকুর পাঠকচিত্তে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসিল।

১৩১৯-সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় 'কাশীনাথ' প্রকাশিত হয়। 'কাশীনাথ' ঠিক ছোটগল্পের পর্যায়ে পড়ে না। আবার উপন্যাসের বিস্তৃতি ও বিশালতাও ইহাতে নাই। 'বড়দিদি'র মত আলোচ্য রচনাটিকে বড়গল্প বলাই বোধ হয় সঙ্গত। 'বোঝা' গল্পটির ন্যায় ইহাও স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। 'কাশীনাথ' এমন একটি সমাজের পটভূমিতে রচিত যেখানে কৌলীন্য-প্রাধান্য স্বীকৃত। এই সমাজেই প্রভূত ধনশালী জমিদারের পক্ষে সহায়সম্বলহীন একটি কুলীন বালককে যাচিয়া জামাই করা স্বাভাবিক। কাশীনাথ বিষয়নিস্পৃহ, উদাসীন, নিঃসঙ্গচারী বালক। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের ন্যায় প্রাচীন শাস্ত্রাদির মধ্যেই সে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন মাতুলের চোখে সে বাতুল ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু কাশীনাথ চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে অনেক ত্রুটি ও অসঙ্গতি চোখে পড়ে। গ্রাম্য প্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে যে বালকটি ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালোবাসে সে পুঁথির বাঁধনের মধ্যে নিজেকে আবার কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারে? কমলার সঙ্গে সে সহজ ভাবে নিজেকে মিলাইতে পারিতেছে না কেন? বাধাটি কোথায়? যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তাহার উদাসীন, নিরাসক্ত প্রকৃতি কাহাকেও নিবিড়ভাবে ভালোবাসিতে পারে না, তাহা হইলে বিন্দুর প্রতি এত স্নেহ আসিল কোথা হইতে?

বিন্দুর স্বামীর রোগমুক্তির জন্য সে যেভাবে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সুস্থির ভাবে অর্থসাহায্য করিয়াছে তাহা তাহার মত উদাসীন লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হয়। সে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুঃখে বিগলিত হইয়া তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া নিজেদের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াছে, অথচ নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসিতে পারে নাই, ইহা আশ্চর্য বোধ হয়। মাঝে মাঝে তাহাকে নিষ্প্রাণ পাথর মনে হইয়াছে। স্ত্রীর অসহ্য অপমানেও তাহার পৌরুষ ও অভিমান জাগিয়া উঠে না। কাশীনাথের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাটিও দুর্জ্ঞেয় রহস্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহা কি কমলার নিয়োজিত কোনো লোকের কাণ্ড, না নূতন ম্যানেজারেরই প্রভুভক্তির নিদর্শন তাহা ঠিক বুঝা গেল না। মুমূর্ষু কাশীনাথও যে এই নৃশংস ঘটনার পিছনে কমলার অদৃশ্য হস্তের অস্তিত্ব সন্দেহ করিয়াছিল তাহা তাহার প্রলাপোক্তির মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সন্দেহের যথার্থ নিরসন না হইলেও কাশীনাথ কমলার প্রতি ক্ষমায় ও প্রেমে বিগলিত হইয়া 'কমলার রুক্ষ চুলগুলি হাতের মধ্যে লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া' করিতে লাগিল, ইহাও বিরক্তিকর বোধ হয়।

কমলা চরিত্রের মধ্যেও অনেক অসঙ্গতি রহিয়াছে। যে-কমলা স্বামীর মন জয় করিবার জন্য বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে, স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রু নেত্রে হৃদয়ের অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাস জানাইয়াছে, সেই আবার অব্যবহিত পরে সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দিয়া যাইবার জন্য পিতাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ইহা খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে। সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার ফলে তাহার চরিত্রেরও যেন একটি আমূল পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। কাশীনাথের প্রতি তাহার আত্যন্তিক নিষ্ঠুর ব্যবহার স্বামীপ্রেমপ্রত্যাশিনীর অভিমান হইতে যেন আসে নাই, ইহা যেন এক ধনগর্বিতা, হৃদয়হীনা নারীর ঘোর স্বার্থপরতা এবং নির্মম প্রতিশোধস্পৃহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কাশীনাথকে অতিশয় হীন ও পাশবিক আক্রমণের দ্বারা মৃতপ্রায় করিয়া ফেলার মধ্যে হয়তো কমলারও কোনো ইঙ্গিত ছিল এ-সন্দেহ কাশীনাথের ন্যায় পাঠকের মনেও দেখা দেয়। নিরীহ নির্বিরোধ স্বামীর প্রতি সুপরিকল্পিত বহুতর দুর্ব্যবহারের পর স্বামীকে মৃতপ্রায় দেখিয়া কমলার মূর্ছিত হইয়া পড়া পাঠকের মনে সহানুভূতির বিপরীত প্রতিক্রিয়াই জাগ্রত করে। কমলার শুধু ঘন ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী মূর্ছাই দেখিলাম, অনুতাপ ও ক্ষমাভিক্ষার একটি কথাও আমরা তাহার মুখে শুনিলাম না। সেজন্য তাহার

চরিত্রে পরিবর্তন ঘটিল কিনা তাহা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রহিয়াই গেল।[১]

'বড়দিদি', 'বোঝা', 'বাল্যস্মৃতি' ও 'কাশীনাথ' প্রকাশিত হইবার পর শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক রচনা প্রকাশের সূচনা হইল। ১৯১২ সালে শরৎচন্দ্র যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন সৌরীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রকে নবপ্রকাশিত যমীন্দ্র পালের যমুনার জন্য গল্প-উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ জানাইলেন। সেই অনুরোধের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিলেন, 'আমি লিখবো, তোমরা যদি লেখো—মানে বুড়ী ( নিরুপমা দেবী ), সুরেন, গিরীন, পুঁটু, তুমি, তোমার ছোটদিদি, উপেন—তাহ'লে আমি লিখবো নিশ্চয়।'[২] ইহার পূর্বে তিনি 'নারীর ইতিহাস' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং 'চরিত্রহীনে'র কিছুটা অংশ লিখিয়াছিলেন। 'নারীর ইতিহাস' সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহনকে বলিলেন, 'একটা চমৎকার জিনিস লিখেছিলুম—নারীর ইতিহাস। প্রায় পাঁচশো পাতা ফুলস্কাপ সাইজের কাগজ। ঘর পুড়ে সে-লেখা ছাই হয়ে গিয়েছে। গল্প নয়, কিন্তু সে-লেখাটি গল্প-উপন্যাসের চেয়ে ঢের বেশী interesting, অনেক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ঘেঁটে, অনেক জীবন অনুশীলন ক'রে লেখা। সেটা পুড়ে যাওয়ায় মনে ভারী আঘাত লেগেছে।'[৩]

১। কাশীনাথ প্রকাশ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নিজের সংকোচ ও আপত্তি ছিল প্রবল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে সমাজপতিকে লিখে দিয়ো কাশীনাথ যেন প্রকাশ না করে।'

২। শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, পৃঃ ২৯

৩। 'নারীর ইতিহাস' রেঙ্গুনের সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় পঠিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'হঠাৎ একদিন কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে অবশেষে ঠাট্টা সহ্য করিতে না পারিয়া শরৎবাবু আমাদিগকে কথা দিলেন যে, তিনি নারীর ইতিহাস নামে একটি প্রবন্ধ আমাদের সভায় পড়িবেন। প্রবন্ধ লেখা সমাধা হইলে তিনি যথাসময়ে আমাকে দিয়া সাহিত্য-সভার সম্পাদককে সংবাদ জানাইলেন।

পক্ষকাল অপেক্ষার পর দীর্ঘ প্রবন্ধ ত লেখা শেষ হইল, কিন্তু লেখক কিছুতেই দশজনের সুমুখে দাঁড়াইয়া উঁচু গলায় প্রবন্ধ পড়িতে রাজি হইলেন না।......প্রবন্ধের চেহারা দেখিয়াই আমার পেটের পিলে জল হইয়া গেল, সর্বনাশ! এই পিঁপড়ের সারির মতন খুদে খুদে অক্ষরে ভর্তি মহাভারত কে পড়িবে? কেহই রাজি হইলেন না। অগত্যা আমাকেই সেই ছোট-খাট মহাভারত পড়িবার ভার গ্রহণ করিতে হইল।...... খুড়ি খুড়ি কোটেশন ভরা মহাভারত আমাকে দুই ঘণ্টায় শেষ করিতে হইল।'

'চরিত্রহীন' সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, 'আর একটা লেখা আছে গল্প। সেটা প্রকাণ্ড উপন্যাস হবে। সিকি ভাগ লেখা প'ড়ে আছে—সে লেখাটাও তোমাদের পড়াবো। সে-গল্পটির নাম দিয়েছি চরিত্রহীন। যদি লিখে শেষ করতে পারি দেখবে সে এক নতুন জিনিস হবে।'[১]

সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র দুই একমাস পরে পুনরায় রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আসিলেন। এবার সঙ্গে করিয়া চরিত্রহীনের ৭০।৮০ পৃষ্ঠার কাপি লইয়া আসিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের ইচ্ছা ছিল, 'চরিত্রহীন' 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপাইবেন। 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী চরিত্রহীনে'র প্রশংসা করিয়া অগ্রিম একশত টাকা দিতে চাহিলেন এবং বইখানি শেষ করাইয়া আনিবার জন্য সৌরীন্দ্রমোহনকে বলিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাড়াহুড়া করিয়া 'চরিত্রহীন' শেষ করিতে সম্মত হইলেন না এবং মহিলা সম্পাদিত পত্রিকায় উহা প্রকাশ করিতেও দ্বিধা প্রকাশ করিলেন। তখন স্থির হইল, উহা 'যমুনা'তেই প্রকাশ করা হইবে। 'চরিত্রহীনে'র কপি সৌরীন্দ্রমোহনের কাছেই ছিল। তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ চলিতেছিল, উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। তিনি 'চরিত্রহীনে'র কাপি পড়িতে চাহিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের নিকট হইতে কপি লইয়া শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে পড়িতে দিলেন। 'চরিত্রহীনে'র কপি প্রমথনাথের কাছে রহিল, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে ফিরিয়া গেলেন। পাছে চরিত্রহীন' ভারতবর্ষ পত্রিকায় ছাপা হইয়া যায়, এজন্য ফণী পাল নিদারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে তিনি ফণীন্দ্র পালকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার

১। শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, পৃঃ ৩০

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ২২.৩.১২ তারিখে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের Manuscript—নারীর ইতিহাস প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তাও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসর Publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয় তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। চরিত্রহীন ৪০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল সবই গেল।'

এই চিঠি হইতে বুঝা যায়, চরিত্রহীন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। পুড়িবার পর তিনি আবার নূতন করিয়া লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন।

লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ বা দুইই কেহ বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।'

'চরিত্রহীনে'র জন্য নানা দিক হইতে নানাপ্রকার অনুরোধ আসিবার ফলে শরৎচন্দ্র কিরূপ বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন তাহা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৬.৪.১৩ তারিখে লিখিত পত্রে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'ভারতবর্ষ কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিতে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে বলিয়াছে, চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায় জ-প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সে-ই হইতেছে ভারতবর্ষের মোড়ল। এখন, দ্বিজুবাবু প্রভৃতি (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে যমুনাতেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registry চিঠি ক্রমাগত লিখেছেন। কোন দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু-বান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে History জান।'

শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকেই 'চরিত্রহীন'-এর কপি পাঠাইয়াছিলেন। ২৬.৪.১৩ এবং ৩.৫.১৩ তারিখের মধ্যে কোন সময়ে তিনি ঐ কপি পাঠাইয়া থাকিবেন। কারণ ৩.৫.১৩ তারিখে তিনি ফণীন্দ্র পালকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝিনা, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখনও তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব।'

ঐ একই তারিখে (৩.৫.১৩) প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'প্রমথ, চরিত্রহীন পেলে কিনা সে খবরটাও দিলে না।…

যা হোক ওটা পড়লে কি? কি রকম বোধ হয়? আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার ভাল লেগে উঠছে না—অন্তত ভাল বলবার সাহস হচ্ছে না, না? কিন্তু ভালই হোক আর মন্দই হোক অ্যানালিসিস ঠিক আছে, না? দার্শনিক গোছের—নীরস? এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে করে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা করো না। হয় সাহিত্যে, না হয় যমুনায়, না হয় ভারতীতে বেরুতে পারবে।'

উপরের পত্র হইতে বুঝা যায়, ভারতবর্ষে 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সন্দেহ ও আশঙ্কা ছিল। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন, বাংলা-সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও বিপ্লবাত্মক। মেসের ঝিকে উপন্যাসের নায়িকা করা এবং এক বিবাহিতা নারীর মুখ দিয়া সমাজবিরোধী, বহ্নিময় আদর্শ প্রচার করা এবং সর্বোপরি চরিত্রহীন এই নামকরণের মধ্য দিয়া চরিত্রবত্তার চিরসম্মানিত পথের প্রতি তীব্র শ্লেষকুঞ্চিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা—সবদিক দিয়াই 'চরিত্রহীন' এক বিদ্রোহরাগরঞ্জিত নূতন দিগন্তের আভাস আনিয়া দিল। কিন্তু চরিত্রহীনের এই বৈপ্লবিক প্রতিবেশ ও চরিত্রসৃষ্টি গতানুগতিকতার পথে চলিতে অভ্যস্ত বাংলা-সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচকের কাছে হয়তো আদৃত হইবে না এ-ভয় শরৎচন্দ্রের মনে বিশেষ পরিমাণে ছিল। সেজন্য তিনি প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্র পাল, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লিখিত তখনকার নানা চিঠিপত্রে 'চরিত্রহীনে'র পক্ষে নানাপ্রকার কৈফিয়ত দিয়াছেন। এইসব কৈফিয়তের মধ্যে নিজের আশঙ্কা ভয় যেমন ছিল, তেমনি ছিল সত্য ও কাল্পনিক বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও ক্রোধ। নিজের উপন্যাসের সমর্থনে তিনি তুলনাপ্রসঙ্গে বহু বিদেশী সাহিত্যিক ও তাঁহাদের লেখার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ১০.৫.১৯১৩ তারিখে উপেন্দ্রনাথকে 'চরিত্রহীনে'র প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়াছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সে-ই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু তাহারা সে দাবী করে না। বোধ করি Manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখথাকিত, এবং কি পরে কি চরিত্র কোথায় কিভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি

অমূল্য হীরা-মাণিক ওঠে তা' যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত একদিন আফশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই—অবশ্য সে ও রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্যের কথা নয়, কিন্তু নিজেই তাহারা বলিতেছে, চরিত্রহীনের শেষ দিকটা (অর্থাৎ তোমরা, যতটা পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবিবাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (Style এবং চরিত্র বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে-লোক ইচ্ছা করিয়া একটা মেসের ঝিকে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম।'

এই চিঠি লেখার কিছুদিন পরেই হয়তো প্রমথনাথের কোন পত্রে শরৎচন্দ্র জানিয়াছিলেন যে, 'চরিত্রহীন' ভারতবর্ষের জন্য মনোনীত হয় নাই। ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (তারিখ ?) প্রমথনাথকে একটি পত্রে তিনি লিখিলেন, 'তোমাদের যখন ওটা পছন্দ হয় নাই তখন আমাকে ফেরত পাঠাইয়ো। বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হইয়াছে সেইমত যমুনাতেই ছাপা হইবে।[১] তুমি বলিয়াছ একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইলে ভাল হয়। সত্য, কিন্তু এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, যদি নিজের স্বার্থের জন্য ফণীকে না দিই সে বড়ই দেখিতে মন্দ এবং লজ্জাকর হইবে। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা আমিও জানিতাম। আমি জানিতাম, ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে-কথা পূর্বপত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে, এ সম্বন্ধে আমার এই একটু বলবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া মেসের ঝিকে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া-শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞ ও-বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছ, এ একটা Scientific Psych. and Ethical Novel আর কেউ এ-রকম করিয়া বাঙলায়

১। 'যমুনা'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে, ১৩২০ সালে শরৎচন্দ্রের নূতন লম্বা সুদীর্ঘ

লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রিসরেকশন পড়েছ কি? His best Book একটি সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে-কথা সত্য।' 'চরিত্রহীন' কেন মনোনীত হইল না সে-সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিয়া সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'সে রাত্রে দীনবন্ধু মিত্রের গৃহের আসরে আমার দেখা প্রমথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দেখা হতেই তাঁকে বললুম ·····চরিত্রহীনের কপি ফেরত না দেওয়ার কথা·· ···বললুম শরৎ চিঠি লিখে সে কপি আমার হাতে ফেরৎ দিতে বলেছেন নিশ্চয়······ তবু কেন ফেরত দিচ্ছেন না? আমার কথায় প্রমথনাথ তখনি বাড়ি গিয়ে বাড়ি থেকে চরিত্রহীনের সে-লেখা কপি এনে আমাকে ফেরত দিলেন; সেই সঙ্গে বললেন—দ্বিজুবাবু (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) বলেছেন, অত্যন্ত অশ্লীল রচনা······ কোনো ভদ্র কাগজে ছাপা চলে না······ভদ্রসমাজে এ-উপন্যাস বার করা যায় না।'[১]

'চরিত্রহীন' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য গৃহীত না হওয়াতে তিনি একদিকে যেমন হতাশ হইলেন অন্যদিকে তেমনি 'যমুনা' পত্রিকার প্রতি অধিকতর অনুরাগী হইলেন। 'ভারতবর্ষে'র প্রত্যাখ্যানের ফলেই 'যমুনা'কে দাঁড় করাইবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার প্রবল জিদ চাপিল। ১৯১৩ সালের ২৪শে মে তারিখে তিনি একটি পত্রে প্রমথনাথকে লিখিলেন, 'আমার স্বরেন মামা লিখিয়াছেন—হরিদাসবাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন ওটা এতই immoral যে কোন কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে-কারণ তোমরা আমার শত্রু নয়, যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে—আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব ওই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে। আমিও সেই কথা স্পষ্ট করিয়া এবং তোমার সমস্ত argument ফণীকে খুলিয়া লিখিয়াছিলাম তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যমুনাতে ওটা বাহির করিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাস আমি এমন কিছু লিখিতেই পারি না যাহা immoral······লোকের যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক, কিন্তু সে যখন বিশ্বাস করে, চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং immoral হোক, moral হোক লোকে খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে—

উপন্যাস চরিত্রহীন ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

১। শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, পৃঃ ৬৬

এখন সে যাহা ভাল বাঝে তাহাই করিবে। তাছাড়া আমি একরকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড় করিব। এজন্য আমার শিষ্য গুলীকেও অনুরোধ করিতে হইবে বলিয়াও একটা কথা উঠিয়াছে। আমি জানি আমাকে তারা এত শ্রদ্ধা করে যে, আমি অনুরোধ করিলে তারা কিছুতেই অস্বীকার করিবে না।'

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে'র কপি পাঠাইলেন। যতটা লেখা ততটা পরিমার্জিত করিয়া পাঠাইলেন। ১৪.৯.১৩ তারিখে তিনি প্রমথনাথকে একটি চিঠিতে লিখিলেন, 'চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে। বাকিটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালোবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, হাঁ একটা লেখা বটে। আর এতে আপনার বদনামের ভয় কি? বদনাম হয়তো আমার। তা'ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? চরিত্রহীন এর নাম।—এখন পাঠককে ত পূর্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়।'

'চরিত্রহীন' ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হইলে ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল মতামত ব্যক্ত হইল। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রমথনাথকে শরৎচন্দ্র লিখিলেন, 'আমার চরিত্রহীন তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে 'Charitrahin creating alarming sensation'. আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হোক, বাসায় ঝিবৃত্তি করিতেছে ( character unquestionable নয় ), আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না।'

সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'কিন্তু চরিত্রহীন ছাপা হ'লে নানা রকমের এত মতের সৃষ্টি হ'ল যে কোন্‌টা পাব্লিকের অভিমত, তা' বোঝা সহজ ছিল

না। এতখানি sensation আমাদের বয়সে অন্য কোনো রচনার সম্বন্ধে ঘটতে দেখিনি।'

'চরিত্রহীন' আগে লেখা আরম্ভ করিলেও উপরিউক্ত নানা কারণে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। 'চরিত্রহীনে'র আগে কয়েকটি লেখা 'যমুনা'য় বাহির হইল। প্রথম প্রকাশিত লেখা হইল 'রামের সুমতি'। কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে ফিরিয়াই শরৎচন্দ্র 'রামের সুমতি' লেখায় হাত দিলেন। এ-সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'শরৎবাবু আসিয়াই রামের সুমতি গল্প লেখায় জোর দিলেন। রোজ যতটুকু করিয়া লেখেন অফিসে আসিয়া আমাকে দেখান, আমি অফিসের সকল কাজকর্ম ফেলিয়া রাখিয়া তাহার গল্প পড়ি। এইরূপ করিয়া ৮।১০ দিনে যখন উক্ত গল্পের অর্ধেকখানি লেখা হইল, তখন প্রথম সংখ্যার উপযুক্ত মনে করিয়া তিনি যমুনা সম্পাদককে ঐ লেখাটুকুই পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্টখানি আগামী মাসে পাঠাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।'

'রামের সুমতি'র প্রথম অংশ ১৩১৯ সালের 'যমুনা'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশ চৈত্র সংখ্যায় বাহির হয়। 'রামের সুমতি' প্রকাশিত হইবার পর রেঙ্গুনের সাহিত্যামোদী সমাজের মধ্যে ইহা কিরূপ সাড়া জাগাইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'শরৎবাবু আমাদের এবং ফণীবাবুর উৎসাহে যখন দ্বিতীয় মাসে রামের সুমতি গল্পটি যে ভাবে খাড়া করিয়া যমুনায় প্রকাশ করিলেন—তাহাতে সত্য সত্য পাঠক মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। যাঁহারা পূর্বে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন, দেখা গেল তাঁহাদের অনেকেরই মত পরিবর্তিত হইয়াছে। অচিরেই তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লেখকেরও কর্ণে গিয়া প্রবেশ করিল। তিনি ইহাতে একটুখানি হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অন্তরের বিপুল আনন্দ কোন বাধাবন্ধনই মানিল না—ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া ও দুইটি চোখের কোণ ছাপাইয়া উছলিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল।'[১]

'চরিত্রহীন' ও 'রামের সুমতি' প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র আদিরস ও বাৎসল্যরস উভয় প্রকার রসসৃষ্টিতেই সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যে-নদী দুর্বার বেগে দুই কূল ভাসাইয়া

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৭০

ভাঙ্গনের পথে ধাবিত হয় এবং যে-নদী গৃহের পার্শ্ব দিয়া শান্তধারার মৃদু আবর্ত রচনা করিয়া প্রবাহিত হয় সেই উভয় প্রকার নদীধারাই শরৎসাহিত্যে মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের পরিবারসম্পর্কহীন উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিবার সময় তিনি কিভাবে স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোকদীপ্ত বাঙালী পরিবারের রহস্য ও মাধুর্যের অন্তঃপুরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারের লোকেদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে যে অন্তর্গীন রস ও মাধুর্যের গোপন সঞ্চয় রহিয়াছে শরৎচন্দ্র তাহার মুখটি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত স্থান হইতে যখন স্নেহপ্রীতির ধারা উৎসারিত হয় তখন তাহা আমাদের মন তৃপ্ত করিলেও আলোড়িত করিতে পারে না। কিন্তু যখন সেই স্নেহপ্রীতির ধারা অপ্রত্যাশিত ও অ-সচরাচরদৃষ্ট স্থান হইতে নির্গত হয় তখন তাহা তীব্র কৌতূহল ও আনন্দের আবেগে আমাদের অন্তর উদ্দীপ্ত করে। শরৎচন্দ্র স্নেহ ও বাৎসল্যের আনন্দবেদনাজড়িত সম্পর্ক এমন সব স্থানে দেখাইয়াছেন যেখানে উপেক্ষা, উদাসীনতা, হিংসা-বিদ্বেষের মনোভাবই স্বাভাবিক। স্বার্থ ও শঠতাপূর্ণ জীবনের মধ্যে তিনি পরার্থপর স্নেহভালোবাসার এমন স্বর্গীয় রসের নির্ঝর আবিষ্কার করিয়াছেন যে আমাদের বিশুষ্ক ও বঞ্চিত জীবন বার বার সেই নির্ঝরতলে আসিয়া শান্ত ও পরিতৃপ্ত হইতে চায়।

রামলাল ও নারায়ণীর দেবর-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক। কিন্তু যেদিন রামলালের মাতা আড়াই বছরের শিশুটিকে নারায়ণীর হাতে সঁপিয়া দিয়া মারা গেলেন সেইদিনই নারায়ণী তাহার এই ক্ষুদ্র দেবরটির মাতার শূন্য স্থান পূরণ করিল। রামলাল তাহার স্বামীর বৈমাত্রেয় ভাই, নারায়ণী অনায়াসে এই দামাল ও দুদান্ত দেবরটির প্রতি স্নেহশূন্য উদাসীনতা দেখাইয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট হইতে পারিত। কিন্তু কোন্ এক অদৃশ্য দেবতার খেয়ালে মানুষের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসার গোপন মধু সঞ্চিত হয় তাহা কেহ জানে না। সেই মধু নারায়ণীর হৃদয়ে এত গভীর ভাবে জমা হইল যে স্বামী-পুত্র-সংসার সব থাকা সত্ত্বেও এই সকলের ধিক্কৃত কিশোর বালকটিই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল। রামলালও সকল প্রকার দুষ্কর্মের নেতা হইলেও বৌদির প্রতি তাহার এমন এক গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য ছিল যে সে সকলের প্রতি নির্বিচারে কঠিন শাসন বিধান করিলেও বৌদির শাসনের কাছে নিতান্ত ভীত ও দুর্বল

বালকের ন্যায়ই নতি স্বীকার করিল। রামলাল ছিল নারায়ণীর প্রতিক্ষণের যন্ত্রণা এবং প্রতি মুহূর্তের সান্ত্বনা। নিত্য নিত্য রামলালের দুরন্তপনার তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া তাহাকে বিঁধিত, আবার কঠিন শাস্তিদানের পর এই দুরন্ত দেবরটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে অনন্ত তৃপ্তি লাভ করিত।

রামলাল বাহিরে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিলেও, যতদিন দিগম্বরী আসেন নাই ততদিন তাহাকে লইয়া কোন পারিবারিক অশান্তি হয় নাই। কিন্তু দিগম্বরী আসিয়াই যখন তাঁহার হিংসাকুটিল দৃষ্টি দিয়া রামলালকে দেখিতে শুরু করিলেন তখনই যত অনর্থের উৎপত্তি হইল। তাঁহার বিষাক্ত বাক্য এবং সুপরিকল্পিত বিদ্বেষক্রিয়ার ফলে সংসারের মধ্যে ফাটল ধরিল এবং অবশেষে রামলালকে আলাদা করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য সকল বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের উপরে নারায়ণীর বুকভরা অদম্য স্নেহই জয়লাভ করিল। সীমাহীন কারুণ্যের দিকে যে-ঘটনা অগ্রসর হইতেছিল তাহা শেষ পর্যন্ত স্নিগ্ধ আনন্দজনক পরিণতি লাভ করিল। শুধু কেবল একটি জায়গায় একটু অনাবশ্যক নীতিমূলকতা আসিয়া গিয়াছে। রাম গল্পের শেষে বলিল 'না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েছি। আমার সুমতি হয়েছে আর একটিবার তুমি দেখ।' রামের মুখে এ-কথা শুনিয়া মনে হয়, লেখক বুঝি দুরন্ত ছেলেকে সংশোধন করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই এই গল্প লিখিয়াছেন। রামের সুমতিলাভের ঘটনাই এই গল্পে মুখ্য নহে, মুখ্য হইল রামের পক্ষে বৌদিকে ফিরিয়া পাওয়ার ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক লেখনীর বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি নিতান্ত ছোটখাট ঘটনা বাছিয়া লইয়া নরনারীর অন্তঃপ্রকৃতি অপরূপভাবে উদ্‌ঘাটন করেন। উঠানে অশ্বত্থগাছ পোঁতা, কার্তিক-গণেশ নামধারী রামলালের প্রিয় মাছধরা প্রভৃতি পরিস্থিতি অবলম্বনে তিনি তীব্র সঙ্কট ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। করুণরসসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের অসামান্য কুশলতার পরিচয় এই গল্পের অনেক স্থলেই পাওয়া গিয়াছে। এই করুণরসের গভীরতম স্পর্শ আসিয়াছে আলাদা হইবার পরে একক রামলালের অপটু হাতের রান্নার চেষ্টা এবং অদূরবর্তিনী নারায়ণীর নিরুপায় অন্তরযাতনার মধ্যে। অবশ্য করুণরসের প্রবাহের মধ্যে লেখক মাঝে মাঝে কৌতুকরসের রঙ্গীন আবর্তও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

'রামের সুমতি'র শেষাংশের সঙ্গে 'নারীর লেখা' নামক প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্র

পাঠাইলেন। দুইটি লেখাই ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসের 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। 'নারীর লেখা' প্রবন্ধটি আসিল অনিলাদেবীর নামে।[১] শরৎচন্দ্র গল্প ও উপন্যাস লেখায় নিরত থাকিলেও তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ ও সমালোচনা লেখার দিকেও তাঁহার প্রবল মানসিক প্রবণতা ছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'ছাখ হে বানিয়ে বানিয়ে কত লেখা যায় বলত? এর চেয়ে ত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়তে আমার বেশ ভাল লাগে। আরও দেখবে একটা মজা, যারা বড় বড় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তাদের লেখাও কত সুন্দর।'

শরৎচন্দ্র তখন এত পড়াশুনা করিতেন যে, তাঁহার পড়াশুনার বিষয়গুলি আলোচনার মধ্যে প্রতিফলিত করিবার ইচ্ছা হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি তাঁহার গল্প-উপন্যাসে পর্যাপ্ত প্রকাশের ক্ষেত্র পাইয়াছিল কিন্তু তাঁহার জ্ঞানবত্তা ও মননশীলতা প্রবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইল।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সমালোচনার রচনারীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে অনুভূতির কোমলতা এবং স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে করুণ-রসের গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে বৈদগ্ধ্যের প্রখরতা এবং বুদ্ধিমার্জিত টীকাটিপ্পনীর শাণিত দীপ্তি দেখা গিয়াছে। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার এক প্রীতিসিক্ত, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রবন্ধ-সমালোচনায় তাঁহার দৃষ্টি বক্র ও তীক্ষ্ণ, শ্লেষতিক্ত ও বিদ্রূপকষায়িত।

'নারীর লেখা'র মধ্যে তিনি আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপাদেবী ও নিরুপমাদেবীর লেখার সমালোচনা করিয়াছেন। যিনি 'নারীর ইতিহাস', 'নারীর মূল্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে নারীদের প্রতি তাঁহার সমস্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তিনিই আবার কিভাবে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দ্বারা বিদ্ধ করিবার জন্য নারীর লেখাই বাছিয়া লইলেন তাহা সত্যই একটু বিস্ময়ের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বিকৃত অনুকরণ করিতে গেলে কিরূপ বিভ্রাট ঘটে

১।১২।২।১৩ তারিখে শরৎচন্দ্র ফণীন্দ্রনাথ পালকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'আমার তিনটে নাম, সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলাদেবী। ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বড় গল্প—অনুপমা। সমস্তই এক নামে হ'লে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।'

আলোচ্য সমালোচনায় তাহা দেখানো হইয়াছে। তবে শরৎচন্দ্র এখানে ভাষা ও অলঙ্কার-প্রয়োগের অসঙ্গতির দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়াছেন। সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করিয়াছেন। গূঢ় উক্তি, তির্যক মন্তব্য, প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন প্রভৃতির মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার সমালোচনায় সামগ্রিক আলোচনা ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ অপেক্ষা একপেশে ও আংশিক বিচারই দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র নিজেও হয়তো সচেতন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার লেখায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝ একটু বেশি আসিয়া গিয়াছে। এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, 'ছোটদিদির লেখার স্টাইল প্রভৃতির সম্বন্ধে স-রচনায় একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছিল। সে প্রবন্ধ ছাপা হলে শরৎচন্দ্র ভেবেছিলেন, সে লেখার জন্য আমি হয়তো রাগ করেছি, ক'দিন তাই আমাকে আর কোনো চিঠিপত্র লিখলেন না, লিখলেন ফণীন্দ্র পালকে।

নানা কথার সঙ্গে লিখলেন—সৌরীনের সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটায় বোধ হয় খুব রাগ করেছেন—না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেছেন, তিনিই দায়ী।[১]

'পথনির্দেশ' ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। 'পথনির্দেশ' রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'এটিও পূর্বটির মতনই লেখা হইতে লাগিল। যতটুকু প্রতিদিন লেখা হয়, ততটুকুই অফিসে আনিয়া আমাকে পড়িতে দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ পড়া এবং আলোচনা হয় এই চায়ের দোকানে।'

'পথনির্দেশ' গল্পটি শরৎচন্দ্র অত্যন্ত যত্ন ও দরদের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন, সেজন্য এই গল্পটির প্রতি তাঁহার মমত্ব ও পক্ষপাতিত্বও একটু বেশি ছিল।[২] সমসাময়িক-কালে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং লোকে যে এই গল্পটি অপেক্ষা 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'কে অধিক প্রশংসা করিত ইহাতে তিনি সুখী হইতেন না। বোধ হয়

১। শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, পৃঃ ৩৯
২। 'পথনির্দেশ গল্পটি শরৎবাবুর নিজের কাছে রামের সুমতি হইতে ভাল লাগিয়াছিল।'—ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৭২

এই গল্পটির মধ্যে তাঁহার অতিপ্রিয় সমস্যাটি, অর্থাৎ বিধবা নারীর ভালোবাসা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ দুর্বলতা ছিল।

১৯১৩ ইং সালের মে মাসে শরৎচন্দ্র একটি পত্রে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'পথনির্দেশ পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা?[১] না পড়লেও ক্ষতি নেই—কিন্তু কেমন লাগল লিখো। শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভালো লেগেছে।' ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রমথনাথকে আর একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'ভাগলপুরে এবং এখানে একটা মতভেদ এই যে, রামের সুমতির চেয়ে পথনির্দেশ ঢের ভালো। দ্বিজুবাবুকে আমার প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ো ত কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথাটাই Final হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে।' ১৯১৩ ইং সালের ১২ই মে তারিখে তিনি পুনরায় প্রমথনাথকে লিখিলেন, 'রামের সুমতিতে আর্ট কম তবুও যদি একেই এত ভাল লাগিয়া থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয় হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই নিরুপায়। এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর এ প্রায় সকলেরই মত। তাছাড়া, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেও এই বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে পথনির্দেশের কাছে রামের সুমতির স্থান নীচে। অনেক নীচে।'

'পথনির্দেশে'র মধ্যে চরিত্রসংখ্যা খবই কম। গুণেন্দ্র, হেমনলিনী, ও সুলোচনা প্রধান। এই তিনটি চরিত্র লইয়াই গল্পটির কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। শেষের দিকে গুণেন্দ্রর বাড়িতে অনেক লোকের ভিড় হইয়াছে বটে, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে তাহারা ভিড় করিতে পারে নাই। কিন্তু গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলি বহুবিচিত্র ঘটনার মধ্যদিয়া চলিয়াছে, সেজন্য তাহাদের চরিত্রের যথোপযুক্ত গভীর বিশ্লেষণ হয় নাই। সুলোচনা ও হেমনলিনীর গুণেন্দ্রর বাড়িতে আসা, হেম ও গুণীর পারস্পরিক অনুরাগ সঞ্চার, হেমনলিনীর বিবাহ, বৈধব্য, পুনরায় গুণেন্দ্রর বাড়িতে আগমন, কাশীবাস, প্রত্যাবর্তন এবং শ্বশুর-বাড়িতে গমন, সেখানকার দুঃখময় জীবন-যাপনের পর আবার গুণেন্দ্রর কাছে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বহু ঘটনার বহুলত্বে হেম ও গুণীর ভালোবাসার গভীরতা ও তার করুণ ব্যর্থতার রূপ যথাযোগ্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ হয় নাই।

১। শরৎচন্দ্র কি এখানে ভাগলপুরে অবস্থান কালে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন?

গুণেন্দ্র ব্রাহ্ম, এজন্য হয়তো সুলোচনা গুণেন্দ্র ও হেমনলিনীর সম্ভাবিত বিবাহের বিরোধী ছিলেন, এবং উভয়ের ঘনিষ্ঠতায় শঙ্কিত হইয়া তাড়াতাড়ি কন্যার বিবাহ দিয়া দিলেন। কিন্তু হেমনলিনীর মনের উপর এই বিবাহের কোন প্রভাব স্পর্শ করে নাই, তাহার মনের মধ্যে গুণেন্দ্রর অধিকার ছিল একচ্ছত্র। সুলোচনাও মৃত্যুর পূর্বে হেমকে একরকম গুণেন্দ্রর হাতেই সঁপিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং গুণেন্দ্রর বাড়িতে তাহারই আশ্রয়ে বাস করিবার সময় হেমনলিনীর যৌবন-রাগরঞ্জিত হৃদয়টি যখন অনিবার্যভাবে গুণেন্দ্রর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল তখন তাহা সংযত করিবার মত বাহিরের কিংবা ভিতরের কোন প্রবল বাধা তাহার ছিল না। তবুও তাহাদের মিলন ঘটিল না। যে হেমনলিনী স্পষ্টই বলিয়াছে, স্বামীকে সে কোনদিন ভালোবাসে নাই, শ্বশুর-বাড়ি কোনদিন তাহার আপনার হয় নাই, গুণেন্দ্রকে পাইতে তাহার বাধা কোথায়? বোধহয় আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সে ধর্ম আচরণে মন দিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, ধর্ম আচরণ তাহার বাহ্য একটি ছদ্মরূপের প্রকাশমাত্র, তাহা তাহার অন্তরের কোন সহজাত সংস্কার হইতে উদ্ভূত হয় নাই। সুতরাং তাহার হঠাৎ কাশী চলিয়া যাওয়া এবং গুণেন্দ্রর উপর নিতান্ত অকারণেই রাগ করিয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া যাওয়া সব কিছুই বাড়াবাড়ি মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের লেখনীর অটল সংযম এই গল্পে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গুণেন্দ্র ও হেমনলিনী এক লোক-বিরল বাড়িতে প্রেমের প্রচণ্ড অগ্নিতাপ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে রহিয়া গেল, অথচ সেই তাপে দগ্ধ হওয়া দূরে থাকুক একটু আঁচ পর্যন্ত উভয়ের শরীরে লাগিল না, ইহা আশ্চর্য বটে! হেমনলিনীর হৃদয়াবেগের একটু আধটু আলোড়ন দেখা গিয়াছে, কিন্তু গুণেন্দ্রকে তো সংযমের প্রস্তরমূর্তি বলিয়াই মনে হইয়াছে। তাহার পৌরুষের দাবী কখনও মাথা চাড়া দিয়া উঠিল না, শুধু কেবল নীরব সহিষ্ণুতার সহিত সবকিছু সে মানিয়া গেল। ইহাতে তাহার ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি চিরদিন আচ্ছন্ন হইয়াই রহিল। কিন্তু গল্পটির সর্বাপেক্ষা বড় অসঙ্গতি ঘটিয়াছে শেষ পরিণতিতে। গুণী হেমকে হঠাৎ বোন বলিয়া পরিচয় দিয়া শুধু যে উভয়ের মধ্যে একটি অতর্কিত নিষেধের প্রাচীর খাড়া করিয়া তুলিল তাহা নহে। তাহাদের বঞ্চিত জীবনের নিভৃত মধু কল্পনার স্বর্গদ্বার যেন চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এই পরিণতি একটি জটিল সমস্যার যেন আকস্মিক সস্তা সমাধান ঘটাইয়া দিল।[১]

১। যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির অনুরোধে সম্ভবত শরৎচন্দ্র গল্পের শেষ অংশটির একটু পরিবর্তন

'অনুপমার প্রেম' ১৩২০ সালের চৈত্রসংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু গল্পটি রচিত হইয়াছিল ১৮৯৬-১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ভাগলপুরে।[1] শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'অনুপমার প্রেম'ও সেই প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। গল্পটির শেষ অংশে জলে ডুবিয়া অনুপমার আত্মহত্যার চেষ্টা এবং ললিতমোহন কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনার মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অসংশয়িত প্রভাব রহিয়াছে। প্রথম অংশে রোমাণ্টিক ব্যাধিকগ্রস্ত নায়িকা অনুপমার শ্রেষরসোজ্জ্বল যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বিধবা নারীর সমস্যা লইয়া গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বিধবার সমস্যা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিজস্ব সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন। 'অনুপমার প্রেম' বিধবা নারীর সমস্যা অবলম্বনে লিখিত শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা। 'বড়দিদি' ইহার পরে রচিত হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে লিখিত গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁহার নিজের জীবনের ছাপ অনেকখানি রহি[illegible]। 'অনুপমার প্রেম' গল্পটির মধ্যেও তাঁহার নিজের এবং তাঁহার [illegible] কোন কোন প্রিয়জনের চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা অনুমান [illegible] নহে। বখাটে, নেশাখোর ললিতমোহনের চরিত্র তাঁহার তৎকালীন [illegible] অনুরূপ। অনুপমার মধ্যেও তাঁহার স্নেহপাত্রী কোন নারীচরিত্রের ছাপ [illegible] কথা চলে। অবশ্য এ-ধরণের অনুমানের ভিত্তি থাকিতে পারে আবার নাও থাকিতে পারে।[2]

করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'সেদিন সম্পূর্ণ গল্পটি পুনরায় পড়িবার অবকাশ পাইলাম সেদিন মনে হইল, ঐন্দ্রজালিকের কাঠির স্পর্শ শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আগাগোড়া গল্পটিকে এমন শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, যাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, অনুপম। যখন উপসংহারে গুণেন্দ্রর মুখে হেমনলিনী নিজের সম্পর্কে ভগিনী সম্পর্ক শুনিলেন, জানি না তখন তাহার মনের অবস্থা কোথা হইতে কিরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহার ব্যাহত কল্পনা সেদিন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের কাছে এই উপসংহার ভাল লাগিয়াছিল। কেন সে কথার উত্তর নাই।'

১। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভাগলপুরে বিভূতিভূষণ ভট্ট সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্রের লেখা বাগান প্রথম খণ্ড পড়িতে দিয়াছিলেন। সেই খাতার অন্যতম গল্প ছিল 'অনুপমার প্রেম।'

২। শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহপাত্রী ও তাঁহার সাহিত্যশিষ্যা নিরুপমা দেবীর জীবনের সহিত অনুপমা চরিত্রের অনেক মিল দেখা যায়। নিরুপমা দেবীর একটি নামও ছিল 'অনুপমা'। এই

'অনুপমার প্রেম' শরৎচন্দ্রের অন্যতম প্রাথমিক রচনা, সেজন্য প্রথম রচনার দোষত্রুটি ইহাতে আছে। ইহা আকৃতিতে ছোটগল্প কিন্তু প্রকৃতিতে উপন্যাস। অর্থাৎ অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদের মধ্যে উপন্যাসের অনুরূপ বহুবিস্তৃত ও জটিল কাহিনী ইহাতে রহিয়াছে। সেজন্য কাহিনীর ঘটনাগুলির মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান আসিয়া গিয়াছে এবং চরিত্রগুলিও যথাযোগ্য বিশ্লেষিত হয় নাই। বিধবা নারীর সাংসারিক লাঞ্ছনা দেখান হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভালোবাসা ও সংস্কারের কোন দ্বন্দ্ব গল্পটির মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই। রোমান্টিক ভাবাপন্ন নায়িকার যে কৌতুকরসাত্মক বর্ণনা গল্পের গোড়ায় দেখান হইয়াছে গল্পের মূল কাহিনীর সহিত তাহার কোনই যোগ নাই। ললিত ও অনুপমার সম্পর্কও গল্পের মধ্যে অপরিস্ফুটই রহিয়া গিয়াছে। দাদার পক্ষে গৃহভৃত্যের সঙ্গে বোনের মিথ্যা কলঙ্কের কথা প্রকাশ্য ভাবে জাহির করিয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ঘটনাও অসংকিত, অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জনদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এসব দোষত্রুটি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী অমৃতলেখনীর আভাস এই গল্পেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষার সহজ যাদুস্পর্শ এখানেও কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমাজে বিধবা নারীর জীবন যে কতখানি পরনির্ভরশীল ও বিড়ম্বিত শরৎচন্দ্র তাহার বাস্তব চিত্র গল্পটির মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অনুপমাকে ললিতমোহন উদ্ধার করিয়া আনিবার পরেই গল্পের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটিয়া গিয়াছে। সুতরাং শরৎচন্দ্র সমস্যাটি সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে কিছু দেখাইলেন না। তবে মনে হয়, তিনি যেন অনুপমাকে ললিতমোহনের আশ্রয়েই তুলিয়া দিলেন। অবশ্য এ-ধরণের মধুরান্তক পরিণতি শরৎচন্দ্র পরবর্তী কালে সমস্যাপ্রধান গল্প-উপন্যাসের মধ্যে আর দেখান নাই।

'বিন্দুর ছেলে' ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার 'বিন্দুর ছেলে' রচনা করিবার কথা লিখিয়াছেন, 'রামের

অনুপমা নামটি শরৎচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার ছদ্মনামরূপেও ব্যবহার করিয়াছেন। গল্পের নায়িকা অনুপমার মতই নিরুপমাদেবীও তাঁহার ধনী পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা ছিলেন। তাঁহার স্বামীও বি. এ. পড়ার সময় যক্ষ্মারোগে মারা যান। তিনিও বিধবা হইয়া দাদার সংসারে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'তবে একথা সত্য যে শরৎচন্দ্রের জীবনে রজসের যুগ চলছিল সেদিন আর তাঁর মনে এমন একটা ছাপ দিয়েছিল যা সারা জীবনের বহু উত্থানপতনের দুঃখসুখের অভিজ্ঞতায় একেবারে মুছে গেলনা।' সুরেন্দ্রনাথ কি নিরুপমা দেবীর কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন?

সুমতি ও পথনির্দেশ যমুনায় প্রকাশিত হইলে, শরৎবাবু নূতন গল্প বিন্দুর ছেলে ও সেই সঙ্গে নারীর মূল্য প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করিলেন। 'বিন্দুর ছেলে' যে সময় লেখা হইতেছিল, ঠিক ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের রাসমণির ছেলেও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল, গল্পটির বিষয় শরৎবাবুকে আমি প্রসঙ্গচ্ছলে একদিন মাত্র বলিয়াছিলাম। তাহাতে শরৎবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, আচ্ছা দেখি আমার এ-গল্পটা কেমন হচ্ছে। আমার ত আর দু'টো গল্প লেখার পরে এতটুকুও লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না —তুমি কি বল? যদি ভাল লাগে ত লিখি। আমার নিজের কাছে কিন্তু বড়ই 'ভাল' মনে হচ্ছে।

'বিন্দুর ছেলে' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একপ নিরুদ্যম ও অপ্রশংস মনোভাব সত্ত্বেও বইখানি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। ২৫শে জুলাই, ১৯১৩, তারিখে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "বিন্দুর ছেলে তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধহয় ওটি মন্দ হয়নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে রামের সুমতির চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি।'

'রামের সুমতি'র মধ্যে নারায়ণীর সুগভীর স্নেহের চিত্র সুঅঙ্কিত হইলেও ঐ গল্পটির মধ্যে একান্নবর্তী পরিবারের পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু 'বিন্দুর ছেলে'র মধ্যে আমরা এক সামগ্রিক পারিবারিক চিত্র পাই। দুই ভাই যাদব ও মাধব এবং দুই বৌ অন্নপূর্ণা ও বিন্দু, পরিবারের একমাত্র সন্তান অমূল্য এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন—ইহাদের পারস্পরিক স্নেহ-অভিমানজনিত আনন্দ বেদনার ঘনীভূত রসই আলোচ্য বড় গল্পটিকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিন্দুর ঘন ঘন মূর্ছা যাওয়ার মধ্যে তাহার অবদমিত সন্তানকামনার কোন গোপন ক্রিয়া রহিয়াছে কিনা তাহা হয়তো ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ভাবিয়া দেখিতে পারেন, কিন্তু যে-মুহূর্তে অন্নপূর্ণার ছেলেটিকে সে কোলে পাইল তখনই তাহার বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়া গেল এবং তাহার মধ্যে এক স্নেহাতুরা জননী জাগিয়া উঠিল। নারায়ণী নিজের সন্তান থাকিতেও অপর আর একটি ছেলের উপরে নিজের সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছে, সেজন্য নারায়ণীর মাতৃত্বের মধ্যে যে উদারতা রহিয়াছে তাহা অবশ্য বিন্দুর মাতৃত্বের মধ্যে প্রকাশ হইতে পারে নাই। বিন্দু মাতৃত্বের পদলাভ করিয়াই তাহার সন্তানকে কণ্টকিত স্নেহ-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছে, সেই বেষ্টনীর মধ্যে কাহারও প্রবেশ সে সহ্য করিতে পারে নাই। তাহার এই অসহিষ্ণু, ঈর্ষাদগ্ধ

স্নেহের আতিশয্যের ফলেই কাহিনীর মধ্যে নানা বিরোধ ও অশান্তি দেখা গিয়াছে।

'রামের সুমতি'র মধ্যে যেমন দিগম্বরীর আগমনের ফলে যত জটিলতা ও সমস্যা দেখা গিয়াছে, এখানেও তেমনি এলোকেশী ও তাহার পুত্র নরেন আসিয়াই যত অনর্থ ও অশান্তি বাধাইয়া তুলিয়াছে। নরেনের কুপ্রভাবে একটির পর একটি কু-অভ্যাস যখন অবুঝ ছেলেমানুষ অমূল্যর মধ্যে দেখা গেল তখনই বিন্দু রাগ করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া সংসারের মধ্যে এক তুমুল অশান্তি ঘনাইয়া তুলিল। শেষ পর্যন্ত সে চিরসহিষ্ণু ও স্নেহশীল অন্নপূর্ণাকে এমন আঘাত হানিল যে দুই ভাইয়ের সংসার পৃথক হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য এই, যে এলোকেশী ও নরেন সকল অশান্তির মূল, তাহারা বিন্দুর সংসারেই স্থান পাইল।

বিন্দুর স্নেহ তাহার সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য লইয়া এই গল্পের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই অন্ধ ও অপরিমিত স্নেহ যে সংসারে অনিবার্য বিপর্যয় আনিয়াছে তাহাও সত্য। তাহার ক্রোধ ও তিরস্কার অমূল্যর প্রতি আত্যন্তিক স্নেহের উৎস হইতে আসিলেও মাঝে মাঝে উহাদের তীব্রতা ও আতিশয্য নিতান্ত অন্যায় ও অশোভন-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্নপূর্ণাকে সে যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে তাহা তাহার খেয়ালী ও স্নেহশীল প্রকৃতির দোহাই দিয়া সমর্থন করা যায় না। তাহার পরম উদার, স্নেহপরায়ণ দেবোপম ভাসুর যাদবকে তাহারই এই নিষ্ঠুর আচরণের জন্য বৃদ্ধ বয়সে ক্লেশজনক কাজে নিযুক্ত হইতে হইল। অবশ্য এই সাংসারিক বিভেদের ফলে বিন্দু নিজেও মানসিক দুঃখ ও গ্লানি এত বেশি পরিমাণে পাইয়াছে যে সে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু সে নিজে শুধু এটুকু বুঝে নাই যে, সকল প্রকার স্নেহ ও আন্তরিক শুভ ইচ্ছা সত্ত্বেও শুধু কেবল মানসিক জেদ ও মৌখিক দুর্বাক্যের ফলে সাজানো সংসার নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

বিন্দুর সঙ্গে অন্নপূর্ণাকে তুলনা করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পৃথক ধাতু দিয়া গড়া মনে হইবে। অন্নপূর্ণা নিজের সত্তাকে তাঁহার সংসারের মধ্যে একেবারে বিলীন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার খেয়ালী ও বদমেজাজী জা'টিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি নিঃশেষে সকল স্বত্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ছেলেটিকে তাহার কোলে তুলিয়া দিয়াছেন। সংসারের সুখ ও সম্প্রীতি বজায় রাখিবার

জন্য তিনি বিন্দুর দেওয়া সকল খোঁচা ও আঘাত সহ্য করিয়া বিনিময়ে সহিষ্ণু অন্তরের স্নেহসুধা তাহার কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিন্দুর অন্তিম আঘাত তাঁহার অন্তর একেবারে গুঁড়াইয়া দিল এবং বাধ্য হইয়া সংসারের অবাঞ্ছিত ভাঙ্গন তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইল। তথাপি নিজের কর্তব্য হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। বিন্দুর কাজের বাড়িতে যাচিয়া আসিয়া সকল কাজ তিনি সুসম্পন্ন করাইলেন। অবশেষে বিন্দুর সকল অপরাধ ভুলিয়া উদ্বেগব্যাকুল চিত্তে তাহার রোগশয্যা-পার্শ্বে মূর্তিমতী শান্তি ও সান্ত্বনার ন্যায় আসিয়া বসিলেন।

অন্নপূর্ণা যেমন খাঁটি অন্নপূর্ণা, তাহার স্বামীও তেমনি ঠিক যেন ভোলানাথ মহেশ্বর। সংসারের সকল গ্লানি ও তিক্ততার ঊর্ধ্বে তিনি এক আত্মমগ্ন প্রশান্তিতে সমাহিত হইয়া আছেন। বিন্দুর অন্যায় আচরণে তাঁহাকে বৃদ্ধ-বয়সে জীবিকা অর্জনের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগে নাই। বিন্দুর কঠিন রোগের কথা শুনিয়া তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'কত সাধ করে সোনার প্রতিমা ঘরে আনলুম, বড় বৌ, জলে ভাসিয়ে দিলে? আমি এখনি যাব।' সাংসারিক স্বার্থ ও নীচতার ক্ষুদ্র পরিবেশে যাদবের ন্যায় সত্যসন্ধ ও মহাপ্রাণ লোকের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

'নারীর মূল্য' ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে 'যমুনা'য় ছাপা হইতে লাগিল। এই 'নারীর মূল্য' রচনার ইতিহাস উল্লেখ করিয়াছেন শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের সাহিত্য-সঙ্গী যোগেন্দ্রনাথ সরকার, যথা—'এই নারীর মূল্য সম্বন্ধে একটুখানি ইতিহাস আছে। সেইটি হইতেছে এই—শরৎবাবু যে নারীর ইতিহাস প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা গিয়াছে সেই প্রবন্ধ হঠাৎ গৃহদাহে নষ্ট হইয়া যায়, তৎসঙ্গে তাঁহার মহাশ্বেতার ছবিখানিও যায়। এই নষ্ট প্রবন্ধটিকে পুনরুদ্ধার মানসে লেখক নূতন প্রবন্ধ ধারাবাহিক-ভাবে লিখিতে শুরু করিলেন।'[১]

'নারীর মূল্যে'র মধ্যে তিনি যে নির্ভীক ভাবে সত্য উন্মোচন করিতে চাহিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া ১৯১৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'দিদির নারীর লেখাটা সম্বন্ধে

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৮২

বোধ করি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু Truth চাই-ই, আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক—খা'তর করে কথা বলতে জানি না—তাই আমি নিজের ওপর এই ভার নিয়েছি ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব।'

'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হইলে ইহা খুব প্রশংসিত হয়। ১৪.৯.১৩ তারিখে শরৎচন্দ্র ফণীন্দ্র পালকে লিখিয়াছিলেন, 'নারীর মূল্য' আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বড় সুখ্যাতি হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, 'নারীর মূল্য অমূল্য। তোমরা এ-লেখককে হাত করবার চেষ্টা কর।'[১]

'নারীর মূল্য' অজস্র প্রশংসা পাইলেও কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনাও এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে হইয়াছিল। সৌরীন্দ্রমোহন নারীর মূল্য' সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ ভট্টের নিকট হইতে একখানি কড়া সমালোচনা-মূলক চিঠি পাইয়াছিলেন। বিভূতিভূষণ লিখিয়াছিলেন, 'শরৎদার নারীর মূল্য জ্বালাতন করিয়াছে। নিজেই নারীর লেখায় মেয়েমানুষের পাণ্ডিত্যের চেষ্টাকে খুবই গালাগালি করিয়াছেন, এদিকে নিজে ত মেয়েমানুষের বেনামীতে বেশ right and left সকলকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ-রকম শিখণ্ডীর ন্যায় অথবা মেঘনাদের ন্যায় নামের আড়ালে যুদ্ধ করিলে আমরা নাচার। কারণ যুদ্ধে স্ত্রী, গো ও পলায়মান অথবা আশ্রয়ার্থী মাত্র অবধ্য। উত্তর দিতে পারিতেছি না। অথচ ভীষ্মের ন্যায় বাক্যবাণও সহিতে পারি না, আমি বুড়কে ( নিরুপমাদেবী ) এই স্ত্রী-নামধারী উদ্ধত মহাপুরুষের অথবা স্ত্রীলোকের স্বত্বরক্ষাকারী DonQuixote-এর কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছি।'[২]

শরৎচন্দ্রকে সৌরীন্দ্রমোহন এ-চিঠি দেখাইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন, 'তোমরা নারীর মূল্য লেখাটার অজস্র সুখ্যাতি করিতেছ—আর পুঁটু সে-লেখাকে চাবকাইয়া দিয়াছে। নারীর মূল্য আর লিখব না। তবে এ-সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিবার আছে, নানা প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। পুঁটুকে লিখিয়া দিলাম। বুড়ি যেন এ-সম্বন্ধে কোনো কিছু

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৮২
২। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য—পৃঃ ৫৯

না লেখে। লেখার প্রতিবাদ আমার সহ্য হয় না। সেটা গালাগালির মত দেখায়। যদি আমার লেখার বিরুদ্ধে তোমাদের কিছু বলিবার থাকে কথায় বলিও।'[১]

নারী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দীর্ঘদিনের চিন্তা, বেদনা ও প্রতিবাদ 'নারীর মূল্যে'র মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের নিযাতিত, প্রতিকারহীন নারীসমাজ শরৎচন্দ্রের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদযবৃত্তিকে সমান ভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। হৃদযবৃত্তির সার্থক প্রকাশ হইয়াছিল তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিস্ফুটন হইয়াছে তাঁহার প্রবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে। নারীর ইতিহাস লেখার সময় তিনি যে বিপুল পরিশ্রমে বিশ্বের নারীসমাজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সমাবেশ রহিয়াছে 'নারীর মূল্যে'র মধ্যে। প্রবন্ধের শেষদিকে এই তথ্য ও দৃষ্টান্তের ভারে তাহার বক্তব্যবস্তু একটু পীড়িত হইয়াছে। প্রথম দিকে তিনি ভারতীয় নারীসমাজের কথাই প্রধানত বলিয়াছেন এবং এই অংশে তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট ও জোরালো। প্রবন্ধের শেষ দিকে নানা অসভ্য ও আদিম অধিবাসীদের নিয়মকানুন ও নারীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র যে হার্বার্ট স্পেন্সারের কতখানি ভক্ত ছিলেন পূর্বে তাহা দেখানো হইয়াছে। স্পেন্সারের সমাজতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে বহু উক্তি তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন, 'যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও, অবশ্য ফলাফলের বিচার-ভার পাঠকের উপর।' ধারাল যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বিশ্বের পুরুষশাসিত নারীসমাজ সম্বন্ধে নির্ভীক সত্যভাষণ করিয়া গেলেন।

'চন্দ্রনাথ' ১৩২০ সালের 'যমুনা'য় বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরে থাকিতে 'কোরেল' 'পাষাণ' প্রভৃতি গল্পলেখার পর শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন 'বড়দিদি' ও 'চন্দ্রনাথ'। ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় সৌরীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রের অনুমতি লইয়া তাঁহার দুইখানা গল্পের খাতা নিয়া আসেন। একখানা খাতায় 'কোরেল' 'চন্দ্রনাথ', 'বড়দিদি' প্রভৃতি গল্প ছিল। ১৯১২ সালে শরৎচন্দ্র

১। শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য, পৃঃ ৫৯-৬০

কলিকাতায় আসিলে সৌরীন্দ্রমোহন যমুনার জন্য শরৎচন্দ্রের পুরানো লেখাগুলি চাহিয়াছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়, 'আমার মনে ছিল চন্দ্রনাথ, পাষাণ প্রভৃতি গল্পের প্লট। শরৎচন্দ্র শুনলেন, শুনে বললেন—বেশ, সুরেনকে লেখো। যদি পাও, আমি একবার দেখে শুনে দেবো। আর যদি না পাও তা'হলে বর্মা থেকে আমি নতুন করে চন্দ্রনাথ লিখে পাঠাব। গল্পটা সত্যি ভালো।'

১০.১.১৩ ইং সালে শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিলেন, 'যদি চন্দ্রনাথ পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা'হলে যা সাধ্য সংশোধন ক'রে ফণিকে পাঠাব।'

১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে 'চন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে লিখিলেন, 'উপেন আমাকে অনেকবার লিখলে চন্দ্রনাথ পাঠাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি চন্দ্রনাথটা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন করে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিসটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েছে—সুতরাং নূতন করে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।'

'চন্দ্রনাথ' যমুনায় প্রকাশিত হইবে এভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু 'চন্দ্রনাথে'র কপি লইয়া সুরেন্দ্রনাথ এবং গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের একটু মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে শরৎচন্দ্র ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিলেন, 'চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমার পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনই প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়।......আরও একটা কথা আপনাকে বলি। সেদিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের চন্দ্রনাথ লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাতে এবং কাশীনাথের সাহিত্যে প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত

নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালা ওটা হাতে পায় এইজন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মতলব করিয়াছে। চন্দ্রনাথ যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিংবা তার দিয়া জানান Yes or no, আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই, দিতেই হইবে।'

সুরেন্দ্রনাথ ভাগলপুর হইতে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের কাছে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাইলেন। তিনি তাহা দেখিয়া শুনিয়া 'যমুনা'র জন্য পাঠাইতে লাগিলেন। বৈশাখ সংখ্যার জন্য 'চন্দ্রনাথে'র কপি পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে ৩.৫.১৩ তারিখে ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিলেন, 'চন্দ্রনাথে'র যাহা পরিবর্তন উচিত মনে করিয়াছি তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে, যাহা হউক, যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতিমাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্বে শেষ হইবে কিনা সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ immorality-র সংস্রব নাই, সকলেই পড়িতে পারিবে।'

'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের মধ্যে এমন এক সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেখানে সমাজের নিষ্ঠুর বিধানের কাছে প্রবলতম ব্যক্তিটিকেও নিরুপায় ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, এবং যেখানে নিরপরাধা নারীর মাথায় দুর্বিবহ কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া তাহাকে চরমতম দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলিয়া দিতে কাহারও বাধে না। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের মধ্যে শরৎচন্দ্র পুরুষের হাতে নারীর বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার বহুপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সেই বঞ্চিতা ও লাঞ্ছিতা নারীর অশ্রুসজল আলেখ্য এই উপন্যাসের মধ্যে শরৎচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। এখানে একজন নারীকে তাহার জুয়াচোর ও বদমায়েস স্বামীর নৃশংস দাবী মিটাইতে মিটাইতে অবশেষে তাহার দুরপনেয় লজ্জা ঢাকিবার জন্য প্রকাণ্ড সংসার হইতে চিরবিদায় লইতে হইল এবং আর একজনকে বিনা অপরাধে তাহার স্বামীর আশ্রয় হইতে নির্বাসিত হইতে

হইল। সীমাহীন ভালোবাসা এবং অকপট স্নেহযত্নের বিনিময়ে শুধু কেবল অপমান ও নির্যাতন! ইহাই নারীর প্রাপ্য ও পুরস্কার! শরৎচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়া এ-সত্য দেখাইয়া গেলেন।

'চন্দ্রনাথ' শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের রচনা। সেজন্য ইহাতে স্বাভাবিক কারণেই ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে কিছু কিছু দোষক্রটি লক্ষ্য করা যায়। সরযূকে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক জানিয়াও চন্দ্রনাথ তাহাকে ত্যাগ করিল কেন? যদি বলা হয়, সামাজিক বিধানের প্রতি বশ্যতার ফলে, তাহা হইলে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই বিধানের অলঙ্ঘ্য ও সর্বব্যাপী প্রভাব এই উপন্যাসে কোথায় দেখানো হইয়াছে? উপন্যাসের শেষ অংশে মণিশঙ্কর চন্দ্রনাথকে বলিয়াছেন, 'সমাজ আমি, সমাজ তুমি! এ-গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি।' সমাজ যদি সত্যই অর্থ ও প্রতিপত্তির অনুগত হইয়া থাকে তাহা হইলে সরযূকে ত্যাগ করিবার পক্ষে কি অনিবার্য কারণ ঘটিয়াছিল? চন্দ্রনাথ যদি লোকনিন্দার ভয়ে সরযূকে ত্যাগ করিয়া থাকে তবে কোন্ ভরসায় সে আবার তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাড়িতে নিয়া আসিল?

নায়ক চন্দ্রনাথের নাম অনুযায়ী এ-উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার চরিত্র মোটেই বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নহে। রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্পের নায়ক ক্রুদ্ধ পিতার নিষ্ঠুর আদেশ মানিয়া লইয়া নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। 'আমি জাত মানি না'—এই কথা বলিয়া সে পিতার নিকট হইতে গৃহ হইতে বহিষ্কারের আদেশ মাথায় পাতিয়া লইল। কিন্তু চন্দ্রনাথের পক্ষে এরূপ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার কারণ না থাকা সত্ত্বেও সরযূকে বিষপানে আত্মহত্যার আদেশ দিয়া বসিল এবং তারপর তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা জানিয়া অপরিসীম করুণাবশে তাহাকে শুধুমাত্র নির্বাসন দণ্ড দিয়া ক্ষান্ত রহিল। কাশী হইতে সরযূ ও তাহার পুত্রকে অবশেষে নিজের গৃহে ফিরাইয়া আনিতে যখন তাহার বাধে নাই তখন সঙ্গত প্রশ্ন করা যায়, নির্বাসনদণ্ডের কি প্রয়োজন ছিল? সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে চন্দ্রনাথের চরিত্রে শুধু কেবল প্রতিরোধহীনতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার নিদর্শনই পাওয়া যায়।

নারীচরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্রের কুশলতা সর্বত্র পরিস্ফুট। এই উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্রটির মধ্যে সেই কুশলী হস্তের অনিন্দিত স্বাক্ষর রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র সমাজশক্তির সহিত দ্বন্দ্বে নিরত বিদ্রোহিণী নারীর করুণ ও প্রখর

উভয় দিকই অতি সার্থকভাবে রূপায়িত করিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু তিনি এমন কয়েকটি নারীচরিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন যাহারা সমাজের প্রচলিত বিধি বিধান অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত মানিয়া লইয়া তাহাদের দুঃখব্রত জীবনের অচপল শিখাটি জ্বালিয়া সংসারজীবন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সরযূ এই শ্রেণীর নারীদের পুরোবর্তিনী পথিকৃৎ। তাহার পরে অন্নদাদিদি, সুরবালা, সৌদামিনী প্রভৃতি চরিত্র একই পথ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। সরযূ চন্দ্রনাথকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া দুর্লভ সৌভাগ্যস্বর্গে স্থান পাইল বটে, কিন্তু মায়ের অপরাধবোধ তাহাকে এমন সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিল যে কিছুতেই সে স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা ও সমান অধিকার লইয়া নিজেকে তুলিয়া ধরিতে পারিল না। তাহার কৃতজ্ঞ চিত্ত প্রেম ও ভক্তিতে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া স্বামীদেবতার পদতলে লুটাইতে চাহিল মাত্র। চন্দ্রনাথ সেই ভূলুণ্ঠিত পদলগ্ন লতাটি সোজা দাঁড় করাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। সেজন্য তাহার অতৃপ্ত ও অসন্তোষ বাড়িয়া গেল মাত্র। কিন্তু যেদিন সব প্রকাশ হইয়া পড়িল সেদিন এই অবনতমুখী, সদানমনীয় লতাটিই ঋজুদেহ, বৃক্ষের ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সব হারাইবার মুহূর্তেই সে প্রমাণ দিল, স্ত্রী অধিকার সম্বন্ধে সে কতখানি সচেতন। রাজরাণী ভিখারিণীর বেশে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু রাণীর পূর্ণ মর্যাদাটুকু যেন তাহার অঙ্গে লাগিয়া রহিল। কিন্তু কাশীতে চন্দ্রনাথের প্রতি বিন্দুমাত্র অভিমান প্রকাশ না করিয়া যখন তাহার সহিত পুনরায় শ্বশুরগৃহের দিকে সে যাত্রা করিল তখন তাহার পূর্ব মর্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রহিল কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে। তবে সরযূ হইল আমাদের অতিক্রান্ত সমাজের সেই সব নারীর প্রতিনিধি যাহারা স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক বশ্যতার মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধ সব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াই নারী-জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজিয়া পাইত।

'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় কিন্তু বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের চরিত্র। কৈলাসের চরিত্র কৌতুক ও কারুণ্যের মিশ্র ধাতুদ্বারা গঠিত। তাঁহার আত্মভোলা, নিরাসক্ত রূপ, দাবাখেলার প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক আসক্তি সব কিছুই আমাদের মনে এক সহানুভূতিসিক্ত কৌতুকরস উদ্রেক করে। বিশ্বনাথের বিরাট সংসারে তাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সমাজের বন্ধন তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই, ধর্মের শাসনেও তিনি ধরা দেন নাই। তাঁহার বিমুক্ত আত্মাটি জীবনের সহজ আনন্দেই শুধু মাতোয়ারা হইয়াছিল। যেদিন

সরযূকে তিনি অকূল পাথার হইতে নিরাপদ কূলে লইয়া আসিলেন সেদিন হইতেই এই সাংসারিক মোহমুক্ত মানুষটি পুনরায় সংসারের মোহে জড়াইয়া পড়িলেন। সংসারের পাকে তাঁহাকে বাঁধিবার জন্ত স্বয়ং বিশ্বনাথ বুঝি তাঁহার সংসারে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু এই ক্ষণিকের অতিথিটি যখন ক্ষণকাল পরেই বিদায় লইল তখন শুধু কেবল একটি চিরন্তন হাহাকার এই বৃদ্ধের শূন্ত হৃদয়ে জাগিয়া রহিল। সেই হাহাকার একদিন শুব্ধ হইয়া আসিল এবং তাহার নিঃসঙ্গ আত্মাটি অবশেষে চিরশান্তি লাভ করিল।

'আলো ও ছায়া' গল্পটি ১৩২০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যার 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। ভাগলপুর হইতে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি যে হাতে-লেখা পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে 'আলো ও ছায়া প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আলো ও ছায়া' গল্পটি প্রথম দিকে ইঙ্গিতময় ও কৌতুকদীপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং দুইটি নরনারীর স্নিগ্ধ প্রেমের স্পর্শে উপভোগ্য গীতিধর্মিতা লাভ করিয়াছে। সুরমা যজ্ঞদত্তের অতি সান্নিধ্যে থাকিয়াও বিধবা নারীর অলক্ষ্য গণ্ডির মধ্যে বন্দী হইয়া রহিয়াছে। নিজের অন্তরের সমস্ত দাবী নিরুদ্ধ করিয়া সে যজ্ঞদত্তকে বিবাহে রাজি করিল। যজ্ঞদত্ত বিবাহ করিল বটে, কিন্তু স্ত্রীকে ভালোবাসিতে পারিল না। গল্পের শেষ অংশে সুরমা অপেক্ষা এই নিরীহ, শান্ত এবং সকলের করুণাপ্রার্থিনী বধূটিই যেন প্রাধান্ত পাইয়াছে। সমাপ্তির দিকে চরিত্রগুলির স্বভাবের উগ্রতা এবং ক্ষিপ্ত আচরণের ফলে গল্পের প্রথম দিককার সেই স্নিগ্ধ, গীতিকাব্যময় সুর হারাইয়া গিয়াছে।[১]

'বিরাজ বৌ' ১৩২০ সালের ( ইং ১৯১৩ ) পৌষ-মাঘ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বিরাজ বৌ' 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের প্রথম লেখা। সুতরাং এই উপন্তাসখানি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ কিভাবে গড়িয়া উঠিল তাহা একটু বর্ণনা করা যাক। 'ভারতবর্ষ' ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

---

১। ১৯১৩ সালের ২৫শে জুন তারিখে লিখিত একটি পত্রে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে 'আলো ও ছায়া' প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, 'আষাঢ়ের যমুনায়' আলো ও ছায়া ব'লে একটা অর্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা। কিন্তু, এই একটা কথা যে, আমার এত আপত্তি সত্ত্বেও তারা প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই ভরসা করবে না, সেই কারণেই ভাবছি—হয়ত আমার ছেলেবেলায় লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে। যা হোক জিজ্ঞাসা করে দেখবো।'

কিন্তু প্রকাশের বহু পূর্ব হইতেই এই পত্রিকা সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল এবং ইহাতে কোন্ কোন্ লেখকের লেখা থাকিবে তাহাও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা দিতে অবশেষে সম্মত হন।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের যখন আয়োজন চলিতেছিল তখন একদিন রেঙ্গুনে যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত শরৎচন্দ্রের ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা হইয়াছিল তাহার বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 'কোর্ট বাজারের চায়ের দোকানটিতে আমরা উভয়ে চা খাইতেছি, হঠাৎ শরৎবাবু আমাকে বলিলেন, ওহে সরকার! আজ প্রমথর (প্রমথনাথ ভট্টাচার্য) চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, হরিদাস (বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) এমন একখানা বাংলা মাসিক বের করবার মনন করেছে, যার তুলনা একমাত্র বিলাতের ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন বা উইণ্ডসর ম্যাগাজিন-এর সঙ্গেই দেওয়া চলতে পারবে বলিয়াই পত্রখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়।

পড়িয়া দেখিলাম, পত্রের ভাবটা এইরূপ—পত্রিকার সম্পাদক হইবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। লেখক হইবেন বর্ধমানের মহারাজা এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে সুরু করিয়া ছোট বড় লেখক যিনি যেখানে আছেন এই বিরাট বাংলা মুলুকে। অর্থাৎ এমন একটা বিরাট ব্যাপার যাহা কাহারও দ্বারা এ-পর্যন্ত সুসাধ্য হইয়া উঠে নাই। পত্রিকার এখনও নামকরণ হয় নাই। নামকরণ হইলেই অনুষ্ঠান-পত্র বাহির হইবে। উহাতে শরৎবাবুর নাম ত থাকিবেই, ইহা বাদে আরও অনেকের থাকিবে, যেমন সৌরীন, নিরুপমা, অনুরূপা দেবী ইত্যাদি। এইবারে শরৎবাবুর একটুখানি নাম প্রচারের সুবিধা হবে।'[১]

প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রকে 'ভারতবর্ষে' লিখিবার জন্য ক্রমাগত চাপ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি 'যমুনা'র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'ভারতবর্ষে'র সহিত যুক্ত হইতে চাহেন নাই। ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে ফণীন্দ্রনাথ পালকে তিনি লিখিলেন, "দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির

১। ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৭৭

করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাললেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম। এরজন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।'

প্রমথনাথকে ১৯১৩ সালের ৪ঠা তারিখে তিনি লিখিলেন, 'প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব— মাপ করবে? যদি কর ত বলি। আমার চেয়ে ভাল Novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে-জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ করো। তার পূর্বে নয়—এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না—আমি সত্য চাই। তোমাদের কাগজে ভাল লেখার অভাব হবে না; কেন না তোমরা টাকা দেবে। কিন্তু, আমি যদি এই সময়েই যমুনাকে ছাড়ি তার আর কেউ থাকবে না। অথচ, আমি বলেছি, যদি Merit-এর আদর থাকে—তবে যমুনা বড় হবেই। আমি কোনদিন কোন কাজেই এলাম না ভাই, যদি এই একটা কাজ সম্পন্ন করে তুলতে পারি, তবুও একটু সুখে মরব।'

'ভারতবর্ষ' প্রকাশের পূর্বেই বিজ্ঞাপিত সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রলালের আকস্মিক মৃত্যু ঐ পত্রিকার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিল। শরৎচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রমথনাথকে চিঠি দিয়াছিলেন। তিনি ৩১ ৫.১৩ তারিখে লিখিলেন, দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী Subscription আর কেউ চালাতে পারবে না। হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। এ-কাগজ Successful হবার হলে দ্বিজুবাবু অন্ততঃ ৬টা মাসও বাঁচতেন। এই আমার ধারণা। একে Superstition বল আর যাই বল।······দ্বিজুবাবুর সঙ্গে কি শুধু তিনিই গেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ influence পর্য্যন্ত গেছে। এই ধর আমি। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর appreciation-এর লোভেও লিখতাম। সারদাবাবুর ভালমন্দ বলার দাম কি? কে গ্রাহ্য করে?'

শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রথম দিকে বিরূপ থাকিলেও ক্রমে ক্রমে সম্ভবত বন্ধুবর প্রমথনাথের আগ্রহাতিশয্যে লেখা দিতে সম্মত হইলেন। ১৭. ৭. ১৩ তারিখে প্রমথনাথকে লিখিত একটি পত্রে জানা যায়, তিনি 'ভারতবর্ষে'

প্রকাশের জন্য ভাগলপুরে লেখা উপন্যাস 'দেবদাস' দিতে সম্মত হইয়াছেন। ঐ পত্রে আরও একটি গল্প পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি লিখিলেন, 'আচ্ছা আশ্বিনের জন্য আমি একটা গল্প দিব, নিশ্চিন্ত থাক। তবে হয়ত একটু বড় হইবে। ২০।২৫ পাতার কম নয়। তবে, এমন গল্প এ-বৎসর আর বাহির হয় নাই তেমনি করিয়া লিখিব। শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত ভারতবর্ষের জন্য একটি বড় গল্প ( উপন্যাস ) লিখিলেন এবং 'ভারতবর্ষে'র প্রথম প্রকাশের ছয় মাস পরে পৌষ সংখ্যায় 'বিরাজ-বৌ' মুদ্রিত হয়।

'বিরাজ-বৌ' রচনার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'এই বিরাজ-বৌ বই লিখিতে লেখকের মাসাধিক কাল লাগিয়াছিল। অত ধৈর্য ধরিয়া, অত কাটাকুটি করিয়া লেখা খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভবপর। লেখক আমাকে বলিতেন, ভাখ যতক্ষণ না আমার এক্সপ্রেসনটা সহজ এবং ঝরঝরে মনে হয়, ততক্ষণ কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয় না। বাহির লেখা দিনের বেলা ভুল বলে মনে হয়।'[১]

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসটি লেখার সময় ইহার নাম কি হইবে সে-বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথের সহিত শরৎচন্দ্রের আলোচনা হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'এই বিরাজ-বৌ যখন লেখা হইতেছিল, তখন আমাদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপারে চৌধুরী মহাশয়ের দোকানে, বইয়ের প্রথম কিস্তি ভারতবর্ষে পাঠাইবার সময় লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নাম দেওয়া যায় বলত ?

বলিলাম, কেন, বিরাজ-মোহিনী বেশ নাম।

না হে, ওর চেয়ে বিরাজ-বৌ নামই আমার পছন্দসই। মোহিনী চরিত্র তেমন ইম্পর্টাণ্ট নয়। থাকগে কাজ নেই আর ও নামটা এর সঙ্গে জুড়িয়ে।

আমার উত্তর জোগাইল, কহিলাম অর্থাৎ প্রথম দফায় যোগেন চাটুয্যের কনে বৌ, দ্বিতীয় দফায় শিবনাথ শাস্ত্রীর মেজ বৌ, আর তৃতীয় দফায় শরৎ চাটুয্যের বিরাজ বৌ এই ত ? তা হোক ! ওই ত তোমাদের কেমন একটা রোগ ; তাঁদের কনে বৌ, মেজ বৌ যত খুশি থাকে থাক। তাতে আমার লোকসান আসে কিছু ?—বলিয়াই নীল পেন্সিল দিয়া বড় বড় অক্ষরে

১। ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৮৪

বিরাজ-বৌ নাম পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় লিখিয়া দিলেন। নীচে লিখিলেন—ছোট ছোট অক্ষরে গল্প।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম। তা হবে না, প্রমথ ভট্টাচার্যের চিঠির কথা মনে নেই ? লিখুন উপন্যাস।

লেখক এবারে আর কোন আপত্তি করিলেন না—গল্প কাটিয়া স্পষ্ট করিয়া আরও বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন—উপন্যাস।'

১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে 'ভারতবর্ষে'র জন্য 'বিরাজ-বৌ'-এর কপি দিবার সময় শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে লিখিলেন, 'প্রমথনাথ, আমার গত পত্রে আশা করি সব কথা জানিয়াছ। গল্পটা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, তাহারও সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছি। একে ত এত বড়, তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তারপর তোমার অভয় পাইয়া পাঠাইলাম, গল্পটা একটু মন দিয়া পড়িয়ো এবং immoral ইত্যাদির ছুতা করিয়া reject করিও না। তাও যদি কর, কাহাকেও reject করার কারণ দর্শাইয়ো না।'

'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হইলে ইহার প্রশংসায় সকলেই মুখর হইয়া উঠিলেন। তবে বিরাজের যে সাময়িক একটু অধঃপতন ঘটিয়াছিল ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। এ-সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'বইখানা এতই ভাল লাগিয়াছিল সকলের কাছে যে, কেহই বিরাজের ঐ সাময়িক অধঃপতনটুকু সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। এ-সম্বন্ধে পাণ্ডুলিপি পাঠকালে আমরাও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আপত্তি টেঁকে নাই।'

শরৎচন্দ্র ১৩৩১৪ তারিখে প্রমথনাথকেও এ-সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'বিরাজ-বৌ নিয়ে যেমন মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই হৈ-চৈ করে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে ও-সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না।'

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসের মধ্যে আমাদের চিরপ্রচলিত পারিবারিক নীতি ও আদর্শের জয়গান করা হইয়াছে। সমাজের ভাঙন ও গড়নের উভয় ধারাই শরৎচন্দ্র তাঁহার সমান সহানুভূতি দিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। একটি ধারা সমাজের কূল উল্লঙ্ঘন করিয়া অশান্ত আবেগে মুক্তির পথে ধাবিত হয়, আর একটি ধারা শান্ত আবর্ত রচনা করিয়া সমাজক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হয়। একদিকে কিরণময়ী আর একদিকে বিরাজ—দুই বিপরীত ধারার প্রতীক। অথচ প্রায় একই সময়ে উভয় চরিত্র শরৎচন্দ্রের

মানস-উৎস হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শবোধ 'বিরাজ-বৌ'-এর মধ্যে সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্রের সাময়িকভাবে নৈতিক কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিলেও শেষ পর্যন্ত সেই কেন্দ্রে আসিয়াই চরিত্রের পরিণতি ঘটিয়াছে। এই উপন্যাসেও পতিব্রতা বিরাজের সাময়িক নৈতিক স্খলন ঘটিলেও অবশেষে তাহার পাতিব্রত্যের অম্লান নিষ্ঠাই বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনী চরিত্রের সহিত বিরাজের সাদৃশ্য বড় বেশি প্রকটিত। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও মানসিক শাস্তি ঠিক বিরাজের মধ্যেও লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। শৈবলিনীর ন্যায় বিরাজেরও দৈহিক বিশুদ্ধির সার্টিফিকেট দিতে লেখকের সযত্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। লেখকের লেখনীতাড়নায় শৈবলিনী ও সূর্যমুখী প্রভৃতি চরিত্রের ন্যায় বিরাজকেও দ্রুতধাবমান ঘটনার বিচিত্র-বন্ধুর পথে ধাবিত হইতে হইয়াছে। লেখক বিরাজকে টানিয়া লইয়া নদী, গৃহস্থ-বাড়ি, হাসপাতাল হইতে পুরী, তারকেশ্বর প্রভৃতি নানা জায়গায় চলিয়াছেন এবং যেভাবে অমন অপরূপ সুন্দরী নারীটিকে কানা ও নুলো করিয়া ঘৃণ্য ভিখারিণীর পর্যায়ে আনিয়া মন্দির সন্নিকটে পথের উপর ফেলিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমাদের কল্পনাশক্তি রূঢ়ভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই সব রোমাঞ্চকর ও অতিনাটকীয় ঘটনার আতিশয্যে 'বিরাজ-বৌ'-এর শেষ অংশ নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

'বিরাজ-বৌ'-এর কাহিনী বর্ণনার মধ্যে স্থানে স্থানে দুর্বল গ্রন্থি রহিয়াছে। যে নীলাম্বর বিরাজের প্রতি সব সময়ে তাহার প্রশান্ত বিশ্বাস এবং অবিচল ভালোবাসা বজায় রাখিয়াছে সেই বিরাজ শুধুমাত্র বাড়ির বাহিরে যাওয়াতে সন্দেহ ও ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়িল ইহা যেন অবিশ্বাস্য বোধ হয়। নেশার ঝোঁকে নীলাম্বর এরূপ আচরণ করিয়াছে ইহা মনে রাখিয়াও বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তাহার পক্ষে বিরাজের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা স্বাভাবিক নহে। বিরাজ আত্মহত্যার জন্য নদীতে গিয়াছিল তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহার পক্ষে সুন্দরীর সহায়তায় রাজেন্দ্রর বজরায় গিয়া উঠা অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। জ্বর ও বিকারের ঝোঁকেও সে এরূপ কাজ করিতে পারে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তাহার নির্জ্ঞান মনে রাজেন্দ্রর প্রতি কোন অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই শুধু এরূপ কাজ তাহার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু একাগ্র পাতিব্রত্যের সংস্কার এমন ভাবে তাহার সমগ্র চেতনার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে যে তাহার

পক্ষে আত্যন্তিক অভিমান বশতও সেই সংস্কার বর্জন করা সম্ভব নহে। সে পতিকে ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু পতিত্বের অধিকারজাল ছিন্ন করা তাহার পক্ষে অসাধ্য।

'বিরাজ-বৌ'-এর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ মিলন-বিরোধের নানা জটিল পর্যায়ের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সম্বন্ধ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা কিরূপ অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন নীলাম্বরের অবস্থা সচ্ছল ছিল ততদিন নীলাম্বর ও বিরাজের সম্পর্ক পারস্পরিক অনুরাগ ও বিশ্বাসে মধুময় ছিল। কিন্তু হরিমতির বিবাহের পর অভাব-অনটন ও ঋণের ভার চতুর্দিক হইতে এই ক্ষুদ্র ও শান্তিপূর্ণ সংসারটিকে পিষিয়া ধরিল। নীলাম্বর ও বিরাজের মিলনকুঞ্জে যেন লতাগুল্মের অন্তরাল হইতে দারিদ্র্যের বিষধর সর্পটি হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাদিগকে দংশন করিল। সেই দংশনের জ্বালায় তাহাদের জীবনের রস বিষাক্ত হইয়া পড়িল। যেখানে শুধু ছিল প্রেম, সেবা ও যত্নের শতপ্রকার আয়োজন সেখানে আসিল বিস্বাদ জীবনের কুশ্রীতা ও মালিন্য, তিক্ততা, গ্লানি ও অবসাদ। শরৎচন্দ্র দারিদ্র্যের এই সর্বনাশী রূপের অতি বাস্তব চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরিশেষে এই দারিদ্র্যের আঘাত আসিল বিরাজ ও নীলাম্বরের শোচনীয় ভুল বোঝাবুঝি ও তাহাদের একান্ত দুঃখজনক ছাড়াছাড়ির মধ্যে।

বিরাজ আমাদের প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসের পতিব্রতা নারীদের ন্যায় তাহার সর্বময় সত্তাকে পাতিব্রত্যের ভূষণে ভূষিত করিয়াছে। কিন্তু তাহার পতিপরায়ণতার মধ্যে শান্ত ও নীরব প্রেম ও আত্মনিবেদনের মহিমা নাই, তাহাতে যেন এক চিরক্ষুধিত আত্মার অতৃপ্ত আবেগ এবং উদ্দাম উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। নিজেকে সে সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীর ঐকান্তিক সেবাযত্নের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছে। সেবাযত্নের এই প্রবল আতিশয্য নীলাম্বরের কাছে সময় সময় পীড়ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও বাধা দিতে গেলে বিরাজ কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া অনর্থ বাধাইবে, সেজন্য নীলাম্বর অনেক সময় বিরাজের ভালোবাসার আতিশয্যের কাছে নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অবশ্য বিরাজ স্বামীর জন্য যতখানি দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছে তাহার তুলনা শরৎচন্দ্রের অপর কোন চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না! নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের আঘাত সব নিজে বরণ করিয়া নিয়া সে স্বামীকে নিশ্চিন্ত সুখ ও আরামের

মধ্যে রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। পরিশেষে রোগে, অনাহারে মৃতকল্প হইয়াও স্বামীকে খাওয়াইবার জন্য চাল ধার করিতে গিয়া নিতান্ত নির্দয়ভাবে অকৃতজ্ঞ স্বামীর দ্বারা অপমানিত হইয়াছে। স্বামীর মন্দির হইতে সে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অন্তরে সে এক চিরস্থায়ী মন্দির গড়িয়া রাখিল। এই হতভাগী রমণীর অন্তিম শাস্তি ও শোচনীয় দুর্গতি এক দুঃসহ বেদনা এবং কঠিন অভিযোগে আমাদের অন্তর পূর্ণ করিয়া তোলে।

কিন্তু বিরাজের অতুলনীয় পাতিব্রত্য সত্ত্বেও ইহা না বলিয়া পারা যায় না যে, তাহার মধ্যে সর্বাঙ্গীণ মহত্ত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্বামী ছাড়া জগতের আর কাহারও জন্য সে কখনও ভাবে নাই এবং কিছুই করে নাই। কিন্তু আর একটি নারীর মধ্যে এই সর্বাঙ্গীণ মহত্ত্বের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সে উপন্যাসের মধ্যে একটি ছোট অংশ জুড়িয়া আছে মাত্র এবং লেখকের সযত্ন দৃষ্টিও সে লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তবুও তাহার স্বল্পপরিসর স্থান হইতে সে এমন এক পুণ্য জ্যোতি বিকিরণ করিয়াছে যাহার কাছে বিরাজের পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল প্রভাও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মোহিনীকে প্রথম আমরা দেখিলাম, যখন সে তাহার ক্ষুদ্র কোমল হাতটিতে তাহার একছড়া সোনার হার ভরিয়া বিরাজের সাহায্যে বাড়াইয়া দিল। তারপর হইতে অলক্ষ্যে এবং নীরবে সেই হাতটি সকলের সেবায় ও কল্যাণে নিযুক্ত রহিল। স্বামীর প্রতি একান্ত ভক্তির বিনিময়ে সে তাহার স্বামীদেবতার নিকট হইতে শুধুমাত্র লাঞ্ছনা ও প্রহার লাভ করিয়াছে। স্বামীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়াও যে অপরের জন্য নিজেকে নিবেদন করা করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত সে দেখাইয়াছে। নীলাম্বর ও বিরাজের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের সঙ্গে সে নিজেকে মনে প্রাণে যুক্ত করিয়াছে, বিরাজের গৃহত্যাগের পর শূন্য গৃহে সে তাহারই প্রত্যাবর্তনের জন্য একাকী অপেক্ষা করিয়াছে, আর সকলে যখন বিরাজকে কুলত্যাগিনী অপরাধিনী ভাবিয়াছে, তখন সেই কেবল তাহার পুণ্যদৃষ্টির আলোকে বিরাজকে অপাপবিদ্ধা মনে করিয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক নীলাম্বরকে লেখক গোড়াতেই গোঁয়ার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে একমাত্র বিরাজকে নেশার ঝোঁকে দুর্বাক্যের দ্বারা অপমান করার ঘটনা ব্যতীত আর কোথাও সে

কোনো রকম গোঁয়ারতুমি দেখায় নাই। বিরাজের গৃহত্যাগের পূর্বে ও পরে সে বিরাজের প্রতি উদার ক্ষমা ও সীমাহীন প্রেমের পরিচয়ই দিয়াছে। নিজের অপরাধের জন্য নিজেকে সে কখনও ক্ষমা করে নাই এবং হতভাগী বিরাজকে শেষ কালে পরম স্নেহে ও সহানুভূতিতে গ্রহণ করিয়া সেই অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। তাহার চরিত্রের আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ভগ্নী হরিমতির প্রতি অপরিসীম স্নেহের মধ্য দিয়া। এই স্নেহের আধিক্যের জন্য সে যত সমস্যার মধ্যে নিজের পরিবারকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, নানাপ্রকার দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, কিন্তু তবুও এই স্নেহের বাঁধন শিথিল হয় নাই।

'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামক একটি প্রবন্ধ ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। রচনাটি ভাগলপুর সাহিত্য-সভার হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'ছায়া'য় বাহির হইয়াছিল। 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হয় নাই। উহাতে নামের স্থানে ছিল শ্রী চট্টোপাধ্যায়। 'ক্ষুদ্রের গৌরব' একটি সুখপাঠ্য রম্য রচনা। রচনাটির মধ্যে 'কমলাকান্তে'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীর পথে 'যমুনা পুলিনে ব'সে কাঁদে রাধা বিনোদিনী' কে একজন গাহিয়া যাইতেছিল। গানটি গঞ্জিকাসেবী সদানন্দের প্রাণের মধ্যে ভাবের যে আলোড়ন জাগাইল তাহারই কবিত্বময় বর্ণনা রচনাটির মধ্যে রহিয়াছে।

১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে 'যমুনা'য় 'পরিণীতা' প্রকাশিত হইল।[১] শরৎচন্দ্র যে স্বল্পসংখ্যক সুখপাঠ্য প্রণয়মূলক রোমান্টিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন 'পরিণীতা' তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই উপন্যাসের মধ্যে সমস্যার ভার নাই, তর্ক-বিতর্কের জ্বালা ও উত্তাপ নাই, নরনারীর মধুর রোমান্স-রসে ইহা সকলের কাছে পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। 'পরিণীতা'র মধ্যে লেখকের পরিণত লেখনীর শিল্পসুষমা সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাহিনী-বিন্যাসে, বর্ণনাভঙ্গিতে ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে ইহার প্রমাণ মিলিবে।

শেখর ও ললিতার রোমান্টিক ভালোবাসা অবলম্বনে প্রধানত এই উপন্যাসের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মিলনান্তক কমেডির মধ্যেও

---

১। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় বিরাজ-বৌ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র জন্য পরিণীতা পাঠাইয়াছিলেন।

—শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য, পৃঃ ১৩৮

সাময়িক বাধা ও জটিলতা আনিয়া ঘনীভূত কৌতূহল ও রসোদ্দীপক উত্তেজনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই বাধা ও জটিলতা আসিয়াছে প্রধানত গিরীন চরিত্রটি হইতে। শেখর ও ললিতার প্রেম বেশ অনুকূল বাতাসে বাহিত হইয়া নিশ্চিন্ত বেগে চলিতেছিল। কিন্তু আকাশের কোনো অজ্ঞাত কোণ হইতে আচমকা এক প্রতিকূল হাওয়ার তাড়নায় যেমন নিরুদ্বেগ নৌকাটি দিশাহারা হইয়া পড়ে, গিরীনের আকস্মিক আগমনে শেখর ও ললিতার প্রেমও তেমনি হঠাৎ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। উভয়ের মধ্যে আর একটি বাধা আসিয়া দাঁড়াইল গুরুচরণের ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে। তবে শেখরের পিতা নবীন রায়ের মৃত্যুতে সেই বাধাটি গৌণ হইয়া পড়িল, সন্দেহ নাই। শেখর ললিতাকে ভুল বুঝিয়াছে, তাহাকে মনে মনে যৎপরোনাস্তি গালাগালি করিয়াছে এবং ঈর্ষার আগুনে দিনরাত দগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সব কিছুই অমূলক, সেজন্য তাহার মানসিক দুঃখভোগের বর্ণনার মধ্যে কমেডির প্রচ্ছন্ন কৌতুকজনকতা রহিয়াছে।

উপন্যাসের নাম 'পরিণীতা' হইয়াছে একারণে যে, ললিতা মনে মনে জানিয়াছিল যে, শেখরের সঙ্গে যে মুহূর্তে তাহার মালাবদল হইয়া গেল, তখন হইতেই সে শেখরের পরিণীতা হইয়া পড়িয়াছে। মালাবদলের ফলেই যে পরিণয় সিদ্ধ হইল শেখর কোন দিন তাহা ভাবে নাই, এই পরিণয়ের সংবাদ অপর কেহও রাখে নাই। কিন্তু ললিতা নিশ্চিত জানিয়াছে, সে পরিণীতা, অপর কাহারও সঙ্গে আর তাহার পরিণয় হইতে পারে না। সংসারে অনেক ঝড়-ঝাপটা আসিয়াছে, শেখরের নিকট হইতে সে দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, শেখরের বিবাহের আয়োজন অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু কোন কিছুতেই সে বিচলিত হয় নাই। সে বুঝিয়াছে শেখর যাহাই করুক, যাহাই হউক না কেন, সে চিরকালের জন্য শেখরেরই থাকিবে, তাহার দেহমনপ্রাণ সব শেখরময় হইয়া রহিয়াছে। অতটুকু মেয়ের অতখানি বিশ্বাস ও দৃঢ়তা কোথা হইতে আসিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

আলোচ্য উপন্যাসের গঠন-কৌশলের মধ্যে শরৎচন্দ্র নাটকীয় রীতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কাহিনীর মধ্যে চমক ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে অনেক স্থানে। শেখর ও ললিতার নিশ্চিন্ত সম্বন্ধ গিরীনের আগমনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, গিরীন ও ললিতার অনিবার্য বিবাহ শেষপর্যন্ত বানচাল হইয়া

গেল, শেখরের বিবাহ প্রায় স্থির হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে পাত্রী বদল হইয়া গেল, ললিতা পরের বিবাহিতা জানিয়া শেখর তাহার প্রতি যে উপেক্ষা ও ঘৃণা দেখাইয়াছে, গিরীনের এক কথায় সে সব কোথায় সরিয়া গেল এবং যত নিরুদ্ধ আবেগ যেন এক নিমেষে তাহার অন্তরের গোপন গুহা হইতে হঠাৎ ছাড়া পাইয়া তাহার সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এমনি ভাবে উপন্যাসের মধ্যে বারে বারে ঘটনা ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবার ফলে ইহাতে নাটকীয় চমৎকারিত্ব ঘটিয়াছে।

'পণ্ডিতমশাই' ১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে পণ্ডিত-মশাই রূপে পরিচিত ছিল। সেই পণ্ডিত-মশাইয়ের নাম অনুযায়ী এই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবনের পণ্ডিত-মশাই রূপ এই উপন্যাসের মধ্যে খুব বেশি প্রাধান্য পাই নাই। একটি মাত্র পরিচ্ছেদে বন্ধু কেশবের সঙ্গে আলোচনার সময় গ্রামের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে নিজের আদর্শ সংস্কারের কথা সে উল্লেখ করিয়াছে। বৃন্দাবন তাহার গ্রামে নানাপ্রকার সংস্কার সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, শিক্ষা সংস্কার তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তবে অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে এই নামকরণের তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। গ্রামের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও অমানুষী হৃদয়হীনতার মূল যে অজ্ঞানতা লেখক তাহা বলিতে চাহিয়াছেন। বৃন্দাবন কেশবকে বলিয়াছিল, 'অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং ত্যাখো।' বৃন্দাবনের সমাজ-সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই অজ্ঞানতা দূর করা, তাহার পাঠশালা সেই উদ্দেশ্যের একটি প্রতীক মাত্র। আর একদিক দিয়াও এই পণ্ডিত-মশাই নামের গভীরতর তাৎপর্য উপলব্ধ হইবে। চরণের মৃত্যুর পর বৃন্দাবন বিশ্বের সকল শিশুর মধ্যেই চরণকে আবিষ্কার করিল। তাহার গ্রামের পাঠশালাটি বিশ্বপাঠশালায় যেন পরিণত হইল। যিনি সকল শিশুকে নিজের মত দেখিতে পারেন তিনিই তো যথার্থ পণ্ডিত-মশাই। বৃন্দাবন পাঠশালাটির ভার বন্ধুর হাতে তুলিয়া দিল। কিন্তু পণ্ডিত-মশাইয়ের ইচ্ছাটি চরণের সঙ্গী-সাথীর মধ্যে চিরকাল বাঁচিয়া ছিল। সেজন্য পণ্ডিত-মশাই-রূপে একদিন যে গ্রামে ছিল, সে চলিয়া যাইবার পরও সেই পণ্ডিত-মশাইটি সকলের মধ্যে রহিয়া গেল।

'পণ্ডিত-মশাই'য়ের মধ্যে বৃন্দাবন ও কুসুমের জটিল সম্বন্ধ অবলম্বনে কাহিনী গড়িয়া উঠিলেও ইহার মধ্যে সমাজের বাস্তব ও ভয়াবহ রূপের যে চিত্র

ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে মূঢ়, নির্মম ও আত্মঘাতী সমাজের এক মহাসর্বনাশের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। মহামারীর বীভৎসতা একখানি বাস্তব তীব্রতা লইয়া অপর কোনো উপন্যাসে পরিস্ফুট হয় নাই। সেই মহামারীর শ্মশানে সন্ধ্যা-আহ্নিকনিষ্ঠ তারিণী মুখুয্যে ও শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় মূর্তিমান প্রেতের মতই যেন চরণের ন্যায় কচি কচি শিশুর মৃতদেহ লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিতেছেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, উপযুক্ত ঔষধ ও চিকিৎসার অভাব এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের অভাব—এই সব বাংলা সমাজকে কোন ধ্বংসের অতলে নিয়া যাইতেছে শরৎচন্দ্র তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

বৃন্দাবন ও কুসুম পরস্পরকে ভালোবাসিয়াও পরস্পরকে কেহ পাইতেছে না, উভয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটি কোথায় তাহা ঠিক বুঝা যায় না। সামাজিক কোনো বাধা ছিল না, কোনো নীতিগত বাধাও ছিল না। বৃন্দাবনকে নূতন করিয়া দেখিয়া এবং তাহার শিক্ষিত ও মার্জিত মনের পরিচয় পাইয়া কুসুমের সমস্ত নারীহৃদয় এক দুর্বার আকর্ষণে তাহার প্রতি ধাবিত হইল, বৃন্দাবনের মাতা আদর করিয়া তাহার হাতে বালা পরাইয়া দিলেন। কিন্তু কুসুম বালা জোড়া ফেরত দিল কেন? কিসের ভরসায় সে নিজেকে চরম দারিদ্র্য, শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে চাহিল? তারপর যেদিন সে বৃন্দাবনের কাছে যাইতে চাহিল সেদিনও একটা তুচ্ছ কারণে উভয়ের মতে মিলিল না বলিয়া তাহার যাওয়া হইল না। কুসুমের অভিমান, বৃন্দাবনের প্রত্যাখ্যান সব কিছুই একটা দুর্বল, নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যেন উভয়ের মধ্যে একটা অবিশ্বাস্য ব্যবধান রচনা করিয়াছে। কুসুম শেষ পর্যন্ত অবশ্য বৃন্দাবনের কাছে আসিল—ঘর বাঁধিবার জন্য নহে, ঘরের বাঁধন ছিঁড়িয়া পথে বাহির হইবার জন্য।

বৃন্দাবন চরিত্রটি লেখক গভীর আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন। বৃন্দাবন সকলের ভালো ভাবিয়াছে, সকলের ভালো করিয়াছে, কিন্তু বিনিময়ে সে কতটুকু পাইয়াছে? ভগবান যাহাদিগকে বড় করিয়া সৃষ্টি করেন তাহাদের মাথায় চিরকাল দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দেন। বৃন্দাবনও চিরদিন এই দুঃখের বোঝাই বহন করিয়াছে। সে স্ত্রীকে আনিতে যাইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রামের সকলের উপকার করিতে যাইয়া, সকলের অভিসম্পাত শুধু কুড়াইয়াছে, তাহার একান্ত স্নেহময়ী মাকে শোচনীয় ভাবে,

হারাইয়াছে এবং অবশেষে তাহাকে একমাত্র অবলম্বন চরণকেও মৃত্যুমুখে সঁপিয়া দিতে হইয়াছে। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং মহৎ বৈরাগ্য লইয়া সে সব আঘাত সহ্য করিয়াছে। চরণকে—তাহার একমাত্র ছেলেকে হারাইয়া সে সকল ছেলের মধ্যেই চরণকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। গভীরতম শোকের মধ্যেও সে সংকীর্ণ মায়ামোহের বন্ধন হইতে মুক্তির একটি আনন্দ উপভোগ করিয়াছে। সে খাঁটি বৈষ্ণব, সেজন্য ভগবানের পায়ে চরমতম দুঃখের দিনে একান্ত ভাবে সে আত্ম-নিবেদন করিয়াছে এবং অবশেষে সব কিছু ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলিটি মাত্র নিয়া বৈরাগ্যের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

'পণ্ডিত-মশাই'-য়ের মধ্যে কয়েকটি সু-অঙ্কিত চরিত্র রহিয়াছে। কুসুমের দাদা কুঞ্জ ভালোয়-মন্দয় মেশানো একটি উপভোগ্য বাস্তব চরিত্র। সে তাহার খেয়ালী ও রাগী বোনটিকে ভয় করে এবং ভালোও বাসে। সে বোকা ও ব্যক্তিত্বহীন, সেজন্য সে সহজেই অন্য লোকের দ্বারা চালিত হয়। তাহার গুরুত্ব ও মর্যাদাবোধ সকলের কাছেই হাস্যকর। বোনের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আবার বোন আত্মহত্যা করিয়াছে ভাবিয়া সে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিয়াছে। তাহার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া হাসি পায় আবার তাহার প্রতি সহানুভূতিও জাগে। বৃন্দাবনের মা এমন একটি চরিত্র পল্লীসমাজে যাঁহার তুলনা পাওয়া কঠিন। তিনি উদার, স্নেহশীল, সক্রিয়ভাবে পরহিতৈষী এবং ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার প্রতিমূর্তি। আর একটি গৌণ অথচ আকর্ষণীয় চরিত্র হইল ব্রজেশ্বরী। তাহার কথায় হুল কিন্তু অন্তরে মধু। একটি সহায়সম্বলহীনা মেয়ের প্রতি তাহার অহেতুক স্নেহ এক অপরূপ মাধুর্যে তাহার চরিত্রকে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

১৩২১ সালের 'সাহিত্য' পত্রে 'হরিচরণ' গল্পটি প্রকাশিত হইল। গল্পটি তাঁহার ভাগলপুরে থাকাকালীন সম্ভবত ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। 'বাল্যস্মৃতি'তে যেমন তিনি একটি মেসের ঠাকুরের কথা লিখিয়াছেন এ-গল্পেও তেমনি একটি গৃহভৃত্যের করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। গল্পটি খুবই ছোট এবং প্রাথমিক লেখার দোষত্রুটি ইহাতে বেশি পরিমাণে রহিয়াছে। হরিচরণের অন্তর্জীবনের কোন রূপ গল্পটির মধ্যে ফোটে নাই, সেজন্য চরিত্রটি এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও অবিকশিত হইয়া রহিয়াছে। হরিচরণের প্রতি দুর্গাদাসবাবুর আকস্মিক প্রচণ্ড ক্রোধ ও অমানুষিক প্রহার সবকিছুই অস্বাভাবিক ও আতিশয্যদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মদেশে বাস করিবার সময় শরৎচন্দ্র যেসব গল্প ও উপন্যাস লিখিতেলাগিলেন সেগুলি প্রথমত 'যমুনা'য় প্রকাশিত হইলেও তারপর নিয়মিতভাবে 'ভারতবর্ষে'ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিছুকাল ধরিয়া একই সঙ্গে 'যমুনা' ও 'ভারতবর্ষ' উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার লেখা বাহির হইতে থাকিল। 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সাহত তাঁহার গভীর ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, আবার 'ভারতবর্ষে'র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিল অতীত বন্ধুত্বের নিবিড় অন্তরঙ্গতা। সুতরাং কাহারও দাবী কম নহে। 'যমুনা'র উত্তরোত্তর উন্নতিবিধানের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করিয়াছিলেন, আবার অন্যদিকে 'ভারতবর্ষে'র প্রবলতর প্রভাব ও প্রতিপত্তি এবং লেখকদের প্রতি আর্থিক দাক্ষিণ্য। শরৎচন্দ্র কিছুকাল উভয় পত্রিকার প্রতিই সমান আনুকূল্য দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি 'যমুনা'র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন এবং 'ভারতবর্ষে'র সহিত একমাত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইলেন।

'ভারতবর্ষে'র সহিত শরৎচন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া ফণীন্দ্রনাথ পাল শঙ্কিত হইলেন এবং 'যমুনা'র সহিত শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক স্থায়ী করিবার জন্য 'যমুনা'র সম্পাদকরূপে শরৎচন্দ্রকে ঘোষণা করিলেন। ১৩২১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল, 'যমুনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে যমুনার সম্পাদন-কার্যে যোগদান করিলেন। যমুনার পাঠকগণের নিকটে শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত, অতএব পরিচিতির নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।'

পরবর্তী শ্রাবণ সংখ্যা হইতে 'যমুনা'র অন্যতম সম্পাদকরূপে শরৎচন্দ্রের নাম মুদ্রিত হইতে থাকে। 'চরিত্রহীন' ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র মাসে এবং ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ সালে যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া কয়েক মাস ছিলেন তখন তিনি 'ভারতবর্ষ' ও 'যমুনা' উভয় পত্রিকার অফিসেই যাতায়াত করিতেন, তবে 'যমুনা'-অফিসে আসা-যাওয়া ধীরে ধীরে কমিতে লাগিল। এ-সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, .....'প্রত্যহ আসতেন কলকাতায় ভারতবর্ষ অফিসে.. মাঝে মাঝে যমুনা অফিসেও আসতেন। তবে যমুনার আসরে আসা দিনে দিনে কমতে লাগল। ওদিক থেকে বাধা-নিষেধ উঠতো...সুস্পষ্ট ভাষায় নয়...পাঁচটা কাজের ছুতায় ভারতবর্ষ অফিসে তাঁকে আটক রাখা হতো। এবং ক্রমে

এমন হলো, ১৩২১ সালের যমুনায় তখন চরিত্রহীন মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে · চরিত্রহীন-এর শেষের অংশ তিনি মাসে মাসে লিখে ছাপতে দিতেন। এ-উপন্যাসের কপি দিতে এমন বিলম্ব হ'তে লাগলো যে সেজন্য যমুনার প্রকাশ হলো অনিয়মিত।' ফণীন্দ্র পালের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রকে নানাভাবে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সৌরীন্দ্রমোহনের ভাষায়, 'ফণীন্দ্র পালের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রকে এমন বোঝানো হয়েছিল যে, শরৎচন্দ্রের রচনা থেকে ফণীন্দ্র পাল পাচ্ছেন প্রচুর অর্থ এবং প্রতিপত্তি আর শরৎচন্দ্রকে যৎকিঞ্চিৎ লাভে পরিতৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ফার্ম থেকে তাঁর বই বেরুলে হু-হু ক'রে তার সংস্করণ কাটবে। ফণী পাল তো ঐ বড়দিদি ছাপিয়েছে··· কখানা বিক্রি করতে পারছে?'

এই সব প্ররোচনায় শরৎচন্দ্র এমন একটি কাজ করিয়াছিলেন যাহা নিতান্তই অন্যায ও অবৈধ। তিনি ফণীন্দ্র পালের অনুপস্থিতিতে একদিন 'যমুনা' অফিসে ঢুকিয়া আলমারী ভাঙ্গিয়া দুই-তিন শত 'বড়দিদি'র কপি বাহির করিলেন এবং মুটের মাথায় চাপাইয়া বইগুলি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে নিয়া তুলিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন পরদিন শরৎচন্দ্রকে এ-জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র অনুতপ্তচিত্তে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'একটা কথা সৌরীন··· শাস্ত্রে আছে দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী। যেসব লেখক অন্য কাজ করে না ..লেখা থেকেই যার জীবিকার সংস্থান তার মতো দুর্ভাগা জীব সত্যই নেই।'

শরৎচন্দ্র নিজের অন্যায বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু 'যমুনা'র সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক আর রহিল না। তিনি 'যমুনা' ত্যাগ করিবার পর ফণীন্দ্র পাল সুধীরচন্দ্র সরকার, অমল হোম প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহার পত্রিকা বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। 'বড়দিদি'র যে কপিগুলি শরৎচন্দ্র নিয়া গিয়াছিলেন উহাদের মূল্য বাবদ কোনো টাকা ফণীন্দ্র পাল পান নাই। কিংবা সেই টাকা তিনি দাবীও করেন নাই। অবশ্য 'যমুনা'র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইলেও ফণীন্দ্র পালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় ছিল। 'যমুনা'র মধ্য দিয়াই শরৎচন্দ্রের খ্যাতি বাংলাদেশে বহু বিস্তৃত হয়, সেজন্য তাঁহার সাহিত্য জীবনের আলোচনায় 'যমুনা' পত্রিকার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। শরৎচন্দ্র এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ইহার সর্ববিধ উন্নতিবিধানের যে সঙ্কল্প বার বার জানাইয়াছিলেন তাহা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই ইহা সত্য।

ফণীন্দ্র পাল তাঁহাকে বিশেষ কোন আর্থিক সাহায্য করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু স্নেহপ্রীতি ও আন্তরিকতা দ্বারা তিনি যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার ঋণ শোধ করিয়াছিলেন। 'যমুনা'র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পরে শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই তাঁহার গল্প ও উপন্যাস বাহির করিতেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি'—ফণীন্দ্র পাল প্রকাশ করেন। আর্থিক দুরবস্থার জন্য মাত্র দেড়শ টাকার জন্য 'বিরাজ বৌ'-এর কপিরাইট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের সব বইগুলি প্রকাশের অধিকার ছিল গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের, কিন্তু একবার টাকার খুব প্রয়োজন হওয়াতে তিনি 'চরিত্রহীন', 'নারীর মূল্য', 'কাশীনাথ', 'পরিণীতা' প্রভৃতি বইগুলির প্রথম সংস্করণের স্বত্ব পঁচিশ টাকা রয়্যালটির ভিত্তিতে এম. সি. সরকার কোম্পানীর সুধীরচন্দ্র সরকারকে দান করেন। তাঁহার অন্যান্য বইগুলি গুরুদাস লাইব্রেরী হইতেই প্রকাশিত হয়।

১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' তাঁহার 'আঁধারে আলো' প্রকাশিত হয়। একটি পতিতা নারীকে কেন্দ্র করিয়া এই গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। গল্প লেখার আগে শরৎচন্দ্র কয়েকখানি পত্রে টলস্টয়ের **Resurrection** বইখানির কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।[১] টলস্টয়ের উপন্যাসের ম্যাসলোভা চরিত্রটি শরৎচন্দ্রকে বিজলীর চরিত্র অঙ্কনে গভীর প্রেরণা জোগাইয়াছিল, এ-অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ব্রহ্মদেশে বাস করিবার সময় বহু পতিতা চরিত্রের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন। তাহাদের জীবনের নিষ্ফল ভালোবাসা, এবং অন্তহীন বেদনা ও দুর্ভাগ্য তিনি মর্ম দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি ভাগলপুরে থাকিতে 'দেবদাস' উপন্যাসে চন্দ্রমুখী চরিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন এবং বহুদিন পরে আবার রেঙ্গুনে বসিয়া তিনি বিজলী চরিত্র সৃষ্টি করিলেন। এই দুইটি চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত।

বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র সর্বপ্রথম সীমাহীন সহানুভূতি লইয়া পতিতাদের চরিত্র আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্বে দুই একটি স্থানে পতিতা চরিত্র দেখা গেলেও সেইসব স্থানে তাহারা সমাজের অপকারী, ঘৃণ্য

১। ১৩২০ সালে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'কাউন্ট টলস্টয়ের রিসরেকশন পড়েছ কি? **His Best Book** একটা সাধারণ বেশ্যাকে নিয়া।'

চরিত্ররূপেই চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের নারীত্বের মাধুর্য ও মহিমা শরৎচন্দ্রই প্রথম দেখাইলেন। রায়বাহাদুর যতীন সিংহ একদিন শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি বেশ্যাদের নিয়ে সাহিত্যে স্থান দিলেন কেন?' শরৎচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, 'আমি কেন ওদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছি? যেহেতু ওদের মধ্যেও আমি সাহিত্যের রসের সন্ধান পেয়েছি।'[১] বিশ্বের সকল সাহিত্যেই চিরকাল পতিতা চরিত্র একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পাইয়াছে। ব্যালজাক, মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতির ফরাসী সাহিত্যে, টলস্টয়, ডস্টয়ভস্কি প্রভৃতির রুশ সাহিত্যে অনেক অবিস্মরণীয় পতিতা চরিত্র রহিয়াছে। আলেকজাণ্ডার কুপরিন তাঁহার 'Yama—the Pit' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসে পতিতাজীবনের ভয়াবহ বাস্তবতার চিত্র আঁকিয়াছেন। বার্নার্ড শ তাঁহার 'Mr . Warren's Profession নামক নাটকে পতিতাবৃত্তির অর্থনৈতিক দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি বহু কথিত অভিযোগ এই যে, পতিতা পাইলেই তাহাকে তিনি সতী সাধ্বী বানাইয়া বসেন। শরৎচন্দ্র নিজে একস্থানে লিখিয়াছেন, 'হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনদিন যেন না এতবড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ ব'লে গণ্য করেচেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড এই অভিযোগ।'[২] পতিতাজীবনের কুৎসিত পরিবেশ, তাহার কদর্য ও কলুষিত বাস্তবতা শরৎচন্দ্র নিজের জীবনে যথেষ্ট দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যে তিনি সে-সব দেখান নাই। তাঁহার সীমাহীন দরদ ও সহানুভূতির রঙে তাহার চরিত্র রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে, সেজন্য সেই চরিত্রের রুক্ষ ও কালিমালিপ্ত বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া পডিয়াছে এবং তাহার আদর্শান্বিত, সুন্দর রূপই আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন তাহার জীবনে ভালোবাসার স্পর্শ আসে নাই ততদিন সে কদর্য দেহবিলাসিনী পতিতা নারী, কিন্তু যে মুহূর্তে ভালোবাসার পরশমণির পরশ তাহার হৃদয়ে লাগিয়াছে তখন তাহা সোনা হইয়া গিয়াছে।

১। বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন—শৈলেশ বিশী, (পৃঃ ১২৪-১২৫)
২। ৫৩ তম জন্মদিনের ভাষণ।

তখন সে আর বারাঙ্গনা নহে, কুলাঙ্গনার নিষ্ঠা, সংযম ও পবিত্রতায় সে তখন ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে।

'আঁধারে আলো'র অনভিজ্ঞ তরুণ নায়ক সত্যেন্দ্র নিত্যম নাথিনী অপরূপ সুন্দরী বিজলীকে দেখিয়া অনুরক্ত হইয়াছে এবং এই অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীকে ঘেরিয়া তাহার স্বপ্ন ও কল্পনাজাল বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ছলনাময়ী বারাবিলাসিনী তাহার সুনিপুণ ছলনার ফাঁদে এই সরল ও অবোধ যুবকটিকে ফেলিয়া পরম মজা উপভোগ করিয়াছে। পতিতা পরিবেশের নাচগান, রঙ্গরস ও মাতলামির মধ্যে যাইয়া সত্যেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে তাহার সব ধ্যান, কল্পনা দেবী ভাবিয়া যাহার পদে অর্পণ করিয়াছে সে দেবী নহে, ঘৃণিতা পতিতা মাত্র। মুহূর্ত মধ্যেই তাহার অন্ধ অনুরাগ এক সজাগ কঠিন বিরাগে রূপান্তরিত হইল। বিজলী অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে তাহাকে লইয়া অনেক ঠাট্টাতামাসা করিয়াছে। কিন্তু সত্যেন্দ্রের, বীর, সংযত ও অটল বিতৃষ্ণার প্রতিঘাতে তাহার সম্বিৎ হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটি সত্য তখন জাগ্রত হইয়া উঠিল, যে সত্য সম্বন্ধে সে নিজেও হয়তো সচেতন ছিল না। সে-সত্য হইল তাহার দলিত নারীত্বের গোপন অন্ধকারে লালিত অনাঘ্রাত পুষ্পের মত পবিত্র—তাহার ভালোবাসা। শরৎচন্দ্রের কথায়—'সে ভালবাসিয়াছে। যে ভালোবাসার একটা কথা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে। এই ভালোবাসার অমৃতচেতনায় যখন তাহার সমগ্র সত্তা ভরিয়া গেল, তখন সত্যেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তাহার কলুষিত দেহ হইতেই যেন এক অপাপবিদ্ধা শাশ্বতী নারীর অভ্যুত্থান হইল। সে বলিল, 'যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য ম'রে গেল বন্ধু।'

ইহার পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। বহুকাঙ্ক্ষিতা বিজলী বাইজী একাকিনী নিভৃত মন্দিরে তাহার ধ্যানের দেবতার আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছে। বাইজীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ভুলিবার জন্যই বোধ হয় সত্যেন্দ্র রাধারাণীকে বিবাহ করিয়াছে। রাধারাণীই বলিয়াছে, 'তোমাকে ভালবেসেছিলেন ব'লেই আমি তাঁকে পেয়েছি।' সত্যেন্দ্র কি বিজলীকে শুধু অপমান করিবার জন্যই ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ডাকিয়া আনিয়াছে? বোধ হয়, না। ভালোবাসা কখনও মরে না। রাধারাণীকে পাইয়াও বিজলীর প্রতি তাহার ভালোবাসা

যে মন হইতে একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে হয় না। বিজলীর সহিত সত্যেন্দ্রের দেখা হইল না, শেষ সুযোগও নষ্ট হইয়া গেল। বিজলী ও সত্যেন্দ্রের মধ্যে বিরহের এক অনন্ত আকাশ ঝিকিমিকি তারার আলো লইয়া চিরকালের জন্য বাঁচিয়া রহিল।

'মেজদিদি' ১৩২১ সালের কার্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মেজদিদি' 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'র সমপর্যায়ভুক্ত গল্প। অর্থাৎ এই গল্পের মধ্যেও বাৎসল্যরসের মাধুর্য ও বেদনাই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এই বাৎসল্যরসের ধারা সম্পর্কিত স্বজনের দিকে প্রবাহিত হয় নাই, নিঃসম্পর্কিত অনাত্মীয়ের প্রতিই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। সেজন্য ইহা এত মর্মস্পর্শী ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কেষ্ট কাদম্বিনীর ভাই হওয়া সত্ত্বেও দিদির নিকট হইতে সে কেবল অবর্ণনীয় অত্যাচারই পাইয়াছে, অথচ হেমাঙ্গিনীর কেহ না হইয়াও মেজদিদির কাছে সে অপরিসীম স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। বাইরের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহধারার এই যে পারস্পরিক বৈপরীত্য, ইহার মধ্যেই গল্পটির যত জটিলতা, যত মাধুর্য ও কারুণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাদম্বিনী ও হেমাঙ্গিনী—নারীচরিত্রের দুই বিপরীত দিক শরৎচন্দ্রের অসাধারণ সৃষ্টিকুশলী লেখনীর মুখে অতি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাদম্বিনীর ঘোর স্বার্থপরতা ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতা যেমন আমাদের তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে তেমনি হেমাঙ্গিনীর সুগভীর সহানুভূতি ও স্নেহশীলতা এক স্নিগ্ধ ও সপ্রশংস ভাব আমাদের অন্তরে জাগাইয়া তোলে। ছোট ছোট পরিস্থিতি রচনা করিয়া লেখক এই দুইটি চরিত্রকে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত করিয়াছেন। এই সংঘাতে কাদম্বিনী কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করিয়া যত কদর্য বাক্যই উচ্চারণ করুক না কেন, হেমাঙ্গিনীর সংযত ও সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলি সেই সব বাক্যের সকল বিষ নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিয়াছে। হেমাঙ্গিনী চরিত্রের মধ্যে স্নেহকোমলতা ও আত্মমর্যাদাবোধের সমন্বয় ঘটিয়াছে। পুত্রকন্যা ও সংসার থাকা সত্ত্বেও এক অভাগা, কাঙাল ছেলের জন্য তাহার অপরিমেয় স্নেহধারা যেমন সকল বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তেমনি তাহার জা ও স্বামীর সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে তাহার মানসিক দৃঢ়তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা নিঃসংশয়িত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার স্নেহশীলতার সঙ্গে এই সক্রিয়

ও অনমনীয় মনোভাব মুক্ত হইয়াছে বলিয়াই শেষ পর্যন্ত সে নিরাশ্রয় কেষ্টকে তাহার স্নেহাশ্রয়ে আনিতে পারিয়াছে।

আলোচ্য গল্পটির মধ্যে স্নেহের পরস্পরমুখী ক্রিয়ার মধ্য দিয়া কাহিনীর সরস জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেষ্টর প্রতি করুণা বশত যেমন হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, তেমনি হেমাঙ্গিনীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা-বোধই ধীরে ধীরে কেষ্টর চিত্তে এক অদম্য অথচ প্রকাশভীরু ভালোবাসায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর বহু স্নেহের পাত্র ছিল, সেজন্য কেষ্টর প্রতি স্নেহের মধ্যে তাহার উদারতা ও মহত্ত্বেরই প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু মাতৃহীন, নিঃসহায় কেষ্ট কাদম্বিনীর নির্মম আশ্রয়ে আসিয়া যখন স্নেহশূন্যতার অমানুষী আঘাতই শুধু পাইতেছিল তখন তাহার পীড়িত কাতর বালকহৃদয় এক বিন্দু স্নেহের জন্য মর্মান্তিক তৃষ্ণা বোধ করিতেছিল! হেমাঙ্গিনীর কাছে অপ্রত্যাশিত ও অপরিমিত স্নেহ লাভ করিয়া সে দুর্নিবার আকর্ষণে তাহার মেজদিদির দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। ভগবান মানুষকে ছোট করিয়া সৃষ্টি করিয়াও তাহার ভিতরে বড় অন্তর দিতে ভুল করেন না। কেষ্ট সংসারের হয়তো একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ একটি ছেলে, কিন্তু তবুও সে অপর সকল বড় ও উঁচু লোকের মতই ভালোবাসিতে জানে, এবং বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই জানে। তাহার সন্ত্রস্ত ও সদাসঙ্কুচিত চিত্তের ভালোবাসা দুর্নিবার কুণ্ঠার বাধা অতিক্রম করিয়া কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার অত্যাচারের ভয় উপেক্ষা করিয়া মেজদিদির কাছে ছুটিয়া আসিবার প্রবল আগ্রহ, দূর হইতে অসুস্থ মেজদিদিকে দেখিবার জন্য কাতর মিনতি, পূজার নির্মাল্য আনিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা এবং এই কাজের জন্য বিনা প্রতিবাদে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়া এই অনাথ ও অনাদৃত ছেলেটির অপরিসীম ভালোবাসার মাধুর্য ও কারুণ্য শরৎচন্দ্র অশ্রুসিক্ত লেখনী দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

'দর্পচূর্ণ' গল্পটি ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গল্পটির সহিত বহু পূর্বে লিখিত 'কাশীনাথ' গল্পটির ভাবসাদৃশ্য রহিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য এবং অবশেষে উভয়ের পুনর্মিলন, এই ঘটনাই গল্পটির মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কাশীনাথের ন্যায় এই গল্পটির নায়ক নরেন্দ্রও শান্ত, নিরীহ, অতিশয় সহিষ্ণু এবং সতত ক্ষমাশীল এবং কাশীনাথের স্ত্রী কমলার ন্যায়

এই গল্পের নায়িকা ইন্দুও ধনগর্বিণী ও খরভাষিণী হৃদয়হীনা স্ত্রী, স্বামীর প্রতি ইন্দুর অত্যাচারের মাত্রা প্রায় অমানুষিকতার স্তরে পৌঁছিয়াছে।

ধনগর্ব, পিতৃ ঐশ্বর্যবোধ এবং এক অসঙ্গত ও অতিশয়িত আত্মমর্যাদাচেতনা স্ত্রীকে কিভাবে স্বামীর কাছ হইতে সরাইয়া আনে এই গল্পটির মধ্যে লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। যে শরৎচন্দ্র প্রচলিত সতীত্বের ধারণায় আস্থাশীল ছিলেন না, যিনি বিবাহিত নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিই অধিকতর শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তিনি আবার দাম্পত্যজীবনের চিরাচরিত আদর্শ এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সর্বময় আনুগত্য কিভাবে সমর্থন করিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্রের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ শক্তি যেন সহ-অবস্থান করিয়া রহিয়াছে। এক শক্তি রক্ষণের আর এক শক্তি ধ্বংসের। প্রাচীন ও বদ্ধমূল নীতি ও আদর্শ তিনি এক কঠিন হাতে আঘাত করিয়া অপর মমতাশিথিল হাতে যেন ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছেন। তবে শরৎচন্দ্রকে যথার্থভাবে বুঝিতে ও বিচার করিতে হইলে তাঁহার পরিণত বয়সের বৃহৎ উপন্যাসগুলির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। ভাগলপুর ও রেঙ্গুনে থাকিতে তিনি যে সব ছোট ও বড় গল্প লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে তাঁহার দ্বিধাবিভক্ত সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামীর প্রতি ইন্দুর একান্ত নিষ্ঠুর আচরণ অনেক সময়েই অকারণ, অনাবশ্যক এবং আতিশয্যপূর্ণ মনে হইয়াছে। স্বামীর নিকট হইতে কোন বাধা নিষেধ ও রূঢ় ব্যবহার না পাওয়া সত্ত্বেও তাহার অতখানি উষ্মা, ক্রোধ উত্তেজনার কারণ কোথায় তাহা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। আসলে ইন্দুমতীর ভিতরে অভিমান ও অহঙ্কারের এমন এক অশুভ আগুনের জ্বালা ছিল যাহা নিজেকে অহরহ দগ্ধ করিয়াছে এবং অপরকেও সর্বদা জ্বালাইয়াছে। মাঝে মাঝে সে তাহার শান্ত বিবেচনা ও সজাগ কর্তব্যবোধ দ্বারা ইহাকে নির্বাপিত করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। এই অন্তরজ্বালা তাহাকে অশান্তভাবে এখানে ওখানে ছুটাইয়াছে, কিন্তু কোন নিশ্চিন্ত জয়ের লক্ষ্যে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে নাই। বিবাহিত নারীর যতগুলি দৃষ্টান্ত সে তাহার আশেপাশে দেখিয়াছে সবগুলিই তাহার বিপরীতধর্মী। আদর্শের দিক দিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইল তাহার সর্বাধিক প্রিয় সখী বিমলা। বিমলার কাছে সে হার মানে নাই, কিন্তু হার মানিতে হইল তাহার সকল অহঙ্কারের মূল উৎস পিত্রালয়ে আসিয়া। পিত্রালয়ের যে

ঐশ্বর্যের গর্বে স্বামীর প্রেমকে সে অবহেলা করিয়াছে. পিত্রালয়ে আসিয়া সেই প্রেমকেই নারীর সর্বাপেক্ষা বড় ঐশ্বর্য বলিয়া সে চিনিতে পারিল। তাহার সকল দর্প চূর্ণ করিয়া সেই ঐশ্বর্যের পদতলে নিজেকে সে বিকাইয়া দিল। এই গল্পের নায়ক নরেন্দ্র একটি বিবর্ণ, নিষ্ক্রিয় ও পৌরুষহীন পুরুষ চরিত্র। নারীকে জয় করিতে হইলে ক্লীবের মত বশ্যতা না দেখাইয়া বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আঘাতও যে মাঝে মাঝে প্রয়োজন তাহা এই নায়ক চরিত্রের জানা নাই। সে কারণে সে যতই সহিষ্ণুতা ও দুর্বলতা দেখাইয়াছে ততই ইন্দু শুধু তাহার নিক ট হইতে অবজ্ঞায় বিরক্তিতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইন্দুর দর্প চূর্ণ হইল অন্য কতকগুলি ঘটনার প্রভাবে, তাহার স্বামীর কোন সক্রিয় আচরণের ফলে নহে। সেজন্য নরেন্দ্র ইন্দুকে ফিরিয়া পাইল মাত্র, তাহাকে জয়ের দ্বারা লাভ করিতে পারিল না।

'পল্লীসমাজ' ১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বিতর্কিত উপন্যাস-গুলির মধ্যে 'পল্লীসমাজ' অন্যতম। ইহার জনপ্রিয়তার কারণ, সমাজচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও একান্ত সত্য বাস্তবতা, কৌতুক ও কারুণ্যের বিচিত্র উপাদানের কুশলী মিশ্রণ এবং রমা ও রমেশের আকর্ষণ-বিকর্ষণ জড়িত রহস্যজটিল গভীর ও ট্র্যাজিক ভালোবাসার বর্ণনা এবং ইহা লইয়া বিতর্কের কারণ, অন্ধ, অনুদার ও কলুষিত সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের সুস্পষ্ট ও প্রবল বিরূপতা এবং সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থনজ্ঞাপন। এই উপন্যাসটির প্রতি লেখকের নিজস্ব মমত্বও কম ছিল না। রেঙ্গুন হইতে তিনি ১০-৩-১৬ তারিখে লেখা একটি পত্রে মুরলীধর বসুকে লিখিয়াছিলেন, 'পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি স্মরণ-শক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরি বইকি! তবে কিনা পাড়া-গাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলিই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলো চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা সহরের বড়লোককে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।'

'সাহিত্য ও নীতি' নামক প্রবন্ধে পল্লীসমাজের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের

ধিক্কারের কথা উল্লেখ করিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, '…শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার পল্লীসমাজের বিধবা রমাকে তাঁর সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা পুস্তকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ। এ-ধিক্কার art-এর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করবার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।' যতীন্দ্রমোহন সিংহের উক্তি শরৎচন্দ্র 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামক প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং আধুনিক সাহিত্যের পক্ষ হইতে রমেশের প্রতি রমার ভালোবাসার কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন।

'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামক প্রবন্ধে 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য শরৎচন্দ্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজসংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে ক'রে আপনারা অপরাধ নেবেন না। পল্লীসমাজ ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালেই কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এতবড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ-জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হ'তে

পারে কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।'

পল্লীসমাজের যে চিত্র শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে অঙ্কন করিলেন তাহার বাস্তব রূপ তিনি কোথায় দেখিয়াছিলেন সে-প্রশ্ন মনে আসিতে পারে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের সমাজচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুব সামান্যই ছিল। শৈশবের দুই তিন বৎসর বাদ দিলে কৈশোরের মাত্র তিনটি বৎসর তিনি দেবানন্দপুর গ্রামে কাটাইয়াছিলেন। রেঙ্গুন যাত্রার পূর্বে তিনি দুই বৎসর কলিকাতায় ছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাম সম্বন্ধে তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তাঁহার হয় নাই। রেঙ্গুন রওনা হওয়ার পূর্বে উনিশটি বৎসর তিনি ভাগলপুরে অতিবাহিত করেন। সুতরাং রেঙ্গুনে বসিয়া তিনি যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার নিজের দেখা ভাগলপুর সমাজের রূপ যে অনেকখানি মিশিয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' নামক নানা তথ্যপূর্ণ গ্রন্থে একাধিক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভাগলপুর বাঙালী সমাজের রূপই শরৎচন্দ্র তাঁহার গল্প-উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মালমশলাগুলিও যেন এই সময়ই সঞ্চয় করে নিচ্ছিলেন। সামাজিক দলাদলি ঝগড়াবিবাদের প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্র এমন কৌশলে তাঁর লেখায় চিত্রিত করেছেন যাতে স্বভাবতই মনে হয় যে তিনি এ-সকল বিষয়ে কেবল দ্রষ্টাই ছিলেন না ব্যক্তিগতভাবে পীড়িত হয়েছিলেন এবং অত্যাচারও ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে।' সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের ফতোয়ায় তিনি সমাজপতিত হন। শিবচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় শ্যালক কান্তিচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যু হইলে শরৎচন্দ্র কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাঁহার দাহকার্য সম্পন্ন করেন। ইহাতে গোঁড়া সমাজপতির দল এতই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, একবার গাঙ্গুলীবাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজার সময় তিনি পরিবেষণ করিতে শুরু করিলে তাঁহারা আহার করিতে অস্বীকৃত হন। সুরেন্দ্রনাথের সেজো জ্যাঠামহাশয় মহেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে পরিবেষণ করা হইতে নিরস্ত করেন। অথচ এই মহেন্দ্রনাথই যখন মুখে রক্ত উঠিবার ফলে মারা গেলেন তখন গোঁড়া

ব্রাহ্মণের দল প্রায়শ্চিত্ত না করিলে শবদাহ করা চলিবে না, এই হুকুম দিলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ 'পল্লীসমাজে'র দ্বারিকচক্রবর্তীর মৃত্যুর ঘটনার সহিত উপরিউক্ত ঘটনার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাগলপুরের বাঙালী সমাজের পরিচয় দিতে যাইয়া সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'সেকালে ভাগলপুরের বাঙালী সম্প্রদায় বোধ করি বিহারের অন্যান্য সহরের তুলনায় একটু বেশী রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত আচার বিচার, বিধিব্যবস্থা একটু কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। যেখানে তাহার ব্যভিচার ঘটিত, সেখানে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন।

ইংরাজি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন চিন্তা এবং তাহার আনুষঙ্গিক আচার ব্যবহার ক্রমেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল। পরে যে সকল দলাদলি, বিরোধ-বিসংবাদ ঘটিল—ইহাই বোধ করি তাহার অন্যতম কারণ।'

সুরেন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন, 'রক্ষণশীলদলের দলপতি ছিলেন আমাদের বাড়ীর কর্তা।' এই রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া শরৎচন্দ্র অন্ধ যুক্তিহীন ও নিষ্ঠুর আচারবিচারের পীড়ন তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্রোহী চিত্ত ভিতরে ভিতরে প্রবল বিক্ষোভে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ছেলে বয়স থেকেই শরৎচন্দ্রের আইন-কানুন ভাঙার মধ্যে এক আনন্দ ছিল। গোঁড়া দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথাবার্তা তাঁর কানে এসে পৌঁছত এবং তাঁর বিদ্রোহী মনে সাড়া জাগত।' গাঙ্গুলী পরিবারে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে তাঁহার বিদ্রোহী মন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত এবং ইহার ফলে তিনি কম নিগ্রহ ভোগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার আসল বিদ্রোহ প্রকাশ পাইল সাহিত্যক্ষেত্রে—মনের সঞ্চিত বহু অভিজ্ঞতা, বহু প্রতিবাদ যখন অনবদ্য শিল্পরূপের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্র বাংলার সমাজ-জীবনকে অত্যন্ত গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাঁহার অনেক গল্প-উপন্যাসে। 'পণ্ডিতমশাই', 'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজের বাস্তব সত্যরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও ইহাদের কথা মনে রাখিয়াও 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসটিকে তাঁহার সর্বাপেক্ষা সমাজসচেতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এ-গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই লেখকের সমাজচিত্র পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য গল্প-উপন্যাসে সমাজের পরিবেশ ও প্রভাব বর্ণিত হইলেও 'পল্লী-সমাজে'র ন্যায় শিল্পচেতনা অপেক্ষা সমাজচেতনার প্রাধান্য আর কোথাও দেখা যায় নাই।

আলোচ্য উপন্যাসে সমাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার তাত্ত্বিক আলোচনা, কাহিনী-বিচ্ছিন্ন অনেক তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ এত বেশি স্থান জুড়িয়া আছে যে ইহাতে শিল্পী শরৎচন্দ্র অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্রের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রসসন্ধানী পাঠককে এই উপন্যাসে রমা ও রমেশের জটিল মনস্তত্ত্বপূর্ণ কাহিনী অপেক্ষা নীরস সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার আতিশয্যে মাঝে মাঝে যে পীড়িত হইতে হইবে তাহাও সত্য। জ্যাঠাইমা ও রমেশের কথাবার্তা অনেক সময় যে পাঠকের পক্ষে একটু ক্লান্তিকর ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু কাহিনীর মধ্যে সমাজতত্ত্বের এই আপেক্ষিক প্রাধান্যের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের সামাজিক মতামতের একটি স্পষ্ট রূপ ইহাতে ধরা পড়িয়াছে। তিনি এখানে শিল্পের দাবী মুখ্য ভাবিয়া তাঁহার মত ও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখিতে চান নাই। নানাপ্রকার টীকাটিপ্পনী, মন্তব্য ও দুঃখময় উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া অতি স্পষ্টভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন, 'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হ'য়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না।'[১] 'পল্লী-সমাজ'-এ রমা ও রমেশের ভালোবাসা ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়াই যে শরৎচন্দ্র সমাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন তাহা নহে, নর-নারীর ভালোবাসা ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়েও যে বিধিনিষেধবদ্ধ অচল ও নির্দয় সমাজের অনিষ্টকর দৌরাত্ম্য চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য তিনি সমাজের সামগ্রিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। বহির্বিমুখ কূপমণ্ডুকতা বর্ণবিদ্বেষ, বৈষয়িক দলাদলি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কৃষকদের দুর্দশা প্রভৃতি নানা সামাজিক সমস্যা এই উপন্যাসে আলোচিত হইয়াছে। শুধু কেবল সমস্যা

১। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি।

নহে তাহার প্রতিকারের পথও লেখক নানাভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতপ্রায় সমাজের কঙ্কালমূর্তি তিনি দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবান, স্বাস্থ্যবান, ও সু-উজ্জ্বল রূপও তিনি আশা করিয়াছেন। তাঁহার আশা ও আদর্শের ধ্যানমূর্তি হইল রমেশ, যে তাহার সবল, সতেজ ও সক্রিয় দেহ ও মন লইয়া মুমূর্ষু সমাজকে প্রাণরসে চেতনায়িত করিতে আসিয়াছে। জড়ত্বকে আঘাত করিতে গেলে জড়ত্বের নিষ্ঠুর প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে, ইহার ফলে অনেক কিছু হারাইতে হইবে, অনেক দুঃখ পাইতে হইবে, তথাপি পরাজয় স্বীকার করা চলিবে না। রমেশও পরাজয় স্বীকার করে নাই, এবং শরৎচন্দ্রও তাহা স্বীকার করেন নাই। বর্তমান অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যৎ আকাশের সুনিশ্চিত আলোর শিখা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে।

'পল্লী-সমাজ'-এ সমাজের যে চিত্রটি শরৎচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগেকার গ্রামের যে পরিবেশ এখানে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন আজিকার গ্রাম্য-পরিবেশের সহিত তাহার সামান্য মিলই চোখে পড়িবে। এই পঞ্চাশ বছরে সমাজ অতিক্রত অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে সমাজের চিত্রটি শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজ। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার প্রভৃতি হইলেন সেই সমাজের কর্তা। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা তখনও বলবৎ ছিল বলিয়া ভূম্যধিকারীর প্রাধান্যই তখন সমাজের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। চাকরীজীবী মানুষের যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জন্মায় এবং শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ণকৌলীন্যের লোপ ও অর্থকৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হয় সে সব এই উপন্যাসে বর্ণিত সমাজের মধ্যে দেখা যায় নাই। গ্রামের লোকের জীবনধারা সম্পূর্ণ গ্রামের মধ্যেই তখন সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া গ্রামের শাসন উপেক্ষা করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। মুষ্টিমেয় বর্ণকুলীন ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর হাতে সেই সমাজের ভার ন্যস্ত ছিল বলিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশি ও উৎপীড়ন বিনা বাধায় যথেচ্ছভাবে সকলের উপরে প্রযুক্ত হইত। তাহারা নিজেরাই শিক্ষাদীক্ষা ও ধনসম্পদে বঞ্চিত ছিল বলিয়া তাহাদের হস্তগত সামান্য সামাজিক ক্ষমতাটুকু প্রয়োগে তাহাদের এতখানি উগ্র উৎসাহ ও নিষ্ঠুর পীড়ন-প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইত। ধর্মদাস, দীনু ভট্টাচার্য, বাঁড়ুয্যে মশাই প্রভৃতি দরিদ্র, পরপ্রসাদভোগী ব্রাহ্মণ, অথচ ইঁহারাও সমাজের শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যখন কোন

সচল ও প্রবল প্রাণ-শক্তি সমাজের ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় তখন জীর্ণ ও জড় সমাজের মধ্যে আত্মঘাতী বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং প্রভাসতীর্থে বিবদমান যাদবগণের ন্যায় এই সামাজিক জড়শক্তিগুলিও পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়া বসে। 'পল্লী-সমাজ'-এ রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজের তথাকথিত সম্মানিত ব্যক্তিদের লজ্জাকর ও কুৎসিত কলহবিবাদের একান্ত বাস্তব চিত্র লেখক তুলিয়া ধরিয়াছেন। মানুষের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অধোগতি তখন দেখা যায় যখন সে তাহার শুভ ও কল্যাণশক্তির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়। এই অধোগতিই পল্লীসমাজের মধ্যে দেখা গিয়াছে। যে রমেশ সব কিছু ত্যাগ করিয়া তাহার সর্বস্ব পণ করিয়া সমাজের মুক্তি দিতে আসিয়াছে তাহাকেই সমাজের সম্মিলিত মূঢ় শক্তি সর্বপ্রকারে বাধা দিয়াছে। যে সমাজে নীচ, স্বার্থপর এবং ঘোর অনিষ্টান্বেষী বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এবং পরের উপকার করিতে আসিয়া রমেশের ন্যায় মহাপ্রাণ যুবককে যেখানে জেলে যাইতে হয় সেই সমাজ রসাতলে যাইবে না তো কে যাইবে?

সমাজের নীচতা, ভণ্ডামি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি শরৎচন্দ্র তুলিয়া ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে অভাব, বঞ্চনা ও বেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। ধর্মদাসের আত্মীয়তার আতিশয্য, দীনুর অপরিমিত লোভ, বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের সুচতুর প্রবঞ্চনাকৌশল সব কিছুর মূলে রহিয়াছে তাহাদের দুর্বিষহ দারিদ্র্য। তাহাদের বাহ্য আচরণের মধ্যে অন্যায় ও অসঙ্গত ভাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যেও যে একটা কারুণ্যের দিক রহিয়াছে শরৎচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষগুলি ন্যায়, ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পথ হইতে একেবারে নির্বাসিত হইলেও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলি সেই পথ যে কিছুটা আঁকড়াইয়া রহিয়াছে অপক্ষপাতী ও সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া শরৎচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। গ্রামের 'ছোটলোক' চাষাভুষা ও মুসলমানেরা কর্তাদের মত নীচ ও নেমকহারাম হইতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে একতা ও ধর্মজ্ঞান আছে। রমেশকে তাহারা আপনার করিয়া লইয়াছে এবং তাহারই নির্দেশে তাহারা চালিত হইয়াছে। সমাজের প্রাণশক্তি কিছুটা যে ইহাদের মধ্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন।

সমাজ-সমস্যার প্রতিকারের কি কোন পথ শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন?

রমেশ ও জ্যাঠাইমার কথোপকথন ও লেখকের নানা প্রকার মন্তব্য হইতে তাঁহার নির্দেশিত পথ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাইতে পারে। সমাজের মূঢ়তা ও কুসংস্কারের মূলে রহিয়াছে সর্বব্যাপী অশিক্ষা। 'পণ্ডিত মশাই'-এর মধ্যে শরৎচন্দ্র এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এই উপন্যাসের মধ্যে পুনরায় একই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সেজন্য বৃন্দাবনের মত রমেশও গ্রামে শিক্ষা প্রচারের দিকে এতখানি নজর দিয়াছে। শরৎচন্দ্র জাতিগত বৈষম্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া কোন জাতিহীন, শ্রেণীহীন সমাজের বৈপ্লবিক আদর্শ ব্যক্ত করেন নাই। কিন্তু যে সজীব, সক্রিয় ও সর্বাত্মক ধর্মবোধ পারস্পরিক সদিচ্ছা ও কল্যাণকর্মে সমাজের সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তাহাকেই জাগ্রত করিয়া তুলিবার কথা বলিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা সম্বন্ধেও তিনি কিছু ইঙ্গিত করিয়াছেন। রমেশ যখন বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাহার বিরাট মন ও বলিষ্ঠ বাহু লইয়া গ্রামের সেবা করিতে আসিল তখন সে তাহার সকল সদিচ্ছা ও শুভ প্রয়াস সত্ত্বেও গ্রামের সর্বসাধারণের সহিত এক হইতে পারিল না, সে যেন অনেক উঁচুতে সকলের নাগালের বাহিরে রহিয়া গেল। কিন্তু জেল হইতে ফিরিবার পর সমাজের নীচতা ও অকৃতজ্ঞতার আঘাত যেন তাহাকে অনেকটা নীচুতে নামাইয়া সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিল। এমনি ভাবে ভাগ্য মন্দয় সাধারণ মানুষের সমান পর্যায়ে আসতে পারলেই তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করা যায় এবং বোধ হয় তাহাদের যথার্থ উপকার করাও তখন সম্ভব হয়।

'পল্লী-সমাজ'-এর মধ্যে রমা ও রমেশের সমাজানানবদ্ধ প্রণয় সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক ও প্রতিবাদ সমসাময়িক সমাজে উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু এই প্রণয়-কাহিনী বর্ণনায় শরৎচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের যত সহানুভূতি এবং লেখনীর যত শিল্পসুষমা সব প্রয়োগ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 'বড়দিদি', 'পথনির্দেশ' প্রভৃতি বইতে তিনি বিধবা নারীর ভালোবাসার চিত্র আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সব বইয়ে বর্ণিত ভালোবাসা অস্ফুট, প্রচ্ছন্ন এবং সংস্কারের ভারে পীড়িত। 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে অবশ্য বিধবা নারীর তীব্র আবেগ ও বেদনায় আলোড়িত ভালোবাসার রূপ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'পল্লী-সমাজে'র পূর্বে 'চরিত্রহীন' সম্পূর্ণভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং 'পল্লী-সমাজে'র মধ্যেই সর্বপ্রথম বিধবা নারীর ভালোবাসা তাহার সকল বেদনা, বিক্ষোভ ও অন্তহীন মাধুর্য লইয়া সার্থক আত্মপ্রকাশ করিল। শরৎচন্দ্র বিধবা নারী

বিশেষ করিয়া রোহিণীর প্রতি যে বঙ্কিমচন্দ্র অবিচার করিয়াছেন তাহা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, শরৎচন্দ্রও তো বিধবার পূর্ণ সুখ ও শান্তির পথ দেখাইতে পারেন নাই। রমার ব্যর্থ জীবনও তো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই রহিয়া গেল। শরৎচন্দ্র যদি রমা ও রমেশের বিবাহ দিতেন তাহা হইলে তিনি সংস্কারকের কাজ করিতেন বটে, কিন্তু শিল্পীর কাজ করিতেন না। রমা ও রমেশের ভালোবাসার ব্যর্থতা দেখাইয়া তিনি পাঠকের মনে যে বেদনা ও সমাজের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার শিল্প ও সমাজ-বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যে সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে রমা ও রমেশের এত বড় ভালোবাসা নিষ্ফল হইয়া গেল, সে সমাজের মূল্য কোথায়? রমেশের মত মহাপ্রাণ সমাজসেবী এবং রমার মত বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীর যদি মিলন ঘটিত তাহা হইলে উভয়ের সম্মিলিত ইচ্ছা ও কাজে সমাজ কতখানি উপকৃত হইত। কিন্তু তাহাদের জীবন বিচ্ছিন্ন ও অসুখী করিয়া দিয়া সমাজের এমন কি লাভ হইল? এ-প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের, এ প্রশ্ন সকল বিক্ষুব্ধ ও বেদনাহত পাঠকের।

রমা ও রমেশের প্রেমের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র জটিল মনস্তত্ত্ব ও কার্যকারণের অনির্দেশ্য বিপর্যয় দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। এই প্রেম সরল ও প্রত্যাশিত পথে অগ্রসর হয় নাই, ইহা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে সংক্ষুব্ধ এবং অন্তরের অনুভূতি ও বাহিরের আচরণের বৈপরীত্যে জটিল ও চমকপ্রদ। অবশ্য রমেশের দিক দিয়া প্রেমের জটিলতা তেমন বেশি দেখা যায় নাই। ছোটবেলায় যাহাকে সে ভালোবাসিয়াছিল তাহাকে এখনও সে ভুলিতে পারে নাই। রমা তাহার কাছে এখনও 'রাণী'। রমার আত্মীয়স্বজনের কাছে নিরবচ্ছিন্ন দুর্ব্যবহার এবং রমার কাছে আঘাতের পর আঘাত সে পাইয়াছে, কিন্তু তবুও সেই ভালোবাসা এক নিরন্তর যাতনাদায়ক কাঁটার মতই তাহার অন্তরে বাসা বাঁধিয়া আছে। শুধু কোল তারকেশ্বরের একটি দিনে সে রমাকে পরিতৃপ্ত চিত্তে বড় কাছে পাইয়াছিল। সেই দিনটি অনেকগুলি কণ্টকক্ষত দিনের মধ্যে যেন একটি গোলাপরঙীন অবিস্মরণীয় দিন। রমা তাহার নিভৃত স্বপ্ন বারবার আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহার বলিষ্ঠ বক্ষের বিপুল উদ্দীপনা নিষ্ঠুর আঘাতে দমাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তবুও এই যাতনা-দায়িনী নারীটি যখনই তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সকল রাগ অভিমান অনুরাগের মধুঝঙ্কারে তাহার অন্তরবীণাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

যে নারী তাহাকে বহু বাধা, বহু আঘাত দিয়াছে সে যখন তাহার কাছ হইতে বিদায় লইল তখন তাহার সকল উৎসাহ, সকল কর্মশক্তি যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং রমাবিহীন জগতের সব আলো তাহার চোখে মুহূর্তের মধ্যে নিভিয়া আসিল। রমেশের অন্তরে ও বাহিরে এই যে অনবচ্ছিন্ন ও অপরিমেয় প্রেম আমরা দেখিয়াছি রমার মধ্যে কিন্তু সেরূপ আমরা দেখি নাই। এ-কথা সত্য যে, রমেশের প্রতি রমার ভালোবাসা চিরস্থির ও সুগভীর হইয়াই তাহার সমগ্র অন্তর জুড়িয়া আছে এবং তাহাব এই গোপন ও নিষিদ্ধ ভালোবাসার বেদনা ও জালা তাহাকে একাকী নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার আচরণের মধ্যে তাহার হৃদয়েব সঙ্গত প্রতিফলন আমরা সব সময়ে দেখি নাই। আসলে রমাব ভিতবে দুই সত্তার অস্তিত্ব বহিয়াছে, একটি হইল জমিদাব-নন্দিনী বৈষয়িক সত্তা, আর একটি হইল তাহার চিরন্তনী নারী সত্তা। তাহার বৈষয়িক সত্তা বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর সহিত একই সূত্রে গ্রথিত, সে নিজের বৈষয়িক স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ এবং রমেশকে গ্রামের অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদী লোকের মতই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে কবে এবং তাহাকে জব্দ ও অপদস্থ করিবার কোন সুযোগই সে ছাড়িয়া দেয় না। সে রমেশের বিরুদ্ধে লাঠিয়াল নিয়োগ করিয়াছে এবং আদালতে রমেশের বিরুদ্ধে এমন ভাবে সাক্ষী দিয়াছে যাহাতে রমেশকে জেলে পর্যন্ত যাইতে হইয়াছে। রমা যদি সত্যই রমেশকে গভীর ভাবে ভালোবাসিয়া থাকে তবে রমেশের এত বড ক্ষতি নারী হইয়া সে কিভাবে করিল? যে রমেশ শুধু তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, যে কোনদিন কোন ক্ষতি তাহার কবে নাই, তাহাব প্রতি রমার এরূপ আচরণ অত্যন্ত অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য মনে হয়। রমা রমেশকে তাহার নিজের গ্রাম হইতে, তাহার আরব্ধ কাজের জগৎ হইতে দূরে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে, ইহাও তাহার অসঙ্গত আবদার বলিয়াই বোধ হয়। হয়তো রমা সমাজের ভয়ে রমেশের বিরুদ্ধে এ-সব কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তথাপি রমেশের প্রতি তাহার আচরণ সমর্থন করা চলে না। কিন্তু রমার এই বৈষয়িক ও সমাজ-অনুগত সত্তা তাহার বাহ্য সত্তা মাত্র। এই সত্তার গভীরে তাহার আসল সত্তাটি আছে, যে-সত্তা তাহার বাহ্য সত্তার প্রতিবাদ। এই সত্তাটি তাহার বিড়ম্বিত বৈধব্য-জীবনের মধ্যেও অতিশয় গোপনে তাহার ভালোবাসা লালন করিয়াছে। তারকেশ্বরে তাহার সেই বহু-কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে প্রাণের সাধ মিটাইয়া সযত্নে খাওয়াইয়াছে, তাহার নিয়োজিত

আকবর লাঠিয়ালের পরাজয়ে গ্লানি অপেক্ষা গৌরব সে বেশি বোধ করিয়াছে। পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করিয়াছে শুনিয়া সে রমেশের নিরাপত্তার জন্ম ভাবিয়া আকুল হইয়াছে এবং তাহার এই ভালোবাসার অধিকারেই বহুলোকের মধ্যে আসিয়া ভৈরব আচাৰ্যকে রমেশের ভয়ঙ্কর ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং অবশেষে গ্রামের সকল নিন্দা ও অপযশ মাথায় লইয়া তাহার ভালোবাসার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ম দূর তীর্থস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তাহার এই বাহ্য ও আন্তর সত্তার দ্বন্দ্বেই তাহার চরিত্রটি এত জটিল, দুর্বোধ ও রহস্যঘন হইয়া উঠিয়াছে। কাজে ও আচরণে রমেশের প্রতি বিরোধিতা এবং মানসিক আবেগ-অনুভূতিতে তাহারই প্রতি প্রবল আকর্ষণ—এই দ্বন্দ্বজটিল রূপই রমাচরিত্রের মধ্যে লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যে মুহূর্তে রমা রমেশের শত্রুতায় প্রবৃত্ত সেই মুহূর্তেই হয়তো কোনো কারণে রমেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় অনুরাগে তাহার মন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আবার রমেশের প্রতি তাহার বেদনাবিগলিত চিত্তের কোন গোপন রক্তিমরাগ প্রকাশ পাইবার পরেই হয়তো রমেশের বিরুদ্ধে সামাজিক দলপতিদের কোন ষড়যন্ত্রে সে যোগ দিয়াছে। এমনি ভাবে আকর্ষণ বিকর্ষণের সংঘাতে অনুরাগ-বিরাগের যে অমৃত-হলাহল উত্থিত হইয়াছে তাহাই এই উপন্যাসের কাহিনীকে তীব্র আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়া শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে তাঁহার অসামান্য কলাকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। নায়ক রমেশের প্রণয়াহত হৃদয়ের বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু প্রণয়াবেগ রমেশ চরিত্রের একটি দিক মাত্র, তাহার সামগ্রিক চরিত্রের মধ্যে মহৎ আদর্শ, সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা এবং বিরাট মানবিকতার এক অত্যাশ্চর্য সমাবেশ ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্র রমেশ অপেক্ষা জটিলতর চরিত্র হয়তো সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু রমেশ অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেন নাই। যাঁহারা শরৎ সাহিত্যে পুরুষ চরিত্র সন্ধান করিয়া পান না, তাঁহারা বোধ হয় রমেশের কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। রমেশের বলিষ্ঠ বাহু এবং প্রশস্ত বক্ষ সমাজের সেবায় সতত প্রসারিত ছিল। কিন্তু সমাজ আঘাতে আঘাতে সেই বাহু ও বক্ষদেশ জীর্ণ ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। ইবসেনের An Enemy of the People নাটকের নায়ক ডঃ স্টকম্যান যাহাদের উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাদের কাছেই চরম নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়াছিলেন। রমেশও তেমনি তাহার দ্বারা উপকৃত সমাজের

কাছে একই রকম ব্যবহার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তবুও রমেশ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত রহিয়াছে। বেণী, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ভৈরব আচার্য এবং রমা তাহার প্রতি যে নির্মম বাণ নিক্ষেপ করিয়াছে সেগুলি তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পতন ঘটাইতে পারে নাই। জেলখানা হইতে যখন সে বাহির হইয়া আসিল তখন তাহার কণ্টকমুকুট বিজয়ীর শিরোভূষণ হইয়া উঠিল। সে রমাকে হারাইল কিন্তু তাহার মাতৃভূমিকে হারাইল না; তাহারই সেবায় সে নিজেকে নিয়োজিত রাখিল। জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর চরিত্রটি একটু বিবর্ণ, নিরুত্তাপ ও অবাস্তব মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বেশ্বরী রমেশ চরিত্রের পরিপূরক। তিনি আহত রমেশের স্নিগ্ধ সান্ত্বনা এবং হতাশ রমেশের চোখে ধ্রুব আশার আলো। অভিমানক্ষুব্ধ রমেশকে তিনি বারে বারে তাঁহার স্নেহের সুধাস্পর্শে শান্ত করিয়াছেন এবং দিশাহারা রমেশের সম্মুখে পুনরায় সত্য পথটি আলোকিত করিয়া দিয়াছেন। তাহার ব্যক্তিত্বের অন্য দিকগুলি সম্যকভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় নাই বলিয়াই তাহার চরিত্র একটু অতিরিক্ত আদর্শসর্বস্ব ও মৃত্তিকাসম্পর্কহীন মনে হয়। তাঁহার অটল সংযমের আচরণ ভেদ করিয়া তাঁহার মানসিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ খুব কমই প্রকাশ পাইয়াছে, সেজন্য রমেশের প্রতি কি নিবিড় স্নেহ এবং বেণীর প্রতি কি নিদারুণ ঘৃণা তাঁহার মনে সঞ্চারিত ছিল তাহার পরিচয় আমরা বেশি নাই। শুধুমাত্র শেষকালে নিজের সন্তানের প্রতি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব হঠাৎ প্রকাশ পাইল। পল্লী-সমাজের ঘৃণ্য নীচতার পঙ্ককুণ্ডের মধ্য হইতে এই সত্যবতী, স্নেহময়ী নারী তাঁহার শুচিশুভ্র মুখটি যেন ঊর্ধ্ব জ্যোতির্ময় আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই উপন্যাসে যে টাইপ চরিত্রগুলি রহিয়াছে সেগুলি কখনও ভোলা যায় না। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কথা প্রথমেই মনে আসিবে। শঠতা, নীচতা, বাক্‌-চাতুর্য ও নিপুণ অভিনয়ে 'দত্তা'র রাসবিহারী ছাড়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীর তুলনা সমগ্র শরৎসাহিত্যে নাই। দীনু ভট্টাচার্য, ধর্মদাস, বাঁড়ুয্যে মশাই প্রভৃতি চরিত্র চলমান চিত্রের মতই একটির পর একটি ক্ষণকালের জন্য আমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া আমাদের মনে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া সরিয়া গিয়াছে। দলপতি বেণী ঘোষাল গ্রামের ক্ষুদে জমিদার হইলেও গ্রামবাসীদের মধ্যে তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপ। কিন্তু জমিদারের ব্যক্তিত্ব ও মেজাজ কিছুই তাহার নাই। গোপন ষড়যন্ত্র ও নীচ স্বার্থপরতায় তাহার দোসর পাওয়া যায় না, কিন্তু সাহস ও পৌরুষ বলিতে

তাহার কিছুই নাই। সেজন্য রমেশ ও রমার তো কথাই নাই, সামান্য প্রস্তাব সম্মুখেও সে হীন কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছে। এই উপন্যাসের মধ্যে মূল করুণরসের ধারা প্রবাহিত হইলেও টাইপ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র হাস্যরসের ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণদের অপরিমিত লোভ, তুচ্ছ বিষয় নিয়া প্রচণ্ড ঝগড়া, রমেশের আত্মীয় সাজিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার সুচতুর প্রচেষ্টা প্রভৃতি ঘটনা প্রবল হাস্যরস উদ্রেক করে। বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রভৃতি চরিত্র প্রধানত ব্যঙ্গরসাত্মক হইলেও, ধর্মদাস, দীনু প্রভৃতি চরিত্ররূপায়ণে লেখকের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি হাস্যরসের সহিত মিলিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র নিছক সৌন্দর্যরসসৃষ্টির জন্য কোথাও প্রাকৃতিক চিত্র অবতারণা করেন নাই। পরিবেশরচনা এবং নরনারীর আবেগ-অনুভূতিময় অন্তর্জীবনের পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যেই তিনি মাঝে মাঝে পরিমিতভাবে প্রকৃতির রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই উপন্যাসেও রমা ও রমেশের সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন দৃশ্যে তিনি উভয়ের প্রচ্ছন্ন হৃদয়াবেগের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। বোধ হয়, ঐ ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব না থাকিলে উহাদের হৃদয়ের আবেগ অমন ভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইত না। তারকেশ্বরে রমার বাড়িতে পরিতৃপ্ত আহারের পর রমেশ যখন রমার কাছে বহুদিন পরে তাহার হৃদয়ের বদ্ধ বাণীর দ্বার মুক্ত করিয়া দিল তখনকার প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নববর্ষার ধূসর শ্যামল মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছিল, অর্ধ-নিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল।' এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেদুর ছায়া রমেশের চোখে না লাগিলে সে বোধ হয় রমার কাছে তাহার হৃদয় উজাড় করিয়া দিতে পারিত না। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে রমা ও রমেশের সাক্ষাতের পূর্বে শরৎচন্দ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের চিত্রটি স্বল্প কথায় ফুটাইয়া তুলিলেন, 'কিছুক্ষণ হইল সন্ধ্যার ঝাপসা ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের এদিক ওদিক ভরিয়া গিয়াছিল।' এই জ্যোৎস্না-রাতের প্রভাব রমেশের চিত্তে লাগিয়াছিল, সেজন্য রমাকে দেখিয়া তাহার হৃদয়-চাঞ্চল্য একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল।' রমা ও রমেশের শেষ সাক্ষাৎকারও রাতেই ঘটিয়াছিল এবং সেই রাতেও আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছিল, 'রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার

কোন উত্তর ছিল না—জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।' বিদায়রাতে জ্যোৎস্নাবীণায় শুধু কান্নার সুরই বাজিয়াছিল। তারপর রমেশের জীবনে হয়তো অনেক বর্ণময় দিন আসিয়াছে কিন্তু সেই কান্নাভরা বিদায়রাতের স্মৃতি বোধ হয় কোন দিন তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

'বৈকুণ্ঠের উইল' গল্পটি ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গল্পটির মধ্যে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্নেহ কিভাবে সকল বিরোধ ও জটিলতা অতিক্রম করিয়া অবশেষে জয়লাভ করিয়াছে তাহাই অপরিসীম মাধুর্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু কেবল ভাইয়ের প্রতি স্নেহ নহে মায়ের প্রতি সুগভীর মমতাও এই গল্পের মধ্যে অনেকখানি স্থানলাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গল্পের ন্যায় এই গল্পেও স্নেহমমতা এমন সব সম্পর্কের মধ্যে দেখানো হইয়াছে যে-সব স্থানে স্নেহমমতার পরিবর্তে ঈর্ষা বিদ্বেষই বাঙালী পরিবারে সচরাচর দৃষ্ট হয়। বিমাতার সহিত সপত্নী পুত্র এবং দুই বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সম্বন্ধ সাধারণত বাঙালী সংসারে হিংসা ও বিরোধেই মলিন হইয়া উঠে, কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই হিংসাবিরোধের পরিবর্তে অপ্রত্যাশিত স্নেহমমতার অবতারণা করিয়াছেন। সেজন্যই আমাদের চিত্ত সেই স্নেহ-মমতার মহৎ প্রকাশ দেখিয়া অতিমাত্রায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত না হইয়া পারে না।

গল্পের নায়ক গোকুল মূর্খ, নির্বোধ এবং অস্বাভাবিক রকমের সৎ। বোধ হয় মূর্খ ও নির্বোধ বলিয়াই সৎ, এ-সংসারে শিক্ষিত ও চালাক লোকেরা ঐ ধরণের সৎ হইতে বোধ হয় পারে না। যে ছেলে নকল করার সুযোগ পাইয়াও নকল করে না, নিজের ব্যর্থতার জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইয়া ভাইয়ের সাফল্যে সকলের কাছে গর্ব করিয়া বেড়ায় তাহার মত নির্বোধ আর কে আছে? কিন্তু লেখক দেখাইয়াছেন তাহার মত মহৎও আর কেহ নাই। তবে বৈকুণ্ঠ যদি উইল করিয়া না যাইতেন তবে বোধ হয় গোকুল এতখানি বিব্রত ও বিপন্ন হইয়া পড়িত না। সমস্ত বিষয়সম্পত্তির মালিক হওয়ার ফলে যেমন তাহার অবাঞ্ছিত শুভানুধ্যায়ীর আগমন ঘটিতে লাগিল তেমনি আবার অভাবিত শত্রুর সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল। গোকুল অত্যন্ত সরল বুদ্ধির মানুষ ছিল বলিয়াই তাহার উপরে স্ত্রী মনোরমা ও শ্বশুর নিমাই রায় সহজেই তাহাদের বিষময় প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের বাক্য

প্ররোচিত হইয়াই গোকুল বিমাতার উপরে মাঝে মাঝে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে কিন্তু তাহার রূঢ় ব্যবহারের মূলে অকারণ ও অবুঝ অভিমানের জ্বালাই শুধু ছিল, প্রকৃত হিংসা ও বিদ্বেষ ছিল না। তবে গোকুলের মান অভিমান ছিল মায়ের সঙ্গে, সোনার মেডেল পাওয়া 'অনার গ্র্যাজুয়েট' বিনোদ সম্বন্ধে তাহার এমন একটি সসঙ্কোচ সম্ভ্রমবোধ ছিল যে, বিনোদের প্রতি তাহার স্নেহধারা অবরুদ্ধ আবেগবেদনা এবং পরোক্ষ উক্তি ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইত, কখনও প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস ও মানঅভিমানের মধ্যে প্রকাশ পাইত না।

লেখক এই নাতিদীর্ঘ গল্পটির মধ্যে এমন কতকগুলি চরিত্রের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন যেগুলি কখনও ভোলা যায় না। শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে ছলনা, চাতুরী, উস্কানি ও প্ররোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যত অনর্থ বাধাইয়াছেন। গ্রাম্য জীবনে বাহিরের লোকের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সংসারের সুখ শান্তি কিভাবে বিঘ্নিত হয় এই বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়া লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। তবে গোকুলের সংসারের মূর্তিমান শনি হইল নিমাই রায়। যেদিন তিনি নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তে কাণা করিয়া জামাইয়ের সংসারে আসিয়া শক্তমুষ্টিতে সংসারের হাল ধরিলেন সেদিন হইতেই সংকট ঘনাইয়া আসিল। গোকুল চণ্ডীদেবীর কাছে 'ভাযাং মনোরমাং দেহি' বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এই মনোরমা অহরহ গোকুলের কানে যে বিষমন্ত্র শুনাইয়াছিল তাহাতে কাহারও মন সে রমিত করিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

'অরক্ষণীয়া' ১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, যে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন সমাজের চিত্র এই উপন্যাসে তুলিয়া ধরা হইয়াছে আজ হয়তো তাহার চিহ্ন মাত্র নাই, কিন্তু নারীর প্রতি এই অতিক্রান্ত সমাজের ভয়াবহ নৃশংসতা আমাদের অন্তর বিস্ময় ও বিদ্রোহে পূর্ণ করিয়া তোলে। তেরো বছরে পড়িতে না পড়িতেই যে কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠে এবং সমস্ত কাজে কর্মে, আচার অনুষ্ঠানে অস্পৃশ্য ও অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয়, সমাজের এরূপ অবস্থা আজ হয়তো আমরা কল্পনাই করিতে পারিনা, কিন্তু একদিন এ-অবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে সত্য ছিল। বাস্তবচিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র এখানে নিরঙ্কুশ ও নির্বিকার। উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নাই, সহানুভূতির আতিশয্য নাই, বর্ণনা ও চিত্রণের অতিরঞ্জন নাই, কিন্তু যে বাস্তব সমস্যাটি তিনি এ-

উপন্যাসে অবতারণা করিয়াছেন তাহা এক তীব্র মর্মভেদী বেদনা আমাদের অন্তরে সঞ্চার করিয়া দেয়।

বাঙালী ঘরের অনূঢ়া কন্যার সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় সকল বাঙালী পরিবারেই অল্পবিস্তর পরিচয় রহিয়াছে। যদি সেই কন্যা দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার গায়ের রঙ যদি কালো হয় তবে তাহার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা যে কতখানি হইতে পারে তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের অনুমেয় নহে। আজও সমাজের বহুতর প্রগতি সত্ত্বেও গরীব কালো মেয়েদের এই লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা দূরীভূত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। যেখানে স্বয়ং স্বামী নির্বাচনের অধিকার নাই, সেখানে যদি কোন মেয়ের বিবাহ বিলম্বিত অথবা বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে তাহার অপরাধ কোথায়? কিন্তু তাহার যে কোন অপরাধ নাই সে-কথা কাহারও মনে থাকে না, এবং আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এমন কি স্বয়ং মাতা-পিতাও সেই দুর্ভাগিনী মেয়েটির মাথায় সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে প্রতি মুহূর্তে নিষ্ঠুর বাক্যবাণ ও অভিশাপে জর্জরিত করিতে থাকে। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসে এমনি এক বিবাহ-বাজারে মূল্যহীন ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে, বিবাহকেই যতদিন নারীর একমাত্র সৌভাগ্যময় পরিণতি বলিয়া মনে করা হইবে এবং সমাজের সকল নারী যতদিন স্বাবলম্বী না হইতে পারিবে ততদিন জ্ঞানদার মত মেয়েদের দুঃখ দূর হইবে না।

শরৎচন্দ্র অনেক দুঃখময়ী নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদার মত এমন একটানা, অবিচ্ছিন্ন ও অতিশয়িত দুঃখ শরৎ-সাহিত্যের অপর কোন নারী ভোগ করিয়াছে কিনা জানি না। তাহার তেরো চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে একটিও সুখের দিন বোধহয় আসে নাই। যেদিন অতুল তাহার হাতে একজোড়া কাঁচের চুড়ি পরাইয়া দিয়া একটি হাস্যোজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি রাখিয়া গেল সেদিন হয়তো জ্ঞানদার বুকে রোমাঞ্চিত আনন্দের একটি শিখা ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তারপর নিবিড় এবং সুচির অন্ধকার। কাকার সংসারে গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের সঙ্গে সে হরিপালে মামার বাড়ি গেল, কিন্তু সেখানে তাহার জন্য এক গভীরতর দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেখানে নিরানন্দ বনজঙ্গল, ভয়াবহ ম্যালেরিয়া এবং অধিকতর ভয়াবহ মামার বিবাহ দিবার ষড়যন্ত্র। কিন্তু এ-সব সহ্য হইত, যদি অতুলের কাছ হইতে কোন সাড়া, কোন সান্ত্বনা সে পাইত। চতুর্দিকব্যাপী মেঘের মধ্যে পুনরায় আলোকচ্ছটার বিকাশ দেখিবার জন্য সে কাতরচিত্তে আকাশের দিকে

তাকাইয়া রহিল, কিন্তু মেঘ মেঘই রহিয়া গেল, আলোকের ক্ষীণ আভাসও সেখানে দেখা গেল না। ম্যালেরিয়াজীর্ণ কুৎসিত চেহারা এবং হতাশাপীড়িত মন লইয়া যখন আবার সে মাকে সঙ্গে করিয়া কাকার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার দুঃখ ও লাঞ্ছনার পাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বর্ণমঞ্জরীর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, প্রতিবেশীদের কপট সহানুভূতি ও তির্যক মন্তব্য তাহাকে আর আঘাত দিতে পারিত না, এমনকি তাহার চোখের সম্মুখে অপর নারীর প্রতি অতুলের বর্ধমান অনুরাগ এবং তাহার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির অমানুষী অস্বীকৃতিও তাহার নিঃসাড় নিস্পন্দ হৃদয়ের মধ্যে কোন বেদনার আলোড়ন জাগাইল না, কিন্তু তাহার একমাত্র বন্ধন, একমাত্র অবলম্বন মায়ের কাছে যখন শেষে নির্দয় গঞ্জনা পাইত তখন মাঝে মাঝে এই চির-হতভাগী মেয়েটি ভূমিতে পড়িয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভগবানের কাছে আর্ত প্রশ্ন জানাইত, 'আমি কার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে সকলেরই চক্ষুশূল। আমার রূপ নাই, বসন-ভূষণ নাই, আমার বাপ নাই, সে কি আমার দোষ? আমার রোগগ্রস্ত এই কঙ্কালসার দেহ, এই জীর্ণ পাণ্ডুর মুখ যে একজনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে কি আমার ত্রুটি? আমার বিবাহ দিতে কেহ নাই, তবুও আমার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে—সেও কি আমার অপরাধ? প্রভু। এতই যদি আমার দোষ—তবে আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও—তিনি আমায় কখনো ফেলিতে পারিবেন না।' জ্ঞানদা সংসারে শুধু পরাজয়ের পর পরাজয়ের গ্লানি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার করুণতম পরাজয় হইল সেদিন যেদিন সে তাহার অভিশপ্ত কুমারী-জীবনের বিড়ম্বনা ঘুচাইবার আশায় ঘাটের মড়া গোপাল ভট্টাচার্যের মন ভুলাইতেও ব্যর্থ হইল। সে তাহার কঙ্কালসার কুরূপ দেহটি দিয়া কোন নবীন যুবকের মন ভুলাইতে পারিবে না তাহা সে জানিত, কিন্তু একজন শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধের মন হয়তো সে জয় করিতে পারিবে এই আশায় সে গোপনে সকলের অলক্ষ্যে দ্রুত ও অপটু হস্তে কিছু প্রসাধনের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এবারও সে প্রত্যাখ্যাত হইল এবং প্রসাধনের সকল বর্ণবিলাস তাহার অঙ্গে শুধু দুরপনেয় কলঙ্কচিহ্ন হইয়া রহিল। তাহার এই প্রসাধনের বিকৃত রূপ এবং বৃদ্ধের মন ভুলাইবার ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যে হয়তো আপাত-কৌতুকজনকতার একটা ভাব আছে, কিন্তু ইহার গভীরে যে অপরিসীম বেদনা ও কারুণ্যের ধারা সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা কঠিনতম চিত্তকেও আর্দ্র করিয়া ফেলে। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে জ্ঞানদা কথা বলিয়াছে মাত্র

স্বল্প কয়েকটি। পিতার মৃত্যুর পর অতুলের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া নিজেকে নিবেদন করিবার ঘটনা ছাড়া আর কোথাও সে বিন্দুমাত্র অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা কিংবা অভিযোগ ব্যক্ত করে নাই। নীরবে, অবিচল চিত্তে সে তাহার সকল কর্তব্যকর্ম করিয়া গিয়াছে। যে অতুলকে সে একদিন মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছিল, তাহার হৃদয়হীন প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও সে একটি নালিশের কথাও উচ্চারণ করে নাই। শ্মশানে অতুল যখন দেহের নশ্বরতা সম্বন্ধে উচ্চতর দার্শনিক ভাবের প্রেরণায় জ্ঞানদাকে অনুকম্পা বশে পুনরায় গ্রহণ করিল তখনও জ্ঞানদা কোন অভিমান না দেখাইয়া বিনা দ্বিধায় তাহার অনুবর্তী হইল। জ্ঞানদার মত শান্ত, নিরীহ, সহিষ্ণু ও দুঃখের দহন শিখায় পবিত্র নারী শরৎসাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ।

'অরক্ষণীয়া'র 'পোড়াকাঠ' একটি অবিস্মরণীয় টাইপ চরিত্র। মানুষের বিকট চেহারার অন্তরালে এমন স্নিগ্ধকোমল একটি অন্তর যে থাকিতে পারে তাহা পোড়াকাঠকে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না। তাহার ভীষণ আকৃতি এবং ভীষণতর হাসি, তাহার উচ্চ কণ্ঠনিনাদ এবং ছুঁচাল বাক্যবাণগুলি দুর্গা ও জ্ঞানদার মনে শুধু কেবল ঘৃণা ও আতঙ্কই উদ্রেক করিয়াছে। তাহার সকল সেবাযত্ন স্নেহ ও আন্তরিকতার মধ্যে উৎকট স্বার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া দুর্গা তাহার প্রতি শুধু তীব্র বিদ্বেষই পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু যেদিন স্বামীর সঙ্গে প্রকাশ্য সমরে পোড়াকাঠ নিজের দাদার সঙ্গে জ্ঞানদার বিবাহের চেষ্টা বানচাল করিয়া দিল সেদিন দুর্গা তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং তাঁহার চোখের জল দুই কূল ছাপাইয়া বহিতে লাগিল। স্বামীকে বাক্য যুদ্ধে ঘায়েল করিলেও এবং স্বামী ও বিবাহার্থী দাদা উভয়ের নাক-কান কাটিয়া মর্দা শূর্পনখা বানাইবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেও পোড়াকাঠের একমাত্র কামনা, 'হাতের নোয়া নিয়ে স্বামী-পুত্তুরের, গো-ব্রাহ্মণের সেবা করে যেন যেতে পারি।'

'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) ১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র নিজের নাম গোপন করিয়া 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা' এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে শরৎচন্দ্র ১৫.১১.১৫ তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে লিখিয়াছিলেন, 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী

যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না। সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফত পাঠানো।

যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ-বিদ্রূপ এ-পর্যন্তই। তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়। এমন কি আপনি ছাড়া উপেনবাবু ছাড়া (তাঁর ত মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—তা ভালই হোক মন্দই হোক) আর কেহ না জানে ত বেশ হয়। ওটা কি? অবশ্য শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে।······রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলের পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন।······ অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয় —তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

····· যাই হোক শ্রীকান্ত পড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে তা জানাবেন। ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখবো না।'

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী কিনা এই লইয়া পাঠকদের মধ্যে চিরকাল নানা কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাস বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র কিন্তু নিজে 'শ্রীকান্তে'র বাস্তব জীবনভিত্তি বারবার অস্বীকার করিয়াছেন। ১৪.৮.১৯ তারিখে বাজে শিবপুর হইতে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, 'রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে? ও-সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বইত নয়; ও-সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। কাহিনীটি কি সত্যি?' শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৪.৮.১৯ তারিখে লিখিত আর একখানি পত্রে তিনি জানাইয়াছিলেন, '···আমার একটু পরিচয় চাই নাকি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই।···শ্রীকান্তটা আর একবার

পড়ে দেখো। হয়তো তার ওপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক মিথ্যে।'

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে'র কাহিনী কাল্পনিক ও মিথ্যা বলা সত্ত্বেও সাধারণ লোকের সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন হয় নাই কেন? শরৎচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও কেন বরাবর পাঠকসমাজ তাঁহাকে ও শ্রীকান্তকে অভিন্ন মনে করিয়াছে? তাঁহাদের ধারণা ও বিশ্বাস কি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক? কখনও নহে। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক ভঙ্গিতে রচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে এমন সব ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণনা করিয়াছেন যেগুলির সহিত তাঁহার নিজের বাস্তব ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি এই বইতে যে জীবনদৃষ্টি ও মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা শুধু শ্রীকান্তের নয়, তাহা তাঁহার নিজেরও বটে। এ-সব কারণে খুব সঙ্গতভাবেই পাঠকসমাজ শ্রীকান্তের সহিত তাঁহার জীবনের সাযুজ্য ধারণা করিয়া থাকেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনের সম্পর্কিত ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের কোথায় কতটুকু মিল রহিয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। 'শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে' শ্রীকান্তের কৈশোরের কিছুটা সময় এবং প্রথম যৌবনের খানিকটা সময়ের বর্ণনা রহিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সাতাশ বছর বয়সের (সাতাশ বছর বয়সে তিনি ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন) যদি হিসাব নেওয়া যায় তবে দেখা যাইবে যে, তিনি জন্মের পর দুই তিন বছর দেবানন্দপুরে কাটান, তারপর নয় বছর ছিলেন ভাগলপুরে। ভাগলপুর হইতে বছর বার যখন বয়স তখন পুনরায় দেবানন্দপুর যাইয়া তিন বছর কাটাইয়া আসেন। তারপর আবার ভাগলপুর ফিরিয়া আসিয়া দশ বছর অতিবাহিত করেন। শেষে দুই বছর মজঃফরপুর ও কলিকাতায় অতিক্রম করেন। এই হিসাব হইতে বুঝা যাইবে, জন্মের পর দুই তিন বছর ব্যতীত কৈশোরের মোটে তিনটি বছর (তের হইতে পনের) তিনি দেবানন্দপুরে ছিলেন, কৈশোর ও যৌবনের বাকি সময়টুকু কাটিয়াছিল ভাগলপুরে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ভাগলপুরের পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্র 'শ্রীকান্তের' প্রথম পর্বে প্রাধান্য পাইয়াছে। অবশ্য মাঝে মাঝে দেবানন্দপুরের স্মৃতিও কিছু মিশিয়া গিয়াছে।

শ্রীকান্তের পাঠাভ্যাসের বিবরণ মামাবাড়িতে শরৎচন্দ্রের পাঠাভ্যাসেরই অনুরূপ, শুধু কেবল কোন কোন চরিত্রের নাম এবং শ্রীকান্তের সহিত তাহার

সম্বন্ধ বাস্তব সত্য হইতে একটু পরিবর্তিত করা হইয়াছে।[১] 'শ্রীকান্তে'র অবিস্মরণীয় চরিত্র ইন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের বন্ধু রাজু, অথবা রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সত্য কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত হইয়াছে। এই রাজুর চরিত্র রূপায়ণে বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যিক কল্পনার কিরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও কৈশোর-যৌবনসঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র রাজুকে বাস্তবের ক্ষণিক অনিত্যতা হইতে সাহিত্যের চির-নিত্যতার মধ্যে আনিয়া অমরত্ব দান করিতে যেটুকু রস-যোজনার প্রয়োজন—তাহা পূর্ণভাবে করিয়াছেন। সেখানে সত্য মলিন না হইয়া প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে হইলে যেমন দূরে সরিয়া যাইতে হয় তাহাতে অনেক বাস্তব প্রচ্ছন্ন হয় অনেক শূন্যতা কল্পনার স্নিগ্ধালোকে পূর্ণ হইয়া উঠে, ইন্দ্রনাথকে উদ্ঘাটিত করিতে শরৎচন্দ্র যথাযথভাবে ওইটুকুই মাত্র করিয়াছেন। তাহাতে পরিচিত চরিত্রটি আরো সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র, কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যাঁহাদের রাজুকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল—একথা নিশ্চয়ই তাঁহারা স্বীকার করিবেন।'[২] 'শ্রীকান্তে' লিখিত আছে যে ইন্দ্রনাথের সহিত শ্রীকান্তের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল একটি ফুটবল ম্যাচের মারামারির মধ্যে। এই মারামারিটা সত্য ঘটনা কিন্তু ইহার পূর্বেই শরৎ ও রাজুর পরিচয় ঘটিয়াছিল।[৩] শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীকান্তকে ভীরু ও পলায়নতৎপর দেখাইয়াছেন। আসলে শ্রীকান্তও ( শরৎচন্দ্র ) কম সাহসী ও বেপরোয়া ছিলেন না। শ্রীকান্ত ( শরৎ ) ইন্দ্রনাথের কাছেই নেশার দীক্ষা

১। 'ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুয়ে আছেন পিসেমশাই নয়—দাদামশাই এবং বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য।—ছোড়দা এবং যতীনদা—ছু'জ'নই মামা—গল্পের খাতিরে দাদা হয়েছেন। এই সময় দেউড়িতে গৌরী সিং তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তো সুর ক'রে।

টিকিটবিলির গল্প সত্য। ছিনাথ বউরূপীর অভিযানও সত্য। তবে সবটাতেই কল্পনার রসান আছে।

বউরূপীর ল্যাজ কাটাটি শরৎচন্দ্রের অধিকন্তু ন দোষায়। সেদিন ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না। শরৎচন্দ্রও না। এই গল্প কুসুমকামিনীর সান্ধ্য বৈঠকে শোনা—শরৎচন্দ্র ত কে এমন অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছেন এইখানে তাঁর কৃতিত্ব।'—শরৎ পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১২৩,

২। শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, ৫৯

৩। 'এই মারামারির সময় সেখানে বর্তমান লেখকের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটেছিল ... শ্রীকান্তের ( শরতের ) সঙ্গে ইন্দ্রনাথের ( রাজুর ) এটি প্রথম দেখা নয়। কারণ এই ঘটনা ১৮৯৩-৯৪ সালে ঘটে। এই সময়ে শরতের বয়স সতের বৎসর, রাজুর আঠার উনিশ হবে। এখানে রাজুর বর্ণনাটি একটুও কাল্পনিক কি অতিরঞ্জিত নয়।'—শরৎ পরিচয়, পৃঃ ১২৫

পাইয়াছিলেন ইহাও সত্য নহে কারণ শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বেই নেশায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।[১] ইন্দ্রনাথের বাঁশি বাজাইয়া গোঁসাই বাগানের ভিতর দিয়া আসা সত্য ঘটনা।[২] ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে ভবঘুরের নেশায় মাতাইয়া দিয়াছিল বাস্তব জীবনে ইহা ঠিক সত্য ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, রাজুর সঙ্গে আলাপের পূর্বেই শরৎচন্দ্র পায়ে হাঁটিয়া পুরী পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রনাথের থিয়েটারের দলে যোগ দিবার আগেই সঙ্গীত ও অভিনয়বিদ্যায় তাঁহার হাতে খড়ি হইয়াছিল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের সংসারবিবাগী হইয়া চলিয়া যাইবার কথা বলা হইয়াছে। রাজুও এমনিভাবে একদিন নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।[৩]

শ্রীকান্তের কুমারবাহাদুরের দলের মধ্যে যাইয়া পড়া, পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে জড়িত হওয়া, সন্ন্যাসী হওয়া প্রভৃতি উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সহিত শরৎচন্দ্রের জীবনের বাস্তব ঘটনার মিল রহিয়াছে। মনে হয় উপন্যাসের পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ভাগলপুর হইতে পঁচিশ বছর বয়সে তাঁহার অন্তর্ধান এবং মজঃফরপুরে অবস্থিতিকালীন নানা অজ্ঞাত ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'এই সব কারণে মজঃফরপুরে শরৎবাবু থাকিতে থাকিতে মজঃফরপুরের একজন জমিদার মহাদেব সাহুর সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট চলিয়া যান। এই মহাদেব সাহুই যে শ্রীকান্তের কুমার বাহাদুর তাহাতে সন্দেহ নাই।' পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে শ্রীকান্তের আলাপের

১। শ্রীকান্ত দেবানন্দপুর থেকে নেশায় দক্ষ হবে কি রূপে। অতএব এটি সম্পূর্ণ অলীক ছন্ন সাধুতা।' শরৎ-পরিচয় পৃঃ ১২৫

২। 'ইন্দ্রনাথের রাতে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ানর গল্প সত্য। · গোঁসাই বাগান সেকালে ছিল রায়বাবুর বাগান।'—ঐ পৃঃ ১২৬

৩। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রাজুর পরিণতি বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু যৌবনেই তাহার সন্ন্যাস সুরু হইয়া গেল। তাহার মনে অদ্ভুত পরিবর্তন আসিল, বাহির্জগৎ হইতে বিদায় লইয়া সে মনোজগতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। গঙ্গার তীরে, শিবশ্মশানের কাছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের গায়ে নিজহাতে কাঠের ঘর বাঁধিয়া সে ধ্যানানন্দমগ্ন হইল। ··

লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল; তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ক্রমে সে মৌনী হইয়া পড়িল। অনশনে দিন কাটিত। বন্ধু-বান্ধব দূরে গেল। কেবল ভালবাসিত শিশুদের—কাছে পাইলে বুকে জড়াইয়া তৃপ্তির আনন্দে অবিরত কাঁদিত।

একদিন সকলে দেখিল—'পাখী উড়ে গেছে সাগর পারে।' সকল অনুসন্ধান ব্যর্থ করিয়া সে আজিও নিরুদ্দেশ।'—শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক—পৃঃ ৬৩-৬৪

সময় বাইজী বলিয়াছিল, সে তাহার গ্রামের একান্ত স্নেহের পাত্রী বাল্য সঙ্গিনী। দেবানন্দপুরের দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী লিখিয়াছেন, 'দেবানন্দপুরের একটি কায়স্থ পরিবারের মেয়ের সহিত কিশোর শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মেয়েটি শরৎচন্দ্রের কিশোর জীবনের খেলাধুলার যেমন নিত্যসঙ্গিনী ছিল, তেমনি তাহার উৎপাত ও উপদ্রবেরও পরম সহিষ্ণু পাত্রী ছিল।' আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্রের সহচারিণী ছিল কালিদাসী নামে যাজক ব্রাহ্মণের একটি কন্যা। সৌরীন্দ্রমোহন অবশ্য দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর মুখে তাহার যে পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত শরৎচন্দ্রের এই কৈশোরসঙ্গিনীর মিল দেখা যায়। শরৎচন্দ্র মহাদেব সাহুর তাঁবুতে কোন বাইজীর সহিত পরিচিত হইতে পারেন, তবে সেই তাঁহার কৈশোরসঙ্গিনী কিনা তাহা বলা খুব শক্ত। শ্রীকান্তের সন্ন্যাসী হওয়ার ঘটনার সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনার মিল রহিয়াছে। ভাগলপুর মামাবাড়ি হইতে যখন পিতার উপর অভিমান করিয়া বাহির হইয়া যান তখন তিনি এক সন্ন্যাসীর আখড়ায় গিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিতে ঘুরিতেই তিনি মজঃফরপুরে উপস্থিত হন। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে ব্রহ্মদেশে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের প্রায় সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত কাহিনীর যে অনেক মিল রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করা হইল। তবে মনে রাখিতে হইবে শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনীকাহিনী নহে উপন্যাস। সেজন্য ইহাতে বাস্তবের সহিত কল্পনা, সত্যের সহিত মিথ্যা, তথ্যের সহিত সৌন্দর্য ও রসের মিলন ঘটিয়াছে। বাস্তব শরৎচন্দ্র খণ্ড, অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস, কিন্তু উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত অখণ্ড, পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রকে ব্যক্ত করিয়াছে যেমন, প্রচ্ছন্নও রাখিয়াছে তেমনি। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে খুব ভালো কথা বলিয়াছেন, "শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার উপকরণেই গঠিত। এমন কি শ্রীকান্তের সহিত শরৎ-জীবনের একটি অদ্ভুত সমান্তরলতা আছে। কিন্তু আবার এ-কথাও সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে, শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে সবচেয়ে বেশী আত্মগোপন করেছেন।'[১]

১। শরৎ পরিচয়—পৃঃ ১২৩

এ পর্যন্ত আমরা শুধু বাইরের ঘটনা বিচার করিয়া দেখাইয়াছি, 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী কতখানি প্রকাশ পাইয়াছে। বাইরের ঘটনা বাদ দিয়া যদি শুধু অন্তর্জীবনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তবে 'শ্রীকান্ত'কে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী বলিবার যুক্তি দৃঢ়তর হইবে। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তা কি শ্রীকান্তের বাসনা ও ভাবনার সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া যায় নাই? মোহিতলাল তাঁহার 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'এই কাহিনীতে দুইটি ভাগ বা ধারা আছে. একটা লেখকের আত্মজীবন বা আত্মচরিত, আর একটা সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তাহার সমালোচনা। প্রথমটি আত্ম-প্রকাশ, দ্বিতীয়টি আত্মচিন্তা।' এই আত্মচিন্তা বা জীবন সমালোচনামূলক অংশে শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একময়তা দেখা যায়। শ্রীকান্তের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে আমরা এক চিরপলাতক, নিরাসক্ত অথচ প্রেমিক. উদাসীন অথচ আবেগপ্রবণ, নির্বিরোধ অথচ রুদ্রবিপ্লবী পুরুষরূপে দেখিতে পাই। শরৎচন্দ্রের অন্তর্জীবন বিশ্লেষণ করিয়া কি একই পুরুষকে আমরা দেখিনা? 'স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না।' 'নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই,' 'এই আদর্শ হিন্দু সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই, 'যে সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু, আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না।' এই উক্তিগুলি কি শুধু শ্রীকান্তের, এগুলি কি শরৎচন্দ্রের বহুকথিত নিজস্ব উক্তি নহে? শ্রীকান্তের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের আত্মদর্শন ঘটিয়াছে, এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে হয়তো শরৎচন্দ্রের জীবনঘটনার মিল না থাকিতে পারে তাহাতে কিছু যায় আসে না। ঘটনাগুলির মধ্য দিয়া এমন একটি অখণ্ড চেতনাময় সত্তার বিকাশ ঘটিয়াছে যাহা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব সত্তা হইলেও তাঁহার সৃষ্ট শ্রীকান্ত চরিত্রের মধ্যে ইহা আরোপ করিয়া তিনি দূর হইতে ইহা সমীক্ষণ করিতে পারিয়াছেন। তিনি শ্রীকান্ত সত্তা হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন দুই-ই বটে। শ্রীকান্ত হইতে ভিন্ন হইয়া তিনি শ্রীকান্তের শৈল্পিক রূপ দিয়াছেন এবং শ্রীকান্তের সহিত অভিন্ন হইয়া তিনি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য শ্রীকান্ত উপন্যাসও বটে, আত্মকাহিনীও বটে। মোহিতলাল এ সম্বন্ধে যাহা

বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য. 'শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনী—উহা কেবল উপন্যাসই নহে। এইরূপ আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, ইহার নায়ক একাধারে আত্মও বটে, পরও বটে। লেখক যেন আপনাকেই, বাহিরে একটু তফাতে ধরিয়া দেখিতেছেন, ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপ সংস্থান ও পশ্চাৎ-পট আবশ্যক তাহা উত্তমরূপে সংযোজন করিয়া লইয়াছেন।'

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, 'ভারতবর্ষে' উপন্যাসখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন এ উপন্যাসের নাম ছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এ-উপন্যাসের নাম লেখক ভ্রমণকাহিনী দিলেন কেন? যে সময়ে 'শ্রীকান্ত' 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয় তখন ঐ পত্রিকায় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর 'য়ুরোপে তিনমাস,' বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চন্দ্র মহাতাবের 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণ, প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হইতেছিল। এই ভ্রমণকাহিনীগুলি যে শরৎচন্দ্রের পছন্দ হয় নাই, তাহা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে এবং 'শ্রীকান্তে'র গোড়াতেই নানা শ্লেষাত্মক উক্তির[১] মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তবুও ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐসব ভ্রমণকাহিনী পড়িয়া তিনি নিজেও হয়তো ভ্রমণকাহিনী লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপন্যাসের নাম ভ্রমণকাহিনী দিয়াছিলেন। যেভাবে তিনি উপন্যাসের আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার ভ্রমণকাহিনী লিখিবার উদ্দেশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। উপন্যাসের ভিতর যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই বুঝিতে পারা যায় যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং যে কাহিনী তিনি রচনা করিলেন তাহা ভ্রমণকাহিনী নহে, উপন্যাস। এই কাহিনী হয়তো ভবঘুরের কাহিনী, কিন্তু ভবঘুরের কাহিনী ভ্রমণকাহিনী নহে। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে বিশেষ বিশেষ জায়গার বস্তুরূপ ও সৌন্দর্য প্রধান হইয়া উঠে। কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে কোনো স্থানিকরূপ স্পষ্ট ও বিশিষ্ট হইয়া উঠে নাই। শুধু কেবল বুঝিতে পারা যায়, ভাগলপুর এবং বিহারের অন্য কোন কোন অংশ এই কাহিনীর পটভূমিতে রহিয়াছে,

১। 'শ্রীকান্তে'র গোড়ায় শরৎচন্দ্রের উক্তি—'গাড়ি পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে কাহিনী নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না।'

আর কিছু নহে। ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে যে অবিরাম গতিশীলতা থাকে এ উপন্যাসে তাহাও নাই। শ্রীকান্তের পিসিমার বাড়ি, কুমারবাহাদুরের তাঁবু ও পাটনায় পিয়ারী বাইজীর বাড়ি, প্রধানত এই তিনটি স্থানে উপন্যাসের ঘটনা ঘটিয়াছে। মাঝে মাঝে অবশ্য শ্রীকান্তের সন্ন্যাসী হইয়া ঘোরার ঘটনা রহিয়াছে এবং ভ্রমণ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় এই অংশেই আছে। এই উপন্যাসের রসসৃষ্টি হইয়াছে গতিশীল জীবনদর্শনে নয়, স্থিতিশীল জীবন-উপলব্ধিতে। সুইফটের Gulliver's Travels উপন্যাস বটে, কিন্তু ঐ উপন্যাসে বিচিত্র দেশের চমকপ্রদ বিবরণ রহিয়াছে, সেজন্য ঐ উপন্যাসের নাম ভ্রমণকাহিনী হওয়া সঙ্গত; কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র মধ্যে শ্রীকান্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থাকিলেও শ্রীকান্তের ভ্রাম্যমাণ রূপ এবং চমকপ্রদ স্থানবৈচিত্র্য এখানে কোথাও মুখ্য হইয়া উঠে নাই, সেজন্য ইহাকে কখনও ভ্রমণকাহিনী নাম দেওয়া যাইতে পারে না। শরৎচন্দ্র নিজেও বোধ হয় এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেজন্য মুদ্রিত পুস্তকের নাম হইল শুধু 'শ্রীকান্ত'।

'শ্রীকান্ত'কে অনেকে খাঁটি উপন্যাস বলিতে চান না এ কারণে যে, ইহাতে বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনা ও চরিত্র আসিয়া পড়িয়াছে, মূল ঐক্যসূত্র ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একথা অবশ্য সত্য যে, এই উপন্যাসে বহুতর ছোট ছোট ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে। তাহারা আসিয়াছে এবং ক্ষণকালের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে দ্রষ্টা, ভোক্তা ও রসস্রষ্টা শ্রীকান্তের জীবনধারাই সমগ্র উপন্যাসের ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং বিক্ষিপ্ত নানা ঘটনা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর আকর্ষণ-বিকর্ষণমূলক চমৎকারী প্রণয়কাহিনীই উপন্যাসের দীর্ঘ চার পর্বের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য দান করিয়াছে। ঐক্য ও সংহতির সহিত বৈচিত্র্য এবং বিশালতাও উপন্যাসের ধর্ম। অনেক শ্রেষ্ঠ বৃহদাকার উপন্যাসের মধ্যে সংহত ও কেন্দ্রবদ্ধ রূপই তো খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। টলস্টয়ের Anna Karenina উপন্যাসের মধ্যে অ্যানা ক্যারেনিনা আর কতটুকু অংশ জুড়িয়া আছে? অধিকাংশ স্থানই তো বিচিত্র চরিত্র ও তাহাদের বহুধাবিভক্ত ঘটনাই অধিকার করিয়া আছে! টলস্টয়ের আর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস Resur-rection-এর নেখলিউডোভ ও ম্যাসলোভার মূল কাহিনী অতি সামান্যই বর্ণিত হইয়াছে, উপন্যাসের অধিকাংশ স্থানই কারাগারের বিভিন্ন কয়েদীদের টুকরা টুকরা কাহিনীতে ভরিয়া রহিয়াছে, সুতরাং একথা বলা যায় যে, বিক্ষিপ্ত ঘটনা

ও চরিত্র থাকিলেও শ্রীকান্তের মূল উপন্যাসধর্ম নষ্ট হইয়া যায় নাই।[১] মোহিতলাল ইহাকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বা Autobiographical Novel বলিয়াছেন। Robinson Crusoe কিংবা David Copperfield যেরকম আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'ও তাহাই! বিশেষভাবে David Copperfield-এর সহিত 'শ্রীকান্তে'র সাদৃশ্য খুব বেশি। ডিকেন্স বরাবরই শরৎচন্দ্রের প্রিয় লেখক ছিলেন। David Copperfield শুধু ডিকেন্সের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস নহে, ইহার মধ্যে ডিকেন্সের সর্বাধিক আত্মপ্রকাশ হইয়াছে। 'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলা যাইতে পারে।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। মানুষ নিজেকে বর্ণনা ও বিচার করিতে পারে না। নিজের মানসিক আনন্দবেদনাজনক অনুভূতি ও বহির্ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে পারে মাত্র। আত্মজীবনামূলক উপন্যাসেও লেখক নিজেকে কিছুটা নিষ্ক্রিয় দর্শক ও সমালোচকের ভূমিকায় রাখিয়া অপর চরিত্রগুলির ক্রিয়া ও আচরণ এবং উহাদের অন্তর্নিহিত দোষগুণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। আলোচ্য উপন্যাসেও শ্রীকান্ত বক্তা ও দ্রষ্টা, সেজন্য সে আর সকলকে বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু নিজেকে বর্ণনা করিতে পারে নাই, ঘটনাস্রোতে সে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ঘটনাস্রোত নিজে নিয়ন্ত্রণ করে নাই। ইন্দ্রনাথ, অন্নদা দিদি, পিয়ারী বাইজী প্রভৃতি প্রধান চরিত্র ছাড়াও সে মেজদা, নতুনদা, কুমার বাহাদুর, রামবাবু, সাধুবাবা প্রভৃতি কত ছোট ছোট চরিত্রের সক্রিয়, সম্পূর্ণ ও সরস চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ইহারা সকলে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মনের উপর বিচিত্র ভালমন্দের প্রভাবজাল বিস্তার করিয়াছে। ইহাদের অনুরাগ ও বিরাগ শ্রীকান্তের হৃদয়ে গভীর অনুভূতির আলোড়ন আনিয়াছে এবং ইহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জগৎসংসার সম্বন্ধে শ্রীকান্তের সত্যদৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসে শ্রীকান্তের এই অনুভূতিশীল ও সত্যসন্ধানী মননশীল সত্তার বিবর্তন ও উন্মোচনই আমরা দেখিয়াছি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীকান্তের অন্তঃপ্রকৃতি বিমিশ্র ও বিপরীত উপাদানে গঠিত। সে ভবঘুরে, ছন্নছাড়া কিন্তু মানুষের প্রতি তাহার আগ্রহ

---

১। 'অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে গ্রন্থকার তাঁহার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই।'

শরৎচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৭২

ও ভালোবাসা অপরিসীম। সে ইন্দ্রনাথকে ভালোবাসিয়াছে, অন্নদাদিদিকে চিরশ্রদ্ধার আসনে স্থাপিত করিয়াছে। তাহার সুতীব্র প্রেমের সঙ্গে এক সুগভীর অনাসক্ত যেন যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সে রাজলক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। গৃহের স্নেহযত্নের জন্য তাহার মন একদিকে লালায়িত ছিল, অন্যদিকে সকল স্নেহ যত্নের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার পলাতক মন পথে বাহির হইতে চাহিত। প্রমোদসম্ভোগে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু আসক্তি ছিল না। কুমার বাহাদুরের সুরামত্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সে নিজের সংযত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল। মানুষের নীচ স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞতার আঘাত সে নতুনদা, রামবাবু ও তাহার স্ত্রীর মত চরিত্রের কাছে পাইয়াছে। তথাপি মানুষের প্রতি ভালোবাসা সে হারায় নাই। গৌরী তেওয়ারীর দুঃখিনী মেয়েটি এবং বসন্ত রোগাক্রান্ত রামবাবুর পরিবার তাহাকে কতখানি বিচলিত করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীকান্তের অন্তরে সহানুভূতির কোমলতার সহিত বিদ্রোহের উত্তাপও অনেকখানি মিলিয়াছিল। অন্নদাদিদি, নীরুদিদি, গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে প্রভৃতির দুঃখদুর্গতি ক্ষমাহীন, হৃদয়হীন সমাজের বিরুদ্ধে তাহাকে তীব্র প্রতিবাদে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। নারীর প্রতি সমাজের নিষ্ঠুর পীড়ন দেখিয়া সে সমবেদনায় বিচলিত হইয়াছে এবং দুর্গত নারীর উপেক্ষিত মূল্য ও মর্যাদা সে সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। তাহার দৃষ্টি স্বচ্ছ, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী। শ্মশানে সে ভয়ে আচ্ছন্ন হইলেও ভুতুড়ে কাণ্ডগুলির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা মনে মনে ভাবিয়াছে। তাহার মুক্ত ও মননশীল দৃষ্টির সহিত সৌন্দর্যরসিক দার্শনিক দৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। দুই রাত্রি শ্মশানে বসিয়া সে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে যে দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করিয়াছে এবং অন্ধকারের যে অপরিমেয় রহস্য ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে সে-স্থানগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতাময় জীবনের প্রারম্ভবেলায় দুইটি বিপরীতধর্মী চরিত্র তাহার মনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চরিত্র দুইটি হইল ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে নিষেধের পথে, ভাঙনের পথে টানিয়া আনিয়াছে কিন্তু অন্নদাদিদি অচল সংস্কার ও অনড় আদর্শের দৃঢ়-ভিত্তির সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোধ হয় শ্রীকান্তের জীবনের ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে।

সেজন্য শ্রীকান্ত কীর্তিনাশা নদীর দুকূলপ্লাবী প্রচণ্ড প্রলয়লীলা যেমন উল্লসিত আবেগে উপভোগ করিয়াছে তেমনি শান্ত নদীর স্নিগ্ধ শুভঙ্কর সঙ্গীতেও আকৃষ্ট হইয়াছে।

সংসারে এমন দুই একজন মানুষ দেখা যায় যাহারা সাংসারিক জনারণ্যের মধ্যে অজ্ঞাত আকাশের স্তর হইতে হঠাৎ জ্বলন্ত উল্কার মত আসিয়া পড়ে। ইন্দ্রনাথ সে-ধরণের মানুষ। সে প্রচলিত নীতির চোখরাঙানি গ্রাহ্য করে না, স্বাভাবিক নিয়মকানুনের পরোয়া করে না। সে উদ্ধত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী। ভয় তাহাকে ভয় পায়, বিপদ তাহার পথ ছাড়িয়া দেয়। তাহার এই বেনিয়মী, বেপরোয়া জীবনের প্রচণ্ড পৌরুষ এবং অসামান্য মহত্ত্ব শ্রীকান্তের কিশোর হৃদয়কে এমন দুর্নিবার আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার মুখের ভাষায় অনাবৃত রূঢ়তা এবং তাহার লৌহকঠিন বাহুতে অসাধারণ শক্তি। কিন্তু এই অমিততেজা মানুষটির মধ্যে এক আশ্চর্য কোমলতার অস্তিত্ব রহিয়াছে। শ্রীকান্তকে সে ভালোবাসে এবং অন্নদাদিদির জন্য জগতের যে কোন অসাধ্য কাজ করিতে সে পারে। ইন্দ্রনাথের চরিত্র কাজে আচরণে অসামান্য হইলেও তাহার সরল বুদ্ধি ও সহজ বিশ্বাস ঠিক তাহার বয়সেরই উপযুক্ত। অশরীরী আত্মাদের গমনাগমন সে বিশ্বাস করে আবার রামনামের অব্যর্থ প্রতিষেধক ক্রিয়াতেও সে আস্থাশীল। সাপুড়েরা সাপের মন্ত্র জানে এ-ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল ছিল, আবার মড়ার যে জাত নাই এ মহাসত্যটি নিতান্ত সহজ সংস্কারের মতই তাহার কিশোর হৃদয়ে উপলব্ধ হইয়াছিল। অন্নদাদিদির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রনাথের চরিত্র যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুনদার সান্নিধ্যে যে ইন্দ্রনাথকে দেখি সে বুঝি পূর্বেকার ইন্দ্রনাথ নহে। সে যেন কিরকম নিস্তেজ, সন্ত্রস্ত এবং আত্মমর্যাদাবোধহীন। ইহার পরে ইন্দ্রনাথ শেষ হইয়া গিয়াছে, ভালোই হইয়াছে, কারণ ইন্দ্রনাথের অন্যরূপ কখনও আমাদের সহ্য হইত না। সে উল্কার মত প্রদীপ্ত আলো ছড়াইয়া আবার ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ক্ষণকালীন আলোকচ্ছটা এক চিরন্তন দীপ্তি লইয়া পাঠকের মনে জাগিয়া রহিয়াছে।

অন্নদাদিদি শ্রীকান্তের অনিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যে চিরকাল সংযম ও নিবৃত্তির এক নিরভ্রী আদর্শরূপেই বাঁচিয়া রহিয়াছে। অন্নদাদিদি নারীর সহিষ্ণুতা, দুঃখভোগ ও পাতিব্রত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ সমাজের চোখে সে কুলত্যাগিনী ভ্রষ্টা নারী ছাড়া আর কিছু নহে। শরৎচন্দ্র

চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের দৃষ্টি কতদূর ভ্রান্ত এবং আমাদের বিচার কতখানি অসঙ্গত। তবে সন্দেহ হয়, অন্নদা স্বামীকে ভালোবাসিয়া ঘর ছাড়িয়াছিল, না স্বামিত্বের আদর্শের প্রতি অনুগত হইয়া এত বড দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছিল? যে স্বামী তার বড বোনকে হত্যা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, স্ত্রীর মাথায় চরম অপমানের বোঝা চাপাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল সেই স্বামীর জন্যই অন্নদার হৃদয়ে ক্ষোভহীন, অভিযোগহীন এতখানি ভালোবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল যে সাপুড়ের বেশে তাহাকে দেখিয়াই অন্নদা গৃহত্যাগ করিল, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, অন্নদার মত নারী পতি অপেক্ষা পাতিব্রত্যের আদর্শকে বড় মনে করে, সেজন্য পতির ব্যক্তিজীবন তাহাদের বিচার্য নহে, পাতিব্রত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিলেই তাহারা সুখী। কিন্তু এরকম পতিব্রতা নারীও অবশেষে একদিক দিয়া পতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। কারণ শাহজীর মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি সে নিজেই অনাবৃত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং অন্নদার মধ্যে শুধু কেবল পাতিব্রত্যের আদর্শ নহে, সত্য ও নীতির আদর্শও বিরাজিত ছিল। ইন্দ্রনাথের কাছ হইতে মিথ্যার পর মিথ্যা বলিয়া শাহজী অনেক টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাত করিয়াছে। এই ঘোর অন্যায় ও মিথ্যাচার অন্নদা শেষ পর্যন্ত তাহার স্বামীর জন্যও সহ্য করিতে পারে নাই, এবং স্বামীর ক্রোধ ও নিজেদের সুনিশ্চিত দুর্গতির আশঙ্কা সত্ত্বেও সে সত্য প্রকাশ করিয়া নিজেকে হাল্কা করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের ন্যায় অন্নদাদিদিও একদিন এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীকান্ত এই অল্পকালের পরিচিত অসামান্য নারীটিকে চিরকাল গভীর শ্রদ্ধায় মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের যৌবনপর্বে যে নারী শ্রীকান্তের হৃদয়-রাজ্যে সম্রাজ্ঞীর মত প্রবেশ করিল তাহার সহিত শ্রীকান্তের দেখা হইল অতিনাটকীয় ভাবে। মদিরামত্ত সঙ্গীত-মজলিসে যে সুকণ্ঠী বাইজী তাহার কণ্ঠের সকল মাধুর্য এবং হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ ঢালিয়া শ্রীকান্তকে গান শুনাইয়াছিল সেই যে তাহার কৈশোর-সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঠিক চিনিয়াছিল। বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া যে নিরীহ ম্যালেরিয়াজীর্ণ মেয়েটি অনেক চোখের জলে সিক্ত করিয়া মালাটি শ্রীকান্তের গলায় পরাইয়া দিত সে যে সঙ্গে সঙ্গে মালার সঙ্গে হৃদয়টিও এই লোভী ও

দুর্দান্ত ছেলেটিকে দিয়া দিয়াছিল এ-সত্য শ্রীকান্তের জানা ছিল না, কিন্তু এ-সত্য বাইজী-জীবনের শতপ্রকার গ্লানি ও বিকার সত্ত্বেও রাজলক্ষীর হৃদয়ে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পিয়ারী বাইজীকে ঘিরিয়া কামোন্মত্ত বহু পুরুষের কালো লালসা হয়তো মধুমত্ত ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিয়াছে, হয়তো তাহাকে ভালোবাসার ছলনা করিয়া তাহাদের মুখে প্রমোদ-মদিরা বার বার তুলিয়া ধরিতে হইয়াছে, কিন্তু এই কলুষিত জীবনের পঙ্কে মগ্ন হইয়া সে তাহার বাল্যকালের ভালোবাসাকে এক অনাঘ্রাত পুষ্পের মত কিভাবে সযত্নে অন্তরের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শুনিতে পাই, ছেলেবেলার ভালোবাসা নাকি কখনো হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় না এবং নারী একবার ভালোবাসিলে নাকি সহজে ভোলে না। সেজন্য হয়তো রাজলক্ষী শ্রীকান্তকে ভুলিতে পারে নাই। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তারপর তাহার বাইজী-জীবন শুরু হইল, কিন্তু বোধ হয় জীবনে সে একমাত্র শ্রীকান্তকেই ভালোবাসিয়াছিল। চারিদিকের পুষ্পিত বসন্তবনের মধ্যে সে বোধ হয় একাকিনী দীর্ঘ বিরহ যাপন করিতেছিল। শ্রীকান্তকে দেখার পর তাহার সেই বিরহপর্ব সাঙ্গ হইল এবং এই বহুবাঞ্ছিতা অথচ একচারিণী নারীর জীবনে প্রকৃত মধুলগ্ন শুরু হইল। শ্রীকান্ত কিন্তু রাজলক্ষীকে দেখিয়াই তাহার কাছে অন্তর উজাড় করিয়া দেয় নাই। সংশয়, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা প্রভৃতি প্রতিকূল স্তর পার হইবার পর তাহার ভালোবাসার পালে অনুকূল হাওয়া লাগিয়াছে। পিয়ারী বাইজী রাজলক্ষীর বাহিরের সত্তা মাত্র। সে বহুরঙ্গিনী বাইজী, মধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া সে তাহার অনুরাগী শ্রোতাদিগকে মোহিত করে, তাহার হাসি ও কটাক্ষ তীক্ষ্ণ ছুরি ও শাণিত বাণের মতই মদোন্মত্ত ভক্তদের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। তাহার কথায় কথায় শ্লেষের হুল ও বিদ্রূপের বাঁকা ঝলক। কিন্তু এ-সব হইল তাহার নিতান্তই বাহ্যবস্তু। সঙ্গীতের সুরামত্ত আসর হইতে যে মুহূর্তে সে বিদায় লইল সেই মুহূর্তেই বাইজীর ছদ্মবেশ যেন খসিয়া পড়িল এবং স্নেহ-কোমলা মমতাময়ী এবং পুণ্যচারিণী এক নারী তখন আত্মপ্রকাশ করিল। রাজলক্ষীর মধ্যেও যেন দুই বিভক্ত সত্তার অস্তিত্ব রহিয়াছে। একদিকে সে তাহার নারীত্বের সমস্ত স্নেহ-যত্ন-অনুরাগের নৈবেদ্য সাজাইয়া প্রণয়দেবতার পাদতলে উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। অন্যদিকে তাহার সচেতন মাতৃত্ব উদ্যত শাসনের মতই তাহার নারীত্বের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীকান্তকে

কাছে রাখিয়া তাহার হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসার গোপন অন্তঃপুরে সে বন্দী রাখিতে চাহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর মা তাহার সকল লজ্জা, সম্ভ্রম ও মর্যাদা লইয়া আসিয়া সেই অন্তঃপুর হইতে শ্রীকান্তকে বিদায় দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। এই যে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে চাওয়া ও না-চাওয়া, ধরিয়া রাখা ও ছাড়িয়া দেওয়ার পরস্পরবিরোধী ক্রিয়া চলিয়াছে তাহারই ফলে চরিত্রটির বেদনা ও রহস্য এত ঘনীভূত হইয়াছে। 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে'—এই প্রেম চারিপর্ব ধরিয়া শ্রীকান্তকে কখনও কাছে টানিয়া রাখিয়াছে, আবার কখনও বা দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে সে-কারণেই মিলনের অমরাবতী এবং বিরহের অলকাপুরী বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যাইতে পারে। শুধু যে এই উপন্যাসে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার নিবিড়তম প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার শিল্পী-সত্তারও প্রকৃষ্টতম পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ইহাতে তাত্ত্বিকতার আতিশয্য যে একটু অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে তাহা সত্য। আলোচ্য প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার যে প্রবণতা এই উপন্যাসে দেখা যায় তাহাতে মূল সূত্র অনেক সময় হারাইয়া ফেলিতে হয় তাহাও সত্য। তবুও অস্বীকার করা চলে না, ভাষার ইন্দ্রজাল, বর্ণাঢ্য চিত্র-সমারোহ এবং বিচিত্র রসসৃষ্টির ফলে আলোচ্য উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রশংসা করিয়া মোহিতলাল বলিয়াছেন, 'ওস্তাদ সুরশিল্পী প্রথমে যেমন যন্ত্রটি নির্বাচন করিয়া পরে তাহার তারগুলিকে আপনার প্রয়োজনে সুতন্ত্রিত করিয়া লয়, শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন তেমনই তাঁহার প্রাণের সুরটি বাজাইবার জন্য ভাষার তারগুলি তাহার উপযোগী করিতে পারিয়াছিলেন—এইখানে সাহিত্য-শিল্পীর প্রথম ও শেষ কৃতিত্ব।' এই ভাষায় একদিকে যেমন আছে কথ্য ভাষার সচল ও প্রত্যক্ষ স্বাভাবিকতা, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃত বিশেষণপদ ও সমাসবদ্ধ বাক্যের গম্ভীর মহিমা ও কলাসৌন্দর্য। শ্মশানের দুই রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণনার সময় তাঁহাকে জগতের অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্য এবং জটিল রহস্য ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে, সেজন্য সেখানে তাঁহার ভাষা এত চিত্রময় এবং সঙ্গীতঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠাভ্যাস, শ্রীনাথ বহুরূপীর বৃত্তান্ত, মেঘনাদ বধ পালা, এবং পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে সরস কথোপকথন প্রভৃতি স্থলে সরস বাস্তব ঘটনা বর্ণনায়

তাঁহার ভাষায় কথ্য ভাষায় লঘুতা ও হাল্কা বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগ দেখিয়াছি। 'শ্রী কান্ত' উপন্যাসখানি চিত্ররসপ্রধান। একটির পর একটি চিত্র—কোনটি স্থির, কোনটি গতিশীল, কোনটি হাল্কা রঙে রঙীন, কোনটি বা গাঢ় রঙে রঞ্জিত —এরূপ বহু চিত্র দেখিতে পাই।[১] শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযানের চিত্র এক দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চরসে আমাদের মন পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। খরস্রোতা গঙ্গার বাঁকে বাঁকে এবং ভুট্টা-জনার-বনঝাউয়ের ফাঁকে ফাঁকে যেন কত অজানা বিপদ ওঁত পাতিয়া আছে, উদ্বিগ্ন, আশঙ্কিত পাঠকের মন সেই চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হইতে থাকে। লোকালয় হইতে বহুদূরে বনজঙ্গলাকীর্ণ ঘন-ছায়াচ্ছন্ন যে সাপুড়ে-পরিবেশের চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যেও যেন অন্নদা ও শাহজীর অজ্ঞাত-জীবন-রহস্যের মত কত রহস্য ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকান্তের শ্মশান-অভিজ্ঞতার চিত্রে আমাদের চোখের সম্মুখে যেন একটি কালো যবনিকা অপসারিত হইয়া যায় এবং বিশ্বসৌন্দর্যের আদি-উৎস হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র হাল্কা ও গম্ভীর, কৌতুক ও করুণ প্রভৃতি পরস্পর বিপরীতধর্মী রস পর পর এমন ভাবে অবতারণা করিয়াছেন যে উপন্যাসের মধ্যে রসের বৈচিত্র্য ও আগ্রহোদ্দীপকতা আদ্যন্ত বজায় রহিয়াছে। শ্রীকান্তের পাঠাভ্যাস ও বহুরূপীর প্রবল কৌতুকাবহ বৃত্তান্তে আমাদের চিত্ত উত্তেজিত করিয়াই লেখক শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের বিপদসঙ্কুল নিশীথ অভিযানের বর্ণনা দ্বারা আমাদের মনে শ্বাসরোধকারী উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। আবার মেঘনাদ-বধ পালায় বীরপুঙ্গব মেঘনাদের অপূর্ব বীরত্বের বর্ণনা দ্বারা আমাদের প্রবল হাস্যবেগ উদ্রেক করিয়া অব্যবহিত পরেই অন্নদাদিদির মর্মান্তিক শোকের দৃশ্যে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। প্রথমদিকে কৌতুকরসের যে অনর্গল, উতরোল ও অতিশয়িত রূপ আছে উপন্যাসের শেষ দিকে তাহা নাই বটে, কিন্তু লেখক আগাগোড়া একটি অন্তরঙ্গ, রমণীয়, পরিহাসোজ্জ্বল রচনাভঙ্গি বজায় রাখিয়াছেন। তাহার ফলে তিনি যেমন অতি সহজেই পাঠকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়াছেন, তেমনি তাঁহার বর্ণনীয় করুণ-গম্ভীর বিষয়গুলিও আরও বেশি উপভোগ্য ও সংবেদনশীল হইয়া উঠিয়াছে।

১। শ্রীকালিদাস রায় তাঁহার 'শরৎ-সাহিত্যে' 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিকে চিত্রকাব্য বলিয়াছেন।

## বিবিধ ঘটনা

কলিকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের লেখা প্রকাশিত হইলে লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মদেশের বাঙালী মহলে ছড়াইয়া পড়িল এবং তখন এই উপেক্ষিত সাধারণ লোকটি সভাসমিতিতে প্রচুর খাতির ও সম্মান পাইতে লাগিলেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যিক সাধনার কথা পরিচিত মহলে গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিতেন এবং প্রকাশ্য সভাসমিতি ও বিশিষ্ট লোকদের সহিত মেলামেশা সযত্নে এড়াইয়া যাইতে চাহিতেন। তবুও বন্ধুবান্ধবদের পীড়াপীড়িতে কয়েকটি সম্বর্ধনা-সভার সহিত তিনি যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা করিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের সম্বর্ধনা-সভার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের পর যখন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে আসিয়াছিলেন তখন রেঙ্গুনের ডঃ. পি জে. মেহ্‌তার গৃহে তাঁহার যে বিরাট সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। রেঙ্গুনে ভিক্টোরিয়া হলে মহাত্মা গান্ধীকে যে সম্বর্ধনা জানান হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট শরৎচন্দ্র লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই রিপোর্ট বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডঃ মেটার বাড়িতে মহাত্মাজীর যে প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে শরৎচন্দ্রকে একখানি ভজন গান করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছিল কিন্তু শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গান গাহিতে রাজি হইলেন না।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বানন্দ রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সেই মঠের একটি মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি সঙ্গীতাভিনয়ের সাহায্যরজনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গিরীন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র আমার বিশেষ অনুরোধে তাহার দৃশ্যপট পরিকল্পনা, সাজসজ্জা নির্বাচন ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত স্টেজের ভিতর উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের উচ্চাঙ্গের নির্বাচিত অভিনয় রেঙ্গুন সহরে প্রথম হওয়ায় ইহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং অর্থ সাফল্যে এক রাত্রে চৌদ্দ শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।'[১]

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ২১৪-২১৫।

রবীন্দ্রনাথ জাপান হইয়া আমেরিকা যাইবার পথে রেঙ্গুনে আসিলেন। রেঙ্গুনের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি. সি. সেনের গৃহে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মিঃ সেন গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের একখানা অভিনন্দনপত্র রচনা করিবার ভার দিলেন। গিরীন্দ্রনাথ অভিনন্দন পত্রখানি শরৎচন্দ্রকে দিয়া রচনা করাইলেন। কবিগুরুর সম্বর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্রের একখানি গান গাহিবারও কথা ছিল, 'কিন্তু তাঁহার স্বভাবজাত দৌর্বল্যবশত তিনি শেষ মুহূর্তে আসিয়া গান করিতে অস্বীকার করিলেন।' শরৎচন্দ্র-লিখিত অভিনন্দন-পত্রখানি ভাষা, ভাব, তত্ত্বব্যাখ্যা ও সাহিত্যগুণে অতিশয় সমৃদ্ধ। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

জগৎবরেণ্য শ্রীযুত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট, ডি লিট মহোদয়

শ্রীকরকমলেষু

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবিপ্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গহৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্য-বীণার সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণু পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।

আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃতসত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা।

| | |
|---|---|
| রেঙ্গুন | ইতি— |
| ২৫শে বৈশাখ, | ভবদীয় গুণমুগ্ধ— |
| ১৩২৩ বঙ্গাব্দ | রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ |

শরৎচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গিরীন্দ্রনাথ তাঁহাকে একদিন মিঃ সেনের বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেখানে বহু গণ্যমান্য লোকের মধ্যে শরৎচন্দ্র খুবই ভয় ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। গিরীন্দ্রনাথের কথায়, 'এত অপরিচিত লোককে একত্র দেখিয়া শরৎচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। আমি অতি কষ্টে তাঁহাকে মিঃ সেনের সম্মুখে লইয়া গিয়া, ইনিই বাংলা অভিনন্দন পত্রখানির লেখক শরৎবাবু বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে মিঃ সেন তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন।' গিরীন্দ্রনাথ মিঃ সেনের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, শরৎচন্দ্র উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথের যে কথোপকথন হইল তাহা গিরীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্যক্ত হইল—

'আমি বলিলাম—শরৎদা, একটু অপেক্ষা কর, রবিবাবু আসছেন এখুনি গ্রুপ ফটো তোলা হবে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—সে তোমাদের জন্য। আমার মত চড়াই পাখীর রবিবাবুর সঙ্গে বসে ফটো তোলান সাজে না।

ইতিমধ্যে রবিবাবু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই, শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি হন হন করিয়া ফটক পার হইয়া গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সাধারণের মধ্যে আসিয়া মেলামেশা করিতে তিনি বড়ই ভয় পাইতেন।'[১]

শরৎচন্দ্র তাঁহার চৌদ্দ বৎসরের ব্রহ্মবাসের মধ্যে তিনবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তিন মাসের ছুটি লইয়া হাইড্রোসিল অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তিনি দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসেন। তিনি একমাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছিলেন।[২] সেবার তিনি হাওড়া শহরে খুরুট রোডে (বর্তমানে নেতাজী সুভাষ রোড) ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ-স্থলের কাছাকাছি ঘোলাডাঙ্গায় এক পতিতালয়ে উঠিয়াছিলেন।[৩] উপেন্দ্রনাথ একদিন ঐ ঠিকানায় আসিয়া তাঁহার খোঁজ নিতে যাইয়া দেখেন, তিনি মেঝেয় বসিয়া চরিত্রহীন উপন্যাস লিখিতেছেন।

এই দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আসিয়া তিনি সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁহার মারফত 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচিত হন। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় 'যমুনা'র জন্য নিয়মিত লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে ছয় মাসের ছুটি লইয়া তিনি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন লিখিয়াছেন, চোরবাগানের কোন গলিতে তাঁহার আস্তানা ছিল। সেখানকার ঠিকানা শরৎচন্দ্র তাঁহাকে জানান নাই। শরৎচন্দ্র রোজ 'যমুনা'র অফিসে যাইতেন। সেখানে অনেক সাহিত্যিক আসিয়া আড্ডা জমাইতেন। কবি ও কথাশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা এই 'যমুনা' অফিসেই গড়িয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র নানা সরস গল্প বলিয়া সকলকে মাতাইয়া রাখিতেন। সেবার তিনি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি ছয়মাস পরে ব্রহ্মদেশে ফিরিবার সময় হিরণ্ময়ী দেবীকে চোরবাগানের বাসায় রাখিয়া যান, কারণ, ১৯১৫ ইং সনের

---

১। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র, পৃঃ ২৩২

২। সতীশচন্দ্র দাস 'শরৎ প্রতিভা'য় লিখিয়াছেন, ১৯১২ ইং অক্টোবর মাসে আবার তিনি দুই মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

৩। 'সৌরীন্দ্রমোহন কিন্তু তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' নামক বইতে লিখিয়াছেন, 'সেবারে এসে শরৎচন্দ্র আস্তানা নিয়েছিলেন চোরবাগানে। কোথায়—ঠিকানা জানান নি। বিশেষ অনুরোধেও নয়, তবে আমাদের কাছে নিত্য আসতেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি চিঠিতে লিখিলেন, 'এঁকে ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না, তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবামাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য B. I S N-কে intimation দিয়ো। তাহারাই বলিয়া দিবে কোন্ berth পাওয়া যাইবে। তারপর যেদিন হোক টাকা লইয়া টিকিট লইয়া আসিয়ো।' ঐ চিঠির মধ্যেই লেখা রহিয়াছে যে, তিনি এক বছর পরেই কলিকাতায় ফিরিবেন। এক বছর পরেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য আসিলেন।

## ব্রহ্মদেশ ত্যাগ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র দুরারোগ্য পা-ফোলা রোগে আক্রান্ত হইয়া গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। ২২. ২. ১৬ তারিখে তিনি এই অসুখ সম্বন্ধে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিলেন, 'এ শুনি বর্মা দেশের ব্যায়রাম দেশ না ছাড়িলে কোনদিন এর ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি আনবায় হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবানই জানেন। ভয় হয়, হয়ত বা চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব। এই সম্ভাবনা মনে করিতেও যেন পারি না। যাহাকে যথার্থই বলে ভয়ে 'পেটের ভাত চাল' হইয়া যাওয়া, আমার তাই হইয়াছে। সুতরাং Dispepsiaও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। হইবার কথাও বটে। কারণ, খাও দাও, স্নান কর, লেখাপড়া কর, কিন্তু চলিয়া বেড়াইবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলে হজম হওয়াও বন্ধ হইয়া আসে। ডান পায়ের হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। অথচ গোদ নয়—কি যে ডাক্তারেরা তাহাও বলিতে পারে না —কতদিনে সারিবে কিংবা কোনদিন সারিবে কিনা এ খবরও তাঁরা দিতে পারেন না। দু'দিন বা কিছু কমে, দু'দিন বা ঠিক তেমনি হইয়া দাঁড়ায়। গতবারে যখন লিখি, তখন এইরূপ কমিবার মুখে আসিতেছিল বলিয়া খুব একটা আশা হইয়াছিল, কিন্তু তার পরেই আবার যখন ধীরে ধীরে তেমনি হইয়া উঠিতে লাগিল তখন আশা ভরসা সব গেল।'

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের এই অসুখের কথা জানিয়া তাঁহাকে মাসে একশত টাকা করিয়া দিবেন এই আশ্বাস দিলেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মদেশ

ছাড়িয়া আসিবার কথা জানাইলেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নিয়মিত অর্থের প্রতিশ্রুতি পাইয়া শরৎচন্দ্র পরম স্বস্তি লাভ করিলেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে লিখিলেন, 'আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না, দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন তাই ভাল।...

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকাকড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়। আর যদি মরি—আপনাকে write off করিতেই হইবে। আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা। আপনি আমাকে ৩০০৲ তিনশ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি।...

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া—আপনার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

......আমার কোটী কোটী আশীর্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়ম কানুন সবই বড় সাহেবের মর্জি। আপনি যা আমাকে দিবেন সে-ই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।'

শরৎচন্দ্রের এই পত্র পাইয়া হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গোপালচন্দ্র রায় তাহার 'শরৎচন্দ্র' নামক জীবনী-গ্রন্থে শরৎচন্দ্রকে মাসিক একশ টাকা করিয়া দিবার যে প্রতিশ্রুতি হরিদাস চট্টোপাধ্যায় দিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে মাসে যে ১০০ টাকা করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে হরিদাসবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন—এই টাকার মধ্য থেকে শরৎচন্দ্র ৫০ টাকা পেতেন ভারতবর্ষের লেখক ব'লে। অবশ্য এই ৫০ টাকার জন্য যে

প্রতি মাসেই তাঁকে ভারতবর্ষে লেখা দিতে হ'ত তা নয়। যে মাসে তিনি লেখা দিতেন না, সে মাসেও তিনি নিয়মিত টাকা পেতেন। হরিদাসবাবু এই ১০০ টাকার বাকি ৫০ টাকা দিতেন, তাঁদেরই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স নামক পুস্তকালয় হ'তে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-সমূহের হিসাব থেকে। এই সময় শরৎচন্দ্রের পুস্তকের আয় বাড়লে, পুস্তকের হিসাব অগ্রিম নেওয়া এই টাকা এবং রেঙ্গুন থেকে আসবার সময় হরিদাসবাবুর প্রেরিত ৩০০ টাকা সমস্তই শোধ হ'য়ে গিয়েছিল।'

১৪, ৩, ১৯১৬ তারিখে শরৎচন্দ্র সুধীরচন্দ্র সরকারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, '···শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না ······আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১২ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না।'

অসুখের জন্য শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সত্য, কিন্তু ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিবার আর একটি কারণের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। ক্রমবর্ধমান সাহিত্য প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্য হইতে স্থায়ী ও নির্দিষ্ট আয়ের সম্ভাবনায় শরৎচন্দ্র অফিসের কাজকর্মের প্রতি দিন দিন বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। এ-সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছেন, 'সাহিত্য-সভার অধিবেশনের পর শরৎবাবু প্রায়ই বলিতেন, আমার আর এখানকার চাকরী একদিনও ভাল লাগছে না।

ভাল না লাগার প্রধান ও মুখ্য কারণ হইতেছে অফিসের বাঁধাবাঁধি নিয়মের সঙ্গে স্বাধীনতা মনোবৃত্তির খাপ না খাওয়া। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, আর্থিক আকর্ষণ।'

শরৎচন্দ্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও সুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত উপরের দুইখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি এক বৎসরের ছুটি লইয়া কলিকাতায় যাইতেছেন। কিন্তু রেঙ্গুন হইতে রওনা হইবার কয়েকদিন আগে কিন্তু অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে মারামারি করিয়া তিনি তাঁহার কাজে ইস্তফা দেন। অফিসের কাজের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরক্তির পরিণতিই যে এই মারামারি তাহা বুঝিতে পারা যায়। শরৎচন্দ্র তাঁহার অবাঞ্ছিত চাকরী হইতে

মুক্তি চাহিতেছিলেন এবং অবশেষে সেই মুক্তি তিনি পাইলেন। শরৎচন্দ্রের কর্মত্যাগ সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্রের চাকুরীজীবন শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতিতে সহিল না। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসের ছোট সাহেবের সহিত সামান্য কারণে ঘুসাঘুসি করিয়া তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এই ঘটনায় তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই মনে করিল যে, এইবার শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টগগন কুহেলিকাচ্ছন্ন হইবে, এমন সরকারী চাকরী তাঁহার অদৃষ্টে আর জুটিবে না, কিন্তু এই ঘটনাই শরৎচন্দ্রের জীবনস্রোতের গতি পরিবর্তন করিয়া দিল। জানি না, ভগবান কাহাকে কোন্ পথ দিয়া কোথায় লইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের বিধান করেন। কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে মানবভাগ্য পরিবর্তিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে?

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পরে রেঙ্গুন ত্যাগ করিবার পূর্বদিন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের কয়েকটি সাহিত্যিক বন্ধু স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবগৃহে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ভরসাতেই তিনি কলিকাতায় যাইতেছেন।'

শরৎচন্দ্রের সহকর্মী যোগেন্দ্রনাথ সরকার অফিসের সাহেবের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মারামারির বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কাহার দোষ কিরূপ ছিল তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াছেন 'সকশনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থেকে সুরু করিয়া বড় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর বার্নার্ড, এমন কি শেষটায় সেকশনের ইনচার্জ অফিসার পর্যন্ত চ্যাটার্জীর প্রতি বিরক্ত হইয়া গেলেন। চ্যাটার্জীও ক্রমশ এমন বেপরোয়া হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে, ব্যাপারটা একদিন চরমে উঠিল। দুই পক্ষে লাগিল ঠোকাঠুকি। বাক্‌যুদ্ধে জয়ী হইলেও শরৎচন্দ্র মল্লযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। সকলেরই মুখে, বিশেষত তামিলভাষী মাদ্রাজদেশীয় দ্রাবিড় জাতির মুখে কেবল ওই এক কথা, চ্যাটার্জী এবার বার্নার্ডের বিরুদ্ধে কেস করুক।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রতিপক্ষ ফিরিঙ্গী বার্নার্ড সাহেবের ব্যবহারও মনে পড়ে। সুন্দর চেহারা, সুশিক্ষিত এই সাহেবটির গলার আওয়াজও সচরাচর কেহ শুনিতে পাইত না। পাছে নিজের ব্যবহার অপরের বিরক্তি উৎপাদন করে, এই দিকে সাহেবের লক্ষ্যও ছিল খুব বেশী।'

আমি কাহারও চরিত্রের সমালোচনা করিতেছি না, যাহা নিছক সত্য, তাহাই বলিতেছি।'

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিলেন।[১] চৌদ্দ বৎসর ইরাবতীর তীরে কাটাইয়া জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় লইয়া তিনি স্বদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। ইরাবতীর ধারা শেষ হইয়া গেল, গঙ্গা ও রূপনারায়ণ তীরে তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু হইল। ভাগলপুরে তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ, রেঙ্গুনে সেই প্রতিভার পরিপুষ্টি এবং বাংলাদেশে তাহার পরিণতি। রেঙ্গুনে তাঁহার অজ্ঞাতবাসপর্ব। সম্মান ও প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল আলোক হইতে দূরে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানুষের মধ্যে তিনি সাহিত্যের অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন। লোকের দৃষ্টির অগোচরে তিনি একাগ্র নিষ্ঠা লইয়া জ্ঞানভাণ্ডারের মণিরত্ন আহরণ করিতেছিলেন। একদিকে জীবনের বাস্তব সংস্পর্শ এবং অন্যদিকে জ্ঞানের অপরিমেয় সম্পদ—ভবিষ্যৎ সাহিত্যজীবনের স্বর্ণদ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মদেশ তিনি ছাড়িলেন, কিন্তু ব্রহ্মদেশকে তিনি ধরিয়া রাখিলেন সাহিত্যের মধ্যে। 'শ্রীকান্ত' (২য়), 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি তাঁহার চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশ পরিক্রমা করিয়াছেন। যাহারা কোনদিন ব্রহ্মদেশে যান নাই তাহাদের কাছেও শরৎ-সাহিত্যের মারফত ব্রহ্মদেশের ঘরবাড়ি ও মানুষ অতি পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

## দেশে প্রত্যাবর্তন—বাজে শিবপুরে অবস্থিতি

রেঙ্গুন হইতে দেশে ফিরিবার আগে শরৎচন্দ্র ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে তাঁহার জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য বলিয়াছিলেন।

---

১। সতীশচন্দ্র দাস 'শরৎ প্রতিভা' গ্রন্থে বলিয়াছেন, তিনি বোধহয় ১১ই এপ্রিল তারিখে রেঙ্গুন ছাড়িয়াছিলেন। হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে রওনা হইবার আগে শরৎচন্দ্র জানাইয়াছিলেন '১১ই এপ্রিলের পূর্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না।' ৭. ৪. ১৬ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বসুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন 'এ পত্র' যখন আপনার হাতে পড়িবে তখন আমি আর এ-ঠিকানায় থাকিব না। সুতরাং এতগুলি প্রমাণ হইতে মনে হয় শরৎচন্দ্র ১১ই এপ্রিল তারিখেই রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন যে, শরৎচন্দ্র ৮ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভার পরে রেঙ্গুন হইতে রওনা হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ সরকারের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথের উক্তি এখানে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। শরৎচন্দ্র ১১ই এপ্রিল তারিখেই রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের ধারণা।

প্রকাশচন্দ্র ঐ চিঠি পাইয়া দিদি অনিলাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন। অনিলাদেবীর মেজদেবরের এক মেয়ে রাণুবালার বিবাহ হইয়াছিল হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে। অনিলাদেবী প্রকাশচন্দ্রকে রাণুবালার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। রাণুবালার এক ভাসুরপো ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন শরৎচন্দ্রের জন্য ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনের তিনখানা ঘর ঠিক করিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে এই বাড়িতেই আসিয়া উঠিলেন। এই বাড়িতে তিনি নয় দশ মাস ছিলেন এবং পরে পাশের ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাই লেনে উঠিয়া যান।

শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুরের বাড়িতে আসিয়া ভাইবোন সকলকেই খবর পাঠাইলেন। অনিলাদেবী ও তাঁহার স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। মুঙ্গেরে তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারী করিয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীদেবী তাঁহার গায়ের সকল গহনা খুলিয়া নববিবাহিতা দেবরবধূকে সাজাইয়া দিলেন। মেজভাই প্রভাসচন্দ্রও (স্বামী বেদানন্দ) আসিয়া দাদার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। ছোট বোন সুশীলাও আসানসোল হইতে আসিয়া দাদার কাছে কিছুদিন ছিলেন।

ভাইবোন ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের অনেক দায়-দায়িত্ব শরৎচন্দ্রকেই বহন করিতে হইত। রেঙ্গুন হইতে ফিরিবার অল্পদিন পরেই অনিলাদেবীর এক কন্যার বিবাহের চাপ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়ে। এজন্য বাধ্য হইয়া হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে টাকার জন্য অনুরোধ জানাইতে হইল।[১] এই সময়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে তিনি যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতে জানা যায় যে, দেশে আত্মীয়স্বজনদের কাছে তিনি একঘরে ছিলেন। ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেক অলীক ও অতিরঞ্জিত ধারণা বিদ্যমান ছিল। হিরণ্ময়ীদেবীর সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধের কথাও অনেকে ঠিক জানিত না। তাহার গল্প-উপন্যাসের তথাকথিত দুর্নীতিমূলক বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও সাধারণের মনে তীব্র প্রতিকূল মনোভাব ছিল।

১ ২৯.৬.১৬ তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'জানেন বোধহয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। একদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি একঘরে। আমার কাজকর্মে বাড়ীকে যাওয়া ঠিক নয়। যাক সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই। অথচ আমি না যাই এই তাদের গোপন ইচ্ছা। আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই।'

এ-সব কারণেই তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে চরিত্রহীন সমাজদ্রোহী ব্যক্তি বলিয়াই জানিত এবং যথাসম্ভব তাঁহার সম্পর্ক পরিহার করিয়া চলিত।

ব্রহ্মদেশ হইতে শরৎচন্দ্র যখন আসিলেন তখন কাহারও সহিত তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না। ক্রমে ক্রমে পাড়াপ্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। তাঁহার বাড়ির একটা বাড়ি পরেই ভূতনাথ মিত্রের বৈঠকখানায় তিনি অনেক সময় কাটাইতেন। তাঁহার সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসিলে এই বৈঠকখানায় বসিয়াই তিনি গল্পগুজব করিতেন। তাঁহার পাড়ার সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। সরোজরঞ্জন 'অরক্ষণীয়া' গল্পটির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিযাছিলেন। 'অরক্ষণীয়া'র অনেকগুলি সংস্করণে এই ভূমিকাটি ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের নাম ও প্রকৃতি অবলম্বনে শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে'র অক্ষয় চরিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন।

সাহিত্যিক সমাজেও শরৎচন্দ্র কিছুদিনের মধ্যে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন। দিলীপকুমার রায়, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল। প্রমথ চৌধুরী নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শরৎচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরস্পরের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই উভয়ে উভয়ের লেখার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।[১] প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি শরৎচন্দ্রকে গল্পগ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থ পড়িয়া শরৎচন্দ্র প্রমথ চৌধুরীকে একখানি পত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিল। নিয়মিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসে তো আসিতেনই, তাহা ছাড়া 'যমুনা'র অফিসেও মাঝে মাঝে আসিতেন। তবে যমুনা'র সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিল। সুকিয়া স্ট্রীটের 'ভারতী' পত্রিকার অফিসেও প্রায়ই আসিতেন। সৌরীন্দ্রমোহনের কথায়, 'তখন শরৎচন্দ্র প্রায় আসতেন ভারতী' অফিসে এবং সকলের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তা যেমন অমায়িক, তেমনি

১। শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির' পড়িয়া প্রমথ চৌধুরী প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ১২,৯,১৬ তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার লেখার আমিও একজন ভক্ত। অন্ততঃ একটু বেশী রকম পক্ষপাতী।'

স্নেহশীল। সকলের প্রীতিশ্রদ্ধা তিনি নিজের স্বভাবের গুণে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতেন।[১]

৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাইলেনের যে বাড়িটিতে তিনি রেঙ্গুন হইতে আ সয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে থাকার অসুবিধা হওয়ায় তিনি পাশের ৫নং বাড়িটিতে উঠিয়া আসিলেন।[২] এই বাড়িতে তিনি নয় বৎসর ছিলেন।

১৯১৬।১৭ খৃস্টাব্দে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটিয়াছিল। বাং ১৩২৬ সালের ২৪শে পৌষ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র তাঁহাদের পাড়ার একটি সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না যে, ঐ তারিখের বেশ কিছুদিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহা না হইলে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হইবার জন্ম আমন্ত্রণ জানাইতে সাহসী হইতেন না। ঐ পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম। কিন্তু, পথে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর কাছে টেলিফোন করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে।' এই কথাগুলি হইতে আভাস পাওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শরৎচন্দ্রের বেশ যাতায়াত ছিল। সম্ভবত জোড়াসাঁকোর সাহিত্যবাসর বিচিত্রার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বিচিত্রা আসরেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিচিত্রার আসর বসিত মেঝেয় ঢালা ফরাসের উপর। সাহিত্যিকরা বাহিরে জুতা খুলিয়া আসরে আসিয়া বসিতেন। এক সময়ে কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্যিকদের জুতা চুরি যাইতে লাগিল শরৎচন্দ্র জুতা হারাইবার ভয়ে একবার নিজের জুতা জোড়া কাগজে মুড়িয়া সঙ্গে লইয়া আসরে আসিয়া বসিলেন। কবি সত্যেন দত্ত ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথকে সব বলিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সভায় বসিয়া শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে শরৎ, তোমার হাতে ওটা কি? পাদুকাপুরাণ নাকি?'

১। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃঃ ১৪৮

২। শরৎচন্দ্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ২.২.১৭ তারিখে তাঁহার বাড়ির ঠিকানা দিয়াছিলেন ৫নং ফার্স্ট বাইলেন —বাজে শিবপুর। কিন্তু শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, ঐ ঠিকানাটি ৫নং নহে, ৩ নং। ঐ পত্রে শরৎচন্দ্র তাঁহার নূতন বাড়ির বর্ধিত ভাড়া সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'তার উপর এই মাস থেকে আবার বাড়ী ভাড়াটাও দশ টাকা বাড়বে।'

১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' 'দেবদাস' প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ ইং সালের ৩০শে জুন ইহা গ্রন্থাকারে বাহির হয়। 'দেবদাস' ভাগলপুরে থাকিতে রচিত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবত ১৯০০-১৯০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল। 'দেবদাস' চরিত্রটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেরই ছায়াপাত হইয়াছে ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। দেবদাসের বাল্যজীবনের উপর শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরে অতিবাহিত বাল্যজীবনের ছাপ রহিয়াছে এবং দেবদাসের উচ্ছৃঙ্খল যৌবনকাহিনী শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে অতিবাহিত তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনেরই প্রতিকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বলিয়াছেন, বইখানি তাঁহার মাতাল অবস্থায় লেখা হইয়াছিল।

শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন তখন তাঁহার অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবরা 'দেবদাস' প্রকাশ করিতে চাহিলে তিনি ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং নিজে বইখানির তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। সুরেনরা আমার সব লেখারই বড় তারিফ করে। তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই। ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।' প্রমথনাথকে পরে আর একখানি পত্রেও তিনি লিখিয়াছিলেন, 'দেবদাস নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও করো না। ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা immoral, বেশ্যা চরিত্র ত আছেই, তা'ছাড়া আরও কি কি আছে ব'লে মনে হয়। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি তা তোমাদের কাগজেই হোক আর যণীর কাগজেই হোক।'

অনেক বিখ্যাত লেখকই নিজের পূর্ব রচনা সম্বন্ধে নির্মম মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও একাধিক স্থানে করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে সমালোচকের দৃষ্টিতে লেখকের নিজস্ব মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'দেবদাস' সম্বন্ধেও শরৎচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা মানিতে পারিতেছি না। আমাদের মতে ভাগলপুরে লিখিত শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টি হইল 'দেবদাস'।[১] পরবর্তীকালে শরৎ-সাহিত্যে যে সুচারু সংযম, চরিত্রের অকুণ্ঠ

১। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য. 'শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে এই উপন্যাসখানি সর্বশ্রেষ্ঠ।'

দীপ্তি ও শিল্পরসের যাদুস্পর্শ দেখা যায় সে-সবই 'দেবদাসে' বর্তমান রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র যে-সময় চিঠির পর চিঠিতে 'চরিত্রহীনে'র তথাকথিত দুর্নীতিমূলকতার অভিযোগ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন সেই সময় 'দেবদাস'কে কেন immoral বলিলেন তাহা বুঝা শক্ত। তিনি টলস্টয়ের Resurrection বইটির কথা বার বার নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে ঐ বইয়ের নায়িকা একজন বেশ্যা, অথচ তিনিই আবার বেশ্যা-চরিত্র আছে বলিয়া 'দেবদাস'কে কেন নিন্দনীয় মনে করিলেন তাহাও রহস্যময় মনে হয়।

অযৌক্তিক ও বিবেচনাহীন সামাজিক বিধি ও সংস্কার কিভাবে দুইটি সম্ভাবনাময় জীবনকে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের মধ্যে তাহাই দেখাইয়াছেন। দেবদাস ও পার্বতীর মিলনে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল না। বেচাকেনার এবং নিতান্তই নিকটবর্তী প্রতিবেশী এই অকিঞ্চিৎকর অজুহাতে দেবদাসের পিতা পার্বতীর সহিত দেবদাসের বিবাহে রাজি হইলেন না। ইহাতে তাঁহার জেদ হয়তো বজায় রহিল, সমাজের প্রচলিত বিধি ও সংস্কারও অক্ষুণ্ণ রহিল, কিন্তু দুইটি প্রাণ স্ফুটনোন্মুখ দুইটি পুষ্পের ন্যায়ই অকালে ঝরিয়া পড়িল। 'দেবদাসে'র মধ্যে বয়স্কের অবিবেচনার যূপকাষ্ঠে তারুণ্যের আত্মদান ঘটিয়াছে। কিন্তু এই আত্মদানের মধ্য দিয়া যে নীরব প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে, তাহা শুধু দেবদাস ও পার্বতীর প্রতিবাদ নহে, তাহা যেন উদ্ধত তরুণ লেখকেরও প্রতিবাদ বটে।

দেবদাস ও পার্বতী ছেলেবেলায় পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছিল। ছেলেবেলার সেই ছেলেমানুষী ভালোবাসা গোপনে গোপনে যৌবনের আবেগ ও কামনার স্পর্শে কিভাবে গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় জানিতে পারিল সেদিন যেদিন তাহারা পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের সহিত 'দেবদাসে'র সাদৃশ্য বড় বেশি রহিয়াছে। হয়তো শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই এই উপন্যাসটি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কতই না পার্থক্য? শৈবলিনী পূর্ব প্রণয় ভুলিতে পারে নাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বারে বারে তাহাকে ধিক্কার দিয়া কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন। আর শরৎচন্দ্র পার্বতীকে পূর্বপ্রণয়ের প্রতি চিরবিশ্বস্ত রাখিয়া তাহার বিবাহিত জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতিই তুলিয়া ধরিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক নীতিকেই বড় বলিয়া মানিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজ-সম্পর্কহীন প্রেমের রীতিকেই

পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের ইন্দ্রিয়জয়ের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, আর শরৎচন্দ্র ইন্দ্রিয়বশ্যতার শোকাবহ ট্র্যাজেডি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যু প্রতাপের মাথায় জয়ের স্বর্ণ-মুকুট পরাইয়া দিল, আর মৃত্যু দেবদাসকে দুরপনেয় কালিমার দুস্তর অন্ধকারে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। প্রতাপকে আমরা প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দেবদাসের জন্য আমাদের অন্তরের মধ্যে অনুক্ষণ এক অন্তহীন কান্না পুঞ্জীভূত হইতে থাকে।

হয়তো শৈবলিনীর আদর্শ সম্মুখে ছিল বলিয়াই শরৎচন্দ্র পার্বতীকে এরূপ সাহসিকা, অবুণ্ঠভাষিণী ও স্বমতবর্তিনী নারীরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। পার্বতী শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালের অভয়া, কিরণময়ী ও কমলের যেন পথপ্রদর্শিকা। তাহার নির্দ্বিধ, ভয়লেশহীন আচরণ, সামাজিক বিধি-বিধান সম্বন্ধে তাহার ভ্রূক্ষেপহীন মনোভাব এবং নিষিদ্ধ অথচ একমাত্র সত্য প্রেমের প্রতি তাহার অকম্পিত আনুগত্য প্রভৃতি তাহার চরিত্রকে এক দীপ্ত মর্যাদায় ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।' মেয়েরা বোধহয় স্বভাবতই masochist, অর্থাৎ পীড়িত হইয়া আনন্দ পায়, সেজন্যই হয়তো পার্বতী দেবদাসের কাছে অত অত্যাচার সহিবার ফলেই তাহাকে অতখানি ভালোবাসিয়াছিল। বায়রন বলিয়াছেন—

> Man's love is of man's life a thing apart,
> 'Tis woman's whole existence

পার্বতীর প্রতি দেবদাসের ভালোবাসার জোয়ার ভাটা দেখা গিয়াছে। কলিকাতার বহুবিধ আকর্ষণে ভুলিয়া সে সাময়িকভাবে পার্বতীর প্রতি উদাসীন হইয়াও পড়িয়াছিল। কিন্তু পার্বতীর ভালোবাসা তাহার সমগ্র সত্তার দু'কূল প্লাবিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, সে তাহার সখী মনোরমাকে অকুণ্ঠিত ভঙ্গিতেই বলিয়াছে যে, তাহার বরের বয়স উনিশ-কুড়ি এবং তাহার নাম দেবদাস। শৈবলিনীর মতই বোধ হয় সে প্রেমের পাত্রকে পাইবার জন্য নিজের সাহস ও সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে, এবং অশ্রু-উদ্বেলিত নিজের সত্তাটি তাহারই চরণে নিক্ষেপ করিয়াছে। দেবদাসের প্রত্যাখ্যান এই অশ্রু-নির্ঝরিণীকে কঠিন পাষাণীতে রূপান্তরিত করিল, ঘাটের পথে দেবদাসের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সেজন্য তাহার স্পষ্ট বাক্যগুলি তীক্ষ্ণ বাণের মতই দেবদাসের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। আবার দেবদাসের হাতের আঘাতে সেই পাষাণী বিগলিত

হইয়া পড়িল এবং তাহার অবরুদ্ধ বেদনার প্রবাহ তাহার অভিমানের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে লুটাইয়া পড়িল। পার্বতীর বিবাহ হইল, তাহার বহির্জীবনের পরিবর্তন ঘটিল কিন্তু তাহার অন্তর্জীবনের কোন রূপান্তর ঘটিল না। তাহার বাহিরের দরজায় দেবদাসের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া গেল কিন্তু ভিতরের দরজা খুলিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় সে যেন দিবারাত্র জাগিয়া রহিল। বিবাহিত জীবনের শুষ্ক মরুবালুর মধ্যে সে দেবদাসকে লইয়া স্বপ্ন ও কল্পনাজড়ান একটি মরূদ্যান রচনা করিয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিল। বিবাহের পরে দেবদাসের সঙ্গে যখন তাহার দেখা হইয়াছিল তখন সে বলিয়াছিল, 'দেবদা, আমি যে ম'রে যাচ্ছি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার যে আজন্মের সাধ।' দেবদাসের শোচনীয় অধঃপতনের কথা শুনিয়া সে তাহাকে স্বামীগৃহে লইয়া আসিবার জন্য দেবদাসের বাড়িতে গেল। এখানেও পার্বতীর স্থির সঙ্কল্প এবং লোকলজ্জা সম্বন্ধে তাহার উদ্ধত ও বেপরোয়া মনোভাব দেখা যায়। স্বামীগৃহে তাহার প্রণয়াস্পদকে আনিতে কোন দ্বিধা ও সঙ্কোচ সে গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু পার্বতীর 'আজন্মের সাধ' অপূর্ণই রহিয়া গেল। দেবদাসকে সে পাইল না। যাহাকে সেবা করিবার জন্য সে এতখানি ব্যগ্র ছিল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই তাহার শেষ সেবা পাইবার জন্য তাহারই গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পার্বতীর রূপ, গুণ, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব সব ছিল কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। দেবদাস তবুও মৃত্যুতে নিষ্কৃতি পাইল। কিন্তু সেই নিষ্কৃতি পার্বতী পাইল না, তাহাকে বাঁচিয়াই তিল তিল করিয়া মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

পার্বতীর চরিত্রে যে স্পষ্টতা, দৃঢ়তা ও উদ্যমশীলতা দেখা যায় দেবদাসের চরিত্রে সেগুলির নিতান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ছেলেবেলায় শুধু পার্বতীকে তাড়না করা ছাড়া আর কোথাও তাহার সক্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় নাই। পার্বতী যেরূপ প্রবল ভাবে দেবদাসকে ভালোবাসিত, দেবদাস সেরূপ পার্বতীকে ভালোবাসিত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, অন্তত উপন্যাসে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলিকাতায় আসিবার পর তাহার মনে পার্বতীর প্রতি আকর্ষণ অনেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল এবং পার্বতী তাহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া একান্ত ভাবে মিনতি করিবার আগে পার্বতীকে বিবাহ করিবার কোন প্রবল আগ্রহও সে দেখায় নাই। পিতার কাছে তাহার প্রস্তাব ব্যক্ত

গ্রাহ্য হইল না তখন কোন প্রচণ্ড দুঃখের ভাবও তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। সুতরাং কেন যে সে তাহার জীবনকে শোচনীয় সর্বনাশের পথে নিক্ষেপ করিল তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। মনে হয় দেবদাসের জীবনে কার্যের গুরুতর শোচনীয়তা যথোপযুক্ত কারণের ফলে অনিবার্য হইয়া উঠে নাই। হয়তো উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন জীবনের শূন্যতা সে মদিরার উত্তেজনায় ভরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সেই কৃত্রিম উত্তেজনার মূলে সুগভীর প্রেমের কোন সুতীব্র বেদনা ছিল না। আবার ইহাও হইতে পারে যে, পার্বতীকে দেবদাস যে সত্যই কত ভালোবাসিত তাহা পার্বতীকে হারাইবার আগে সে হয়তো নিজেও বুঝে নাই। ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত যাহা তাহার অন্তরের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভালোবাসার দীপ্তি ও দাহ দুই-ই দেখাইয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র ভালোবাসার শুধু দাহ-ই দেখাইয়াছেন তাহার দীপ্তিটুকু দেখান নাই, সেজন্য শরৎ-সাহিত্যে ভালোবাসার অন্তর্মুখী ও অনুচ্চারিত ধারাই প্রধানত দেখা যায়। দেবদাস-চরিত্রে ভালোবাসার প্রচণ্ডতা নাই, ভালোবাসার অবক্ষয় রহিয়াছে। পার্বতী ও চন্দ্রমুখী কাহারও প্রতি তাহার প্রবল প্রেম আমরা দেখি নাই, কিন্তু ব্যর্থ প্রেমের পরিণতিতে সে কিভাবে অধঃপতনের একটির পর একটি সোপান নামিয়া গেল তাহা আমরা দেখিলাম। তাহার এই অধঃপতন দেখিয়া আমাদের হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু এই নিরুদ্যম, পৌরুষহীন সর্বনাশা আত্মহত্যার কাহিনী পড়িতে পড়িতে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরক্তিও উদ্রিক্ত হয়। সারাজীবন ধরিয়া সে তাহার অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্তই করিয়াছে। শরৎচন্দ্র 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের মত দেবদাস চরিত্রেও মাতাল-জীবনের বাস্তব কদর্যতা ও করুণ হাহাকার অতিসুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তবে দেবদাসের মৃত্যুদৃশ্যে কারুণ্যের অতিরঞ্জন বীভৎসতার স্তর স্পর্শ করিয়াছে। তাহাতে আমাদের চিত্ত এত রূঢ়ভাবে পীড়িত হয় যে, লেখকের প্রার্থিত অশ্রু বিসর্জন করিতেও যেন আমরা ভুলিয়া যাই। অবশ্য উপন্যাসের শেষে লেখক যেখানে দেবদাসের জন্য নিজে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং পাঠকেরও উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই উপন্যাসের একমাত্র দুর্বল অংশ ধরা পড়িয়াছে।

দেবদাস একবার চন্দ্রমুখীকে বলিয়াছিল 'তোমাদের দু'জনে কত অমিল আবার কত মিল। একজন অভিমানী, উদ্ধত আর একজন কত শান্ত, কত

সংযত। সে কিছুই সইতে পারে না, আর তোমার কত সহ্য।' দেবদাসের এ-কথাগুলির মধ্যেই চন্দ্রমুখীর চরিত্র যথার্থভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। চন্দ্রমুখী পতিতা, কিন্তু পতিতা জীবনের কোন কলুষ ও কালিমা আমরা তাহার মধ্যে দেখি নাই। শরৎচন্দ্র পঙ্কস্তর হইতে এই পুষ্পটি আহরণ করিয়া তাঁহার লেখনীর পাবনী ধারায় ধৌত করিয়া তাহাকে যেন দেবপূজায় নিবেদন করিলেন। শরৎচন্দ্রের অতিরিক্ত আদর্শায়নের ফলে এ ধরণের চরিত্র বাস্তব পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরান্তৃত আদর্শলোকের অধিবাসী হইয়া পড়ে। দেবদাসকে দেখিবা মাত্রই পতিতা চন্দ্রমুখীর মৃত্যু ঘটিল এবং প্রেমের দেউলে কৃচ্ছ্রসাধিকা এক তপস্বিনী নারী নবজন্ম গ্রহণ করিল। পার্বতী ও চন্দ্রমুখী উভয়ে দেবদাসকে ভালোবাসিয়াছে এবং উভয়েই শুধু দুঃখ পাইয়াছে। কিন্তু পার্বতীর দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা ছিল যে সে দেবদাসের ভালোবাসা তো লাভ করিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রমুখীর তো কোন সান্ত্বনাই ছিল না। দেবদাসের কাছে সে শুধু অবিমিশ্র ঘৃণাই লাভ করিয়াছিল। কি সম্বল লইয়া সে তাহার ভোগমত্ত জীবনের আনন্দ-উত্তেজনা বিসর্জন দিয়া সর্বত্যাগিনী সাজিয়া বসিল! চন্দ্রমুখীর এই প্রেমের তপশ্চর্যা বুঝিতে হইলে প্রেমের প্রচলিত আদান-প্রদানের ধারণা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। চন্দ্রমুখীর প্রেম কোন প্রতিদানের অপেক্ষা করে না আপনার আবেগে আপনি উদ্বেলিত হইয়া তাহা পাষাণ-দেবতার পায়ে লুটাইয়া পড়ে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেবদাস এই ভালোবাসার স্বীকৃতি দিল, সে চন্দ্রমুখীকে ভালোবাসা জানাইল। সেই ভালোবাসার স্মৃতি অমূল্য রত্নের মত বক্ষতলে লুকাইয়া রাখিয়া সে পরলোকের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল এই আশায় যে, হয়তো ইহলোকের প্রায়শ্চিত্তের পর পরলোকে দেবদাসের সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিতেও পারে।

'দেবদাস' উপন্যাসের আকর্ষণীয়তার কারণ, লেখক ইহার মধ্যে পরিস্থিতি রচনার মধ্যে চমকপ্রদ নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পার্বতীর বিবাহের পূর্বে ও পরে দেবদাসের গৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎকার, ঘাটের পথে উহাদের কথোপকথন, এবং পার্বতীর গৃহপ্রাঙ্গণে দেবদাসের মৃত্যু প্রভৃতি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব স্থানে আবেগের ঘাতপ্রতিঘাত চরিত্রের দ্রুত ও বিচিত্র ভাবান্তর ও ঘনীভূত বেদনার অবতারণার ফলে নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। আবেগগর্ভ ও ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ-

রচনায় লেখকের অদ্বিতীয় কুশলতার পরিচয়ও এই সব স্থানে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি সংলাপের অংশ উদ্ধৃত হইল—

১। দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

২। দেখতে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা ব'লেই তাতে কালো ভোমরা বসে থাকে। এস, তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে যাই।

৩। ছিঃ অমন করো না পারু। শেষ বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম। অমন সোনার মুখ আরসিতে মাঝে মাঝে দেখবে ত।

৪। সন্ধ্যা হল, এখন বাড়ি যা পারু।

আমি যাব না। তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

আমি পারিনে।

কেন পার না?

সবাই কি সব কাজ পারে?'

ইচ্ছে করলে নিশ্চয় পারে।

তুমি কি আমার সঙ্গে আজ রাত্রে পালিয়ে যেতে পার?

শরৎচন্দ্রের লেখনীর সংযম অসাধারণ। 'দেবদাসে' নিষিদ্ধ প্রেম, মদ্যাসক্তি, পতিতা-সংসর্গ সব আছে, কিন্তু লেখকের সংযমের বাঁধ কোথাও একটু টলে নাই, কোথাও বিন্দুমাত্র ইন্দ্রিয়-স্পর্শ নাই, কোথাও অশ্লীলতা সামান্য পরিমাণেও প্রশ্রয় পায় নাই। নিশীথ রাত্রে নিভৃতকক্ষে প্রণয়মত্ত দুইটি তরুণ-তরুণী পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছে, নায়িকার উদ্বেলিত অশ্রুধারায় নায়কের পদযুগল প্লাবিত হইয়াছে, তথাপি উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানটি রহিয়া গিয়াছে, ইহা বিস্ময়কর মনে হয়। বেশ্যাগৃহে দেবদাস পাত্রের পর পাত্র উজাড় করিয়া দিতেছে, চন্দ্রমুখী তাহার অতি সন্নিকটে বসিয়া সেবা করিতেছে। কিন্তু ঐপর্যন্ত। শরৎচন্দ্র নিষিদ্ধ প্রেমের জগতে বিচরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই প্রেম দেহকামনার তীরে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

'নিষ্কৃতি' গল্পটি 'ঘর-ভাঙ্গা' নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনা'য় ও সমগ্র অংশ ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত

হইয়াছিল। ইং ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই ইহা গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছিল।

'নিষ্কৃতি' গল্পটি 'রামের সুমতি', বিন্দুর ছেলে', 'মেজদিদি,' প্রভৃতি গল্পের শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ, ইহাতে একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের রস ও মাধুর্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বিরোধ ও জটিলতা দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই বিরোধ ও জটিলতার উপরে একান্নবর্তী জীবনের স্নেহ ও ত্যাগের আদর্শই বড় হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী গল্প 'বিন্দুর ছেলে'র-সঙ্গে 'নিষ্কৃতি'র কয়েকটি চরিত্রগত মিল রহিয়াছে। 'বিন্দুর ছেলে'র যাদব, অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর সঙ্গে 'নিষ্কৃতি'র যথাক্রমে গিরীশ, সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজা চরিত্রের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 'বিন্দুর ছেলে'র মূল রস হইল বাৎসল্য রস, কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে বিরোধ ও তাহার অবসান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে 'নিষ্কৃতি'র কাহিনী।

যতদিন গিরীশের সংসারে মধ্যম ভ্রাতা হরিশ ও তাঁহার স্ত্রী আসে নাই ততদিন সেই সংসার বেশ শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যেই যাইতেছিল। গিরীশ তাঁহার মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন, ছোট ভাই রমেশ নিশ্চিন্ত মনে তাহার বেকার জীবনে সংবাদপত্রীয় রাজনীতিতে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারিত, সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার বিরাট শয্যার বামে ও দক্ষিণে শায়িত ছেলে-মেয়েদের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং শৈলজা সংসারের সকল কাজ নিজের সুপটু হাতে চালনা করিয়া যাইত। কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সব পারিবারিক সমস্যাপূর্ণ গল্পের মধ্যে যেমন বাহিরের কোন অবাঞ্ছিত আগন্তুকের আগমনের ফলে অপ্রীতিকর জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে এই গল্পেও তেমনি হরিশ ও তাঁহার স্ত্রী নয়নতারার আগমনের ফলেই সংসারের মধ্যে যত বিরোধ ও অশান্তি দেখা গিয়াছে। একান্নবর্তী সংসারে গোলমালটি প্রথমে বাধে মেয়েমহলে এবং তারপর তাহা, ছড়াইয়া পড়ে কর্তাদের মধ্যে। এই উপন্যাসেও তাহাই ঘটিয়াছে। নয়নতারা সর্পীর ন্যায় ক্রূর অভিসন্ধি এবং বৃশ্চিকের ন্যায় তীব্র জ্বালা লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজার মধ্যে একটি প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্টি করিয়া রমেশ ও শৈলজাকে সংসারছাড়া, হইতে বাধ্য করিল। কাহিনীর শেষ অংশে হরিশের একটু বেশি সক্রিয়তা দেখা গিয়াছে এবং সে তাহার উকিলী 'কূটকৌশল 'বিস্তার করিয়া রমেশ ও

শৈলজা'কে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু নয়নতারার বিষময় অভিসন্ধি এবং হরিশের কূটকৌশল কিছুই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল না। জয়ী হইল উদার স্নেহশীলতা এবং একান্নবর্তীতার শুভ আদর্শ। শরৎচন্দ্র প্রেমমূলক গল্প-উপন্যাসে গভীর দুঃখবাদী কিন্তু পারিবারিক আদর্শভিত্তিক রচনাগুলিতে আশ্চর্য রকমের আশাবাদী। সেজন্য সাময়িক বিরোধ ও সঙ্কটের উপরে তিনি স্নেহপ্রীতি ও মিলনের আদর্শকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। এ-কারণে এই রচনাগুলির পরিণতি মধুর সমাধান ও বাঞ্ছিত মিলনের মধ্যেই ঘটিয়াছে। এই গল্পটির পরিণতি অবশ্য একটু আকস্মিক ভাবেই ঘটিয়াছে। কিন্তু গিরীশ এই পরিণতির জন্য দায়ী, তাহার মধ্যে এমন একটি উদার, আত্মভোলা সত্তা রহিয়াছে যে তাহার পক্ষে প্রত্যাশিত কাজের বিপরীতটাই করা খুবই সম্ভব।

শরৎচন্দ্র উদাসীন, অন্যমনস্ক ও আত্মভোলা চরিত্র কয়েকটি সৃষ্টি করিয়াছেন যথা যাদব, প্রিয়নাথ ডাক্তার ইত্যাদি। গিরীশ চরিত্রটি ইহাদের সদৃশ হইলেও তাহার স্নেহ ও মহত্ত্ব তাহাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। রমেশের প্রতি তাহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল বলিয়াই রমেশ তাহার বহু টাকা নষ্ট করা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে শাসন করিবার ছলে তাহাকে আরও আট হাজার টাকার চেক লিখিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। রমেশের সঙ্গে যখন মোকদ্দমা চলিতেছিল তখন যেন নিতান্ত রাগ করিয়াই তাহাকে আট শত টাকা দিলেন। নিরাভরণা শৈলজাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তর এতই ব্যথিত হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার নামে দানপত্র করিয়া দিলেন। গিরীশের মুখ ও অন্তর ঠিক পরস্পর বিপরীত পথে ক্রিয়া করিয়াছে। বোধ হয় অন্তরের স্নেহ ও করুণা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই তিনি মুখে অত তর্জন-গর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পের রামকানাইয়ের মতই তিনি যে কাজটি করিয়া আসলেন বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের কাছে তাহা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেজন্য সকলের কাছে তিনি যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইলেন, কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী অবশেষে তাঁহাকে ঠিক বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, 'তোমাকে যার যা মুখে এলো—ব'লে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড় সে কথা আজ যেমন আমি বুঝেছি এমন কোনদিন নয়।'

সিদ্ধেশ্বরী ও শৈলজা ঠিক যেন বিপরীত ধাতু দিয়া গঠিত। সিদ্ধেশ্বরীর

বুদ্ধি কিছু মোটা ধরণের। সেজন্য নয়নতারা সহজেই তাঁহাকে বশীভূত করিতে এবং শৈলজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শৈলজার প্রতি অন্যায় ব্যবহার তিনি করিয়াছেন। কিন্তু শৈলজার প্রতি বরাবর একটু স্নেহের ভাব তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল। ছেলে-মেয়েদের শোওয়ার তত্ত্বাবধান করা ছাড়া সংসারের কাজ-কর্মে তাঁহার ইচ্ছা ও পটুতা বেশি ছিল না। কিন্তু শৈলজা ছিল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে সকলেই মাথা নত করিতে বাধ্য হইত। তাহার নিপুণ হাতের নিখুঁত স্পর্শে সংসারটি এমন সুচারুভাবে চলিত, সকলের প্রতি তাহার এমন সযত্ন দৃষ্টি ছিল এবং সর্বপ্রকার অন্যায় ও নীচতার বিরুদ্ধে তাহার এমন কঠিন মনোভাব ছিল যে, তাহাকে সকলে যেমন ভয় করিত তেমনি ভক্তিও করিত। কিন্তু নয়নতারা সিদ্ধেশ্বরীর উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার পরে তাহার চরিত্র যেন কাহিনীর নেপথ্যে সরিয়া গেল। স্বামী রমেশের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটি ভালোভাবে বিশ্লেষিত হয় নাই, সুতরাং কিভাবে সে তাহার বেকার ও পরনির্ভরশীল স্বামীর পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাকে লড়িবার শক্তি জোগাইয়াছিল তাহা অস্পষ্টই রহিয়া গিয়াছে। অথচ এই স্বামীর জন্যই তাহাকে যত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। শেষকালে তাহার চরিত্রের কোন সক্রিয় রূপই দেখা যায় নাই। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত লেখক তাহার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

'নিষ্কৃতি' গল্পটির উপভোগ্যতার কারণ, ইহার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটি স্নিগ্ধ কৌতুকরসের ধারা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। টুকরা টুকরা ঘটনার মধ্যে যেমন কৌতুক-কণা ছড়াইয়া আছে, তেমনি লেখকের নানা সরস টীকাটিপ্পনী ও ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্যগুলি হীরকের দ্যুতির মতই চতুর্দিকে জ্যোতি বিকিরণ করিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরীর ডানে ও বামে শুইবার স্থান দখল করিবার জন্য ছেলে-মেয়েদের তুমুল বিবাদ, অপাঠ্য পাঠ্য পুস্তকে হরিচরণের অখণ্ড মনোযোগ, শৈলজার আগমনে সকলের মধ্যে একটা ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন প্রভৃতি বর্ণনায় কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শৈলজার সঙ্গে দুর্বলচিত্তা সিদ্ধেশ্বরীর প্রচ্ছন্ন মান-অভিমানের পালাও যথেষ্ট হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছে। বাহিরে কৃত্রিম ক্রোধ এবং ভিতরে ভাব করিবার প্রবল উৎকণ্ঠা এই দুইয়ের টানা-পোড়েনে বেচারী সিদ্ধেশ্বরীর চরিত্রটি কিরূপ হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে তাহাও দেখিবার মত। কিন্তু হাস্যরসের প্রধান

উৎস হইলেন স্বয়ং গিরীশ। অসতর্ক ও অন্যমনস্ক লোক চিরকাল হাসির লক্ষ্য হইয়াছে। গিরীশ-চরিত্রও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। গিরীশ বাড়ির কর্তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সেজন্য সিদ্ধেশ্বরী ও হরিশের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় রমেশকে তিনি যথোচিত ধমক দিয়াছেন এবং শাসনও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধমকের তলায় যে সত্যকার ক্রোধ বিন্দুমাত্রও ছিল না এবং শাসন করিতে যাইয়া বার বার রমেশের প্রতি যে তিনি অত্যাশ্চর্য দাক্ষিণ্য দেখাইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই আমরা কৌতুক বোধ করি। রমেশকে তিরস্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি শেষকালে তাহার নামে আট হাজার টাকার চেক লিখিয়া দিবার কথা ঘোষণা করিলেন। সিদ্ধেশ্বরীর হাউমাউ কান্নার ফলে তিনি হঠাৎ তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বেচারা হরিচরণকে নিয়া পড়িলেন। হরিচরণ কিছু বুঝিয়া উঠার আগেই তিনি তাহার অদৃশ্য এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ মাস্টারের উপর ঝড়ের বেগে আক্রমণ চালাইলেন এবং তারপর কর্তব্যপালনের আত্মপ্রসাদ বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। আর একদিন বাড়িতে আসিয়া রমেশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ ব্যক্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার জানাইলেন যে সে তাঁহার নিকট হইতে আটশত টাকা নিয়া তবে ছাড়িয়াছে। এমনি ভাবে রমেশকে তিনি বারে বারে জব্দ করিয়াছেন। তবে মোক্ষম জব্দ করিয়াছেন শেষকালে, যখন ছোট-বধূমাতার নামে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। এই আত্মভোলা, অন্যমনস্ক লোকটির কথা ও কাজে অসঙ্গতি দেখিয়া আমরা হাসি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহানুভবতার জন্য তাহার প্রতি আমাদের অন্তর প্রীতি ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়। 'চরিত্রহীন' রচনা ও 'যমুনা'য় ইহার প্রকাশের ইতিহাস পূর্বেই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ১৯১২ সালের পূর্বেই শরৎচন্দ্র এ-উপন্যাসের ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপি আগুনে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। ১৯১২ সালে তিনি পুনরায় উপন্যাসটি লিখিতে শুরু করেন। ১৯১৩ সালে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে তিনি ইহার আংশিক পাণ্ডুলিপি 'ভারতবর্ষে'র জন্য পাঠান। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত না হইলে ইহা ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র এবং ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। 'চরিত্রহীন' যখন তিনি পাঠাইলেন তখন এ-উপন্যাসের প্রায়

কিছুটা অংশ তাঁহার লেখা ছিল মাত্র। ১৯১৩ সালে প্রমথনাথকে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপ্টার লেখা আছে, বাকিটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব।' ১৩৪৪ সালে 'চরিত্রহীনে'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের সময় লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, 'চরিত্রহীনে'র গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তার পরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় হয় না।—এই ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না করে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন ক'রে দিলাম।'

উপরিউক্ত ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, 'চরিত্রহীন' এক সময় লেখা সম্পূর্ণ হয় নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যবধানের পর শরৎচন্দ্র এই উপন্যাস সমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে প্রথম ও শেষ অংশের মধ্যে কাহিনীপরিকল্পনা, চরিত্রসৃষ্টি ও রচনারীতির দিক দিয়া লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে। মনে হয়, উপন্যাস যখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনীই লেখকের মন জুড়িয়া ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কিরণময়ীর অসামান্য চরিত্র-পরিকল্পনাই হয়তো তাঁহার মন অধিকার করিয়া ছিল। সেজন্য উপন্যাসের শেষ অংশে কিরণময়ীর প্রখর কিরণে সাবিত্রীর স্নিগ্ধ জ্যোতি অনেকখানি পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপি এবং ইহার প্রকাশিত অংশ পড়িয়া তৎকালীন পাঠক-সমাজে আতঙ্কজনক আলোড়ন শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায় তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার প্রাথমিক অংশে অর্থাৎ সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনীতে মেসের ঝি এর সঙ্গে ভদ্র যুবকের প্রণয়চিত্র থাকিলেও এ-ধরণের অ-সচরাচরদৃষ্ট প্রণয়চিত্র শরৎ-সাহিত্যে কিছু নূতন নহে। 'দেবদাস,' 'আঁধারে আলো,' 'শ্রীকান্ত' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুর্নীতিমূলক ও সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের বর্ণনা রহিয়াছে। সাবিত্রী মেসের ঝি হিসাবে শরৎ-সাহিত্যে নূতন হইলেও তাহার আসল ব্যক্তিসত্তাটি কিন্তু নূতন নহে। তাহার মধ্যে চন্দ্রমুখী, হেমনলিনী, বিজলী ও রাজলক্ষ্মীর অনেকাংশে পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় না কি? সাবিত্রী-সতীশের প্রেম শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী প্রেমকাহিনীগুলির

অনুরূপ—সংযমশাসিত, সূক্ষ্মমানসচারী ও আকর্ষণ-বিকর্ষণে জটিল। সুতরাং এই উপন্যাসের প্রথম অংশে শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী ব্যক্তিমানসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কিরণময়ীর কাহিনীতে আমরা পরবর্তীকালের পরিণত-মানস শরৎচন্দ্রকেই দেখিতে পাই। যাঁহাকে এ-পর্যন্ত শুধু হৃদয়বান দেখিয়াছি তাঁহাকে যেন নূতন ভাবে তার্কিক ও তাত্ত্বিকের আসনে উপবিষ্ট হইতে দেখিলাম। ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলাদেশে আসিবার পর শরৎচন্দ্র উপন্যাসগুলির মধ্যে যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এবং বিদগ্ধ মননশীলতার স্বাক্ষর রাখিলেন তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় কিরণময়ীর চরিত্রচিত্রায়ণে। এই চরিত্রটি উপলক্ষ্য করিয়া তিনি যে রূঢ় জীবনবাস্তবতা, দেহকামনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এবং চিরপ্রচলিত ধারণাসংস্কারের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের অবতারণা করিলেন সেগুলিই পরবর্তী প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি, যথা, 'শ্রীকান্ত' (২য়) 'গৃহদাহ,' 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতির মধ্যে ধারাবাহিত হইয়াছে। কিরণময়ীর আগে তিনি যে সব নায়িকা চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহারা নীরব দুঃখভোগী, অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত এবং সমাজের উদ্যত দণ্ডের সম্মুখে নতশির। কিন্তু কিরণময়ী শরৎ-সাহিত্যে তেজস্বিনী, আত্মনির্ভরশীলা ও সমাজবিদ্রোহিণী নারীর সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং সেই দ্বারপথে অভয়া, সুমিত্রা, কমল প্রভৃতি নারীর প্রবেশ ঘটিল। সুতরাং গ্রন্থের পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ কিরণময়ীর কাহিনী পরবর্তীকালে রচিত হইয়াই শরৎচন্দ্রের পরিণত সাহিত্যধারার সহিত যুক্ত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

রচনারীতি বিচার করিয়াও 'চরিত্রহীনে'র প্রথম ও শেষ অংশের মধ্যে পার্থক্য দেখাইতে পারা যায়। প্রথম অংশের রচনার মধ্যে অনুভূতিশীলতাই প্রধান, কিন্তু শেষ অংশের রচনায় অনুভূতির গাঢ়তার সঙ্গে মননের খরদীপ্তির মিলন ঘটিয়াছে। প্রথম অংশের ঘটনা মন্থরগতি কিন্তু শেষ অংশের ঘটনা দ্রুতধাবমান। প্রথম দিককার ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলির মধ্যে একটু মন্থর ও আড়ষ্ট ভাব যেন দেখা যায়। দীর্ঘ উপমাগুলি অনেকস্থলেই রচনার সৌন্দর্য বর্ধন না করিয়া যেন রচনার ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্যও যেন একটু দূরকল্পিত এবং চমকহীন, যথা—

১। ধাবমান অশ্ব অকস্মাৎ গভীর খাদের মুখে আসিয়া তাহার দুই পা অগ্রস্থত করিয়া যেভাবে প্রাণপণে রুখিয়া দাঁড়ায় সাবিত্রীর চলন্ত জিহ্বা ঠিক সেইভাবে থামিল। (তিন)

২। ক্রুদ্ধ গুরু মহাশয়ের অতর্কিত চড় খাইয়া হাস্য-নিরত শিশু ছাত্রের মুখের ভাবটা যেমন করিয়া বদলায়, এই দু'জনের মুখের হাসি তেমনি করিয়া এক নিমেষে কালি হইয়া গেল। ( বার )

শেষ দিককার অলঙ্কারগুলিতে কিন্তু অনাড়ষ্ট, সাবলীল এবং চমৎকারী ভাব দেখা যায়। উপমার সঙ্গে সঙ্গে শেষ অংশে উৎপ্রেক্ষা, রূপক, নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অধিকতর সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ অলঙ্কারগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। অলঙ্কারগুলি ক্ষিপ্রবেগগামী ও রচনার সৌন্দর্যসৃষ্টিতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছে। যথা—

১। কিরণময়ী তাহার শুষ্ক মুখের উপর নবীন যৌবনের একটা সদ্য জাগ্রত ক্ষুধার মূর্তি অকস্মাৎ অনুভব করিয়া সসঙ্কোচে থামিয়া গেল। ( একত্রিশ)

২। ঠাকুরপো, দু'জনের যে জিনিসটা তাকে সুমুখে ঠেলে, সেই জিনিসটাই তাকে পেছনে ঠেলতে পারে, অপরে পারে না। ( ঐ )

৩। দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল। ( চৌত্রিশ )

৪। কিন্তু, কাল গভীর রাত্রে উপেন্দ্রর রাজসিংহাসন তলে বসিয়া উভয়ের সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হইয়া গেল···( ছত্রিশ )

'চরিত্রহীনে'র প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রথম অংশের কাহিনীর সহিত সঙ্গতিহীন বলিয়া মনে হয়। এই পরিচ্ছেদের মধ্যে সতীশকে ধর্ম সম্বন্ধে ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী তার্কিক বলিয়া মনে হয়। অথচ সমগ্র উপন্যাসে সতীশকে ধর্মনিষ্ঠ এবং যুক্তিতর্ক সম্বন্ধে উদাসীন ও অপরাগ বলিয়াই মনে হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে সতীশের বুদ্ধিদীপ্ত ও বৈপ্লবিক মত ও যুক্তিগুলি কিরণময়ীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে বলিয়াই ভ্রম হয়। তবে কি এই পরিচ্ছেদটি পরবর্তীকালে কিরণময়ী চরিত্রচিত্রণের সময় লিখিয়া পরে উপন্যাসের গোড়ায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন? ইহা হইতে পারে, আবার নাও হইতে পারে। তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না, এই পরিচ্ছেদের ঘটনার সহিত পরবর্তী কাহিনীর কোন যোগ নাই এবং ইহাতে সতীশ চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত, পরবর্তী সতীশের অন্তত কোন মিল নাই।

'চরিত্রহীন' বহুবিস্তারী, বিচিত্র ঘটনাবহুল উপন্যাস। টলস্টয়ের **Anna Karenina** অথবা **Resurrection** উপন্যাসের ন্যায় ইহার কাহিনী যেন একটি বহু শাখাপ্রশাখা সম্বলিত বিরাট বনস্পতি। কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন নারী চরিত্র অবলম্বনেই যেন ইহার নানা

শাখা বিস্তারিত হইয়াছে। সাবিত্রী, কিরণময়ী, সুরবালা ও সরোজিনী এই চারটি নারীর কাহিনী যেন এই কাহিনীর চারটি শাখা। উপেন্দ্র ও সতীশ এই চারটি শাখার মধ্যে যোগ সাধন করিয়াছে। অনেক জায়গায় ঘটনার গতি দ্রুত, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সাবিত্রীর কাশী চলিয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে তাহাকে পুনরায় আবার বেহারীর লইয়া আসা, সতীশের হঠাৎ সাঁওতাল পরগণায় চলিয়া যাওয়া এবং সেখানে আরো হঠাৎ সরোজিনীকে উদ্ধার করা এবং তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়া, যে-কিরণময়ী কোনদিন ঘরের বাহিরে যায় নাই তাহার পক্ষে দিবাকরকে লইয়া আরাকানের পথে যাত্রা করা, আবার কোন ঠিকানা না জানিয়াও সতীশের পক্ষে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা, উপেন্দ্রর ঘুরিতে ঘুরিতে পুরীতে ঠিক ভুবন মুখুজ্যের হোটেলে ওঠা এবং সেখানে মোক্ষদার কাছে সাবিত্রীর পরিচয় পাওয়া—এ-সব ঘটনা কষ্টকল্পিত ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। লেখক বহুবিস্তারী কাহিনীর অবতারণা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় কাহিনীর বিভিন্ন ধারার মধ্যে যোগ সাধন করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাপ্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহাকে এ-ধরণের আকস্মিক ও চমকপ্রদ ঘটনার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

উপন্যাসটি যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, সতীশ-সাবিত্রীর কাহিনীই বুঝি ইহার মূল কাহিনী। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কিরণময়ীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাবিত্রী নেপথ্যে চলিয়া গেল। তাহার পর সাবিত্রী মাঝে মাঝে আবার রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছে বটে, কিন্তু কিরণময়ী তাহার রূপ ও ব্যক্তিত্বের চোখঝলসানো আলোকচ্ছটায় রঙ্গমঞ্চ এরূপ আলোকিত করিয়া রাখে যে সাবিত্রীর স্বকীয় দীপ্তি আর যেন আমাদের চোখ আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে লেখক এই অসামান্যা নারীর অত্যদ্ভুত চরিত্র চিত্রিত করিতে করিতে নিজেও হয়তো এমনিভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার আরব্ধ কাহিনীর প্রাথমিক নায়িকার কথা অনেকখানি বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। দুই, তিন, আট, নয়, কুড়ি, একুশ পরিচ্ছেদের পর দীর্ঘকাল সতীশ-সাবিত্রীর আর দেখা নাই। আবার তাহাদের দেখা হইয়াছে একেবারে উনচল্লিশ পরিচ্ছেদে। উনচল্লিশ, চল্লিশ ও একচল্লিশ পরিচ্ছেদের পর সতীশ সাবিত্রীর দেখা হইয়াছে একেবারে শেষ অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ পরিচ্ছেদে। সুতরাং উপন্যাসের পঁয়তাল্লিশ পরিচ্ছেদের মধ্যে সাবিত্রী ও সতীশের সাক্ষাৎকার

রহিয়াছে মাত্র দশটি পরিচ্ছেদে আর কিরণময়ীর কাহিনী জুড়িয়া রহিয়াছে উপন্যাসের কুড়িটি পরিচ্ছেদে। সতীশের সহিত সম্পর্কে ছাড়া সাবিত্রীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ কোথাও হয় নাই। কিন্তু কিরণময়ীর ব্যক্তিত্বের প্রবল আকর্ষণ ও প্রচণ্ড সংঘাত অনুভব করিয়াছে উপেন্দ্র, সতীশ, দিবাকর, অঘোরময়ী প্রভৃতি অনেকে। এ-উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা কিরণময়ী, সাবিত্রী নহে। কিরণময়ী সাবিত্রী অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি, রূপ কর্মতৎপরতায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যে শুধু সে নায়িকা তাহা নহে, কাহিনীর মধ্যে তাহার স্থান অনেক বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে এবং অন্যান্য চরিত্রের উপরেও সে প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেজন্যও তাহাকে নায়িকার স্থান দিতে হইবে।[১] সাবিত্রীকে লইয়া এ কাহিনীর আরম্ভ এবং উপন্যাসের নায়ক সতীশের বহুবাঞ্ছিতা প্রণয়পাত্রী হইল সে। কিন্তু লেখক তাহার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। শুধু যে কিরণময়ীর প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে সাবিত্রী-চরিত্র গৌণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সরোজিনীর সহিত সতীশের রোমান্টিক অনুরাগের বর্ণনার ফলেও সাবিত্রীর প্রতি পাঠকের বেদনাবিদ্ধ কৌতূহলও যেন কিছুটা শিথিল হইয়া পড়ে।

শরৎচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সাহিত্যে যে যে ধরনের নারীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রতিনিধি এই উপন্যাসের মধ্যে রহিয়াছে। সরোজিনী রোমান্টিক প্রেমাসক্ত নারীচরিত্র। ইহার সহিত ললিতা, বিজয়া, বন্দনা প্রভৃতি নারীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এ-ধরণের নারী চরিত্র তিনি বেশি সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু ইহাদের আকর্ষণীয় মাধুর্য তিনি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সুরবালা বিরাজ, অন্নদাদিদি, সৌদামিনী, মৃণাল প্রভৃতির সমগোত্রীয়। পাতিব্রত্যের দীপশিখাটি সযত্নে জ্বালাইয়া ইহারা সংসারপ্রাঙ্গণটি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। সাবিত্রী শরৎ-সাহিত্যের বিশিষ্টতম নারীচরিত্রের প্রতিনিধি। সমাজের দৃষ্টিতে ইহারা পতিতা, কিন্তু আসলে ইহারা কঠোর নিয়ম ও সংযমের রিক্ত জগতের মধ্যে স্বেচ্ছা-নির্বাসিতা। অনুরাগের রসপ্রবাহে ইহাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া

---

১। শরৎচন্দ্রও যে কিরণময়ীকেই নায়িকা মনে করিতেন তাহা সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের উক্তি হইতে জানিতে পারা যায়। শরৎচন্দ্র সৌরীন্দ্রমোহনকে বলিয়াছিলেন, 'যতটা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে নায়িকা এখনো দেখা দেয় নি। এ বইয়ের নায়িকা কিরণময়ী। সে এক নতুন জিনিস হবে।'
—শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃঃ ৩১

উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও ইহারা নিয়ম ও সংযমের বাঁধ আলগা করিয়া সম্ভোগ ও মিলনের নন্দনকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। কিরণময়ী যে শরৎ সাহিত্যের নূতন এক শ্রেণীর নারী চরিত্রের অগ্রদূত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সমাজের বাঁধন ও শাসনের বাহিরে ইহারা স্পর্ধিত শির ও ভ্রূক্ষেপহীন দৃষ্টি লইয়া স্বাতন্ত্র্যের ভাস্বর গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

চারটি নারীচরিত্রের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র প্রেমের চারপ্রকার আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। সরোজিনীর প্রাগ্-বৈবাহিক প্রেমের মধ্যে রোমান্সের রক্তরাগের স্পর্শ রহিয়াছে। সুরবালার বিবাহিত জীবনের প্রেম সাংসারিক জীবনের কর্তব্য ও কল্যাণের প্রেরণায় এবং অবিচল ও অকম্পিত। সাবিত্রী ও কিরণময়ীর প্রেম মিলনস্বর্গ হইতে বহুদূরে ব্যাকুল বেদনার মধ্যে দিশাহারা। তবে সাবিত্রীর প্রেম ব্যর্থতার মধ্যেও একটা শান্ত আত্মত্যাগের পথে অভিসারী। কিন্তু কিরণময়ীর ব্যর্থ প্রেম এক লেলিহান অগ্নির শিখা মধ্যে আত্মাহুতি দিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। সাবিত্রীর প্রেম যেন দূর আকাশের তারার মত স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকিরণ করিয়াছে, কিন্তু কিরণময়ীর অতৃপ্ত প্রেম ধূমকেতুর মত অগ্নিপুচ্ছ তাড়নায় অপরকে দগ্ধ করিয়াছে এবং নিজেও পুড়িয়া ছাই হইয়াছে।

একটি মেসের ঝিকে লইয়া 'চরিত্রহীন' উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্রকে অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র ১৯১৩ সালে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'যে লোক জানিয়া শুনিয়া মেসের ঝিকে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই।' এই কথাগুলির মধ্যে সমালোচনার আঘাতে বিব্রত শরৎচন্দ্রের বিরক্তি ও উষ্মাই প্রকাশ পাইয়াছে। মেসের ঝি-এর সঙ্গে ভদ্র যুবকের ভালোবাসা বাংলা সাহিত্যে হয়তো সেদিন অভিনব ও অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র অনেক দিক দিয়াই বাস্তবতার কঠিন আঘাতে সাহিত্যের স্বপ্নসৌধকে টলাইয়া দিয়াছিলেন, মেসের চিরউপেক্ষিতা ঝিকেও তিনি মর্যাদা দিয়া সাহিত্যের জগতে লইয়া আসিলেন এবং তাহার অনুদ্ঘাটিত-পূর্ব জীবনরহস্যের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিপাত করিলেন। সাবিত্রীকে বোধ হয় শুধুমাত্র ঝি বলা চলে না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'সাবিত্রী বাসার ঝি

এবং গৃহিণী।' মেসের গৃহিণী ছিল বলিয়াই বোধ হয় সকলের তত্ত্বাবধান এবং ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্রীত্ব করিবার অধিকারও সে পাইয়াছিল।৮ কিন্তু সাবিত্রীচরিত্র সম্বন্ধে একটু অস্বাভাবিক দিক ইহাই যে, তাহার ভগ্নীপতি তাহাকে ফুসলাইয়া আনিয়া এক কদর্য পরিবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করিল, সেই পরিবেশের লালসা-পঙ্কিল বহু দৃষ্টি তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তবুও সে কিভাবে নিজেকে এরূপ নির্মল, নিষ্কলুষ রাখিতে পারিল? পাপাশয় ভগ্নীপতির প্রলোভনজালে যে ধরা পড়িল সে নিজেকে শুদ্ধাচারের আসনে কিভাবে অতখানি দৃঢ় ও অটল রাখিতে পারিল? যাহার বিগত জীবন কলুষপঙ্কে মলিন, সতীশ তাহার অঞ্চল ধরাতেই সে একেবারে ফোস করিয়া উঠিল, তাহার অতখানি স্পর্শকাতরতাও একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়।

সাবিত্রীর প্রতি সতীশের ভালোবাসা তাহার সতৃষ্ণ কামনা, জ্বালা-বেদনা-অভিমান ও হতাশার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু সতীশের প্রতি সাবিত্রীর ভালোবাসা তাহার অন্তরের এত গভীর তলদেশ দিয়া প্রবাহিত যে, বাহিরে কখনো সামান্যতম বীচিবিক্ষেপ কিংবা কলোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হয় নাই। চল্লিশ পরিচ্ছেদে যেখানে সাবিত্রী সতীশের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর প্লাবনে সতীশের দেহ ভাসাইয়া দিয়াছিল, তাহার পূর্বে সতীশ সম্বন্ধে সাবিত্রীর বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও কোথাও ধরা পড়ে নাই। এই পাষাণপ্রতিমার বেদীতলে সতীশের প্রচণ্ড প্রেম বার বার আছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে একটুও টলাইতে পারে নাই। সাবিত্রী তাহার হৃদয়তলে ভালোবাসার যত মধু গোপনে সঞ্চিত করিয়া বাহিরে শুধু কণ্টকগুলি খাড়া করিয়া রাখিল। সতীশ সেই মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া শুধু কেবল কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, মধুর স্পর্শ একটুও পায় নাই। তাহার এই একান্তকঠিন প্রতিরোধ, এই তিল তিল আত্মাবলুপ্তি মাঝে মাঝে মাত্রাতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসাকে এভাবে হনন করার দৃষ্টান্ত আজিকার স্বার্থসম্ভোগমত্ত জগতের মধ্যে একান্ত দুর্লভ বলিয়াই মনে হয়। সাবিত্রী সতীশকে বড় বেশি ভালোবাসিয়াছিল বলিয়াই সতীশকে সে ছাড়িতে পারিল। সে সমাজত্যক্তা, কিন্তু সে সমাজকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। সাবিত্রী একদিন সতীশকে বলিয়াছিল, 'তুমি বলবে সত্য হোক, মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি

ত তাকে মানি।' সমাজের প্রতি সাবিত্রীর এই আনুগত্য ছিল বলিয়াই সমাজ-নিষিদ্ধ এই প্রেমের বৈবাহিক ও দৈহিক পূর্ণতা সে চাহে নাই। সে বুঝিয়াছিল, সতীশকে প্রশ্রয় দিলে সতীশ তাহার প্রচণ্ড প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। সতীশের রূপ, স্বাস্থ্য, সম্পদ সব ছিল অতিরিক্ত পরিমাণে। সুতরাং সতীশের আকর্ষণ দমন করা যে কোন নারীর পক্ষেই অতিমাত্রায় কঠিন। তবুও সাবিত্রী প্রাণপণ শক্তিতে সেই কঠিন কাজে নিজেকে নিরত রাখিয়াছিল। সতীশের কাছে ধরা দিলে তাহার পর্যাপ্ত লাভ ঘটে, কিন্তু তাহাতে সতীশের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই সমাজত্যক্তা নারীটিকে গ্রহণ করিলে তাহার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হইবে, লোকের কাছে সে বিকৃত ও হেয় হইয়া পড়িবে। সতীশের যে ভালোবাসা তাহার কাছে স্বর্গের অমৃতের ন্যায়, সেই ভালোবাসার পরিবর্তে সতীশের মনে সে ঘৃণা উদ্রেক করিতেই চাহিয়াছে। তাহার একটির পর একটি শাস্ত ও সংক্ষিপ্ত মিথ্যা ভাষণ তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় সতীশের সংশয় ও হতাশাপীড়িত চিত্তকে কাটিয়া কাটিয়া ঝসিয়াছে। সতীশ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছে, কিন্তু তাহার শতগুণ অধিক যন্ত্রণা সে নিজের অন্তরতলে সহ্য করিয়া সতীশের সম্মুখ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়াছে। সতীশ যতদিন তাহারই ছিল ততদিন সে এমনভাবে নিজের অন্তরকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু যেদিন সে তাহার চিরকাঙ্ক্ষিত হৃদয়দেবতাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার কাছ হইতে চিরবিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছে সেইদিনই শুধু অবরোধমুক্ত করিয়া অনর্গল উচ্ছ্বাসে ভালোবাসার নির্ঝরিণীটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—'ভালোবাসি কিনা! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? কিসের জন্য আমার এত বড় সুখ, আমার এত বড় দুঃখ? ওগো, তাই ত তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না।' চিরদুঃখিনী সাবিত্রী তাহার সকল সাধ ও আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বিসর্জন দিয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত উপেন্দ্রর সেবাশুশ্রূষাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখিল। শেষ পরিচ্ছেদে তাহারই চোখের সম্মুখে তাহার প্রেমাস্পদ পরের হইয়া গেল, তাহার একমাত্র অবলম্বন উপেন্দ্রও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আর সে এক আশাহীন, পরিত্রাণহীন ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে চলিবার জন্যই বাঁচিয়া রহিল।

কিরণময়ী শরৎচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। তাহার মধ্যে অসামান্য রূপের

সঙ্গে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং উদ্দাম হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ মননশীলতার যে সম্মিলন হইয়াছে তাহা শরৎসাহিত্যের অপর কোন নারীচরিত্রের মধ্যে দেখা যায় না। সেজন্য কিরণময়ীকে শরৎসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র বলিলে বোধ হয় অতিরঞ্জিত উক্তি হয় না।[১] কিরণময়ীর সঙ্গে তুলনায় 'শেষপ্রশ্নে'র কমলকে গভীর জীবনবোধবিরহিত শুষ্ক তর্কসর্বস্ব চরিত্র বলিয়াই মনে হইবে। শুধু কেবল শরৎসাহিত্যে কেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও কিরণময়ী অনন্যা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিমলা, শৈবলিনী, দেবী চৌধুরাণী, শান্তি প্রভৃতি প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী ও অমিত কর্মপরায়ণা চরিত্র বটে, কিন্তু তাহাদের কাহারও মধ্যে কিরণময়ীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা নাই। হেলেনের মত সে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, মিডিয়ার মত প্রতিহিংসাপরায়ণা, পোরশিয়া ও রোজালিণ্ডের মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যশালিনী, এবং নোরা ও মিসেস অ্যালভিঙের মতই সমাজবিদ্রোহিণী।

শরৎচন্দ্র নারীর রূপসৌন্দর্য লইয়া বেশি মাথা ঘামান নাই, কিন্তু কিরণময়ী হইল একমাত্র নারী যাহার অতুলন রূপসৌন্দর্যের কথা শরৎচন্দ্র বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম আবির্ভাবেই সে তাহার বিদ্যুৎ শিখার মত রূপের তীব্র আলোকচ্ছটায় উপেন্দ্র ও সতীশের দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের বর্ণনা—'নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোক-সম্পাতে ভ্রূযুগলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচ পোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল।' সতীশ একদিন কিরণময়ীকে বলিয়াছিল, 'দেখুন, আমার মতামতের বেশি দাম নেই। কিন্তু যদি থাকে, তা হলে এই বলি আমি, আপনার মত রূপের বোধ করি পৃথিবীতে আর নেই।' কিরণময়ীর এই অসাধারণ রূপের সঙ্গে তাহার অদ্বিতীয় বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া তাহার রূপের মধ্যে যেমন একটি তীব্র বলসান দীপ্তি মিশিয়াছিল, তেমনি তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যেও একটি মার্জিত ও সম্ভ্রান্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

---

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—'মোটের উপর কিরণময়ী চরিত্রের অসাধারণ জটিলতা ও দিগন্তব্যাপী প্রসার উপন্যাসসাহিত্যে অতুলনীয় এবং ইহার আলোচনা আমাদের মনকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।'

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

কিরণময়ীর জ্ঞান ও মনীষার তুলনা নাই। বিবাহিত জীবনে স্বামীর কাছে সে একফোঁটা ভালোবাসা পায় নাই, কিন্তু রাশি রাশি জ্ঞান লাভ করিয়াছে। বেদবেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য কিছুই পড়িতে তাহার বাকি নাই। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশের অজ্ঞাতবাসে যত জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন সেসব কিরণময়ীর মধ্যে উজাড় করিয়া দিয়াছেন। শুধু কেবল মুদ্রিত পুস্তকাদি নহে, সংস্কৃত রামায়ণের হাতে লেখা পুঁথি পর্যন্ত সে অখণ্ড মনোযোগে অধ্যয়ন করিয়াছে। তাহার অধ্যয়ননিষ্ঠা দেখিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারত কোন অধ্যাপিকা বলিয়াই তাহাকে ভুল হয়। শুধু কেবল অধ্যয়ন নহে, অধীত বিষয় সম্বন্ধে তাহার বিচারবিতর্ক এবং মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি আমাদিগকে ক্রমাগত বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। তাহার স্বাধীন মতামত ও নির্ভীক সমালোচনার মধ্যে তাহার বিশিষ্ট জীবন-দর্শন এবং ব্যক্তিজীবনের রুচি, আদর্শ ও মতবাদ প্রতিফলিত হইয়াছে। সেজন্য তাহার বিচারবিতর্কে৷ খাঁরা বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করা উচিত। অতিরিক্ত পড়াশুনার জন্যই সে নিরীশ্বরবাদী, ইহসর্বস্ব, ভোগস্পৃহ ও ঘোর বাস্তবনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ব্যঙ্গকুটিল ওষ্ঠাধারের মধ্য দিয়া যে-সব শাণিত ও অকাট্য যুক্তিগুলি নির্গত হইয়াছে সেগুলি প্রচলিত ধারণা ও প্রতিষ্ঠিত সত্যসমূহকে নির্মমভাবে বিদ্ধ করিয়াছে। কঠোপনিষৎ তাহার নখাগ্রে, কিন্তু উপনিষদের আত্মার লীলা সে শ্লেষের ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে। শাস্ত্রের অনুশাসন তাহার কাছে অসঙ্গত জবরদস্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। সে হার্বার্ট স্পেন্সারের Agnostic মতবাদে বিশ্বাসী। এপিকিউরাস ও চার্বাকের দর্শনের দ্বারা সে প্রভাবিত, তাই দেহকামনার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি জানাইতে সে সঙ্কোচ বোধ করে না। পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা তাহার তীক্ষ্ণ ও প্রবল যুক্তির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, সমাজের বিধিবিধানের উপরে তাহার রুদ্ররোষ বজ্রের মতই পতিত হয়। রোমান্টিক ভাববিলাসী সাহিত্য তাহার নির্মম উপহাসের লক্ষ্য বস্তু। কিরণময়ীর যুক্তি ও মতগুলি প্রধানত ধ্বংসাত্মক, গঠনাত্মক নহে। সে নির্বিচারে ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু কোন কিছু সৃষ্টি করিতে কিংবা রক্ষা করিতে পারে না। তাহার এই মানসপ্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সে কেবল তৃষ্ণার্ত পথিকের মত মরীচিকার নেশায় ঘুরিয়াছে, অন্ধকারে শুধু হাতড়াইয়া চলিয়াছে, কাম্যবস্তু কখনও তাহার করায়ত্ত হয় নাই।

শরৎচন্দ্র কিরণময়ীর ঠিক বিপরীতধর্মী একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। সে হইল সুরবালা। সুরবালা তাহার সহজ বিশ্বাসে সব কিছু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বিশ্বাস, ও ভক্তির মধ্য দিয়া সে জীবনের অবিচল শান্তি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিরণময়ী একবার তর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করিবার জন্য সুরবালার কাছে গিয়াছিল। কাশীদাসী মহাভারত সম্বন্ধে সুরবালার জলন্ত বিশ্বাস দেখিয়া আর সকলে যখন তাহাকে ঠাট্টাবিদ্রূপে বিব্রত করিতেছিল তখন কিরণময়ী তাহাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া প্রবল আবেগে বুকে টানিয়া লইয়াছিল। তবে কি কিরণময়ীর প্রবল অবিশ্বাস সুরবালার সহজ বিশ্বাসের কাছে সেদিন পরাভব স্বীকার করিয়াছিল? আমাদের তাহা মনে হয় না। সুরবালার অতখানি দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া কিরণময়ী সম্ভবত বিস্মিত হইয়াছিল এবং সেজন্যই এই সরলবিশ্বাসী নারীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক নিরর্থক ভাবিয়াই অনুকম্পাভরে তাহাকে সমর্থন জানাইয়াছিল। আর একটি বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে। উপেন্দ্র ও সুরবালার হাস্যপরিহাসস্নিগ্ধ সুমধুর দাম্পত্য-জীবনের রূপ দেখিয়া অসার তর্কবিতর্ক হইতে তাহার মন সম্ভবত দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সেজন্যই ঈর্ষাবেদনায় অভিভূত হইয়া সে সুরবালার বিশ্বাস স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিরণময়ীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই তাহা পরবর্তীকালে দিবাকরের সঙ্গে তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

কিরণময়ী একটি প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার মতই যাহার সান্নিধ্যে গিয়াছে তাহাকেই পুড়াইয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু কত অভাব, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা হইতে সে তাহার এই দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ না করিলে তাহার প্রতি সুবিচার করা হইবে না। বিবাহের পরে একটি আলোহীন বায়ুহীন অন্ধকার প্রেতপুরীতে সে বছরের পর বছর কাটাইয়াছে। তাহার স্বামী শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখরের ন্যায় দিবারাত্র জ্ঞানচর্চাতেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। স্ত্রী তাঁহার কাছে শুধু ছিলেন শিষ্যা, তাহার সঙ্গে নীরস জ্ঞানের শুষ্ক তর্কবিতর্কে সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধনার তলে তলে একটি বিকাশোন্মুখ নারী-হৃদয় তাহার সমস্ত মধু ও সৌরভ লইয়া কাঁদিয়া যাইতেছিল এ-খবর তাঁহার জানা ছিল না। শাশুড়ী অঘোরময়ীর কাছে কিরণময়ী পাইয়াছিল একটানা যন্ত্রণা ও নির্যাতন। বহির্জগতে কত বসন্ত আসিয়াছে আর গিয়াছে, কত ফুলের

মেলা, আলোর হাসি—সে সব কিরণময়ীর অবরুদ্ধ নিরানন্দ পুরীতে কখনও প্রবেশ করিতে পথ পায় নাই। সেই পুরীতে অভাব ও দারিদ্র্যের ছিল একচ্ছত্র প্রভুত্ব। সেই দারিদ্র্যের রন্ধ্রপথে ঢুকিল অনঙ্গ-ডাক্তার। পিপাসিত কিরণময়ী সেদিন কর্দমাক্ত জলাশয়ের জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই জলের বিষক্রিয়ায় যখন তাহার সমস্ত দেহমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ সে সুধা-সরোবরের সন্ধান পাইল। তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল উপেন্দ্র ও সতীশ। উপেন্দ্রকে ভালোবাসিয়া সে প্রেমের অমৃতস্বাদ পাইল এবং সতীশকে ছোট ভাইরূপে লাভ করিয়া সে স্নেহের স্বর্গসুখ অনুভব করিল। তাহার মঞ্জরিত প্রেমের স্বর্ণলতাটি একমাত্র যে সহকারটিকে বেষ্টন করিতে চাহিয়াছিল, সে হইল উপেন্দ্র, আর কেহ নহে। সে হারাণের বিবাহিত স্ত্রী ছিল, অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে দেহসম্ভোগে লিপ্ত হইয়াছিল, দিবাকরের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করিয়াছিল, কিন্তু ভালোবাসিয়াছিল শুধু উপেন্দ্রকে। কিরণময়ী উপেন্দ্রকে বলিয়াছিল; 'শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণ অহল্যা যেমন মানুষ অহল্যা হয়েছিলেন আমিও যেন তেমনি বদলে গেলুম। অহল্যা মানুষ হয়ে কি পেয়েছিলেন, জানিনে, কিন্তু আমি যা পেলুম, তার তুলনা নেই। আমাদের ভাই ছিল না, সতীশকে পেলুম আমার মায়ের পেটের ভাই, আর পেলুম তোমাকে।' সতীশের কাছে সে সুরবালার ভালোবাসার কথা শুনিয়াছিল। সেজন্য কিরণময়ীও তাহার স্বামীকে সুরবালার মতই ভালোবাসিতে চেষ্টা করিল, মুমূর্ষু স্বামীকে সেবাযত্নের দ্বারা সে ভালো করিয়া তুলিতে চাহিল। কিন্তু না পারিল স্বামীকে ভালোবাসিতে, না পারিল তাহাকে ভালো করিয়া তুলিতে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপেন্দ্রর প্রতি কিরণময়ীর এতখানি প্রবল ভালোবাসা কখন কিভাবে তাহার মনের মধ্যে জন্মলাভ করিল? উপেন্দ্রর প্রতি কটু-ভাষণ এবং অনুচিত ব্যবহার সত্ত্বেও উপেন্দ্রর সৌজন্য, উদারতা ও মহত্ত্ব যে কিরণময়ীকে তলে তলে উপেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাহার অতৃপ্ত ও অসুখী চিত্তে উপেন্দ্র-সুরবালার সুখময় দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী প্রবল প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং সম্ভবত ঈর্ষা ও বেদনার দ্বারা কতকাংশে তাড়িত হইয়াও সে উপেন্দ্রর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

উপেন্দ্রকে নিভৃতে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছে হৃদয়ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিয়া সে স্বস্তি পাইয়াছে। কোন পুরুষের কাছে প্রেমার্ত নারীর এরূপ অসঙ্কোচ প্রণয়নিবেদনের দৃশ্য বাংলা সাহিত্যে আমরা বেশি দেখি নাই। কিন্তু কিরণময়ী চরিত্রের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতা ও লক্ষ্যহীনতা দেখা যায় যে, প্রশান্ত নিষ্ঠা লইয়া সে তাহার প্রেমাস্পদের চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতে পারে নাই। দিবাকরকে কাছে পাইয়া সে তাহার ঠাট্টা-পরিহাসের মধ্য দিয়া এই নির্দোষ ও অনভিজ্ঞ তরুণটির উপর তাহার দুর্নিবার সম্মোহিনীজাল বিস্তার করিয়াছিল। দিবাকরকে সে ভালোবাসে নাই, ভালোবাসিতে পারে না, কিন্তু ভালোবাসার এই বিপজ্জনক অভিনয় সে তাহার সহিত করিতে গেল কেন? হয়তো তাহার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রবণ মন বেচারা দিবাকরের সঙ্গে অভিনয় করিয়া একটু মজা পাইয়াছিল। হয়তো পুরুষের সান্নিধ্য-বঞ্চিত তাহার সত্তা এই তরুণটিকে কাছে পাইয়া অসতর্ক মুহূর্তে একটু তরল আনন্দে মাতিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল? কিন্তু তাহার এই নিছক আমোদ বিলাস বিকৃত আসক্তি বলিয়া অনেকেই ভুল করিল, উপেন্দ্রও সেই ভুল করিয়া তাহাকে অপমান করিল। তখন আহত ফণিনীর মত কিরণময়ী উপেন্দ্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু এখানে একটা খটকা থাকিয়া যায়। দিবাকরকে যদি শুধু একটু প্রশ্রয় দিয়া মজা করিবার উদ্দেশ্যই কিরণময়ীর থাকে তাহা হইলে দিবাকরকে সরাইয়া লওয়ার প্রস্তাবে সে অতখানি উত্তেজিত হইবে কেন? উপেন্দ্রর অপমানে তাহার ন্যায় অভিমানী ও অসহিষ্ণু নারীর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সে যে অভাবনীয় এবং অসমসাহসিক পথটি বাছিয়া লইল তাহাও অস্বাভাবিক মনে হয়। কিরণময়ীর সমস্ত সত্তাটি অনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দাম প্রবৃত্তির অধীন ছিল। সেজন্য তাহার পক্ষে সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া কোন হঠকারিতার পথে অগ্রসর হওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু তবুও তাহার মত গৃহবধূর পক্ষে সুদূর আরাকান রওনা হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া ভোর হইতে না হইতেই জাহাজে যাইয়া উঠা যেন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

জাহাজে কিরণময়ী দিবাকরের সঙ্গে বিপজ্জনক প্রেমের অভিনয় করিয়াছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত দিবাকরের ভিতরকার ক্ষুধিত শ্বাপদটি গুহা হইতে বাহিরে আসে নাই। কিন্তু আরাকানে পৌঁছিবার পর কদর্য জীবনের গ্লানিকর

পরিবেশে সেই শ্বাপদটি বাহির হইয়া আসিয়া যখন তাহার লোলুপ হিংস্র থাবাটি বাড়াইয়া দিল তখন কিরণময়ী নিজেকে রক্ষা করিতে বিব্রত হইয়া পড়িল। প্রকৃতপক্ষে আরাকানে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত কিরণময়ী গর্বিতা বিজয়িনীর মতই চলিয়াছে, তাহার কাছে যেন সকলেরই পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু আরাকানের সেই কুৎসিত বস্তিপরিবেশে তাহার বিজয়গর্ব সব যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। অন্ধকার পুরীতে যে একাকিনী সম্রাজ্ঞীর মত বাস করিতেছিল বিদেশের বস্তিতে বহু নীচ লোকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সে যেন নিতান্তই এক সামান্য নারীতে পরিণত হইল। কিরণময়ীর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি তাহাকে বেপরোয়া, উদ্দাম ও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু বাস্তব-জীবন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিবেচনা ও দূরদৃষ্টি দিতে পারে নাই। বাস্তব-জীবন যে কত রূঢ় ও ভয়াবহ তাহা সে আরাকানের বস্তিতে আসিয়া বুঝিল। তাহার অসামান্য জ্ঞান ও মনীষা সেখানে কোন কাজেই আসিল না, সেখানে সে শুধুমাত্র এক সহায়সম্বলহীনা অবলা নারীতেই পরিণত হইল।

সতীশ যখন আরাকানে যাইয়া কিরণময়ীকে উপেন্দ্রর গুরুতর অসুখের কথা বলিয়াছিল তখন কিরণময়ী মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। উপেন্দ্রকে সে কত গভীর ভাবে ভালোবাসিত এই ঘটনার মধ্যে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে সে এতখানি ভালোবাসিত তাহার উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য সে যে কি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে তাহা ছয় মাসকাল এই বস্তির নগ্ন প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে তাহার অনুতাপদগ্ধ চিত্ত খুব ভালোভাবেই বুঝিয়াছে। নিত্যকার এই কঠোর সংগ্রামের ফলে তাহার দেহমন এত ক্লান্ত ও রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে উপেন্দ্রর অসুখের খবরটি সে সহ্য করিতে পারে নাই, একেবারে হতচেতন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় এই গুরুতর আঘাতটি সে আর কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ ইহার অল্পকাল পরেই কিরণময়ীকে কলিকাতায় বিকৃতমস্তিষ্কারূপে দেখিতে পাই। কিরণময়ীর শেষ যে পরিণতি লেখক দেখাইলেন তাহা এত শোচনীয় যে তাহা আলোচনা করিতেও কষ্ট হয়।

কিরণময়ীর মত দুর্দমনীয় আবেগ ও প্রবৃত্তির বশীভূতা নারীর পক্ষে আকস্মিক আঘাতে অপ্রকৃতিস্থা হইয়া পড়া মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া হয়তো অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, শরৎচন্দ্র এই মানসিক বিকৃতির জন্য

যথেষ্ট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন কিনা[১] এবং কিরণময়ীর মত অসামান্যা নারীর পক্ষে রাস্তার পাগলীর মত পথচারীর করুণা ভিক্ষা করিয়া চলাটা কতখানি শিল্পসম্মত হইয়াছে। আরাকান হইতে সতীশ যখন কিরণময়ীকে কলিকাতায় লইয়া আসিল তখন কিরণময়ীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির অন্তত কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। তারপরেই তাহাকে লেখক একেবারে গঙ্গার ঘাটের পাগলী ভিখারিণী করিয়া ছাড়িয়াছেন। কিরণময়ীর এই পরিণতি দিতে হইলে তাহার চরিত্রের যে বিশ্লেষণ এবং পাঠকের মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য যে ঘটনার পারম্পর্য প্রয়োজন লেখক সেসব কিছুই দেখান নাই। সেজন্য কিরণময়ীকে ঐ শোচনীয় অবস্থায় দেখিয়া অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমাদের চিত্ত বিপর্যস্ত হইয়া যায় এবং আমাদের অবিশ্বাসী ও অসন্তুষ্ট মন কেবলই এই পরিণতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে লিখিত একখানি পত্রে কিরণময়ীর এধরণের নীতিশাসিত পরিণতি দিবেন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'তবে যাতে এটা in strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব।' এই moral অথবা নৈতিক পরিণতি দিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নীতিধর্মদ্রোহিণী নারীটিকে বিকৃতমস্তিষ্কা করিয়া তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন এবং তাহার মুখ দিয়া তাহার যত অপরাধের জন্য অনুতাপের বাক্য বাহির করিয়াছেন। সে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উপেন্দ্রর জন্য মাকালীর প্রসাদ লইয়া আসিয়া তাহা খাওয়াইবার জন্য মিনতি করিতেছে! কিরণময়ীর নীতি ও ধর্মদ্রোহিতার যে ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত শরৎচন্দ্র করাইয়াছেন তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়? অথচ শরৎচন্দ্র একাধিক স্থানে রোহিণীর অপমৃত্যুর জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দায়ী করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী প্রভৃতি চরিত্রের পরিণতিতে আর্টের পরিবর্তে নৈতিকতার মূল্যই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিরণময়ীর পরিণতিতে শরৎচন্দ্রও তাঁহার নিন্দিত নৈতিকতাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আর্টকে নহে। কিরণময়ী চরিত্র-

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রণিধানযোগ্য—'কেবল সর্বশেষে তাহার মস্তিষ্কবিকারের চিত্রটি অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটি সুবিদিত করিয়া দিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।'

পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্র যে নির্ভীক সত্যসন্ধানী ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিলেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

শরৎচন্দ্র এ-উপন্যাসের নাম 'চরিত্রহীন' দিলেন কেন, সে-প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ-উপন্যাসে কোন চরিত্রহীন চরিত্র আছে কি? উপেন্দ্র নিষ্কলঙ্ক দেবোপম চরিত্র, তাহার কথা তো উঠিতেই পারে না। দিবাকর চরিত্রবান অথবা চরিত্রহীন কোন কিছু হইবার যোগ্যতা রাখে না। বাকি থাকিল কেবল সতীশ! সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে হয়তো সতীশকে চরিত্রহীন বলা চলে। সে মেসের তথাকথিত পতিতা ঝি-এর প্রতি আসক্ত। মদ খাওয়ার অভ্যাসও তাহার রহিয়াছে। বিপিনের সঙ্গে পতিতালয়েও সে গিয়াছে। সুতরাং সাধারণ লোকে তাহাকে চরিত্রহীন বলিবে। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাকে চরিত্রহীন বলা যায়? মেসের ঝিকে সে ভালোবাসিয়াছে বটে, কিন্তু সেই ভালোবাসায় শুধু কেবল যাতনা ও হতাশাই ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কলুষের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নাই। পতিতালয়েও সে গিয়াছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং মদ খাইয়াও কখনও অশোভন ও অসঙ্গত আচরণ করে নাই। কিন্তু এই তথাকথিত চরিত্রহীন লোকটি যে অন্যদিক দিয়া কতখানি চরিত্রবান লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। সে উদার, পরোপকারী, স্নেহশীল ও ক্ষমাবান। শরৎচন্দ্র চরিত্রবান উপেন্দ্র ও চরিত্রহীন সতীশকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংসারে চরিত্রবান লোকেরাও ভুল করে, অন্যায় করে, আবার চরিত্রহীন লোকেরাও অনেক মহৎ কাজ করিতে পারে। উপেন্দ্র নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলিয়া দুর্নীতি ও পাপের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। সেজন্যই সতীশের বাড়ীতে সাবিত্রীকে দেখিয়াই তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সুরবালাকে লইয়া সতীশের বাড়ীর প্রবেশপথ হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং সতীশ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা তাহার মনে এত বদ্ধমূল ছিল যে, জ্যোতিষকে টেলিগ্রাম করিয়া সতীশের বিরুদ্ধে কঠোর মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উপেন্দ্র কিরণময়ীকে বুঝিতে ভুল করিয়াছিলেন এবং তাহাকে অনুচিত কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া তাহার কোন কৈফিয়ত ভালো করিয়া না শুনিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। সতীশ ও কিরণময়ী—যে দুইটি চরিত্র তাহাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসিত তাহাদের দুইজনকেই উপেন্দ্র ভুল বুঝিয়াছেন।

উপেন্দ্রর নীতিজ্ঞান ও শুচিতাবোধ এত প্রবল না হইলে তিনি হয়তো ক্ষমা ও সহানুভূতি লইয়া তাহাদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিতেন। অবশ্য সুরবালার মৃত্যুর পর উপেন্দ্রর স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার অন্তরে তখন সকলের প্রতি স্নেহ ও করুণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু উপেন্দ্রর সঙ্গে সতীশের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে নিজে নীতি ও সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া কাহারও প্রতি তাহার কোন অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা ছিল না। কিরণময়ীর চরিত্র অনেকের কাছে নিন্দনীয় হইলেও সতীশ তাহাকে বরাবরই পূজনীয়া বৌঠানের আসনে বসাইয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আরাকানে যাইয়া কিরণময়ী ও দিবাকরের গুরুতর সামাজিক অপরাধ সম্বন্ধে প্রশ্নমাত্র না করিয়া নারকীয় পরিবেশ হইতে সে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। এ-চরিত্রই যদি চরিত্রহীন তবে চরিত্রবান কে এ প্রশ্ন শরৎচন্দ্র বোধ হয় করিতে চাহিয়াছেন। সেজন্য চরিত্রহীন নামটির পরে খুব একটা বড় অদৃশ্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন রহিয়াছে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে বড় বড় ঘটনার ফাঁকে যে সব ছোট ছোট বাস্তবচিত্র রহিয়াছে সেগুলি সমাজের নানা স্তরের পরিচয় নির্মম ভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। দারিদ্র্যের নির্মম পেষণে নারী কিভাবে নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিয়া নিজের দেহটি পণ্যের মত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় কিরণময়ী ও অনঙ্গ ডাক্তারের সম্পর্ক আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যাইবে। এ-যেন **Crime and Punishment**-এর সোনিয়া ও Mr .Warren's Profession-এর মিসেস ওয়ারেনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। শাশুড়ী অঘোরময়ী পুত্রবধূর এই অবৈধ কাজে বাধা তো দেনই নাই, বরঞ্চ প্রশ্রয় দিয়াছেন। নীতিধর্ম প্রভৃতি কিভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার অধীন শরৎচন্দ্র তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন। আরাকানের বস্তি-পরিবেশের চিত্র শরৎচন্দ্র বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন। হরিশ ভট্টাচার্য ও কামিনী বাড়িউলির চরিত্র অনেকটা 'শ্রীকান্ত' (২য়) উপন্যাসের নন্দ ও টগর বোষ্টমীর অনুরূপ। কামিনী বাড়িউলি কিরণময়ী ও দিবাকরকে যে বস্তির মধ্যে লইয়া গেল সেখানকার লোকগুলিকে রেঙ্গুনে বাস করার সময় শরৎচন্দ্র নিজের পল্লীতেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহারা মিশ্রজাতীয় লোক, পৃথিবীর নানা অঞ্চল হইতে সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছে। তাহারা মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, সমাজবিরোধী ও পাপাচারী

তাহাদের কুৎসিত, গ্লানিকর জীবনের বিষাক্ত স্পর্শে দিবাকর-কিরণময়ীর সম্বন্ধের ভদ্র, শোভন ও সঙ্গত দিকগুলি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। কিরণময়ী অসহায়ভাবে গণিকা-জীবনের দ্বারদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সতীশ ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত না হইলে তাহার ভাগ্যে আরও কত লাঞ্ছনা ছিল তাহা কল্পনা করিতেও আতঙ্ক হয়। শরৎচন্দ্র নির্বিকার বাস্তবনিষ্ঠা লইয়া কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকানবাসের রূঢ় ও কদর্য অধ্যায়টি তুলিয়া ধরিয়াছেন।

'চরিত্রহীনে' বর্ণনাত্মক অংশ খুবই কম, নাটকীয় রীতিতে সংলাপের মধ্য দিয়াই উপন্যাসের অধিকাংশ বিবৃত হইয়াছে। মাঝে মাঝে চরিত্রের অন্তর-রহস্য অথবা আবেগানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য লেখক নিজস্ব বর্ণনার আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু এ-ধরণের বর্ণনা খুব বেশি নাই। সংলাপ-রচনায় শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এই উপন্যাসের মধ্যেও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। সেজন্য চরিত্র এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপের ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। সাবিত্রী ও সতীশের কথোপকথন মেসের মধ্যে প্রাথমিক পরিচ্ছেদগুলিতে হাস্যপরিহাসে দীপ্ত কিন্তু শেষ দিকে আবেগমুহূর্তগুলি হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতিতে অভিষিক্ত। কিরণময়ীর কথায় তির্যক বাগ্‌ভঙ্গি ও গূঢ় শ্লেষাত্মক বাক্যগুলি বাঁকা বিদ্যুতের হাসির ঝিলিক দিয়া উঠিয়াছে। আবার মোক্ষদা ও কামিনী বাড়িউলির কথায় স্থূল বাস্তবের প্রত্যক্ষ পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন স্থলে লেখক সম্পূর্ণ নাট্যরীতি অবলম্বন করিয়া চরিত্রের নাম ও ক্রিয়া উল্লেখ না করিয়া শুধু পর পর সংলাপের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, যথা—

'মদ, গাঁজা হাত দিয়েও কখনো ছোঁবে না?

না।

আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তন্ত্রমন্ত্রের দিকেও যাবে না?

না।

যতদিন না শরীর একেবারে সারে দু'দিন অন্তর চিঠি লিখবে?

লিখব।

তাতে কোন কথা লুকোবে না?

না।

শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে প্রকৃতিচিত্র খুব কমই আঁকিয়াছেন। যেখানে

অনিবার্যরূপে প্রকৃতির কোন রূপ চিত্রিত হইয়াছে, সেখানে প্রকৃতিরূপের সঙ্গে বিশেষ কোন চরিত্রের অন্তর্জগতের গূঢ় সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। এগার পরিচ্ছেদে উপেন্দ্র ও সতীশ যখন ট্রেনে কলিকাতায় যাইতেছে তখন সতীশের দৃষ্টি দিয়া জ্যোৎস্নারাতের একটি ছবি লেখক তুলিয়া ধরিয়াছেন। আকাশের ম্লান জ্যোৎস্নায় পার্শ্ববর্তী বৃক্ষলতা, মাঠ-বন সব যেন কত শান্ত ও নির্লিপ্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, সাবিত্রীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে যখন সতীশের মন বেদনায় হতাশায় মুহ্যমান তখনই সে প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া দেখিল জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতি সাবিত্রীর মতই তাহার প্রতি নির্বিকার ও নিষ্ঠুর, বিন্দুমাত্র সমবেদনা সেখানে সঞ্চিত নাই। সেজন্য প্রকৃতি আজ তাহার চোখে শুধু জলই আনিল।

কিরণময়ী ও দিবাকরের আরাকানযাত্রার বর্ণনা করিবার সময় শরৎচন্দ্র সমুদ্রের বিভিন্ন রূপের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা নিসর্গ বর্ণনা রূপে অনবদ্য। অস্তায়মান সূর্যের কিরণে মণ্ডিত সমুদ্রের স্নিগ্ধ রূপের পরেই অন্ধকারের কালো ছায়ায় আবৃত সমুদ্রের কালিমালিপ্ত রহস্যময় রূপটি লেখক তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই চতুর্দিকব্যাপী কালিমার সঙ্গে দিবাকর নিজের জীবনের কালিমার একটি সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। পরের দিন আবার সেই সমুদ্র উন্মত্ত ঝটিকার দ্বারা তাড়িত হইয়া এক ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। শরৎচন্দ্রের বর্ণনা—'জাহাজ ওলটপালট করিতে লাগিল, বাহিরে ক্রুদ্ধ পবন গোঁ গোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত জলকণা প্রবলতর বেগে ক্ষুদ্র জানালার মোটা কাঁচের উপর বারম্বার আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।' এই সংক্ষিপ্ত ও শব্দভারহীন বর্ণনায় ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের আবেগটি অতি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থটি হইল 'স্বামী'।[১] 'স্বামী' গ্রন্থটির মধ্যে 'স্বামী' ও 'একাদশী বৈরাগী' এই দুইটি গল্প স্থান পাইয়াছে। 'স্বামী' ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হয়। 'নারায়ণ' পত্রিকাখানি দেশবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতায় বসুমতী প্রেস হইতে মুদ্রিত হইত। দেশবন্ধুর অনুরোধেই শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লেখেন। এ-প্রসঙ্গে 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সখ্য। দেশবন্ধু তখন দেশবন্ধু

১। প্রকাশকাল ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ (ফাল্গুন, ১৩২৪)

হননি। তিনি তখনও ব্যারিষ্টার এবং কবি চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর পরিচালিত বাঙ্গলা মাসিক পত্র নারায়ণে প্রকাশের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে একটি লেখা চেয়ে পাঠান। শরৎচন্দ্র তাঁর স্বামী গল্পটি রচনা ক'রে গল্পটি কোন নামকরণ না ক'রে দাশ মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁহাকেই গল্পটির নামকরণ করবার ভার দেন। দাশ মহাশয় গল্পটির স্বামী নামকরণ ক'রে নারায়ণে প্রকাশ করলেন ( ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ) এবং শরৎচন্দ্রকে পারিশ্রমিক হিসাবে একখানি সাদা চেক পাঠিয়ে দিলেন। চেকের সঙ্গে একখানি পত্রে তিনি শরৎচন্দ্রকে লিখে পাঠালেন, 'অর্থ দিয়ে আপনার মত শিল্পীর রচনার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু আপনার পারিশ্রমিকের জন্য একখানা চেক পাঠাচ্ছি, অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করবেন এবং চেকে আপনার ইচ্ছামত টাকা লিখে নেবেন, কোন সঙ্কোচ করবেন না। শরৎচন্দ্র এই চেকে যদৃচ্ছা টাকার অঙ্ক লিখে চেক ভাঙ্গিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চেকে মাত্র এক'শ টাকা লিখে চেক ভাঙ্গিয়ে নিয়েছিলেন।'

ফরমায়েসী গল্প বলিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রতিভার স্ফূর্তি এই গল্পটির মধ্যে হয় নাই। দেশবন্ধুর রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্র এখানে জীবনের রক্ষণশীল আদর্শই বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন। দেশবন্ধু বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বলিয়াই সম্ভবত বৈষ্ণবধর্মনিষ্ঠ চরিত্রই এই গল্পের নায়করূপে দেখা দিয়াছে। পাতিব্রত্যের আদর্শের জয়গান করিয়া শরৎচন্দ্র আরও অনেক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যথা, বিরাজ, অন্নদা-দিদি, সুরবালা ইত্যাদি, বিশেষ করিয়া বিরাজ-চরিত্রের সঙ্গে সৌদামিনীর ঘটনাগত মিলও রহিয়াছে। কিন্তু সেসব স্থলে পাতিব্রত্য একটি স্বাভাবিক ধর্মরূপে সহজ ও সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর আলোচ্য গল্পে সতীধর্মের সোচ্চার প্রচারকের ভূমিকাতেই শরৎচন্দ্র যেন অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিবাহিতা নারীর পরপুরুষের প্রতি আসক্তি নৈতিক অপরাধ হইতে পারে, কিন্তু প্রাক্-বৈবাহিক প্রেম সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হওয়া সত্ত্বেও সেই প্রেমকেও লেখক এখানে সৌদামিনীর মুখ দিয়া প্রবল ধিক্কার দিয়াছেন। বিবাহের পূর্বে সৌদামিনীর সহিত নরেনের যে অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে তাহাই এই গল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর ও উপভোগ্য অংশ। অথচ সেই অনুরাগকেই মুহুর্মুহু কঠিন তিরস্কারে জর্জরিত করা হইয়াছে। সৌদামিনীকে যতবার পাপীয়সী পাপিষ্ঠা প্রভৃতি ধিক্কারসূচক বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে বঙ্কিমচন্দ্র

শৈবলিনীর প্রতিও বোধ হয় ততবার ঐ-সব বিশেষণ প্রয়োগ করেন নাই। মনে হয় কিরণময়ীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া রক্ষণশীল সমাজের উপর যে কঠোর আঘাত শরৎচন্দ্র হানিয়াছিলেন সৌদামিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়া সেই আঘাতের উপর তিনি প্রলেপ লাগাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সৌদামিনী শরৎপ্রতিভার একটি বিচ্ছিন্ন ও আকস্মিক সৃষ্টি মাত্র, কারণ সৌদামিনীর অল্প কয়েকমাস পরেই আসিল অভয়া—সম্পূর্ণ বিপরীত পথ দিয়া, যে পথে কিরণময়ী আসিয়াছিল।

সৌদামিনী বারো বছর বয়সে হার্বাট স্পেন্সারের Agnostic মতবাদে পাকাপোক্ত হইয়া নরেনের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াছে ইহা একটু অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার প্রিয় দার্শনিকের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া এই গল্পে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেজন্য সৌদামিনীর স্বামীর ভগবদ্‌নিষ্ঠাই এখানে সৌদামিনীর নাস্তিকতার উপরে জয়লাভ করিয়াছে। তবে লেখক স্বামীকে অতিরিক্ত আদর্শায়িত করিয়া তাহাকে সম্ভাব্যতার সীমানার বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ধৈর্য ও ক্ষমার অবতার, সকলের প্রতি তাঁহার উদারতা, স্নেহশীলতা ও কর্তব্যবোধ সদাজাগ্রত রহিয়াছে, বোধ হয় কোন অলৌকিক শক্তি বলেই তিনি যেখানে যাহা ঘটে সব কিছুই জানিয়া বুঝিয়া থাকেন। গল্পে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ও অবিশ্বাস্য অংশ হইল সেখানে যেখানে বহুদিনকার প্রণয়ী নরেন হঠাৎ নরেনদাদা হইয়া গেল। যে নরেনের ভালোবাসা সৌদামিনীর জীবনে যত সমস্যা, যত বেদনা আনয়ন করিয়াছে সে যে চট করিয়া দাদা হইয়া গিয়া সকল জটিল সমস্যার উপর যবনিকাপাত করিল, ইহা বড় আশ্চর্যজনক মনে হয়।

'স্বামী' গল্পটি নায়িকার মুখ দিয়া শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। নায়িকা নিজে তাহার কথা বলিয়াছে, সেজন্য তাহার নিজস্ব আবেগ, বেদনা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি তাহার মুখে সত্য ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে। চলিত ভাষার মধ্যে বর্ণনার রীতিটিও খুব অন্তরঙ্গ হইতে পারিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার মুখ দিয়া তাহার নিজের কাহিনী বিবৃত করাইয়াছেন। 'রজনী' উপন্যাসেও বিভিন্ন চরিত্র কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও এই রীতিটি অনুসরণ করিয়াছেন।

'একাদশী বৈরাগী' গল্পটি ১৩৪২ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'স্বামী' গল্পটির সঙ্গে একসূত্রে গ্রন্থবদ্ধ হয়। গল্পটির

প্রথম অংশ, অর্থাৎ যেখানে অপূর্ব ও গ্রামের ছেলেদের হঠাৎ সনাতনধর্মনিষ্ঠ হইয়া উঠার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে গল্পের মূল রসের কোনই যোগ নাই। গল্পটির যথার্থ আরম্ভ হইয়াছে একাদশী বৈরাগীর বর্ণনা হইতে। গল্পটি ঘটনাহীন, একাদশীর চরিত্রচিত্রই এখানে মুখ্য। মানুষের মধ্যে কিরূপ জটিল ও পরস্পরবিরোধী উপাদান থাকে তাহাই লেখক এই চরিত্রটির মাধ্যমে দেখাইয়াছেন। একাদশী নির্মম, হৃদয়হীন সুদখোর মহাজন, কিন্তু কলঙ্কিতা ভগ্নীটির প্রতি তাহার স্নেহমমতার গভীরতা দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। আবার যে নিজের পাওনার বেলায় একটি পয়সাও ছাড়িতে নারাজ সেই আবার অপরের পাওনাও সুদসমেত পাইপয়সাটি পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে আগ্রহী। একাদশীর ভগ্নী গৌরী সমাজের দেওয়া ঘৃণার বোঝা মাথায় নিয়া গৃহের অন্তরালেই নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অপূর্বকে সযত্নে জলপান করাইতে আসিয়াও সে সকলের সমবেত অপমানের আঘাতেই শুধু পীড়িত হইল। কিন্তু তবুও কাহারও বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই। বরং অন্তরাল হইতে দুঃখী ও অসহায় মানুষের প্রতি ন্যায়বিধানের জন্য সে দৃঢ় নির্দেশ দিয়াছে। গৌরীচরিত্রের সত্যকার পরিচয় পাইয়া অপূর্বের সংকীর্ণ ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং তাহার পূর্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য গৌরীর হাতে জলপান করিতে আবার একাদশীর বাড়ির দিকে সে ফিরিয়া গিয়াছে।

'দত্তা' উপন্যাসটি ১৩২৪ সালের পৌষ—চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী গল্প 'স্বামী'র মধ্যে লেখক প্রতিনায়ক নরেনকে বহু ধিক্কার দিয়া তাহার সঙ্গে সৌদামিনীর ভালোবাসার গ্লানিকর মালিন্যই তুলিয়া ধরিলেন, কিন্তু 'দত্তা' উপন্যাসে নায়ক নরেনের উপরেই প্রশংসার পর প্রশংসা চাপাইয়া তাহার সহিত বিজয়ার পারস্পরিক প্রেমের প্রীতিকর মাধুর্যই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের মন কত দ্রুত কত বিপরীত পথ পরিক্রমা করিতেছিল তাহা ইহাতেই বুঝা যায়।

শরৎচন্দ্র সমস্যাবিরহিত রোমান্টিক প্রেমের চিত্র খুব কমই আঁকিয়াছেন। এই ধরণের প্রেমের একটি চিত্র আমরা পাইয়াছিলাম 'পরিণীতা' উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসে পুনরায় এই প্রেমের একটি লাজরক্তিম, সংশয়মধুর ও কৌতুকদীপ্ত চিত্র পাওয়া গেল। প্রেমের পথ মসৃণ-ও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। তাহা বাধাবিঘ্নের উপল খণ্ডে বন্ধুর এবং সংশয় ও ভুল বোঝাবুঝির কণ্টকে

আকীর্ণ। কিন্তু এই বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথের শেষে রহিয়াছে আনন্দের মোক্ষধাম। নরেন ও বিজয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার দুরতিক্রম্য বাধা ছিল রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী এবং তারপর উপন্যাসের শেষ দিকে নলিনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইল। অবশেষে সেই বাধা ও জটিলতার মেঘ অপসারিত করিয়া সেই ভালোবাসা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকের মত আত্মপ্রকাশ করিয়া চারিদিকে প্রসন্নমধুর হাসি বিকিরণ করিল।

এই উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে শরৎচন্দ্র প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বিরোধী শক্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও মনের অজানা স্তরের অচিন্তিতপূর্ব বাসনাকামনার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে এবং নির্ধারিত ব্যবস্থার চমকপ্রদ পরিবর্তনে কাহিনীর মধ্যে ঘনীভূত কৌতূহল শেষ পর্যন্ত তীব্রমাত্রায় বজায় রহিয়াছে। বিজয়ার পিতা বনমালী বিজয়াকে নরেনের হাতেই তুলিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার সেই ইচ্ছার সঙ্গে বিজয়ার মনের যে আন্তরিক যোগ ছিল তাহা মনে হয় না। কারণ বিলাসবিহারীর প্রতি তাহার মন একটু উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, বিলাসের সঙ্গে একযোগে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারেও সে মাতিয়া উঠিয়াছে। বিলাস বিজয়াকে পল্লীগ্রামে আনিয়া যে নিজের পায়েই নিজে কুড়াল মারিয়াছিল তাহা শুধুমাত্র পরিহাসপ্রিয় অদৃশ্য ভাগ্যদেবতাই জানিয়াছিলেন। সেই সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ দেহধারী ও অদ্ভুত লোকটি যেদিন বিজয়ার সম্মুখে আসিল সেদিনই বিজয়ার অন্তরজগতে কোথা হইতে যেন কি ঘটিয়া গেল। তারপর একদিকে বিজয়ার কুমারীহৃদয়ের প্রবল অনুরাগ এবং অপরদিকে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর প্রতিকূল মতলব ও ক্রিয়াকলাপ এই দুই শক্তির ঘাতপ্রতি-ঘাতে উপন্যাস জমিয়া উঠিয়াছে। বিজয়া স্বনির্ভরশীলা এবং বিষয়সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী, সুতরাং সে তো সহজেই নরেনকে পতিরূপে নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিতে পারিত, এ-প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সে কুমারীহৃদয়ের স্বাভাবিক লজ্জা ও পিতৃবন্ধু রাসবিহারীর প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের ফলেই প্রকাশ্যভাবে নিজের মত প্রকাশ করিতে পারে নাই। রাসবিহারী যখন সমবেত অতিথিবর্গের সম্মুখে বিলাস ও বিজয়ার আসন্ন বিবাহের কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছিলেন তখনও ভিতরের প্রবল বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও স্বাভাবিক লজ্জা ও শালীনতাবোধের ফলেই বিজয়া

ঐরূপ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনও কথা উচ্চারণ করিতে পারে নাই। শেষের দিকে দুইটি ঘটনা উপন্যাসের মধ্যে জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। জগদীশের কাছে লিখিত বনমালীর চিঠিতে বিজয়াকে নরেনের হাতে তুলিয়া দিবার ইচ্ছার কথা নরেনের মুখে শুনিয়া বিজয়ার অনুরাগ যেমন প্রবল সমর্থন লাভ করিল তেমনি আবার নরেন ও নলিনীর ভিতরকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা চিন্তা করিয়া সে রাসবিহারী ও তাঁহার পুত্রের ইচ্ছার কাছে নিরাশচিত্তে, আত্মসমর্পণ করিয়াও ফেলিল। বিজয়া ও বিলাসের বিবাহের দিন যখন একেবারে আসন্ন হইয়া আসিল তখন নরেন আসিয়া আবার সবকিছু ওলটপালট করিয়া দিল। বিজয়ার সন্দেহের নিরসন হইল এবং নাটকীয়ভাবে অবশেষে বিবাহের পাত্রপরিবর্তন হইয়া গেল। এমনিভাবে পরস্পরবিরোধী ও জটিল ঘটনা পর পর আনিয়া লেখক শেষ পর্যন্ত পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল তীব্রভাবে জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

উপন্যাসের নাম 'দত্তা' হইল কেন এ-প্রসঙ্গে সেই প্রশ্নটি আলোচনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই দেখি, বনমালী বিজয়াকে বলিতেছেন যে, তিনি বন্ধুকে কথা দিয়াছিলেন যে, বিজয়াকে তিনি জগদীশকে তাঁহার পুত্রের জন্য দিবেন। অর্থাৎ, বিজয়া পূর্ব হইতেই পিতার দ্বারা নরেনের কাছে বাগ্‌দত্তা অথবা দত্তা হইয়াই ছিল। কিন্তু পিতার এই প্রতিশ্রুতি কন্যার মনে ছিল কিনা তাহা গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ পায় নাই। এই প্রতিশ্রুতির কথা মনে থাকিলে নরেনের প্রতি বিজয়ার অনুরাগ অনেকখানি দ্বিধা ও সংকোচমুক্ত হইতে পারিত। নরেন পিতার কাছে লিখিত বনমালীর যে চিঠির কথা বিজয়াকে জানাইয়াছে, সেই চিঠিতে ব্যক্ত প্রতিশ্রুতি ও গ্রন্থের প্রারম্ভে বিজয়ার কাছে বনমালীর স্বীকার করা প্রতিশ্রুতি একই। কিন্তু তবুও বিজয়ার তীব্র কৌতূহল ও চিত্তদ্বন্দ্ব দেখিয়া মনে হয়, বিজয়া যেন এই প্রথম পিতার প্রতিশ্রুতির কথা জানিল। যাহা হউক ঐ চিঠিতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে বিজয়া নরেনের কাছে পিতার বাগ্‌দত্তা ছিল। শেষ পর্যন্ত দয়ালের সহায়তায় বিজয়া নরেনের কাছে প্রকৃতই দত্তা হইল। উপন্যাসের প্রথমেই যাহাকে বাগ্‌দত্তা দেখিয়াছি নানা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে সে এমনি ভাবে দত্তা হইল।

'দত্তা' উপন্যাসে হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধের একটি চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কেশব সেনের বক্তৃতার তোড়ে অনেক হিন্দু যুবকই এককালে

দিশাহারা হইয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বনমালী ও রাসবিহারীও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে নবদীক্ষিত অনেক গোঁড়া ও উগ্রপন্থী লোকের ন্যায় রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীও স্বধর্মপ্রচারে অত্যুৎসাহী এবং হিন্দুধর্মের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন। ইঁহাদের গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা ও পরধর্মবিদ্বেষের রূপ শরৎচন্দ্র নির্মমভাবে উদঘাটন করিলেন। তিনি দেখাইলেন, ইঁহারা ধর্মের বড়াই করিলেও আসলে ইঁহারা কত সংকীর্ণ, স্বার্থপর, কপট ও উদ্ধত। তবে রাসবিহারী বিলাসবিহার মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, রাসবিহারীর ধর্মনিষ্ঠা তাঁহার ঘোর স্বার্থপর ও অসাধু প্রকৃতির একটি ছদ্ম আবরণ মাত্র, বিলাসবিহারী অসহিষ্ণু ও উদ্ধত হইলেও তাহার ধর্মনিষ্ঠা কিন্তু খাঁটি। ব্রাহ্মদের কৃত্রিমতা, বাক্‌সর্বস্বতা ও তুচ্ছ সামাজিক আচার-আচরণ সম্বন্ধে অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা শরৎচন্দ্র এ-উপন্যাসে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। সেজন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিদ্বেষের ভাব ইহাতে কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন। আসলে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের কোন অভিযোগ ছিল না। হিন্দুসমাজ হউক, ব্রাহ্মসমাজ হউক, যেখানেই সমাজের নীচতা, স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়াছেন সেখানে তিনি প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের অনেক গলদই তিনি 'দত্তা' উপন্যাসের আগে ও পরে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অসঙ্গতি ও আতিশয্যও তিনি এই উপন্যাসে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সৎ, উদার ও স্নেহশীল চরিত্রও তিনি এখানে দেখাইয়াছেন। রাসবিহারী কপট ও স্বার্থপর হইলেও তাঁহার বন্ধু বনমালী কিন্তু 'ভগবৎপরায়ণ এবং ধর্মভীরু'। রাসবিহারীর পাশে আর একজন ব্রাহ্ম আচার্যের সততা, সরলতা ও স্নেহশীলতা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। তিনি হইলেন দয়াল। রাসবিহারীর পাশে দয়ালকে দাঁড় করাইয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়াছেন। তবে হিন্দু নরেন ও ব্রাহ্ম বিজয়ার প্রণয়ের পরিণতিতে অবশেষে তিনি নরেনকেই জিতাইয়া দিয়াছেন। কারণ উভয়ের বিবাহ শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতেই হইল এবং হিন্দুপুরোহিত কানা ভট্টাচার্য মহাশয়ই সেই বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন। বিজয়ার ভালোবাসার কাছে অবশেষে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা পরাজয় বরণ করিল।

'দত্তা'র রাসবিহারী চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণক্ষমতার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। রাসবিহারীর অতি সূক্ষ্ম প্রতারণাকৌশল, তাঁহার নিখুঁত অভিনয়কুশলতা, কপট ধর্মপরায়ণতার সম্মোহিনী প্রভাব বিস্তার করিয়া সকলকে বশীভূত করার সকল চেষ্টা প্রভৃতি দেখিয়া প্রতি মুহূর্তেই আমরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হই। শেকস্‌পীয়রের ফলস্টাফ চরিত্রের মত রাসবিহারীকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও ভালো লাগে। শরৎচন্দ্র রাসবিহারী চরিত্রের আসল প্রকৃতি ও তাঁহার কথা ও আচরণের মধ্যে এত বেশি পার্থক্য দেখাইয়াছেন যে, চরিত্রটির প্রতি প্রবল ধিক্কারে আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সুমার্জিত ও সুপরিপাটি অভিনয়কলা দেখিয়া আমরা মজা বোধ না করিয়া পারি না। রাসবিহারী এত ভদ্র, এত ধর্মপ্রাণ ও এত স্নেহশীল রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন যে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া প্রতারিত না হইয়া পারে না এবং যাহারা তাঁহাকে যথার্থ ভাবে চিনিতে পারিয়াছে তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নালিশ জানাইবার সুযোগ পায় না। বিজয়া এজন্যই রাসবিহারীর যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াও তাঁহার স্নেহের অভিনয় অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহ জানাইতে পারে নাই। রাসবিহারী জানেন নিজের পুত্রের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত বিজয়ার বিরাট সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইবে না, তিনি সম্পত্তি পরিচালনা করিলেও এবং বিজয়ার অভিভাবক রূপে নিজেকে জাহির করা সত্ত্বেও এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ও ব্যক্তিত্বময়ী নারীটি কিন্তু নিজের অধিকার সম্বন্ধে পুরাপুরি সচেতন। বিলাসবিহারীকে বিজয়ার কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার বুদ্ধি ও কৌশলের তূণ হইতে সব রকম বাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার উদ্ধত পুত্রটি নিতান্ত হঠকারীর মত আচরণ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া পরমুহূর্তেই তাঁহার পরম উদার ও প্রীতিপ্রসন্ন বাণী দ্বারা বিজয়াকে আপ্যায়িত করিয়া তাহার কাছে পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সম্মুখে তিনি পরম পিতার অপার করুণার কথা এবং পরলোকগত বন্ধু বনমালীর সহিত তাঁহার সুদুঃসহ বিচ্ছেদের কথা বলিতে বলিতে ভাবাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলের মন যখন বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তখনই তিনি সুকৌশলে বিজয়া ও বিলাসের আসন্ন বিবাহের কথা ঘোষণা করিয়া সেই বিবাহের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। সকলের সানন্দ স্বীকৃতির মধ্যে বিব্রত ও বিপন্ন বিজয়া নিজেকে

কথাটি জানাইবার সুযোগও পায় নাই। নরেনের কাছে পিতার চিঠিতে তাঁহার সুস্পষ্ট ইচ্ছার কথা জানিবার পর বিজয়ার ভালোবাসা যেমন একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইবার সাহস সঞ্চয় করিয়াছে, তেমনি রাসবিহারীর বিরুদ্ধতা করিবার শক্তিও সে যেন অনেকটা পাইয়াছে। ইহার পরেই রাসবিহারীর পরাজয়ের সূচনা হইল যখন তিনি বিজয়ার কাছে দলিল চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। রাসবিহারী যেখানে প্রকাশ্যভাবে বিজয়ার বিরুদ্ধে কুৎসিত অভিযোগ আনিলেন সেখানে তিনি তাঁহার বহু যত্নলব্ধ সংযম ও শালীনতা হারাইয়া নিজের দুর্বলতা ও ভিতরকার কদর্যরূপই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তবে রাসবিহারীর বড় শোচনীয় পরাজয় ঘটিল শেষকালে। যিনি চিরকাল তাঁহার অব্যর্থ প্রতারণার ফাঁদে সকলকে ফেলিয়াছেন তিনি নিজেই যে অবশেষে অন্যলোকের প্রতারণাজালে ধরা পড়িলেন তাহাই বিস্ময় ও কৌতুকের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু রাসবিহারীর এই পরাজয় স্বস্তি ও প্রসন্নতায় আমাদের মন উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেও সঙ্গে সঙ্গে এই অসাধারণ লোকটির এই করুণ পরিণতি দেখিয়া একটু বেদনা ও সহানুভূতি বোধ না করিয়াও আমরা পারি না।

'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব) ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্বের শেষে রাজলক্ষ্মীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীকান্ত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের গোড়াতেই পুনরায় তাহাকে রাজলক্ষ্মীর কাছে যাইয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। শ্রীকান্ত যখনই কোন সঙ্কটে পড়িয়াছে কিংবা গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী হইয়াছে তখন রাজলক্ষ্মীর শরণাপন্ন তাহাকে হইতে হইয়াছে। এবারও তাহার একজন মাতৃসখীর কন্যাদানে রাজলক্ষ্মীর কাছে সাহায্য চাহিতে তাহাকে রাজলক্ষ্মীর কাছে যাইতে হইল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্তের ব্রহ্মদেশ বাস এবং অভয়ার কাহিনীই অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া আছে। এই অংশে শ্রীকান্তের ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় আছে খুবই সামান্য। সে শুধুমাত্র দ্রষ্টা, বিবৃতিকার ও ব্যাখ্যাতা। দ্বিতীয় পর্বের শেষ অংশে পুনরায় শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের নিজের শরীরটা যে মোটেই ভালো ছিল না তাহা শ্রীকান্তের কাহিনী পড়িলেই বুঝা যায়। প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত একবার অসুখে পড়িয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বার দুইবার গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী

হইয়াছে। প্রথম বার রেঙ্গুনে অভয়া তাহাকে ভালো করিয়া তুলিয়াছিল এবং দ্বিতীয়বার রাজলক্ষ্মী স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করিয়া অসুস্থ শ্রীকান্তের পাশে আসিয়া বসিয়াছে।

প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের ভবঘুরে ও বিচিত্র রহস্যরোমাঞ্চময় জীবনের নানা চমকপ্রদ ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য চলমান সমাজজীবনের নিষিদ্ধ মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেই সে তাহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, পিয়ারী বাইজী প্রভৃতি চরিত্র নীতি ও নিয়মের বাঁধা রাস্তা হইতে তাহাকে দূরে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাদের কাহিনী এক অজানা রোমাঞ্চরসে আমাদের চিত্তকে উৎসুক ও উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে শ্রীকান্ত যেন অনেকটা সামাজিক, সংযত ও ঘরোয়া হইয়া পড়িয়াছে। পরিচিত সামাজিক জগতের নানা দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে যেন তাহাকে জড়িত হইতে হইয়াছে। তাহার নিজস্ব বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির নানা কথা এখানে আসিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশে যেসব নরনারীর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে সেগুলির মধ্যেও বঙ্গদেশীয় অথবা ব্রহ্মদেশীয় সামাজিক জীবনের সমস্যাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের কোন রহস্য ও রোমাঞ্চ দ্বিতীয়পর্বে নাই। প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব অপেক্ষা যে অনেক বেশি আকর্ষণীয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম পর্বের ন্যায় দ্বিতীয় পর্বেও বিশেষ কোন কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন ধারা অপেক্ষা টুকরা টুকরা ঘটনা ও ক্ষণস্থায়ী চরিত্রচিত্রই বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অবশ্য মূল চরিত্র শ্রীকান্ত সব খণ্ড ও বিভক্ত ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। তবে অভয়া-রোহিণীদার কাহিনী অত্যধিক প্রাধান্য পাইবার ফলে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কাহিনী যেন একটু গৌণ ও চমকহীন হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের গঙ্গাজল-সখী, নন্দ-টগর যুগল চরিত্র, অভয়ার পাষণ্ড স্বামী, কদলীপ্রদর্শনকারী বাঙালী পুরুষ ও তাহার সাধ্বী বর্মী স্ত্রী, অতিহিংসাবী মনোহর চক্রবর্তী, বর্ধমানগামী দরিদ্র কেরাণী প্রভৃতি বহু অস্থায়ী চরিত্র আমাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিয়া তারপরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

'শ্রীকান্তে'র দ্বিতীয় পর্বে রসসৃষ্টি অপেক্ষা তত্ত্বপ্রচারের দিকেই শরৎচন্দ্রের যেন অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়। যেসব চরিত্র তিনি চিত্রিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ সামাজিক মতপ্রচারের উদ্দেশ্যই যেন পরিস্ফুট হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের সমাজবিদ্রোহের অগ্নিশিখা জলিয়া উঠিয়াছে অভয়ার

চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে। অভয়া চরিত্রটির বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র শৈলেশ বিশীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বিশী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন, 'ঐ রকমই মিস্ত্রীশ্রেণীর একজনের স্ত্রী ছিল অভয়ার মতই—সেইরকম সুন্দরী ও মার্জিতরুচি। লোকটি ছিল মাতাল, অন্য রমণীতে আসক্ত ও স্ত্রীকে ধরে মারত। এই রকম মেয়ের চাহিদা আছে। জুটে গেল তার একজন পূজারী। সে তাকে ভালোবাসত এবং এই দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে সব সময়ই বাঁচাবার চেষ্টা করত।...তাদের দুজনের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা ছিল। দুঃখের নিকষে তাদের ভালবাসার পরখ দু'জনের মনেই হয়েছিল—সেটা তারা খাঁটি সোনা বলেই জানতো।... এইভাবেই তারা অনেকদিন দু'জনে দু'জনের মুখ চেয়েছিল—শেষে অনিয়ম ও অত্যাচারে ঐ স্বামী মহাশয়ের ক্যানসার বা গ্যাংগ্রীনের মতই একটা কিছু হয়। দাদাকে বলতে শুনেছি, রোগীর ঘরে মানুষ ঢুকতে পারে না, দুর্গন্ধে সর্বাঙ্গ খসে পড়ছে তার নিদারুণ ক্ষততে। কিন্তু ঐ নারী কী নিষ্ঠার সাথেই না তার সেবাশুশ্রূষা করলে এবং পরে সে মারা গেলে এলো তার প্রণয়ীর কাছে—যে এতদিন তারই আশাপথ চেয়ে বসে ছিল।' কিরণময়ীর চরিত্রের লেলিহান শিখা হইতে বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ হইতেই এই অগ্নিশিখার জন্ম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও এই দুই অগ্নিময়ী নারীর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। কিরণময়ীর আগুন অপরকে যেমন পোড়াইয়াছে, নিজেকেও তেমনি পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়াছে, কিন্তু অভয়ার আগুন তাহার জীর্ণ আবরণ দগ্ধ করিয়া তাহার ভিতরকার এক তেজোময়ী মূর্তিকেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিরণময়ীর অসাধারণ রূপ, বিদ্যাবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব কিছুই অভয়ার নাই, কিন্তু তাহার একটি শান্ত, স্থির ও অকুণ্ঠ বিশ্বাস রহিয়াছে। কিরণময়ীর তর্কবিতর্ক তাহার ব্যক্তিসীমানা ছাড়াইয়া এক নৈর্ব্যক্তিক মননশীলতার জগতে বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু অভয়া নিজের ব্যক্তিজীবনের বেদনাক্ত অভিজ্ঞতা হইতেই তাহার বিচার ও আচরণের প্রেরণা পাইয়াছে এবং যে সমাধানের পথ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহাও তাহার নিজের জীবনেই অবলম্বন করিয়াছে। কিরণময়ীর দুঃসাহসিক বিদ্রোহ অবশেষে অপ্রকৃতিস্থ পরিণতির মধ্যে যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে তাহাতে চরিত্রটির সঙ্গতি বজায় থাকিতে পারে নাই। কিন্তু অভয়ার মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র বিবাহবন্ধন-মুক্ত সমাজনিষিদ্ধ অথচ চিরপবিত্র ভালোবাসার

মূলে অকপট শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। সতীত্বের অপেক্ষা একনিষ্ঠ প্রেম যে শ্রেষ্ঠ এই মত শরৎচন্দ্র স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন অভয়ার মধ্যে এবং পরে 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের মধ্যে। 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামক প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, 'সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ-কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায় ত সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?' ইবসেন 'A Doll's House', 'Ghosts' প্রভৃতি নাটকে এবং বার্নার্ড শ 'Getting Married', 'Man and Superman' নাটকগুলিতে বিবাহব্যবস্থার অসারতা এবং স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের ফাঁকি ও বৈষম্যের দিকগুলি দেখাইয়াছেন। পুরুষের প্রতি নারীর নির্ভরতা ও নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতার সুযোগ লইয়াই যে পুরুষ নারীর উপরে চিরকাল নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাইয়াছে ইবসেন, শ প্রভৃতির মত শরৎচন্দ্রও তাহা বলিতে চাহিয়াছেন। 'Ghosts' নাটকের মিসেস অ্যালভিং সমাজের নীতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইয়া বলিয়াছিল,…'but I will not be bound by these responsibilities, these hypocritical conventions any longer—I simply cannot! I must work my way through to freedom.' অভয়াও শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করিয়াছে, 'যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্ত একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না?' অভয়া যে শেষ পর্যন্ত রোহিণীদার সঙ্গেই তাহার জীবন যুক্ত করিয়াছে, ইহা ছাড়া তাহার আর কি উপায়ই বা ছিল? সে রোহিণীদার প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও প্রথমত স্ত্রীর কর্তব্যেই একনিষ্ঠ থাকিতে চাহিয়াছিল। স্বামীর অন্য স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে স্বামীর সংসারে থাকিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পাষণ্ড স্বামী পৈশাচিক অত্যাচার দিয়া এই স্বামীনিষ্ঠার পুরস্কার দিল, তাহার পরে আর কোন পথই তো তাহার সম্মুখে খোলা ছিল না। রোহিণীদার প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রেম এবং তাহার গোপন সন্তানকামনার দাবীকে অবশেষে সে মানিয়া লইল। রোহিণীদা ও অভয়া হয়তো সমাজের বাহিরে, পরিত্যক্ত হইয়া রহিল, কিন্তু তাহারা সুস্থ, সুখী, ও

সম্ভাবনাময় মিলিত জীবনের চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

অভয়ার আচরণের প্রতি আমাদের সংস্কারমুক্ত মনের তাত্ত্বিক সমর্থন থাকিলেও অভয়া ও রোহিণীদার সঙ্গে আমাদের সহানুভূতিশীল হৃদয়সত্তা যুক্ত হয় না। তাহার কারণ, তাহাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, বেদনা অভিমান ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন রূপ আমরা দেখি নাই। রোহিণীদা চরিত্রটি একেবারেই অপরিস্ফুট এবং রোহিণীদার প্রতি অভয়ার গভীর ভালোবাসার কোন বর্ণনা আমরা পাই নাই, শুধু কেবল আভাসে ইঙ্গিতে জানিতে পারিয়াছি। অভয়া-রোহিণীদার বৃত্তান্ত একটি সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াছে, কিন্তু তাহা নরনারীর অন্তর্জীবনের রহস্যের দিকে আমাদের রসপিপাসু চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

ব্রহ্মদেশের জীবনযাত্রার বর্ণনা করিয়া শরৎচন্দ্র বর্মীসমাজ ও ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় সমাজের বাস্তব ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় নারীসমাজের স্বাধীন চলাফেরা, তাহাদের কঠোর শ্রমনিষ্ঠা, বিদেশী স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা, তাহাদের সরল ও কোমল প্রকৃতি শরৎচন্দ্র সপ্রশংস শ্রদ্ধার সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন। তাহাদের সহিত নিজের দেশবাসীদেব নীচ প্রতারণাবৃত্তি এবং উৎকট নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত বর্ণনা কবিয়া তিনি তাহাদের প্রতি প্রবল ধিক্কার জানাইয়াছেন। বাঙালী বাবুটি তাহার বর্মী-স্ত্রীকে যেভাবে প্রতারণা করিয়াছে তাহাতে মানবচরিত্রের জঘন্যতম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশে বাঙালীরা আসিয়া কিভাবে নানা রকম ব্যবসা ও বৃত্তিতে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং নূতন পরিবেশে আসিয়া তাহাদের ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাতের বিচার কিভাবে লুপ্ত হইয়া যায় শরৎচন্দ্র তাহাও দেখাইয়াছেন। নৈতিক শিথিলতার অবাধ প্রশ্রয় পাইবার জন্য অনেকে যে দেশ ছাড়িয়া এই শিথিল নীতির দেশে আশ্রয় নেয়, লেখক তাহাও দেখাইতে ভুলেন নাই। রেঙ্গুনের অনেক ঘটনা ও চরিত্রই শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মৃতি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দাঠাকুরের হোটেল শরৎচন্দ্র নিজে যেমন দেখিয়াছিলেন তেমনি বর্ণনা করিয়াছেন।[১] হোটেলের যে সব মিস্ত্রী-মজুরদের কথা তিনি লিখিয়াছেন তাহারা রেঙ্গুনে তাঁহারই প্রতিবেশী ছিল।

১। 'এই বোটাটং-এর হোটেলে খেত কারখানার মিস্ত্রিগণ। এই হোটেল দা-ঠাকুরের হোটেল বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। মিস্ত্রিরা সকলেই বামুন ঠাকুরকে দাঠাকুর বলিয়াই ডাকিত।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রের বিচিত্র বিবর্তন দেখা গিয়াছে। প্রথম পর্বে তাহার চরিত্র প্রথম যেভাবে দেখি দ্বিতীয় পর্বেও সেভাবে অর্থাৎ বাইজীরূপে দেখিতে পাই। সে তাহার রূপমুগ্ধ বহু ভক্তের হৃদয় তাহার রূপ ও সঙ্গীতের তরঙ্গআঘাতে উদ্বেলিত করিয়া সম্রাজ্ঞীর মত বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীকান্তকে দেখিবামাত্রই এই সম্রাজ্ঞী সামান্যা নারীর মতই বিগলিত আবেগে লুটাইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকান্তকে সে পত্রাদি খুব কমই লিখিয়াছে। কিন্তু শ্রীকান্তের প্রতি এখন তাহার প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, সেজন্য প্রথম পর্বের ন্যায় সে আর তাহার সহিত লঘু হাস্যকৌতুকে মাতিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীকান্তের প্রতি গোপনে তাহার যেমন একটা অধিকারবোধ জন্মিয়া গিয়াছে, তেমনি তাহার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মীর মনে একটা চিন্তা ও উদ্বেগের ভাবও জাগ্রত হইয়াছে। শ্রীকান্তের বিবাহ সম্বন্ধে সে মুখে উৎসাহ দেখাইলেও আসলে তাহার মনে কোন সায় ছিল না। কারণ সে এখন মনে মনে শ্রীকান্তের জীবনসঙ্গিনীর পদেই নিজেকে স্থাপিত করিয়াছে। সেজন্য তাহার ভালোবাসায় এখন পূর্বেকার রহস্য-রোমান্সের রঙীন নাই, কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর শান্ত ও গভীর কল্যাণবোধ মিশিয়াছে। সুদূর বিদেশের পথে যখন শ্রীকান্ত রওনা হইল তখন প্রবল ঝড়ের আঘাতে সহকারশাখাচ্যুত স্বর্ণলতার মতই সে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীকান্ত ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর রাজলক্ষ্মীর মনের মধ্যে একটা নূতন কামনা প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া গেল। সে রোহিণীদা ও অভয়ার সমাজবন্ধনহীন মিলিত জীবনের কথা শুনিয়া গোপনে গোপনে সেই ধরণের জীবনের প্রতি লুব্ধ হইয়া উঠিল। রোহিণীদা ও অভয়া যদি নূতন করিয়া তাহাদের জীবন শুরু করিতে পারে তাহা হইলে শ্রীকান্তের সহিত সেও মিলিত হইতে পারিবে না কেন? অভয়ার মা হইবার প্রবল সাধের কথা শুনিয়া তাহারও বিশুষ্ক সত্তাটি মাতৃত্বের মধুস্বপ্নে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

শ্রীকান্তের সহিত তাহার সম্বন্ধটি নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও একটি সূক্ষ্ম ব্যবধানের প্রাচীরের দ্বারা পৃথগীভূত ছিল। রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্বকামনা সেই

শ্রীকান্ত বইতে শরৎচন্দ্র এই দাঠাকুরের হোটেলের কথাই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই দাঠাকুরও শ্রীকান্ত হইতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।'

শরৎ প্রতিভা—সতীশচন্দ্র দাস।

প্রাচীরের গায়ে কাতরভাবে মাথা ঠুকিয়াছে কিন্তু শ্রীকান্তের সম্ভ্রমবোধ সেই কামনাকে বাধা দিয়াছে। কাশী যাইবার সময় দরিদ্র কেরাণীর কন্তার কথা শুনিয়া তাহার সেই মাতৃত্বকামনাই ব্যথায়, সহানুভূতিতে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের ভাষায়,—'আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে সন্তনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।'

'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের মধ্যে বঙ্কুর মা আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর ভিতরে সত্যকার মা হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, সেজন্য বঙ্কুর মা আর তাহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না। শ্রীকান্ত ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিবার পর হইতে উভয়ের কাশী পৌছান পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী বারে বারে কথাবার্তায়, হাবভাব ইঙ্গিতে হৃদয়ের সেই সন্তজাগ্রত অনবদমনীয় আকাঙ্ক্ষাই শ্রীকান্তকে জানাইয়াছে। কিন্তু শ্রীকান্ত তাহার নিস্পৃহ ও সম্ভ্রমসচেতন মন লইয়া সেই আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা দিতে পারে নাই। ইহাতে রাজলক্ষ্মী কঠিন আঘাত পাইয়াছে। সে আরও আঘাত পাইল, কাশীতে যখন শ্রীকান্ত তাহার পরিকল্পিত প্রয়াগভ্রমণে রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিল, শ্রীকান্তের কাছে তাহার এই একান্ত-গভীর ভালোবাসার কোন মূল্য নাই। শ্রীকান্তের সমাজ ও আত্মীয়স্বজনের কাছে তাহার কোনই স্বীকৃতি নাই। তখন সে তাহার ভগ্ন ও হতাশ মন লইয়া অভিমানভরে পুনরায় তাহার বাইজী জীবনেই প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিল। বিশুদ্ধ জলের যখন অভাব ঘটে তখন লোকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণ করিতে দূষিত জলাশয়ের দিকেই ধাবিত হয়, রাজলক্ষ্মীর অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। ঘরের শান্ত সেবাযত্ন ও কল্যাণকর্মে যে নিরত ছিল সে বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া জ্যোৎস্নালোকিত রাজপথে অভিসার শুরু করিল। কিন্তু এ-অভিসার শুধু ছলনা মাত্র, শ্রীকান্তের কাছে তাহার যে সত্তাটি পূজার পবিত্র পুষ্পরূপে নিবেদন করিয়াছিল তাহা আর কোনমতেই সে ভোগবিলাসের আসরে কামনাকলুষিত ফুলদানীতে স্থাপন করিতে পারে না। ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল পরে,—শ্রীকান্তের গুরুতর অসুখের সময়ে।

রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তের গ্রামের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইল তখন সকল দ্বিধাসংকোচ, ভয় ও আড়ষ্টতা কাটাইয়া পরম নিশ্চিন্ত প্রশান্তিই তাহার অন্তর জুড়িয়া বিরাজিত ছিল। সে সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মতই বিষয়সম্পত্তি সব কিছু অপরকে বিলাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই শ্রীকান্তের কাছে আসিয়াছিল। বুঝিতে পারা যায়, পিয়ারী বাইজী একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, তাহার ভিতরে ও বাহিরে শুধু রাজলক্ষ্মীই বাঁচিয়া ছিল। সব কিছু ছাড়িয়া, সব কিছু হারাইয়া এখন সে তপস্বিনী উমার মতই শ্রীকান্তের কাছে নিজের সর্বরিক্ত জীবনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। শ্রীকান্তের আত্মীয়স্বজনকে এখন আর সে ভয় করে না, শ্রীকান্তের বিরক্তি ও তিরস্কারেও আর বিচলিত হয় না। সে নিশ্চিত বুঝিয়া লইয়াছে তাহাকে ছাড়া শ্রীকান্তের যেমন অন্য কোন উপায় নাই তেমনি শ্রীকান্তকে ছাড়াও তাহার আর কোন গতি নেই। এই সর্বত্যাগিনী নারীর অটল সঙ্কল্প ও অকুণ্ঠিত আচরণের কাছে অবশেষে শ্রীকান্তের উদাসীন ও সূক্ষ্মমর্যাদাসচেতন মন পরাজয় বরণ করিয়া লইল এবং তাহাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়া সকলের সমক্ষে উভয়ের জীবন একসূত্রে বাঁধিয়া ফেলিল। মনে হইল বুঝি শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর জীবনের টানা পোড়েন অবশেষে সমাপ্তি লাভ করিল। কিন্তু তাহা যে করে নাই, পরে দেখা যাইবে।

শ্রীকান্ত চরিত্রের মধ্যে একটা উদাসীন, নিরাসক্ত ভাব সব সময়ে বজায় রহিয়াছে। এই উদাসীনতা ও নিরাসক্তির জন্য সে যেমন কোন জায়গায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনি কাহাকেও তীব্র আবেগের সঙ্গে ভালোবাসিতেও পারে না। তাহার চরিত্রের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতিশীলতা, পরোপকারবৃত্তি রহিয়াছে, সেজন্য মায়ের গঙ্গাজলসখী, অভয়া, রোহিণীদা, চক্রবর্তীমহাশয় প্রভৃতি অনেকেরই উপকার সে করিয়াছে। কিন্তু প্রবল প্রবৃত্তিময়, আবেগতপ্ত ভালোবাসা কখনও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। রাজলক্ষ্মীর অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাহার সংযমের বাঁধ কখনও বিন্দুমাত্র টলে নাই। এই সংযমের আতিশয্যের ফলে তাহাকে কখনও কখনও জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী অথবা পৌরুষহীন পুরুষ বলিয়াই ভুল হয়। তাহার মর্যাদাবোধের মধ্যেও যে সর্বত্র সঙ্গতি আছে তাহাও মনে হয় না। যখনই অর্থের অথবা রোগে শুশ্রূষার প্রয়োজন হয় তখন সে রাজলক্ষ্মীর শরণাপন্ন হয়, অথচ যেখানে আত্মীয়স্বজনের বিন্দুমাত্র সংস্রব আছে

সেখানেই সে রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে রাখিতে অনিচ্ছুক। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কোনদিনই ঘনিষ্ঠ ছিল না। সুতরাং তাহাদের কাছে রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে তাহার এতখানি সঙ্কোচ অন্যায় কাপুরুষতা বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছ হইতে শুধু গ্রহণই করিয়াছে, কিছুই সে দেয় নাই। তবুও মাঝে মাঝে সে রাজলক্ষ্মীর দুর্বল স্থানে আঘাত করিয়াছে। ইহা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নহে। আলোচ্য উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল ও কৌতুক-সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া জীবনের বিচিত্র পথে বিচরণ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার দৃষ্টিতে বহু ঘটনার হাস্যকর অসঙ্গতি এবং বহু চরিত্রের কৌতুকজনক বিকৃতি ও উদ্ভটত্ব ধরা পড়িয়াছে। জাহাজঘাটে পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরির যে ভয়াবহ বর্ণনা লেখক দিয়াছেন তাহা যথেষ্ট কৌতুকরসাত্মক। আর একটি কৌতুকরসাত্মক ঘটনা হইল জাহাজের ভিতরস্থ সর্বজাতির সমবেতভাবে গীত মহাসঙ্গীত। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র, কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যাবতীয় সুরব্রহ্মের সম্মিলিত সাধনা যে কি রোমাঞ্চকর ঘটনা শ্রীকান্তের বর্ণনায় তাহা আমরা জানিতে পারিলাম। নন্দ মিস্ত্রী ও টগরের সুমধুর দাম্পত্যজীবনের বর্ণনাও আমাদিগকে প্রবল কৌতুকের আবেগে উত্তেজিত করিয়াছে। জাতবোষ্টমের মেয়ে টগর নিজের জাতের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে গর্ব করিতে পারে বটে, কারণ তাহার কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে, 'বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু এক দিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি!' নন্দ ও টগরবৃত্তান্তের ক্লাইম্যাক্স ঘটিয়াছে উভয়ের লোমহর্ষণ মল্লযুদ্ধে। সেই মল্লযুদ্ধের বিবরণ পড়িতে পড়িতে ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অভয়ার পূজনীয় পতিদেবতার চরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্র তীব্র বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। গভীর বিতৃষ্ণা গোপন করিতে না পারিয়া তিনি লোকটিকে বর্মার জঙ্গল হইতে আগত মহিষ, মহাপাপিষ্ঠ প্রভৃতি সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়াছেন। পতিপ্রাণা বর্মী স্ত্রীর নিতান্ত হীনচেতা বাঙালী স্বামীটির হীন প্রতারণার বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াছেন। কিন্তু সেই কৌতুকরসের তলায় সরলা বর্মী নারীটির প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি এবং নিষ্ঠুর প্রতারক বাঙালী বাবুটির প্রতি কঠোর ধিক্কার ভাবই নিহিত রহিয়াছে।

## দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—বসুমতী কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশ আরম্ভ

বাজে শিবপুরে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্র বাংলা দেশের সাহিত্যিক সমাজে ক্রমে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু সাহিত্যিক তাঁহার বাড়িতে নিয়মিত যাইয়া আড্ডা জমাইতে লাগিলেন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহার সাদর আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। সভা-সমিতি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণা চিরকালের। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও অনুরক্ত সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গল্পগুজবে মত্ত হইয়া থাকিতেন। সাহিত্যিকদের অনেকের লেখা হইতেই শরৎচন্দ্রের তৎকালীন জীবনযাত্রার চিত্র পাওয়া যায়। শৈলেশ বিশী শরৎচন্দ্রের বাড়ি ও আসবাব পত্রের বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 'বাজে শিবপুরের একখানি একতলা ছোট কোঠা বাড়ি। হয়তো ওপরে আর দু'খানি ঘর ছিল, তবে তার বাইরে থেকে একতলাই দেখায়। ছোট একটু আঙিনা, তাতে একটা পেয়ারা গাছ, উঠানে গোটা দুই ফুলের গাছ—টগর, শেফালী জাতীয়। বাড়িতে কোন শ্রী নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই। উঠানে ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দায় দাদার সাবেক-কালের লম্বা হাতা ইজিচেয়ার। তার একপাশে একটি টিপয়। অন্যপাশে ছোট টুলের উপর তাঁর লম্বা নল গড়গড়া, তার পাশে একটি পেতলের পিকদানী। ইজিচেয়ারের সামনে বাঁ পাশে চেয়ার বা বেঞ্চি ছিল কিনা তা আমার মনে নেই, ঘরে ঢুকতেই দোর গোড়ায় দড়ির ময়লা একটা পাপোছ।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায় ঢালা ফরাস, চাদর সব সময় পরিষ্কার থাকতো না। গোটা দুই তাকিয়া। পাশে একটা খোলা বুক শেলফ। তাতে তকতকে ঝকঝকে বাঁধান বই সাজান তিন থাক। তাতে সাহিত্য ছাড়া আর সবই ছিল, কঠিন গণিতের বই, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র। তবে ভূতুড়ে বা পরলোকতত্ত্ব দেখিনি। আর ছিল কাঠের পাল্লা, মার্বেল টপ নয়, একটি বন্ধ চেস্ট অব ড্রয়াস' তার মাথার উপর না ছিল এমন জিনিস নেই। ঘরে গোটা চারেক কুলুঙ্গি ছিল। তার একটাতে ছিল—কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের নমুনা হিসাবে গৌর-নিতাইয়ের যুগল মূর্তি। তার নীচে যা থাকতো তা না বলাই ভালো। একটি কাচের পাত্রে বোধ হয় আফিং ভেজান থাকতো। লেখবার সময় মাঝে মাঝে দাদা তা দিয়ে গলা ভেজাতেন।

ফরাসের উপর ছিল হাত দেড়েক লম্বা, অনুপাতে চওড়া বর্ডারে দামী মেহগনী কাঠ এমবস করা একখানি ঠাকুর বাড়ি মার্কা হাত টেবিল। তার উপর ছিল দাদার লিখবার প্যাড। একটি ভাবের উপর শরৎ এই কথাটি এমবস করা। লেখবার প্যাড মরক্কো দিয়ে বাঁধান। হাত টেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড সেটারও চারপাশে মরক্কো দিয়ে বাঁধান। দাদার লিখবার জিনিষগুলি এতই দামী ছিল। সেই হাত টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য কাঠের পাত্রে থাকতো ডজন খানেক, নানা আকারের ও নানা ছাঁদের ফাউন্টেন পেন, পার্কার হতে ওয়াটারম্যান সব রকম এবং যখন যে ভাল ফাউন্টেন পেন বেরুতো তা। প্যাডের পাশে জুটো এন্টিএয়ারক্রাফট গানের মত মাথা উঁচু করে থাকতো ফাউনটেনপেন হোলডার। এই গেল দাদার পটভূমি।'[১]

পশুপাখীর প্রতি শরৎচন্দ্রের অত্যধিক স্নেহমমতা সম্বন্ধে অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় কুকুর ভেলুর কথা সকলের সুবিদিত। ভেলু অথবা ভেলির পরিচয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এভাবে দিয়াছেন—'ভেলির বংশ পরিচয় সুবিধাজনক নয়। পথে-ঘাটে যে সকল সরমার অপত্য বেওয়ারিশ ঘুরে বেড়ায়, চলিত কথায় যাদের বলে নেড়ীকুত্তা ভেলি তাদেরই একজন। শুধু অপরিমিত মাংস খেয়ে খেয়ে এবং শরৎচন্দ্রের কাছে অসঙ্গত আদর পেয়ে পেয়ে সে যেমন হয়ে উঠেছে মোটা, তেমনি রাগী। আমি একদিনও তাকে ঠাণ্ডা মেজাজে দেখিনি। ভেলির ধারণা, শরতের বাড়িতে যারা বাস না করে তারা সকলেই তার শত্রু। তাই বাইরে থেকে কেউ এলেই প্রথমে সে দন্তাস্ফালন করে, তারপর তেড়ে যায়। এবিষয়ে তার ভদ্র-অভদ্র বাছবিচার নেই।'[২]

ভেলুর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র কিরকম শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিয়া শৈলেশ বিশী লিখিয়াছেন, 'আমি ঘরে ঢুকতেই ভেলুর কোন সাড়া পেলুম না। শরৎদার দিকে চেয়ে দেখি। কেঁদে কেঁদে তার চোখ ছুটি ফুলে গেছে। আমাকে দেখেই তিনি একেবারে কেঁদে উঠলেন। আমার নাম ধ'রে বললেন—ভেলু আমাদের ছেড়ে গেছে। কোন প্রিয় আত্মীয় বিয়োগ

১। বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন
২। স্মৃতিকথা—(৩য়)-পৃঃ ১৭৬

হলে, কোন অন্তরঙ্গকে দেখলে যেমন সেই শোক উথলে উঠে, আমাকে দেখে দাদার শোক যেন দ্বিগুণ উথলে উঠল। আমার অবস্থা তখন, আমি হাসি কি কাঁদি? হাসলে তিনি জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না। অথচ কাঁদাও দরকার। দেখতে পেলুম দাদার এই দুঃখ ও ব্যথা কত গভীর। কিন্তু কান্না আমার এলো না। মনে মনে আমি শুধু বললাম, ভগবান, এত দিনে আমাদের প্রার্থনা তোমার কানে গেল।'[১] শরৎচন্দ্র নিজে তাঁহার বাগানে কোদাল দিয়া এক কোমর মাটি খুঁড়িয়া ভেলুকে কবর দিয়াছিলেন। ভেলুর স্মৃতিস্তম্ভ কিরকম হইবে সেই চিন্তায় শরৎচন্দ্র গভীরভাবে বিচলিত ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবীর প্রস্তাব মত তিনি ঠিক করিলেন, শ্বেত-পাথরের পাদপীঠের উপর একটা মার্বেলের তুলসীমঞ্চ স্থাপন করিবেন।

শুধু কেবল ভেলুর উপরে নহে, সমগ্র কুকুরজাতির উপরেই শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রীতি ছিল। শৈলেশ বিশী লিখিয়াছেন, শরৎচন্দ্র একবার কাশীতে থাকিবার সময় রাস্তার যত কুকুর সব একত্রিত করিয়া লুচি ও বোঁদে খাওয়াইয়াছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পশুপ্রীতির আর একটা কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, 'শরৎচন্দ্র তখন থাকেন শিবপুরে·· শিশিরকুমার মিত্র মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় যান তাঁর কাছে শিবপুরে তাগাদা দিতে এবং আরো নানা কথার আলোচনা করতে। গল্পাদি ক'রে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায়··· তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করতেন। শরৎচন্দ্রের বাড়ী ছিল গলির মধ্যে। তিনি প্রায়ই গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার উপর এসে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতেন। ঘোড়ার গাড়ী দেখে শরৎচন্দ্র খুঁৎখুঁৎ করতেন···বলতেন —ঘোড়ার গাড়ীতে চড···আমার মনে ব্যথা লাগে। গাড়োয়ানরা চাবুক মারে ঘোড়াকে·· আমি কেমন সহ্য করতে পারি না। শিশিরকুমার বললেন—ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া আসবো-যাবো কি করে? অত রাত্রে ট্রামও পাওয়া যায় না এবং হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ নয়। তিনি যতবার ঘোড়ার গাড়ী দেখেছেন ততবারই কাতরভাবে অভিযোগ করেছেন।'

ভেলুর মত শরৎচন্দ্রের প্রিয় আর একটি প্রাণী ছিল, সেটি হইল তাঁহার পোষা টিয়া পাখী বেটু। বেটু একবার একটি চোর ধরিয়াছিল। সেজন্য তাহার আদর অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। তাকের উপর চারপাটটা

১। বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন, পৃঃ ২১-২২

কাঁসার বাটিতে বেটুর হরেক রকমের খাবার প্রস্তুত থাকিত, যথা বেদানার দানা, আনারসের টুকরা, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস ইত্যাদি। শৈলেশ বিশী একবার শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত পেয়ারা গাছ হইতে দুই একটি পেয়ারা পাড়িয়াছিলেন, তাহাতে শরৎচন্দ্র খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। অসন্তোষের কারণ, বেটু খাইবার আগে কেন পেয়ারা পাড়া হইয়াছিল। তাঁহার কড়া নিয়ম ছিল, বেটু খাইবার আগে অন্য কেহ কোন ফল খাইতে পারিবে না।

শরৎচন্দ্র ছোট ছোট ছেলেদের খাওয়াইতে বড় ভালোবাসিতেন। শরৎচন্দ্রের শিবপুরের প্রতিবেশীপুত্র বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'শরৎবাবুর বাড়ীতে আমরা দুইটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাইতাম—খাবার ও বই। বিশেষ ছেলেদের খাওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। যখন তাঁহার বাড়ী যাইতাম, দেখিতাম, হয় তিনি ভেলুর তত্ত্বাবধান করিতেছেন, না হয় লেখাপড়া লইয়া আছেন। পড়িবার সময় কিংবা লিখিবার সময় তাঁহার যে তন্ময়তা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। তখন ঘরে কে আসিল না আসিল, তাহা তাঁহার চোখেই পড়িত না।'[১]

শরৎচন্দ্র প্রধানত সাহিত্যসাধনা লইয়া থাকিলেও পরাধীন দেশের বেদনা ও গ্লানি তাঁহাকে গভীর ভাবে বিচলিত করিত। কিভাবে তিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িলেন তাহা পরে আলোচিত হইবে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে নাইটহুড ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে শ্রীঅমল হোমকে লিখিত একখানি পত্রে তাঁহার তখনকার মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 'অমল ভারতীর আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে। ইংরেজের মার মূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ-একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল।

আর এক লাভ দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

১। ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, ফাল্গুন

নারায়ণের সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।'

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর শ্বশুর বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। এই গ্রামের অনতিদূরে সামতা গ্রামে তিনি জমি কিনিয়া বাড়ি নির্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'অনেকদিন থেকে রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা মাটির বাড়ি করবার চেষ্টা করছি। খবর পেলাম আজই গেলে যা হোক একটা কিছু হয়। জমিটার দাম ১১০০৲ টাকা। এত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে আমার ভারী মায়া হচ্ছে। তা' ছাড়া বাড়ি করার খরচটাও বেশি থাকবে না। আপনার কাছে নিবেদন যে, সেদিনের টাকা থেকে নিজে ৭০০৲ টাকা দিই, আর আপনি যদি ধার দেন ৪০০৲ তা হলে সুন্দর সুবিধে হয়।'

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা লইয়া প্রায় একবৎসর ধরিয়া শরৎচন্দ্রের কাছে যাতায়াত করিতেছিলেন। সুলভ সংস্করণের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইলে শরৎচন্দ্রের প্রধান পুস্তকপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানের ক্ষতি হইতে পারে এই ভাবিয়া তিনি অনেকদিন ধরিয়া সতীশ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অবশেষে টাকার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন।[১] এই সময়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে কৈফিয়তের সুরে

১। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ( ১ম-৭ম খণ্ড ) ইং ১৯১৯-৩৫ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল—

১ম—( ২০.১০.১৯ ): দত্তা ; পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২য়—(২০.১.২০): শ্রীকান্ত ২য়, দেবদাস, দর্পচূর্ণ, পল্লীসমাজ, বড়দিদি।

৩য়—(১৮.৬.২০): স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪র্থ—(২৫.৯.২০): চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ম—(২১.২.২৩): গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ষ্ঠ—(২৫.৯.৩৪): শ্রীকান্ত ৩য়, নববিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ।

৭ম—(১৭.৯.৩৫): শ্রীকান্ত ৪র্থ, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১১.৮.১৯ তারিখে লিখিত ঐ পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল, 'সেদিন রাত্রে যে গ্রন্থাবলী করার একটা কল্পনা হয়, সেটা পরিত্যাগ করিলাম। কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলাম ইহা অত্যন্ত নীচতা। যাহার জন্য সতীশবাবু এক বৎসর যাবৎ আসা যাওয়া করিতেছেন সেটা না হয় নাই হইল, কিন্তু অপর কোথাও করা অত্যন্ত ঘৃণিত নীচাশয়তা। যাহাকে নীচতা বলিয়া বুঝিব তাহা করিব না।...

সতীশবাবু আজ সকালেও আসিয়াছিলেন। মত দিই নাই, কিন্তু তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে এরূপ involved হইয়া পড়িয়াছেন যে শুনিলে ক্লেশ বোধ হয়। আপনার আশ্রয়ে আমার একপ্রকার করিয়া চলিয়া যায় বটে, কিন্তু আজ এই পর্যন্তই ভাবিতে পারিয়াছি।

তিনি বলেন ত, এই তিন বৎসরে ২৫।৩০ হাজার টাকা হয়তো দিতেও পারেন অসম্ভব নয়, সম্ভব নয়। অথচ সে হইলে আমার পশ্চিমে যাওয়ার একটা উপায় হয়, ইহাও সত্য। ওদিকে যাবার জন্য মনটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

আগামী বৃহস্পতিবার কিংবা শুক্রবার যাহোক একটা final করিয়া ফেলিব। এই ক্রমাগত লেখার উপর খাওয়া পরার নির্ভর করাটা ভাল নয়,—আর ইহাও মনে করি—এরা যে টাকা দেবে বলে—সে তো বর্তমান অবস্থায় সারা জীবনেও পাওয়া যায় না। অবশ্য জীবনটার মেয়াদ যদি আরও ১০ বৎসর ধরা যায়।

আপনার দোকানের হয়ত কিছু ক্ষতি হইতে পারে—আবার নাও হইতে পারে। কারণ—cheap edition তারাই কেনে যারা কোন কালেই বই কেনে না।'

বসুমতী সাহিত্যমন্দির অতি অল্প মূল্যে সমগ্র শরৎ-গ্রন্থাবলী জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিল, সেজন্য শরৎ-অনুরাগী পাঠক-সমাজ 'বসুমতী'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। শরৎচন্দ্রের ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূলে 'বসুমতী'র দান অনেকখানি তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'ছবি' প্রকাশিত হয়। 'ছবি'র মধ্যে 'ছবি', 'বিলাসী' ও 'মামলার ফল' এই তিনটি গল্প স্থান পাইয়াছিল। এই গল্পটি সম্বন্ধে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'বসুমতী সাহিত্য-

মন্দিরের মালিক সতীশচন্দ্র একখানি পূজা-বার্ষিকী প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন…সুরেশ সমাজপতির উপর ভার দিয়েছিলেন নানা লেখকের কাছ থেকে গল্প সংগ্রহ করার জন্য। বার্ষিকীর নাম আগমনী—সুরেশ সমাজপতির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সে বার্ষিকীতে শরৎচন্দ্র একটি গল্প লিখে দিয়েছিলেন। সে-গল্প লেখার সম্বন্ধে তিনি এই কাহিনী বলেছিলেন: বলেছিলেন—সমাজপতি মশাই এসে ধরেচেন…গল্প দিতে হবে পূজাবার্ষিকীর জন্য। তাঁকে ভারী ভয় করি। রাজী হলুম এবং গল্প আসে না। তবু লিখেছি নাকের জলে হয়ে।—ভয় কেন? বললেন—তাঁর সাহিত্য-পত্রের মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—শরৎ চট্টোপাধ্যায় লেখকের আবির্ভাব হয়েছে…এঁর মনে মায়া-মমতা-দয়া বড় বেশী। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি লিখেছিলেন—কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এই শরৎচন্দ্র একটা নেড়ি কুত্তাকে খাওয়াবার জন্য কাটলেট কিনে তাকে খাওয়াচ্ছেন…তার দিকে এই দয়ালু শরৎচন্দ্রের নজর পড়েনি। এ কাহিনী উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—এমনি কটু কথা যদি আবার আমার সম্বন্ধে লেখেন…তাই তাঁকে না বলতে পারি নি। তাঁকে তুষ্ট করতে এত কষ্ট করে'ও গল্পটি লিখে দিয়েছি।'[১]

'ছবি' গল্পটি লেখা সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত শরৎচন্দ্রের বক্তব্য হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত পত্রিকার জন্য একটি গল্প লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, 'ছবি' ভাগলপুরে লেখা কোরেল গল্পটির পরিবর্তিত রূপ। তিনি লিখিয়াছেন, কোরেল গ্রাম (পরে পরিবর্তিত আকারে ছবি) সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে; ইহার আরম্ভকাল—২৯ আগষ্ট ১৮৯৩, সমাপ্তিকাল—৩ আগষ্ট ১৯০০—পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখ দেখিয়াছি।'

ব্রজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তিনি 'কোরেল' গল্পের পাণ্ডুলিপি উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে এই গল্পটি চিরকালের মত হারাইয়া গিয়াছিল। সৌরীন্দ্র-মোহন এই গল্পটির রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

---

১। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃঃ ৮০

'মনে পড়ে কোয়েল গল্প লিখছিলেন। সে-গল্পটি জন্মের মতো হারিয়ে গিয়েছে। ছাপা দেখিনি। লেখবার সময়ে বলতেন—বিলাতী পাত্র-পাত্রী নিয়ে গল্প লিখছি, বড় গল্প। ট্রানস্লেশন নয়—original

সে-গল্পটির কিছু কিছু আজো মনে আছে। ডার্বি-খেলাকে কেন্দ্র করে তরুণ জকি, কিশোরী নায়িকা—ভালোবাসার গল্প—বড় সাসপেন্স বিজড়িত অপূর্ব গল্প—মনস্তত্ত্বের কি সহজ সুন্দর বিশ্লেষণ। আধুনিক কোনো ইংরেজ লেখকের লেখনীতে আজ পর্যন্ত তেমন গল্প বেরুতে দেখিনি।

ব্রজেন্দ্রনাথ কোয়েল গল্পটির সঙ্গে 'ছবি'র কতখানি সাদৃশ্য দেখিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। তবে সৌরীন্দ্রমোহনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে 'তরুণ জকি, কিশোরী নায়িকা' ছাড়া 'ছবি' গল্পের সহিত কোয়েলের কোন সাদৃশ্য চোখে পড়ে না। 'কোয়েলের' মধ্যে বিলাতী পাত্র-পাত্রী, কিন্তু 'ছবি'র নায়ক-নায়িকা ব্রহ্মদেশ হইতে লওয়া হইয়াছে। ডার্বি খেলা সম্পূর্ণ ইংলণ্ডের ব্যাপার। সুতরাং মনে হয় লেখক 'ছবি'র মধ্যে শিল্পী বা থিন ও মা শোয়ের যে প্রণয়কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সম্ভবত 'কোয়েলে'র মধ্যে ছিল না। শরৎচন্দ্র কষ্ট করিয়া এই গল্পটি লেখার কথা বলিয়াছেন। পুরাতন গল্পের অনুরূপ গল্প যদি তিনি লিখিতেন তবে তাঁহার আর তেমন কষ্ট হইবে কেন?[১]

'ছবি'র মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় নানা স্থান, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও পাত্র-পাত্রীর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পরিস্ফুট রহিয়াছে সে-সব ভাগলপুরে বাস করার সময় তরুণ শরৎচন্দ্রের কল্পনার অতীত ছিল। ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকাল কাটাইবার পরই ব্রহ্মদেশের ঐরূপ অন্তরঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব। সুতরাং 'ছবি'র মধ্যে বর্ণিত ব্রহ্মদেশীয় জীবন ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরই শরৎচন্দ্রের মানস-উদ্ভূত,—ইহা বলা যাইতে পারে।

সতীশচন্দ্র দাস তাঁহার 'শরৎ-প্রতিভা' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে 'ছবি'

গল্পের নায়ক বা-থিন সত্য চরিত্র। এই বা-থিনের কাছেই শরৎচন্দ্র চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের কথায়, 'অনেকেই জানেন না শরৎচন্দ্র চিত্রবিদ্যা জানতেন কিনা, তিনি বর্মাতে বাথিনের কাছেই চিত্রবিদ্যা শিখিয়া নিজ হাতে এত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন, না দেখিয়া প্রত্যয় করা অসম্ভব।' বা থিনের নাম ব্যবহার করিলেও গল্পের নায়ক বা-থিনের সঙ্গে বাস্তব বা-থিনের জীবনের অবিকল সাদৃশ্য সম্ভবত ছিল না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

বা-থিন ও মা-শোয়ে পরস্পরকে ভালোবাসিত। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য ছিল বলিয়াই উভয়ের মধ্যে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ঘটিয়াছিল। বা-থিন ছিল—স্থির, সংযত ও গম্ভীর। সে তাহার আবেগকে মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন রাখিত, কিন্তু তাহার মনোমন্দিরে স্থাপিত প্রতিমাই তাহার শিল্পকল্পনার মধ্যে মিশিযা গিয়াছিল। সেজন্য তাহার শিল্পমূর্তি অজ্ঞাতসারে মা-শোয়ের মূর্তিই ধারণ করিয়াছিল। মা-শোয়ের অধঃপতন দেখিয়া সে মনে গভীর আঘাত পাইয়াছিল কিন্তু সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করা ছাড়া সেই আঘাতের কোনো বেদনা ও বিরক্তি সে প্রকাশ করে নাই। পরিশেষে সে বিনা প্রতিবাদে সর্বস্ব বিক্রী করিয়া মা-শোয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মা-শোয়ের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ঐশ্বর্যগর্বিত, বিলাসব্যসনপ্রিয় ও উত্তেজনামদিরার প্রতি লুব্ধ। বা-থিনকে ভালোবাসিলেও বা-থিনের শান্ত, সংযত প্রেম তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। ঘোড-দৌড প্রতিযোগিতার বিজয়ী বীর পোথিনের বলিষ্ঠ ও উদ্দাম চরিত্র তাহার চঞ্চল চিত্তে মদির মোহ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বা-থিন বড শান্ত, বড় শীতল, সে ধরিয়া রাখিতে জানে না, সে রাগ করিতে, শাসন করিতে পারে না, এজন্য মা-শোয়ের নারীচিত্ত অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পো-থিনের প্রতি আকৃষ্ট হইবার ভাব দেখাইয়া বা-থিনের মনে সে ঈর্ষা ও ক্রোধের জ্বালা ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বা-থিনের শান্ত চিত্তে বিন্দুমাত্র আঁচ লাগিল না দেখিয়া সে শুধু নিজের পরাজয়ের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। গল্পের শেষে অবশ্য উভয়ের আবার মিলন ঘটিল। কিন্তু এই মিলন যেন আকস্মিক ভাবে অতি সহজেই ঘটিয়া গেল। তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে এতদূরে সরিয়া গিয়াছিল যে তাহাদের মিলনের জন্য চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অপ্রাসঙ্গিক মান-অভিমানের

লীলা এবং অনুতাপ ও স্বীকারোক্তির যে সব স্তর দেখান উচিত ছিল লেখক সেগুলি পরিহার করিয়া হঠাৎ যেন গল্পটির সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া দিলেন।

'গৃহদাহ' উপন্যাসটি ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ও পৌষ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ ২০শে মার্চ, ১৯২০ (ফাল্গুন, ১৩২৬)। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবাব কয়েকবছর আগে হয়তো তিনি উপন্যাসটি লেখা শুরু করিয়াছিলেন। ১৩.৩.১৪ তারিখে প্রমথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন হইতে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'বৈশাখের জন্য হরিদাস বাবুকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস গৃহদাহ নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি'—। তবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ১৯১৪ সালে হয়তো গৃহদাহ শুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হন নাই। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে বাস্তবতাবোধ, চরিত্রচিত্রণ, গঠনকৌশল সবদিক দিয়া শরৎপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পরিস্ফুট। ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিবার পরেই সেই প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশ ঘটিয়াছিল। সুতরাং যে-সময়ে 'গৃহদাহ' 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতেছিল সেই সময়কেই উহার রচনাকাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি, ইহা যেমন লেখক স্বয়ং বলিয়াছেন তেমনি অধিকাংশ সমালোচকও স্বীকার করিয়াছেন।[১] সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র কথা প্রসঙ্গে 'গৃহদাহ' উপন্যাসই যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাহা একদিন বলিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের কথায়, 'আমার মনে হয় গৃহদাহ বইখানি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বই। ওটার মধ্যে তোমার চিন্তাশীলতার একটি গভীর পরিচয় আছে।

উত্তরে তিনি বললেন, বোধ হয় তোমার কথা অনেকটা সত্যি। আমারও

---

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'মোটের উপর গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম'...।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মতে,...'গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাতে নারীহৃদয়ের গভীরতম রহস্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। গঠনকৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস অদ্বিতীয়।

বিশ্বাস ওটাই আমার বেস্ট বই। ওটা লিখতে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ব্যয় হয়েছিল ব'লে আমার বিশ্বাস।

আমারও তাই মনে হয়।

কেন বলো ত?

ওটাতে তোমার শুকমারা বিত্তের পরিচয় আমি পাই! একখানি বই, তুমি যতখানি সুখ্যাতি কর তার, তোমার সত্যি করে পছন্দসই হয়নি, আব সেটাকে তোমার বিস্তার মত করতে গিয়েছ। তাই বইখানি একটা যেন কেমন কেমন হয়েছে। কিন্তু মনস্তত্ত্বে তুমি বোধ হয় খুব বড় পরিচয় দিয়েছ তোমার শক্তির।

বোধ হয়, শরৎ বললেন, তোমার কথা অনেকটা সত্যি। ওটার যদি এডিশন ফুরোতো তো ঢেলে সাজাতাম-কিন্তু বড হওয়াতে দাম বেশী হোল তাই আর সংস্করণ শেষ হোল না।

বোললাম, কাজেই আর তোমার অবসর হল না ফের বদল করার।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, ভেবে দেখবো, বোধ হয় তোমার অনুমান অনেকটা ঠিক। দেখ, মুড মানুষের জীবনে বদলায় আর বয়সের সঙ্গে মানুষের শক্তিও কমে আসতে থাকে। এখন আমার ধৈর্যের হ্রাস হয়ে গেছে। আর অভাবটাও কমে গেছে কিনা। এসব জীবনের বড় ফ্যাকটর।

অত তলিয়ে ভাবার বুদ্ধি আমার নেই বোধ হয়। উত্তরে বোললাম।

তবে ঐ বইখানি লেখার ফিরে ফিরতি অবসর যদি আসতো, তা' হলে বইখানির দরজা আরও বাড়তো নিশ্চয়।

শরৎ হাসলেন। বললেন, বোধ হয় তা হ'ত না। কেন না—আমার মনে হয়, ওতে আমার যথাসাধ্য শক্তির প্রয়োগই হয়ে গেছে।'

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সুহৃদ অবিনাশচন্দ্র ঘোষালও 'গৃহদাহ' সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মতামত আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, 'আমার নিজের ধারণা ছিল, গৃহদাহই শরৎচন্দ্রের নিকটে সবচেয়ে প্রিয়। এবং এই ধারণা হবার প্রধান কারণ ছিল এই যে, গৃহদাহ সম্পর্কে যখনি কোন প্রসঙ্গ উঠত তখনি তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সে সম্বন্ধে কথা কইতেন আর কোন বই সম্বন্ধে তাঁর এমনি উৎসাহ দেখা যেত না।'

১। শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, পৃঃ ২৬-২৭

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোন্‌খানি তাহা বিচার করিতে গেলে তিনখানি উপন্যাসের কথাই প্রথমে মনে আসে, 'শ্রীকান্ত' 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ'। 'পথের দাবী'র কথাও উঠিতে পারে। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে 'পথেরদাবী' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাহা সত্য, কিন্তু চরিত্রবিশ্লেষণ ও শিল্পকৌশলের দিক দিয়া এই উপন্যাসখানি উপরিউক্ত তিনখানি উপন্যাসের সমকক্ষ নয়। 'দেনা-পাওনা'র মধ্যে গঠনকৌশলের শিথিলতা অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট বলিয়া ইহা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পর্যায়ে স্থান পাইতেই পারে না। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে চরিত্রবিশ্লেষণ, বর্ণনাশক্তি অতি উচ্চ পর্যায়ের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উপন্যাসের পরিণতি ত্রুটিপূর্ণ এবং ঘটনার সংহতি অপেক্ষা বিস্তার বেশি, এবং কোন কোন চরিত্র একটু বেশি পরিমাণে আদর্শের রঙে রঞ্জিত। একদিক দিয়া 'শ্রীকান্ত'কে শরৎচন্দ্রর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা যায়; কারণ, ইহার দীর্ঘতা ও বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা বেশি এবং শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি-মানস ও জীবনদর্শন ইহাতেই সার্থকতম রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তবুও বলিতে হয়, ইহার গঠনভঙ্গি শিথিল এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচিত্র ঘটনাধারা ইহার মূলকাহিনীর গতিকে অনেকস্থানেই কেন্দ্রচ্যুত ও অসংবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্তে' যে সামান্য দোষত্রুটি রহিয়াছে 'গৃহদাহে' তাহাও নাই। ইহাকে একখানি নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস বলিলে অতিরঞ্জিত উক্তি হয় না। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের একটি ঘটনা এবং একটি চরিত্রও অপ্রয়োজনীয় অপরিস্ফুট ও অতিশয়িত নহে। প্রধান চরিত্রগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও রাক্ষুসী, রামবাবু, সুরেশের পিসিমা প্রভৃতি ছোট ছোট চরিত্রও সুবিকশিত। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে চরিত্র সংখ্যা খুবই কম, অথচ এই স্বল্পসংখ্যক চরিত্র লইয়াই লেখক এত বড় একখানি উপন্যাস লিখিলেন, অথচ কোন স্থানেই একঘেয়েমি অথবা পুনরাবৃত্তি নাই। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নরনারীর অজ্ঞেয় ও রহস্যময় মনের গভীরে আলোকপাত করিয়া বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির যে নিষ্ঠুর ও মর্মঘাতী সংগ্রামের রূপ দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র জীবনের রূঢ় ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে সেই বাস্তবতার চিত্র নির্বিকার ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিষিদ্ধ প্রেমের কাহিনী তিনি অন্য অনেক উপন্যাসেই বর্ণনা করিয়াছেন

কিন্তু সেই প্রেমের শুধু সৌন্দর্য, শুধু সৌরভই তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এখানে সেই প্রেমের দেহমৃত্তিকাশ্রিত রূপও তিনি দেখাইয়াছেন। সেই মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কামনার শিকড়গুলি কিভাবে মৃত্তিকারসের সন্ধান করিয়াছে তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। দেহচারী প্রেমের এই প্রমত্ত রূপ শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসে দেখা যায় নাই। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও এই উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ, সংস্কারমুক্ত ও পক্ষপাতশূন্য। গঠনকৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার কাহিনী সুসংহত ও দৃঢ়বদ্ধ, এবং ঘটনার গতি দ্রুত, অবিচ্ছিন্ন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে কৌতূহলোদ্দীপক। এ-সব কারণেই আলোচ্য উপন্যাসটিকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায়।

বিবাহিতা নারীর সহিত অন্য পুরুষের সমাজনিষিদ্ধ ভালোবাসার চিত্র শরৎচন্দ্র কয়েকটি নারীচরিত্রের মধ্যে দেখাইয়াছেন, যথা, সৌদামিনী, কিরণময়ী, অভয়া, অচলা ও কমল ইত্যাদি। সৌদামিনী চরিত্রচিত্রণে তিনি প্রাচীন রক্ষণশীল আদর্শেরই জয়গান করিয়াছেন। কিরণময়ীর অসাধারণ মননশীল চরিত্রও শেষ পর্যন্ত সমাজসংস্কারনির্দেশিত প্রায়শ্চিত্তের সন্ধান করিয়াছে। অভয়া ও কমল সচেতনভাবে সতীত্বের সংস্কারমুক্ত পথে চলিবার অকুণ্ঠ সাহস দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ কামনার মর্মবিদারী অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় নাই। অচলার চরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্র কোন তত্ত্ব ও মতবাদের দিক দিয়া সমস্যাটি দেখান নাই, দুই বিপরীত দোলায়মান অসহায় হৃদয়বৃত্তির ক্ষতবিক্ষত রূপটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। নিষিদ্ধ প্রেমের ট্র্যাজিকশিল্পরূপটি এই উপন্যাসে যেমন সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে তেমন আর অন্য কোন উপন্যাসে হয় নাই।

'গৃহদাহ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র যে সমস্যাটির অবতারণা করিয়াছেন সেই ধরণের সমস্যা অন্য বহু সাহিত্যিক তাঁহাদের সাহিত্যে দেখাইয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। হার্ডি ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি অনেক দিক দিয়া একরূপ। শরৎচন্দ্রের মতই হার্ডি দুঃখবাদী, সহানুভূতিশীল ও জটিল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণনিপুণ। 'গৃহদাহে'র অচলার মতই হার্ডির কয়েকখানি উপন্যাসের নায়িকা দুই পুরুষের প্রতি দুর্নিবার প্রেমের ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মত হার্ডিও

নীতি ও দুর্নীতির দিক দিয়া এই সমস্যাটি না দেখিয়া মানবজীবনের এক অন্তহীন দুঃখ ও দুর্ভাগ্যরূপেই ইহাকে দেখিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুই ঔপন্যাসিকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র নরনারীর সমাজস্বীকৃত প্রেমের অকুণ্ঠ জয়গান করিয়াছেন। যেখানে সেই প্রেম সমাজনিষিদ্ধ সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে সেখানে তিনি অপরূপ শিল্পসৌন্দর্যের অবতারণা করিয়াও শেষ পর্যন্ত সেই নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি কঠিন শাস্তি বিধান করিয়াছেন। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর ভালোবাসা শিল্পের দিক দিয়া অতি সুন্দর, কিন্তু তবুও সেই ভালোবাসা সমাজনীতির কঠোর ধারক বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমাহীন আঘাতে জর্জরিত হইয়াছে। তবে 'রজনী' উপন্যাসের একমাত্র লবঙ্গলতাচরিত্রে নিষিদ্ধ প্রেমের অশ্রুসিক্ত, দুর্ভাগ্যময় রূপটি অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লবঙ্গলতা ও তাহার হতভাগ্য প্রণয়ী অমরনাথের শেষ বিদায়দৃশ্যে লবঙ্গ তাহাকে বলিয়াছে, 'এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—।' লবঙ্গলতার অকৃত্রিম স্বামীভক্তির তলায় অমরনাথের প্রতি যে একটা গোপন অনুরাগ প্রচ্ছন্ন ছিল এই কথাগুলি হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই একটি মাত্র জায়গা ছাড়া আর সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্র সমাজনীতির কঠোর ন্যায়দণ্ড দ্বারাই নরনারীর ভালোবাসা বিচার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সমাজনীতির ঊর্ধ্বে ভালোবাসার ক্রন্দনকরুণ রূপটি স্থাপন করিয়াছেন। 'নষ্টনীড়' গল্পটির মধ্যে প্রবাসী অমলের জন্য চারুর বেদনাবিদ্ধ অন্তরের বিলাপ ও আর্তির ফলে চারু ও ভূপতির সুখের নীড়টি নষ্টনীড়ে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্নের মধ্যে না যাইয়া সমবেদনাশীল দৃষ্টি লইয়া চারু ও ভূপতি উভয়েরই জীবনের সুকরুণ ট্র্যাজেডি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ক্ষমাশীল স্বামী ও অপ্রতিরোধনীয় সন্দীপের মধ্যে বিমলাচরিত্রের তীব্র দোদুল্যমানতা আমরা দেখিয়াছি এবং কাহিনীর এক স্তরে বিমলাকে সন্দীপের কাছে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্যের ন্যায়ই উৎসর্গ করিতেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিমলার ভালোবাসার নিষিদ্ধতার দিক আলোচনা করেন নাই, তিনি বিমলা ও নিখিলেশের পারস্পরিক ব্যবধানের অন্তর্নিহিত বেদনা ও কারুণ্যের দিকটাই সহানুভূতিসিক্ত তুলিকায় অঙ্কন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ

সামাজিক নীতির মাপকাঠি দিয়া নরনারীর ভালোবাসার ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিচার করেন নাই তাহা সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার কবিদৃষ্টি লইয়া ভালোবাসার মৃত্তিকাচারী ও পঙ্কলিপ্ত মূলটি সন্ধান করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি সব সময়েই নক্ষত্রখচিত গগনের আলোকোজ্জ্বল পথেই বিচরণ করিতে চাহিত, বাস্তব মাটির ক্লেদাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত রূপ সেই দৃষ্টিপথে তেমন পড়িত না। তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি এত অলঙ্কৃত ও কবিত্বময় যে সেই অলঙ্কার ও কবিত্বের স্বর্ণপ্রাসাদের রত্নমণ্ডিত উষ্ণীষশোভিত শাণিত অস্ত্রধারী অনেক প্রহরীকে অতিক্রম করিয়া তবেই বাস্তব উত্তাপ ও বেদনাভরা মানবসত্তার সান্নিধ্যে যাওয়া যায়, সেজন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কোন সামাজিক সমস্যা থাকিলেও সেই সমস্যার দূরবর্তী, বাষ্পীয় রূপটিই শুধু আমরা দেখিতে পাই, নিকটবর্তী স্থূল ও রূঢ় রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না।

শরৎচন্দ্র ভাবরঞ্জিত আকাশে স্বপ্নপ্রয়াণ করিতে চাহেন নাই। তিনি নির্দ্বিধচিত্তে পঙ্কিল জলাশয়ে অবতরণ করিয়াছেন। বিবাহিত নারীর সংস্কার, তাহার সচেতন বুদ্ধিচালিত প্রেম এবং অবচেতন প্রবৃত্তিতাড়িত আসক্তি সব কিছুই অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। দুর্বার প্রবৃত্তির প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং তাহার ভয়াবহ সর্বনাশ তিনি অবিচল বাস্তবনিষ্ঠা লইয়া দেখাইয়াছেন। মানুষের বহির্জীবনের দৃশ্যমান রূপ অপেক্ষা তাহার অন্তর্জীবনের অদৃশ্য অন্ধকার স্তরের গুরুত্ব যে বেশি শরৎচন্দ্র তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। সেজন্য সেই অন্ধকার স্তরের গুহায় গুহায় সেইসব অসামাজিক শক্তিগুলির সন্ধান করিয়াছেন যাহাদের প্রমত্ত কাণ্ডকারখানার ফলে মানুষের বহির্জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ও আচরণ দেখা যায়। ভূমিকম্পে যখন পথঘাট ও ঘরবাড়ি সব কাঁপিতে থাকে তখন সাধারণ মানুষ তাহার অস্তিত্ব অনুভব করে, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের মূলে অদৃশ্য মাটির গর্ভে যে সব উত্তেজিত শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে সেগুলি শুধু ভূতত্ত্ববিদের কাছেই ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রও সেই ভূতত্ত্ববিদের ন্যায় মানব-জীবনের ভূমিকম্পের অদৃশ্য কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। যে বাস্তব পরিবেশে যে ধরণের ঘটনা ও চরিত্রের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক তাহাও তিনি পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টি লইয়া উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। সেজন্য শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত সমস্যার তীব্রতা, ও তাহার দাহ ও জ্বালা পাঠকচিত্তে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অস্থির ও উত্তেজিত করিয়া তোলে। মানুষের দুর্বল হৃদয়বৃত্তি অনেক সময় নিষিদ্ধ পথে চলিয়া নিজের ও অপরের জীবনে অনেক বেদনা, অনেক অশান্তি বহিয়া

আনে। সেই হৃদয়বৃত্তিকে অভিসম্পাত না করিয়া উদার, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়া তাহাকে তুলিয়া ধরা, ইহাই চিরকালের বড় শিল্পীর কাজ। শরৎচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন। তিনি নীতিরক্ষায় আগ্রহী নহেন, দুর্নীতি প্রচারের ইচ্ছাও তাঁহার নাই, নীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বস্থিত মানবজীবনরহস্য উদ্‌ঘাটনই তাঁহার উদ্দেশ্য। 'সাহিত্য ও নীতি' নামক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গ'ড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করছি নে। কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে তা' আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে, কাল তাকে ক্ষমা করবে না। নীতি পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্য সৃষ্টি হবে না।'

উপন্যাসের নাম 'গৃহদাহ' হইল কেন? মহিমের গৃহদাহের ঘটনা অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু এই গৃহদাহের কারণ লেখক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা নিছক দৈব ঘটনা, না শত্রুভাবাপন্ন গ্রামবাসীদের কাজ, না ঈর্ষাপরায়ণ সুরেশের কাণ্ড তাহা ঠিক বুঝা যায় না। মহিমের ঘরে আগুন লাগাইয়া সুরেশ তাহাকে পোড়াইয়া মারিতে চাহিয়াছিল এ-রকম একটা সন্দেহ হয়তো কাহারও মনে উঠিতে পারে। অচলা সুরেশকে ট্রেনের মধ্যে বলিয়াছিল, 'তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলে।' কিন্তু অচলা এ-কথাগুলি সুরেশের প্রতি তীব্র রাগ ও সন্দেহ বশতই বলিয়াছিল, এগুলির মধ্যে সত্য ঘটনার বিবৃতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুরেশ অন্যায়কারী অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু এরূপ হীন কাজ করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। যেভাবে মহিমের ঘর পোড়া গেল তাহাতে সুরেশ নিজেই বড বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল এবং পাছে কেহ তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করে এই চিন্তায় সে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার সকল চিন্তা ও আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়া মহিম তাহাকে বলিয়াছিল, 'কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়ে তুমি যাই কর না কেন, যাকে 'ক্রাইম' বলে সে তুমি কোনদিন করতে পার না ব'লে আজও আমি বিশ্বাস করি।'

কিন্তু মহিমের গৃহদাহের স্থূল ঘটনা অবলম্বনেই এই উপন্যাসের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে তাহা মনে হয় না। গৃহদাহের মধ্যে যে ব্যঞ্জিত অর্থ আছে সম্ভবত সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লেখক উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছেন। মহিম ও অচলা যে ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহাদের গৃহজীবনের শোচনীয় ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে 'গৃহদাহ।' মহিমের গৃহদাহ রূপ ঘটনার সাঙ্কেতিক তাৎপর্য রহিয়াছে। সুরেশ মহিমের পল্লীগৃহে আসিবার পরেই মহিম ও অচলার বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, পরিশেষে সেই বিরোধ এমন এক পর্যায়ে আসিয়াছে, যখন অচলা সুরেশকে বলিয়াছে, 'সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও—যাকে ভালবাসিনে তার ঘর করবার জন্য আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।' অচলা সুরেশের সঙ্গে মহিমের আশ্রয় ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অচলা ও মহিমের গৃহদাহ সম্পূর্ণ হইল। কারণ, দুইজন একসঙ্গে আর তাহাদের নিজস্ব গৃহে বাস করে নাই। ইহার পর অচলা অসুস্থ মহিমের পাশে বসিয়া সেবাশুশ্রূষার মধ্য দিয়া তাহাকে ভালো করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ঘটিয়াছে সুরেশের গৃহে, তাহাদের নিজেদের গৃহে নহে। মহিমকে নিয়া দূরপ্রবাসে কিছুকাল ঘর বাঁধিবার স্বপ্ন পুনরায় অচলা দেখিয়াছে; কিন্তু সেই স্বপ্নও তাহার রূঢ় আঘাতে ভাঙিয়া গেল। অবশেষে সে গৃহ একটি পাইল; কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই ঐশ্বর্যসম্ভারপূর্ণ গৃহ সুরেশের, মহিমের নহে। মহিম ও অচলার যে গৃহ পুড়িয়া গিয়াছিল তাহা আর কোনদিন পুনর্নির্মিত হইল না। গৃহদাহের অগ্নিশিখা মহিমের সংযম ও ক্ষমাকে হয়তো উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু অচলার বুকে তাহা অনির্বাণ জ্বালা হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া রহিল।

মহিম ও অচলার গৃহদাহের জন্য সুরেশের দায়িত্বই যে সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবৃত্তির যে ক্ষুধিত অগ্নিশিখা তাহার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে মহিম ও অচলার গৃহে আগুন লাগিল এবং নিজেও সে অগ্নিশিখার দহনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। গৃহদাহের মূল আগুনের স্পর্শটুকু হয়তো সুরেশ জোগাইয়াছিল, কিন্তু অচলা, মৃণাল, মহিম সকলেই কি সেই আগুনে ইন্ধন জোগায় নাই? সুরেশের জন্য অচলার প্রচ্ছন্ন ও অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতা না থাকিলে হয়তো অচলার সংসারে আগুন লাগিত না। মহিমের প্রতি মৃণালের অতিশয়িত আকর্ষণ, মহিমের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া

অচলার সঙ্গে ঠাট্টারসিকতা, মহিমের কাছে লেখা তাহার চিঠি প্রভৃতি অচলার মন ভাঙ্গিয়া দিতে এবং মহিমের প্রতি বিরক্তি উদ্রেক করিতে অনেকখানি সহায়ক হইয়াছিল। মহিমের নিরুত্তাপ ব্যবহার, তাহার প্রস্তরকঠিন সংযম, তাহার বিবর্ণ ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অচলাকে সংসারের প্রতি আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। অচলাকে সে কোনদিন বুঝিতে চাহে নাই, নিজেকেও কখনও বুঝাইতে চেষ্টা করে নাই। স্থতরাং মহিম ও অচলার গৃহদাহ ও উপন্যাসের শোক-করুণ পরিণতির জন্য স্থরেশ ও অন্যান্য সব চরিত্রেরই দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। সাজানো বাগান যেমন শুকাইয়া যায়, তেমনি মানুষের তৈরী ঘরও পুড়িয়া যায়। বাহিরের আগুন উড়িয়া আসিয়া চাল ধরাইয়া দেয়, আবার ভিতরের আগুন বেড়ায় লাগিয়াও ঘর পোড়াইয়া ফেলে। মহিম ও অচলার ঘরের চালেও আগুন ধরিয়াছিল, বেড়াতেও আগুন লাগিয়াছিল। সেজন্য এই অগ্নিকাণ্ড এত ব্যাপক ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল।

এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ছুইটি সমাজ-পরিবেশ পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন, যথা, নাগরিক ব্রাহ্ম পরিবেশ ও গ্রামীণ হিন্দু পরিবেশ। উপন্যাসের শেষ অংশ ডিহরীতে স্থাপিত হইয়াছে। ডিহরী বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হইলেও বাঙালী হিন্দুসমাজের পরিবেশই উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও কাহারও ধারণা যে, এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। ব্রাহ্মসমাজের কৃত্রিমতা, আতিশয্য ও উগ্র প্রগতিশীলতা হয়তো মাঝে মাঝে তাঁহার শ্লেষবাণে বিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কোন বিদ্বেষ কোথাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। কেদারবাবু একটু হীনচেতা, অর্থলোলুপ ও পরনির্ভরশীল হইলেও ব্রাহ্ম বলিয়াই যে তিনি এরূপ হইয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্র কোথাও বলেন নাই। বরঞ্চ শেষদিকে কেদারবাবুর উদার, ক্ষমাশীল ও স্নেহসুন্দর পরিণতিই তিনি দেখাইয়াছেন। অচলা ব্রাহ্ম মহিলা বলিয়াই যে তাহার চিত্তবিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাও নহে। স্বামীর প্রতি অচলার ভক্তি-ভালোবাসা যে কোন হিন্দুরমণীর মতই ছিল। অচলার ট্র্যাজেডি হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক গভীরে, তাহা যে কোন সমাজের নারীর ট্র্যাজেডি। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা হিন্দুসমাজের প্রতি শরৎচন্দ্র অধিকতর কঠোর আঘাত হানিয়াছেন। মহিমের

ঘর পুড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের লোকেরা যে সহানুভূতিলেশহীন অমানুষী ব্যবহার করিয়াছিল তাহার মধ্য দিয়া হিন্দুসমাজের ক্ষুদ্রতা ও হৃদয়হীনতার রূপই পরিস্ফুট হইয়াছে। মহাজ্ঞানী ভিখু বাঁড়ুয্যে তো মহিমের এই গৃহদাহের মধ্যে ব্রহ্মাব ক্রোধবহ্নিব সাক্ষাৎ ক্রিয়া দেখিতে পাইয়া অচলাকে ত্যাগ করিবার সদুপদেশই দান করিলেন। ডিহরীব রামবাবু অচলাকে অতখানি ভালোবাসিয়াছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে অচলার প্রতারণাটুকু ধরা পড়িল তখনই তাঁহার সব স্নেহমমতা নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তাঁহার ধর্মান্ধ মনে শুধু কেবল বিদ্বেষ ও অভিশাপই জাগিয়া রহিল। মহিমের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রই প্রশ্ন করিয়াছেন, 'যে-ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্তনারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না ; আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম ? ইহাকে যে স্বীকাব করিয়াছে, সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে ? যাহা ধর্ম সে ত ধর্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই ! সেই ত তার শেষ পরীক্ষা।'

অচলা চরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্র মানবহৃদয়ের জটিলতম মনস্তত্ত্বের রহস্যময় স্তরে আলোকপাত করিয়াছেন। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের সার্থকতম প্রয়োগ হইয়াছে এই উপন্যাসে। মানুষের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তরে যে পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি বাস করিতে পারে এবং একই লোকের সম্বন্ধে ঘৃণা ও ভালো-বাসা যে পাশাপাশি বিরাজ করিতে পারে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তাহা ধরা পড়িয়াছে। আমাদের মানসিক অনুভূতি অখণ্ড ও অবিভাজ্যরূপে অবস্থান করে না। বিচিত্র ও বিমিশ্র অনুভূতিগুলি একই সঙ্গে পরস্পরের কাছাকাছি বাস করিতে থাকে। সেজন্য একই সময়ে দুইজন স্বতন্ত্র লোকের মধ্যে আমাদের হৃদয় বিভক্ত হইয়া থাকিতে পারে। মানুষ যখন ভালোবাসে তখন একজনকেই শুধু ভালোবাসিতে পারে এই সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। হৃদয়কে অবিভক্ত ও একমুখী রাখিবার জন্য মানুষের নীতিশাস্ত্র লোকবিধি প্রভৃতির কঠোর নির্দেশ বলবৎ রহিয়াছে। যে ভালোবাসা পায় সে সবটুকু পাইতে চায়, তাহার নিঃসপত্ন অধিকারের দাবী কোনো দ্বিতীয় পাত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মানুষের হৃদয় তাহার অবদমিত প্রবৃত্তির দুর্দমনীয় তাড়নায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহার সচেতন সংস্কার, নীতিবোধ, লোকলজ্জা প্রভৃতি এই

ভাজন বোধ করিতে পারে না। তখনই দেখা দেয় মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি। সেই ট্র্যাজেডি অচলার জীবনেও শোচনীয়ভাবে দেখা দিয়াছিল।

অচলার চরিত্র বিচার করিতে হইলে যে পরিবেশে সে মানুষ হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। অচলা শিক্ষিত, মার্জিতরুচি ও প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কলিকাতার উন্নত ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রায় সে আজীবন অভ্যস্ত ছিল। তাহার শিক্ষাদীক্ষা এবং সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে তাহার চরিত্রে শান্ত সংযম, অকুণ্ঠ দৃঢ়তা ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সমাবেশ হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের চিরপালিত পাতিব্রত্যের সংস্কার তাহার হয়তো ছিল না, কিন্তু শিক্ষা, শুভবুদ্ধি ও স্বাভাবিক নারীত্বের সহজ কর্তব্যবোধের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া পতি-পরায়ণতা ও কল্যাণময় সাংসারিক জীবনের আদর্শের প্রতি তাহার সুদৃঢ় আকর্ষণ ছিল। তাহার জীবনে যদি কোন বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে তবে তাহার শিথিল নীতিবোধ কিংবা সমাজনিষিদ্ধ কোন জীবনধারার প্রতি প্রবণতার ফলে ঘটে নাই, তাহার নীতিবোধ এবং পতিপরায়ণতা অন্য যে কোন সমাজ-অনুশাসিত নারীর মতই সজাগ ও প্রবল। তবে এ-কথা সত্য, মৃণালের মত অন্ধ ও অলঙ্ঘ্য সংস্কারের জালে নিজেকে সে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিতে পারে নাই। তাহার স্বাধীন ও বিচারশীল বিবেক, বাহ্য শালীনতা ও সম্ভ্রমবোধ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা-রক্ষায় তাহার আত্যন্তিক আগ্রহের ফলেই অনেক সময় সে স্থিত অবস্থাকেই অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততার সহিত মানিয়া লইতে পারে নাই এবং অনেক অবাঞ্ছিত ও অকল্যাণজনক পরিস্থিতিও এড়াইতে সক্ষম হয় নাই।

মহিমকে সে ভালোবাসিয়াছিল। মহিমের কি গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সে এতখানি ভালোবাসিয়াছিল, তাহা অবশ্য বুঝা যায় না। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, তাহার রোমান্টিক ভালোবাসা মহিমের ব্যক্তিসত্তাকে আশ্রয় করিয়াই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমের গ্রাম্য গৃহ সম্বন্ধে সে শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই গ্রাম্যগৃহের রূঢ় বাস্তবতার সান্নিধ্যে তাহার ভালোবাসা পরীক্ষিত হইবার সুযোগ পায় নাই। সেই সুযোগ যখন বিবাহের পরে আসিল তখন তাহার ভালোবাসার প্রশস্ত ও মজবুত মাটিতে একটা বড় রকমের ফাটল দেখা দিল। মহিমকে ভালোবাসিয়া যখন সে মৃদু-সুরভিত স্বপ্নকাননের মধ্যেই

বিচরণ করিতেছিল তখন হঠাৎ প্রমত্ত একখণ্ড ঝড়ের মতই সুরেশ আসিয়া তাহাকে অনাবৃত রূঢ় জগতের মধ্যে উড়াইয়া আনিয়া ফেলিয়া দিল। সুরেশ তাহার অন্তরকে এক তীব্র উত্তেজনাজনক বিষামৃতের মাদকতায় আলোড়িত করিয়া তুলিল। ঐ প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকটির উন্মত্ত প্রেম জলন্ত সীসার মতই তাহাকে জ্বালাইয়া চলিল, কিন্তু সেই জ্বালার এক অনির্বাচ্য রোমাঞ্চকর সুখও তাহার অবচেতন হৃদয় সঙ্গোপনে আস্বাদ করিতে লাগিল। মহিমকে নিয়া ঘর বাঁধিবার একটি শান্ত স্বপ্ন তাহার মধ্যে জাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সুরেশ যেন একটি দুর্দান্ত বাজপাখীর মতই তাহাকে তাহার নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় হইতে বজ্র-বিদ্যুৎসমাকীর্ণ অনাশ্রয়ের মহাশূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাহিল। শেষ পর্যন্ত মহিমের প্রতি তাহার বিশ্বস্ত প্রেম জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু সুরেশের দাবী প্রত্যাখান করিতে তাহাকে যথেষ্ট মানসিক শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। শুধু যে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে যাইতে হইয়াছিল তাহা নহে, সুরেশের প্রতি তাহার অবচেতন হৃদয়ের দুর্নিবার আকর্ষণকেও তাহাকে জোর করিয়া রুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মহিমের হাতে সে আংটিটি পরাইয়া দিয়াছিল শুধু কেবল তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদান জানাইবার জন্য নহে, তাহার অশান্ত মনকে সচেতন সঙ্কল্পের দ্বারা বাঁধিবার জন্যও বটে। কিন্তু মহিমকে বিবাহ করিবার সম্মতি জানাইয়া সে মহিমকে নিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল রচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই, বরং সেই প্রত্যাখ্যাত দুঃখদায়ক লোকটির চিন্তা একটি কালো ভ্রমরের মতই তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া চলিতেছিল। সেজন্য দূরপ্রবাসে সুরেশের অসম-সাহসিক মহৎ কাজের বিবরণ সংবাদপত্রে পড়িয়া 'আমাদেরই সুরেশবাবু' বলিয়া গৌরব বোধ করিয়াছে, আহত সুরেশকে সযত্নে সেবা করিয়াছে এবং সুরেশের বাড়িতে গিয়া তাহার অপরিমিত ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়া বিবাহের প্রাক্কালে সুখময় স্বপ্নের নেশায় বিভোর না হইয়া সে এক নীরব কান্নার আবেগেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

মহিমকে লইয়া অচলার বিবাহিত জীবন হয়তো সুখের হইতে পারিত। কিন্তু বিবাহের পরেই সেই সুখ শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটার মতই অচিরে মিলাইয়া গেল। মহিমের মলিন ও নিরানন্দ পল্লীগৃহে আসিয়া তাহার নাগরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে লালিত জীবন হতাশা ও অবসাদে ভাঙিয়া পড়িল। বিবাহের রোমান্টিক স্বপ্ন দেখা এক এবং বিবাহের নিত্যকার বাস্তব জীবনযাত্রা

হইল আর এক বস্তু এ মর্মান্তিক সত্যটি সে উপলব্ধি করিতে পারিল। যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সব ছাড়িয়া আসিয়াছিল সে যদি তাহার ভালো-বাসার উত্তাপ ও আশ্বাসে তাহাকে ভরিয়া রাখিত তবে সে হয়তো সব অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিতে পারিত। কিন্তু মহিম তাহার অটল ঔদাসীন্যের বর্মে আবৃত হইয়া তাহাঁর বাঁধাধরা কাজের গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এই নিরানন্দ ও নির্বান্ধব পুরীতে মৃণাল যখন তাহার হাস্যপরিহাসের প্রসন্ন আলো ছড়াইয়া আসিল তখন অচলা কিছুটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এই সেবা-যত্ন-আদরের মূর্তিমতী প্রতীকটি অচলার জীবনে শান্তি ও আনন্দের পরিবর্তে সংশয়, অশান্তি ও বেদনাই জাগাইয়া তুলিল। তাহার সেকেলে রঙ্গরসিকতা ও মহিমের সঙ্গে তাহার আত্যন্তিক ঘনিষ্ঠতা নাগরিক ভব্যতা ও রুচিতে অভ্যস্ত অচলার চোখে বিসদৃশ ও অসঙ্গতই লাগিল। মহিমের নিরুত্তাপ ও নির্বিকার ব্যবহার তাহার সংশয় ও জ্বালা শুধু কেবল নিরন্তর বাড়াইয়া চলিল। বিবাহিত জীবনের সুরভিত পুষ্প চয়ন করিতে যাইয়া এমনিভাবে যখন সে কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত তখন হঠাৎ সুরেশ তাহাদের পল্লীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহাকে সে তাহার জীবনের অভিশাপ বলিয়া এককালে মনে করিয়াছিল তাহাকেই সে এখন পরম প্রার্থিত বান্ধব বলিয়া মনে করিল। সুরেশের সঙ্গে নিভৃত কথোপকথনের সময় একটি দুর্বল মুহূর্তে সে বলিয়াছিল, 'আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু?' মহিমের সঙ্গে প্রবল ঝগড়ার এক মুহূর্তে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, 'সুরেশবাবু, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও, যাকে ভালবাসিনে, তার ঘর করবার জন্যে আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিয়ো না।' মহিম সম্বন্ধে এই একান্ত রূঢ় কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইলেও ইহার সহিত তাহার সাময়িক অভিমান অনেকখানি মিশিয়াছিল, ইহা পুরাপুরি তাহার অন্তরের কথা মনে করিলে ভুল হইবে। মহিমের গৃহ দগ্ধ হইলে মহিমের প্রতি তাহার আচ্ছন্ন ভালোবাসা আবার জাগিয়া উঠিল। তখন সর্বরিক্ত স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'আর বলেইচি ত তোমার ভার এখন থেকে আমার ওপর।' কিন্তু তবুও অচলাকে তাহার দগ্ধ পল্লীগৃহ ছাড়িয়া কলিকাতায় রওনা হইতে হইল। স্বামীগৃহে বাসের আশা তাহার চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

মহিম যখন গুরুতর অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য সুরেশের গৃহেই আসিল

তখন অচলা প্রাণপণ সেবাশুশ্রূষার মধ্যে তাহার কল্যাণী নারীসত্তাটি উজাড় করিয়া দিল। মহিমকে ভালো করিয়া তুলিবার আনন্দে তাহার পতিনিষ্ঠ অন্তরটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই নির্মল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই সুরেশের সান্নিধ্যে এক নিষিদ্ধ আনন্দের মাদকতার জন্য তাহার চিত্ত লুব্ধ হইয়া থাকিত। তাহার প্রতি সুরেশের গোপন ভালোবাসায় নানা প্রকার পরিচয় পাইবার সময় সুরেশকে ক্ষমাহীন ধিক্কারের দ্বারা শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করিলেও এক নিষিদ্ধ অনুভূতির রোমাঞ্চস্পর্শে তাহাব সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন গান গাহিয়া উঠিত। স্বামীর সঙ্গে তাহার যখন জব্বলপুব যাওয়ার কথা ঠিক হইল তখন সুরেশের অপ্রতিরোধ্য অথচ অবাঞ্ছিত আকর্ষণ হইতে সে দূরে পলাইতে পারিবে এই আশ্বস্তিতে তাহার মন লঘুপক্ষ প্রজাপতির মতই যেন উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু বিদায়ের মুহূর্তেই আবার সুরেশের করুণ মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অশ্রুসজল মিনতি জানাইয়া বসিল। এমনিভাবে তাহার মনের একভাগ সুরেশকে পরিহার করিয়া চলিত এবং আর একভাগ তাহাকেই গোপনে গোপনে কামনা করিত।

কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশের পথে রওনা হইবার পরেই অচলার নারী-জীবনের কঠোরতম পরীক্ষা শুরু হইল। সুরেশের প্রতি দুর্বলতা থাকিলেও অচলা স্বামীর কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নীতিবিগর্হিত কোন জীবন যাপন করার কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সেজন্য সে যখন বুঝিতে পারিল যে, সুরেশ তাহাকে এক সর্বনাশা ভবিষ্যতের দিকে লইয়া চলিয়াছে তখন তাহার স্বামীর প্রতি স্নেহভক্তি, মায়ামমতা অদম্য আবেগে উদ্বেলিত হইয়া নিরুপায় কান্না ও মিনতিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সুরেশের প্রতি ক্ষোভ, ঘৃণা ও ধিক্কারে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এই, সুরেশ যখন সরাইখানায় গুরুতর অসুস্থ হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়াছিল তখন এই পরস্ত্রীলোলুপ ঘোরঅনিষ্টকারী লোকটির জন্যই তাহার মন উদ্বেগে, করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সুরেশের জন্য ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যে লোকটি তাহার চরম সর্বনাশ ঘটাইয়াছে তাহারই জন্য অচলা অতখানি করিতে গেল কেন? অচলা যদি শুধু মাত্র পতিব্রতা নারী হইত তাহা হইলে সে কখনই সুরেশের মঙ্গলের জন্য অতখানি করিতে পারিত না। কিন্তু পাতিব্রত্যের সঙ্গে তাহার চরিত্রে উদার মনুষ্যত্বেরও সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া একটি অসহায়

মানুষের জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন তখন তাহার অপরাধের বিচার না করিয়া সে তাহাকে সারাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুরেশ তাহার অশেষ ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু সে যাহা করিয়াছে তাহা অচলার প্রতি দুর্দম প্রেমের আবেগে, এ-কথাও অচলা সুরেশের মুমূর্ষু দেহের দিকে তাকাইয়া না ভাবিয়া পারে নাই।

কিন্তু অচলার প্রকৃত আত্মঘাতী সংগ্রাম শুরু হইল ডিহরীতে সুরেশের সঙ্গে বাস করিবার সময়। সুরেশের আশ্রয়ে থাকিয়া সুরেশকে প্রতিনিয়ত প্রতিরোধ করিতে হইতেছে, এ-সংগ্রাম যে কি ক্লেশকর, কি কঠোর সেই শুধু তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছে। তাহার নীতিবোধ, পতিপরায়ণতা প্রভৃতি তাহার অন্তরের মধ্যে কঠিন অবরোধ খাড়া করিয়া রাখিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সুরেশের অপরিমেয় প্রেমের করুণ-কাতর আবেদন প্রভৃত ভোগৈশ্বর্যের লোভনীয় আয়োজন, বাহিরের লোকেদের দেওয়া সম্ভ্রম ও সম্মানের নেশা ক্ষণে ক্ষণে সেই অবরোধকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। শরৎচন্দ্রের কথায়, 'দেখিতে দেখিতে তাহার মনের মধ্য দিয়া লোভ ও ত্যাগ, লজ্জা ও গৌরব ঠিক যেন গঙ্গাযমুনার মতই পাশাপাশি বহিতে লাগিল এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার কোনটাকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না।' অবশেষে সে এক ঝড-জল-দুর্দিনের রাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল। মিথ্যা সম্মান, প্রীতি ও শ্রদ্ধার তাডনায় সে সুরেশের শয্যায় নিজেকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল সত্য, কিন্তু তাহার বহুদিনকার তৃষিত, লুব্ধ কামনার প্রেরণাও যে সেই সঙ্গে মিশিয়াছিল তাহা সত্য। ইহার পর সুরেশ ও অচলা স্বামী-স্ত্রীর মত জীবন যাপন করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই জীবনের গ্লানি ও জ্বালা সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিয়াছে। সে সুরেশকে দেহ দিয়াছে বটে। কিন্তু হৃদয় সবটুকু দিতে পারে নাই। সেজন্য সে নিজে যেমন সুখী হইতে পারে নাই, সুরেশকেও তেমনি সুখী করিতে পারে নাই। সে অনিবার্য ঘটনার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু মহিমকে সে কখনও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। মহিমকে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে রামবাবুর বাড়িতে দেখিয়া সে হতচেতন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তথাপি অচলা মহিমের কাছে ফিরিয়া যায় নাই, কারণ সে উপায় আর ছিল না। সুরেশ তাহার জীবনে মহা সর্বনাশ আনিয়াছে। কিন্তু এই সুরেশ ছাড়া তাহার আর কোন অবলম্বনও নাই। সুরেশকে

ছাড়া তাহার ভয়াবহ একাকিত্ব সে কল্পনা করিতেও পারে না। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, 'আর তাহার কেহ নাই; তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে, কোথাও কেহ নাই, সংসারে সে একেবারে সঙ্গীবিহীন। এই কথা মনে করিয়া তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।' সুরেশ যখন প্লেগের মধ্যে গিয়া নিজে মৃত্যুকে ঘনাইয়া আনিল তখন তাহাকে বাঁচাইবার জন্য অচলা প্রাণান্তকর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। সুরেশবিহীন সেই দুর্গহীন, আশ্রয়হীন মহাশূন্য ভবিষ্যতের চেহারা তাহার চোখে পড়িল। সে কাতরভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে, 'হে ঈশ্বর! আমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পাইয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখ, সকল ব্যথার পরিবর্তে একে তুমি ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লও; আমার মা নাই, বাপ নাই, স্বামী নাই—এত বড় লজ্জা লইয়া কোথাও আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি কত যে সহিয়াছি, সে ত তুমি জান—আর আমাকে বাঁচিতে দিয়ো না প্রভো! আমাকে তোমার কাছে টানিয়া লও।' এই মর্মবিদারী কাতর ক্রন্দন সমবেদনার গভীরতম উৎসকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সুরেশের মৃত্যুর পর অচলা আবার মহিমের সঙ্গে মুখোমুখি হইল। সব কিছু ছাড়িয়া, সব কিছু হারাইয়া সর্বরিক্ত বৈরাগ্যের ধূসর প্রতিমূর্তির মতই সে দেখা দিল। তাহার চাহিবার কিছু নাই, পাইবারও কিছু নাই, তাহাকে ভালবাসিবার কেহ নাই, তাহাকে ঘৃণা করিবারও কেহ নাই। মহিম তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিল কিনা গ্রন্থমধ্যে তাহা স্পষ্ট নহে। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, লোভী মানুষ ও নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা তাহার জীবনটি লইয়া যে ছিনিমিনি খেলা খেলিয়াছে তাহার মর্মান্তিক আর্তনাদ পাঠকচিত্তে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে।

অচলাচরিত্রের বিপরীত আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে মৃণালের মধ্যে। অচলা যেমন শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি মৃণালও তেমনি সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য নারীসমাজের প্রতিনিধি। মৃণাল, বিরাজ, সরযূ, অন্নদা, সুরবালা, সৌদামিনী প্রভৃতি চরিত্রের সমগোত্রীয়া—প্রাচীন সংস্কারের কঠোর বিধিনিষেধের দ্বারা তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত। তাহার বিশ্বাস, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্বন্ধ অদৃশ্য বিধাতার দ্বারাই সংঘটিত এবং সে-সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের সূত্রে আবদ্ধ। মহিমের প্রতি তাহার হৃদয়ভাব কিরূপ ছিল তাহা খুব স্পষ্ট

নহে, কারণ মৃণাল ও মহিমের ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের কোন দৃশ্য আমরা দেখি নাই। মহিমের সঙ্গে ছেলেবেলায় তাহার ভালোবাসা জন্মিয়াছিল, মহিমের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাও হইয়াছিল। সুতরাং মৃণালের প্রবল স্বামীভক্তি এবং সংস্কারের কঠিন আবরণের তলায় মহিমের প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগের নিভৃত অস্তিত্ব থাকা স্বাভাবিক। যাহা সে তরল হাস্যপরিহাসের সুরে উল্লেখ করিয়াছে তাহার সঙ্গে তাহার গোপন অন্তরের কোন গভীর যোগ ছিল না, তাহা মনে হয় না। মানুষের সংস্কারের তলে তলে তাহার অবদমিত ও অসামাজিক কামনা যে বাস করিতে পারে শরৎচন্দ্র তাহা বহুস্থানে দেখাইয়াছেন। মৃণালের বেলায় তাহার বাহ্য সংস্কারই একমাত্র সত্য, সেই সংস্কারের নীচে আর কোন বিপরীত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, এ-কথা কখনও জোরের সঙ্গে বলা যায় না। মৃণালের মনে পাতিব্রত্যের সংস্কার এত দৃঢ়বদ্ধমূল যে, সে কখনও হয়তো অচলার মত আত্মসমর্পণ করিত না, কিন্তু তবুও অচলার মতই স্বামী ও অন্যপুরুষের মধ্যে বিভক্ত হৃদয় লইয়া তাহাকেও হয়তো সঙ্কটে পড়িতে হইত, কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই সমস্যার মধ্যে যান নাই, সেজন্য মৃণালের পতিভক্তি কোনো কঠিন পরীক্ষার আঘাতে আলোড়িত হয় নাই। পাতিব্রত্যের অত্যাজ্য সংস্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাহারা যে কোন প্রকার স্বামীর সঙ্গেই পরম সুখে বাস করিবার গৌরব ব্যক্ত করিয়া থাকে, আসলে তাহাদের বাসনাকামনার ঊর্ধ্বায়ন ( sublimation) ঘটিয়া থাকে এবং ভিন্নতর জগতে তাহারা আত্মতৃপ্তি সন্ধান করিয়া পায়। মৃণালও সেবাযত্নের মধ্যে ব্যক্তিগত বাসনা-কামনার এক ঊর্ধ্বায়িত তৃপ্তিই খুঁজিয়া পাইয়াছিল। মহিমকে যত্ন করিয়া খাওয়ানো এবং সেবাশুশ্রূষা করার মধ্যে এই রকম একটা তৃপ্তিবোধই তাহার ছিল। শুধু কেবল মহিম নহে অন্যান্য সকলের সেবাযত্নের মধ্য দিয়াও সে তাহার ব্যর্থ নারীজীবনের এক আদর্শায়িত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এই সেবাযত্ন এবং প্রীতিকর হাস্যকৌতুকময়তার জন্য সে উপন্যাসের সকল চরিত্রেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছে, স্বয়ং লেখকও তাহার উপরে যেন একটু অতিরিক্ত দাক্ষিণ্যই বর্ষণ করিয়াছেন।

সুরেশ ও মহিম ভাবজগতের দুই বিপরীত মেরুতে যেন অবস্থান করিতেছে। সুরেশের অন্তরে প্রচণ্ড আবেগের লাভা যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, নিমেষের মধ্যেই যেন তাহা উদ্গীর্ণ হইয়া আশে পাশের সকলকে

দগ্ধ করিয়া বহিয়া যাইবে। কিন্তু মহিম যেন এক হিম প্রস্রবণ, যেখান দিয়া প্রবাহিত হইবে সেখানকার সকলকেই হিমে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিবে। সুরেশের ভালোবাসা অশান্ত অগ্নিশিখার মতই তাহার ভয়াল-সুন্দর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সেই অগ্নিশিখায় সে নিজেকে ও তাহার ভালোবাসার পাত্রকে যতক্ষণ না নিঃশেষ করিতে পারে ততক্ষণ যেন তাহার শান্তি নাই। সে যে-রকম দুর্দান্ত আবেগে মহিমকে ভালোবাসিয়াছিল তেমনি আবেগে অচলাকে ভালোবাসিয়াছিল। মহিমের ভালোবাসা কিন্তু এত শান্ত, সমাহিত ও অন্তর্মুখী যে তাহার অস্তিত্ব টের পাওয়াই যায় না। তাহার মধ্যে একটা দীনতা ও স্বভাবকৃপণতা আছে, সুরেশ সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সংযত এবং অচলা সম্বন্ধে সে উদাসীন ও নিরুত্তাপ। সুরেশ যাহাকে ভালোবাসে তাহার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু মহিম যেন নিজের স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডির মধ্যে নিশ্চিন্তভাবে সমাসীন, ভালোবাসার দাবী তাহাকে তাহার নির্দিষ্ট জীবনপথ হইতে একটুও নড়াইতে সক্ষম নহে। সুরেশের কাছে পাপপুণ্য, ন্যায়অন্যায়ের তেমন কোন মূল্য নাই আবার মানবিকতার আহ্বানে মৃত্যুবরণ করিয়া লইতেও তাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। জীবন সম্বন্ধে সে প্রচণ্ডভাবে আসক্ত আবার একান্তভাবে নিরাসক্ত। মহিমের মধ্যে এই আসক্তি ও নিরাসক্তি কোনটাই প্রবলভাবে দেখা যায় নাই। কাহারও ক্ষতি করিতে সে যেমন পরাঙ্মুখ, কাহারও উপকার করিতেও সে তেমনি অসমর্থ। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের ট্র্যাজেডির জন্য সুরেশের সক্রিয়তা যতখানি দায়ী, মহিমের নিষ্ক্রিয়তাও ততখানি দায়ী। সুরেশ অচলাকে নিশ্চিন্তভাবে সুস্থ, সাংসারিক জীবন যাপন করিতে দেয় নাই, কিন্তু মহিমও অচলাকে কোনদিন বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহে নাই। অচলা সুরেশের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে কিন্তু স্বামীর কাছে বলিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ প্রেমের নিরাপদ আশ্রয় ও মধুর সান্ত্বনা পায় নাই। মহিম শুধু কেবল পরের সেবা ও উপকারই লইয়াছে, অচলাকে দৃঢ় হাতে ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি সে পাইবে কোথায় ?

'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ ও শিল্পসার্থক উপন্যাস। এখানে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও অবাস্তব চরিত্র একেবারেই নাই।[১] সুরেশ মহিম ও

১। **E. M. Forster** তাঁহার **Aspects of the Novel** নামক গ্রন্থে প্লট সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, **'Every action or word in a plot ought to count; it**

অচলা এই তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই এই বৃহৎ উপন্যাসটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কেদারবাবু, মৃণাল, রামবাবু প্রভৃতি অপর যে কয়েকটি চরিত্র ইহাতে রহিয়াছে তাহারা মূল চরিত্রগুলির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সেজন্য এই উপন্যাসে কোন উপকাহিনী নাই, কোন বিচিত্র ঘটনার বিস্তার এখানে দেখা যায় না। মূল যে কাহিনীটি ইহাতে রহিয়াছে তাহাতেও ঘটনার দূরবিস্তৃতি ও চমৎকারিত্ব কিছু নাই। শুধু কেবল সুরেশের অচলাকে ভুলাইয়া অন্য ট্রেনে তুলিয়া লইবার ঘটনার মধ্যে ঘটনার উত্তেজনাজনক চমৎকারিত্ব দেখা গিয়াছে। বহির্ঘটনার স্বল্পতার জন্য এই উপন্যাসের প্রকৃতি অন্তর্মুখী ও বিশ্লেষণ-মূলক হইয়া উঠিয়াছে। লেখক বাহিরের কোন ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কিছু পরে পরেই চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করিয়া পরস্পরবিরোধী নানা প্রবৃত্তির কথা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং মানুষের মনোজগতের অনধিগম্য রহস্যের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই উপন্যাসের গঠনরীতির উৎকর্ষের কথা আলোচনা করিতে গেলে শরৎচন্দ্র যে নাটকীয় রীতির ব্যবহার করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতে হয়। ঘটনার আকস্মিকতা, এক পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ বিপরীত পরিস্থিতির অবতারণা, চরিত্রের দ্রুত রূপান্তর প্রভৃতির মধ্যে নাটকীয় রীতি লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে মুহুর্মুহু এই ধরণের নাটকীয় রীতি প্রয়োগ ক'রে পাঠকের মনকে কৌতূহলে আগ্রহে ভরিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মমহিলার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ লইয়া সুরেশ অচলার কাছে গেল কিন্তু আবার সেই মহিলার প্রতিই সে দুর্নিবার আকর্ষণ লইয়া ফিরিল। সুরেশ ও অচলার পারস্পরিক হৃদয়বিনিময় যখন বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিল তখনই হঠাৎ ধূমকেতুর ন্যায় মহিমের আবির্ভাব এবং অচলা তাহাকেই বিবাহ করিবার সঙ্কল্প জানাইয়া বসিল। আবার মহিমের সঙ্গে অচলার বিবাহ স্থির হইয়া যাইবার পর সুরেশের বাড়িতে তাহার অপরিমিত ঐশ্বর্য দেখিয়া অচলার ভাবান্তর ঘটিল। অচলা স্বামীর সংসারে মন নিবিষ্ট করিতে যখন চেষ্টা করিতেছে তখনই আবার সুরেশ তাহার মূর্তিমান সর্বনাশরূপে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচলা স্বামীর সঙ্গে বিদেশযাত্রার সুখস্বপ্নে যখন বিভোর তখনই ক্লেশকর দুঃস্বপ্নের মত সুরেশ স্টেশনে আসিয়া হাজির হইল। ডিহরীতে অচলা সুরেশের সংসারে

ought to be economical and spare; even when complicated it should be organic and free from dead matter'.

নিজেকে মানাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে সেই সময়েই হঠাৎ মহিমের সেখানে আবির্ভাব। এমনিভাবে শরৎচন্দ্র একটি ঘটনার মধ্যে বিরুদ্ধ ঘটনার আঘাত হানিয়া কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকীয়তার আর একটি উপাদান হইল সংলাপ। শরৎচন্দ্রের সংলাপ দীপ্ত, আবেগময় ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ। সংলাপের মধ্যে কোন কোন স্থানে বক্তার নাম ও ক্রিয়াপদ থাকে, আবার কোথাও কোথাও নাম ও ক্রিয়ার উল্লেখ থাকে না, শুধু কেবল কথাগুলিই থাকে। অনেক স্থানে লেখক সংলাপের মধ্যে পরিস্থিতির রূপান্তর, এমন কি বৈপরীত্য ঘটাইয়া থাকেন। দুইজনে হয়তো একটি বিশেষ মানসিক অবস্থায় কথাবার্তাশুরু করিল, কিন্তু কথায় কথায় তাহাদের এমন একটি মানসিক উত্তেজনা ঘটিল যাহার ফলে পরিস্থিতির একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল এবং চরিত্রগুলির অদৃষ্টপূর্ব কোন দিক হয়তো এক ঝলকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৬ পরিচ্ছেদে মহিমের বাড়িতে সুরেশ ও অচলার কথোপকথনের দৃশ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুরেশ অচলাকে জিজ্ঞাসা করিল সে সুখে আছে কিনা, তখন অচলা বলিল, 'আমি সুখে নেই এ কথা আপনার মনে হওয়াই অন্যায়।' যে-অচলা স্বামীগৃহে সুখেই আছে এরূপ ভাব প্রকাশ করিল সেই আবার কথায় কথায় সুরেশের প্রতি দুর্বলতা স্বীকার করিয়া বসিল। 'দুঃখ কি পাও অচলা?'—সুরেশের এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, 'আমি কি পাষাণ সুরেশবাবু?' কথোপকথনের মধ্য দিয়া পরিস্থিতি একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া গেল।

রচনারীতির দিক দিয়াও 'গৃহদাহে'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পসৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে যে ভাবাতিরেক, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ও সমবেদনার আতিশয্য দেখা গিয়াছিল 'গৃহদাহ' উপন্যাসে সে সবের কোন চিহ্ন নাই। এখানে লেখক সংযত, পরিমিত, সতর্ক ও কঠোরভাবে নিরপেক্ষ। এখানে শিল্পের দাবীর দিকে তিনি অতিমাত্রায় অবহিত। এখানে তাঁহার সহানুভূতির অভাব নাই, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণশীল দৃষ্টি তিনি সর্বদা জাগরূক রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে তিনি বাহিরের পটভূমি ও বর্ণিত চরিত্রের হৃদয় একীভূত করিয়া চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন, যথা, 'বাহিরে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পরপারের ধূসর সৈকতভূমি এক হইতে অন্তপ্রান্ত পর্যন্ত এই দুটি ক্ষুব্ধ মৌন লজ্জিত নারীর

চক্ষের উপর স্বপ্নের মত ভাসিতে লাগিল।' শরৎচন্দ্র প্রকৃতিবর্ণনা খুব পরিমিতভাবে করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে প্রকৃতিবর্ণনা রহিয়াছে সেখানেই তাঁহার কবিদৃষ্টি ও বর্ণনাশক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যেমন, 'একটা বাতাস উঠিয়া সুমুখের কতকটা আকাশ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, শুধু মাঝে মাঝে একটা ধূসর রঙের খণ্ড মেঘ এক দিগন্ত হইতে আসিয়া নদীপার হইয়া আর এক দিগন্তে ভাসিয়া চলিয়াছিল এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কভু উজ্জ্বল, কভু ম্লান জ্যোৎস্নার ধারা যেন সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ হইতে চারিদিকের প্রান্তর ও গাছপালার উপর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।'

শরৎচন্দ্র অনেক স্থানে বাহিরের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়া নরনারীর বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থার দ্যোতনা আনিয়াছেন। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে মানুষের মনোজগতের ভাবানুষঙ্গ রহিয়াছে। সেজন্য প্রকৃতির কোন বিশেষ লীলা দেখিলেই পাঠকের মনে মানুষের কোন কোন ভাবানুভূতির চিন্তা জাগিয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঝড়বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুতের দৃশ্য দেখিলেই মানুষের দুঃখ ও বিপর্যয়ের কথাই আমাদের মনে আসিয়া যায়। অচলা ও সুরেশের জীবনের দুর্যোগ লেখক একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগচিত্রের মধ্য দিয়া চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যথা, 'বাহিরে মত্ত রাত্রি তেমনি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমনি বারবার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেমনিভাবেই সমস্ত পৃথিবী লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নরনারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ-সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।' যেদিন অচলা সুরেশের শয্যায় নিজেকে সমর্পণ করিয়া বসিল সেদিনও লেখক একটি ঝড়জলভরা প্রকৃতির প্রমত্ত হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া অচলার জীবনের একটি বিষামৃতময় অভিজ্ঞতার আভাস দিয়াছেন, যথা, 'বাহিরের মত্ত প্রকৃতি তেমনি মাতলামি করিতে লাগিল, প্রগাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ তেমনি হাসিয়া হাসিয়া উঠিতে লাগিল, সারারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার লেশমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।'

'গৃহদাহ' উপন্যাসে অলঙ্কারপ্রয়োগেও শরৎচন্দ্র যথেষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। উপমা অলঙ্কারই তিনি বেশি প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা, 'যাহারা নূতন জুতার কামড় গোপনে সহ্য করিয়া বাহিরে স্বচ্ছন্দতার ভান

করে, ঠিক তাহাদের মতই সুরেশ সমস্ত দিনটা হাসিখুশিতে কাটাইয়া দিল।' 'কালো কালো অক্ষরগুলো প্রথমে ঝাপসা এবং পরে যেন ছোটছোট পোকার মত সমস্ত কাগজময় নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।'—কীট দেখিলে মানুষের মনে যে-রকম ঘৃণার শিহরণ জাগে, মৃণালের লেখা অক্ষরগুলিও অচলার মনের মধ্যে সে-রকম শিহরণ জাগাইয়াছিল, সেজন্য কীটের সঙ্গে অক্ষরের তুলনা খুবই সার্থক হইয়াছে। 'খাবারের লোভে বন্যপশু ফাঁদে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে যাহা পায়, তাহাই যেমন নিষ্ঠুর দংশনে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেইভাবে সুরেশ অচলাকে একেবারে যেন টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে চাহিল।'—এখানে উন্মত্ত সুরেশকে ক্ষুধার্ত বন্যপশুর সঙ্গে তুলনা করিয়া লেখক সুরেশের তৎকালীন আচরণের রূপটি আমাদের কল্পনায় মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 'প্রভাত-রবিকরে পল্লবপ্রান্তে যে শিশিরবিন্দু দুলিতে থাকে, তাহার অপরূপ অফুরন্ত সৌন্দর্যকে যে লোভী হাতে লইয়া উপভোগ করিতে চায়, ভুলটা সে ঠিক তেমনই করিয়াছে।'—এখানে শুধু কেবল অলঙ্কার নয় শব্দচিত্রপ্রয়োগে নৈপুণ্যও লক্ষণীয়, শিশিরবিন্দুর উপমেয় এখানে লুপ্ত থাকায় অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব এখানে বাড়িয়াছে। মাঝে মাঝে লেখক সমাসোক্তি অলঙ্কারব্যবহারে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন, যথা, 'ইহজীবনের চরম লজ্জা মূর্তি ধরিয়া এক-পা এক-পা করিয়া যে কোথায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে চাহিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন অত্যন্ত অকস্মাৎ অচিন্তনীয়রূপে মুখ ফিরাইয়া আর এক পথে চলিয়া গেল, তাহাকে স্পর্শমাত্র করিল না, তখন এই বিপুল সৌভাগ্যকে বহন করিবার মত শক্তি আর তাহাতে ছিল না।'

শরৎচন্দ্র চরিত্রের হৃদয়াবেগের বাহ্য প্রকাশ বুঝাইবার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবজ্ঞাপক শব্দ ও বাক্যাংশ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলি বার বার গ্রন্থমধ্যে আসিয়াছে, যথা, 'মুক্তার আকারে টপ টপ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল,' 'অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল', 'অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল', বুকের ভিতরটা হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল', 'ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত উন্মত্ত হইয়া উঠিল', 'ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল' ইত্যাদি।

'বামুনের মেয়ে' ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। কৌলীন্য-প্রথার ঘোর অনিষ্টকর দিক উদ্‌ঘাটন করিবার জন্যই শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটি

রচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্যপ্রথা সমাজের এক মারাত্মক ব্যাধিরূপে বর্তমান ছিল ইহা সকলেরই জানা আছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন এই প্রথার কুফল তাঁহার 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মধ্যে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সময়ে 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র সমাজ টিঁকিয়া ছিল কিনা, এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগ্রত হয়। শরৎচন্দ্র যে কুলীন সমাজের ভয়াবহ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা এক অতিক্রান্ত সমাজের চিত্র বলিয়াই মনে হয়। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃত হইল—'বামুনের মেয়ে বলে আমার একখানা বই আছে। অনেকে হয়ত পড়েন নি। লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা-বার্তা হয়, তাঁকে বলি, এই রকম একখানা বই লিখতে ইচ্ছা হয়, এ-সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত experience আছে। তিনি বললেন, 'এখন ত আর কৌলীন্য নেই, একজনের ১০০টা বিয়ে নেই। Plot-এর ত ভাবনা নেই—তবে আর এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে লেখো, কিন্তু কিছু মিছে কল্পনা করো না।' পুরানো ছাই ঘাঁটা আমারও উদ্দেশ্য নয়। কৌলীন্যপ্রথাটা আমার বড় লেগেছিল। যারা ব্রাহ্মণ বলে নিজেদের ভারি গৌরব বোধ করেন আর ভাবেন ব্রাহ্মণের রক্ত অবিমিশ্রভাবে ব'য়ে এসেছে, তাঁদের সেটা মস্ত ভুল ধারণা। ইংরাজীতে যাকে blue-blood বলে, তা আর নেই।' কিন্তু শরৎচন্দ্র যে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ একটি বাস্তব সমাজকে ভিত্তি করিয়াই এই গল্পটি লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা হরিহর শেঠের একটি লেখা হইতে জানিতে পারি,—'তাঁহার হাতে পয়সা ছিল না, কিছু সংগ্রহ হইলেই প্রায় তিনি কোথাও না কোথাও বেড়াইয়া আসিতেন। কয়েক আনা পয়সা লইয়া তিনি হঠাৎ একদিন ষ্টীমারে কালনার নিকট সোনার নন্দী বা ঐরূপ কোন নামের একটি গ্রামে যাইয়া ক্ষুধার্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক কুলীন ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় লইয়া তথায় দুইদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহাকে পল্লীসুলভ যথোচিত আদর যত্ন করিলেন, কিন্তু অতিথির ব্রাহ্মণ পরিচয়ে তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তুত অন্ন দিলেন না, সমস্ত আয়োজন করিয়া স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে তিনি সেই ব্রাহ্মণকন্যার কৌলীন্যপ্রথার কুফলোদ্ভূত জন্মগত কলঙ্কের কথা বিশদভাবে অবগত হইলেন।...ইহাকেই প্লটের ভিত্তি করিয়া পরে তিনি বামুনের মেয়ে রচনা করিয়াছিলেন।'[১]

১। মাসিক বসুমতী, মাঘ, ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে বামুনের মেয়ে বিশেষভাবে কাহাকে বলিতে চাহিয়াছেন? তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রাখিলে মনে হইবে সন্ধ্যাকেই তিনি বামুনের মেয়ে বলিয়া সেই অনুসারেই গল্পের নামকরণ করিয়াছেন। সন্ধ্যা কাতরকরুণ কণ্ঠে অরুণকে বলিয়াছে, 'আমি ত বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে।' 'বামুনের মেয়ে' এই নামকরণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিসিক্ত শ্লেষ যে মিশিয়া রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার একটু ব্যাপক ভাবে বিচার করিলে কালীতারা জগদ্ধাত্রী ও রাসমণি ইঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বামুনের মেয়ের অবস্থা ও প্রকৃতি কিছু কিছু উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে কালীতারা কিভাবে শতপত্নীক স্বামীর নিয়োজিত নাপিতকেই স্বামী ভাবিয়া তাহার ঔরসজাত সন্তানের জননী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। আবার কুলীনের মেয়ে জগদ্ধাত্রীও কৌলীন্যের মোহে নিজের মেয়ের সুখশান্তির দিকে না তাকাইয়া বিবাহের নামে তাহাকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং স্বামী ও কন্যা অপেক্ষা কৌলীন্যের মূল্যই তাঁহার কাছে এতবড় হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা চিরতরে বিদায় লইবার সময়েও তিনি দরজা খুলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা পর্যন্ত করিলেন না। বামুনের মেয়ের আর একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইলেন স্বয়ং রাসমণি। দুলে মেয়ের আঁচলের হাওয়ায় ঘোর অশুচিতার স্পর্শ পাইয়া তাঁহার নাতিনীটিকে স্নান করাইয়া তবে তিনি ছাড়েন, মঙ্গলবারের বারবেলায় ছাগলের দড়ি ডিঙ্গাইবার মত অশাস্ত্রীয় ব্যাপারে তিনি শিহরিত হইয়া উঠেন, আবার প্রবল প্রতাপান্বিত গোলোক চাটুজ্যের সমস্ত পাপকাজে সহযোগিনী হইয়া একটি অনাথা নারীর গর্ভপাতে তিনি সক্রিয় সাহায্য করেন।

তবে এই উপন্যাসে যে চরিত্রটি মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে সেটি কোন বামুনের মেয়ের চরিত্র নহে, সেটি হইল দুর্ধর্ষ পৌরুষের অবতার গোলোক চাটুজ্যের চরিত্র। গোলোক শরৎসাহিত্যের ঘৃণ্যতম, নৃশংসতম ও জঘন্যতম চরিত্র। এমন কোন অপরাধ নাই যাহাতে সে নিজেকে জড়িত করিতে পারে না। সে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ভেড়া পাঠাইবার কলাও কারবার করে, মুসলমান কারবারীকে চড়া হারে সুদ নিয়া গোরু চালান দিবার জন্য টাকা ধার দেয়, সংসারের প্রতি একান্ত অনাসক্তির

জন্যই পরলোকগত পত্নীর পবিত্র স্মৃতি অন্তরে ধারণ করিয়াই একটি আশ্রিতা অনাথা বিধবা নারীর চরম সর্বনাশ করিয়া বসে এবং নিজের অপরাধের বোঝাটি এক আত্মভোলা, মহাপ্রাণ ডাক্তারের উপর চাপাইয়া তাহাকে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দেয়, একটি তরুণী নারীর বিবাহের দিন তাহার কুলকলঙ্কের কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া তাহার বিবাহ পণ্ড করিয়া বসে এবং অবশেষে নিতান্ত করুণাপরবশ হইয়াই এক পঞ্চদশীর পাণিপীড়ন করিয়া তাহার কুল রক্ষা করে। মহাকীর্তিমান গোলোক চাটুজ্যের দুষ্কর্ম ও পাপাচারের তালিকা দিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না। কিন্তু এই পাষণ্ড চরিত্রটিকে শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গরসে সিক্ত তুলিকায় অঙ্কন করিয়াছেন বলিয়া ইহার প্রতি আমাদের তীব্র ঘৃণা উদ্রিক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহাকে আমরা উপভোগ না করিয়া পারি না। ইহার ঘোর নীচাশয়তা বাহিরের একটি প্রবল নিষ্ঠা ও উদার বৈরাগ্যের আবরণে আবৃত রহিয়াছে বলিয়াই তাহার চরিত্রের বাহ্য ও আন্তর রূপের উৎকট বৈসাদৃশ্যই আমাদের ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরস উদ্রেক করে। গোলোক যতবার কলুষিত মুখে মধুসূদনের নাম উচ্চারণ করিয়াছে ততবারই প্রবল ধিক্কার পাঠকের মন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছে। চরিত্রটির প্রতি শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ এত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী যে বার বার তিনি গোলোককে নানা মহৎ বিশেষণে ভূষিত করিয়া তাহার নীচতা ও নৃশংসতার দিক শ্লেষাত্মক রীতিতে তুলিয়া ধরিয়াছেন, যথা, ‘সেই হিন্দু কুলচূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি’, ‘ভগভক্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী চাটুজ্যে মহাশয়’, ‘মূর্তিমান ব্রহ্মণ্যের ন্যায় চাটুয্যে মহাশয়’ ইত্যাদি। প্রিয়নাথকে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিবার সময় ছাড়া গোলোক কখনও তাহার ধীর, স্থির, প্রশান্ত ভাবটি হারায় নাই। কথাগুলি যখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে তখন সেগুলি খুবই স্নিগ্ধ, মোলায়েম এবং সকলের প্রতি অপার করুণায় সিক্ত মনে হইয়াছে, অথচ সেই করুণাধারাটি যে তীব্র কালকূটে ভরা তাহা কাহারও বুঝিতে আর বাকি থাকে না।

শরৎচন্দ্র এই গল্পে জীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের এক বীভৎস চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ‘অরক্ষণীয়া’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘পণ্ডিতমশাই’ প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসে তিনি সমাজের অন্যায়, অত্যাচারের দিক উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ‘বামুনের মেয়ে’র ন্যায় সমাজ-সমস্যার তীব্রতা ও সমাজশাসকদের নির্দয়তা এত কঠিন ও ভয়াবহ আকারে আর কোথাও দেখা যায় না। শরৎচন্দ্র এখানে

স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় দেখাইয়াছেন যে, সমাজে মানুষ মানুষকে এতখানি ঘৃণা করে, নিরীহ ও দুর্বল লোকেদের উপব সমাজের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অত্যাচার এত নিষ্ঠুর। যেখানে কৌলীন্যেব অন্ধ মোহে মানুষ মায়ামমতা ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসে তাহার মূল্য ও প্রয়োজন কোথায় ?

এই গল্পে সমাজের চিত্র পরিস্ফুটনে লেখকের দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ ছিল বলিয়া তিনি অরুণ ও সন্ধ্যার ভালোবাসার দিকটিতে মনোযোগ দিতে পাবেন নাই। অরুণেব প্রতি সন্ধ্যার ভালোবাসা যেমন অস্ফুট ও অনুচ্চারিত, সন্ধ্যার প্রতি অরুণের হৃদয়ভাবও তেমনি আচ্ছন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত। সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিবার পক্ষে যাহার কোন বাধাই ছিল না, সন্ধ্যাব চরম লজ্জা ও সঙ্কটমুহূর্তে তাহার দ্বিধা ও নিষ্ক্রিয়তা তাহার পৌরুষহীনতা ও ভীরুতাব পরিচায়ক। কিন্তু 'বামুনের মেয়ে'র মধ্যে যে চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা সরস, প্রীতিকর ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে সেটি হইল প্রিয়নাথের চরিত্র। শবৎচন্দ্রের অদ্বিতীয় চরিত্র সৃষ্টিনৈপুণ্যের দুই বিপরীতধর্মী দৃষ্টান্ত হইল গোলোক ও প্রিয়নাথ। 'বামুনের মেয়ে'র মধ্যে যখন আমরা মানুষের নীচতা ও নিষ্ঠুবতা দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখন প্রিয়নাথকে দেখিয়া আমবা স্বস্তি ও তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। গোলোক যেমন ব্যঙ্গরসাত্মক চরিত্র, প্রিয়নাথ তেমনি খাঁটি হিউমার, অর্থাৎ করুণ হাস্যরসাত্মক চরিত্র।[১] প্রিয়নাথকে দেখিয়া আমরা হাসি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি সীমাহীন দরদ ও অনুকম্পায় আমাদের মন ভরিয়া উঠে। বাতিকগ্রস্ত চরিত্রমাত্রই আমাদের কৌতুক উদ্রেক করে। প্রিয়নাথের বাতিক হইল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। শরৎচন্দ্র নিজে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভালোভাবে জানিতেন বলিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের এত পারিভাষিক নাম তিনি প্রিয়নাথের মুখে বসাইতে পারিয়াছেন।[২] হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়াও তিনি একটি রোগী জোগাড় করিতে পারেন না, তাহার কারণ বাস্তব-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের অভাব। সকলের ভালো করিবার

১। শরৎচন্দ্রের হাস্যরস সম্বন্ধে লেখকের 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

২। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৩।১১।১৯ তারিখে লিখিত একটি পত্রে ছিল, 'তাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা আর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ নয়। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মারিতে পারিয়াছি, আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত।'

সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ডন কুইক্সোটের মত তিনি সকলের কাছে লাঞ্ছনা ও অপমানই শুধু কুড়াইয়াছেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। গোলোক চাটুজ্যে তাঁহাকে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেয়, নাপিতের ঔরসজাত পুত্র হইবার কলঙ্ক বিনা অপরাধে তাঁহাকে মাথায় লইতে হয় এবং অবশেষে স্ত্রীর আশ্রয় হইতে বিতাড়িত হইয়া হোমিওপ্যাথি বাক্সটি সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে পথে বাহির হইতে হয়। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের হাস্যানুভূতি করুণায় ও বেদনায় বিগলিত হইয়া যায়।

## রাজনৈতিক জীবন

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশের সর্বত্র কংগ্রেস কমিটি গড়িয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র অসহযোগ-আন্দোলন সমর্থন করিয়া তখন কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তখন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার ইতিপূর্বেই ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। দেশবন্ধুর অনুরোধে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার কংগ্রেস সংগঠন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। হাওড়ার অনেক স্বদেশপ্রাণ কর্মী তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদেও নির্বাচিত হইলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

কংগ্রেসের কাজে তাঁহাকে প্রতিদিন শিবপুর হইতে কলিকাতায় আসিতে হইত। ভবানীপুরে দেশবন্ধুর গৃহে, ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের গৃহে অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে আসিয়া তিনি কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনায় যোগদান করিতেন। দেশবন্ধুর অনুগামীদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল সুভাষচন্দ্র, নির্মলচন্দ্র, হেমন্তকুমার সরকার ও ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের সঙ্গে। কংগ্রেসের কার্যপরিচালনায় যখনই কোন দুরূহ বা জটিল সমস্যার উদ্ভব হইত তখন শরৎচন্দ্রের মন্ত্রণা না হইলে চলিত না। 'কোন জটিল ব্যাপারের গ্রন্থিমোচনের জন্য রথী মহারথী কর্মীরা যখন বৃহৎ টেবিলের চারিদিকে

জটলা পাকিয়ে ব'সে মাথা কোটাকুটি করতেন ও সমস্যার গোলকধাঁধার মধ্যে হাবুডুবু খেতেন, শরৎচন্দ্র তখন একান্তে বসে পেয়ালার পর পেয়ালা চায়ের ধোঁয়া মুখ থেকে পেটে ঢোকাতেন এবং একটা মোটা বর্মা চুরুটের ধোঁয়া টানে টানে মুখ থেকে নাক দিয়ে বার করে দিতেন। সকলে যখন হয়রাণ ও দিশেহারা হ'য়ে পড়তেন, তখন তিনি সহসা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একটি মোক্ষম পরামর্শে সমস্যার দফা রফা করতেন।'[১]

কংগ্রেস-আন্দোলনের সকল কর্মসূচীতে শরৎচন্দ্রের আস্থা ছিল না। চরকায় সূতা কাটিয়া দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। খদ্দর তিনি পরিতেন শুধু কেবল কংগ্রেসের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিবার জন্য। বিলাতী পণ্য বর্জনে তাঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল। সরকারের খেতাববর্জনও তিনি স্বাদেশিকতার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন নাইটহুড ত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তিনি খুবই খুশি হইয়াছিলেন। ১৬।৮।১৯ তারিখে তিনি অমল হোমকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন ক'রে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

নারায়ণের সময় সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন তখন না কি দাস সাহেব কেঁদেছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।'

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে শরৎচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু এই ঋষিতুল্য ও সর্বজনপূজ্য ব্যক্তিও যখন তাঁহার উপাধি ত্যাগ করিলেন না তখন শরৎচন্দ্র খুবই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি কতবার বলিতেন, চাঁদেও কলঙ্ক রয়ে গেল। ওঁর উচিত ছিল স্যর টাইটেলটা ত্যাগ করা। ওঁর মত অত বড় পেট্রিয়ট যে টাইটেলটা ছাড়লেন না এর ব্যথা আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না।'

সরকারের দেওয়া উপাধিতে তাঁহার যেমন আত্যন্তিক ঘৃণা ছিল, তেমনি আবার সাধারণ মানুষের দেওয়া উপাধিতে ছিল তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা।

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫

দেশের লোকের দেওয়া গান্ধিজীর মহাত্মা উপাধি এবং বালগঙ্গাধর তিলকের লোকমান্য উপাধি তাঁহার বিশেষ পছন্দসই ছিল। চিত্তরঞ্জনের 'দেশবন্ধু' উপাধি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'না. আমার মুখে তাঁর আর কোন নামই আসে না। ঐ ত ওঁর সত্য পরিচয়। কে জানে কে সর্বপ্রথম ঐ একটি নামের মধ্যেই ও'র ভেতরকার যথার্থরূপ আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। দেশবন্ধু সত্যই দেশবন্ধু! দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ভালমন্দ নরনারী, পতিত তুচ্ছ ব্যথিত সকলের অকৃত্রিম বন্ধু তিনি। মানুষের এত বড় দরদী বন্ধু আমি কখনও কোথাও দেখিনি।'

হাওড়া জেলার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া শরৎচন্দ্র জেলার সর্বত্র কংগ্রেসকমিটি গঠন, তাঁতচরখা স্থাপন, বিলাতী পণ্যবর্জন প্রভৃতি কাজে অতি উৎসাহে যোগ দিলেন। তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে শিবপুরের প্রবোধচন্দ্র বসু, গুরুদাস দত্ত, অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌড়ীর নারায়ণচন্দ্র বসু, মাজুর ডাঃ অমৃতলাল হাজরা, ডোমজুড়ের ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জনসভাতে তিনি বক্তৃতা করিতে পারিতেন না, কিন্তু যাঁহারা জোরালো বক্তৃতা করিতে পারিতেন তাঁহাদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের একটি প্রোগ্রাম ছিল স্কুলকলেজ বর্জন করা। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্র স্কুলকলেজ বয়কট করে। কিন্তু এই স্কুলকলেজ বর্জনের ব্যাপারে স্যার আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের বিরোধিতা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধাভক্তির সীমাপরিসীমা ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার গুরুদেবকে সমর্থন করিতে পারিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার বিশ্বাস ও সত্যের প্রতি অবিচল থাকিয়া তিনি কবির সহিত বাদপ্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। শরৎচন্দ্র তখন প্রবল উদ্দীপনা লইয়া দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিলেন। নিজে তিনি কখনও যশের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। নিজেকে সকল প্রচার ও প্রকাশ্যতা হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি নিরলসভাবে দেশের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিয়া তিনি নিজের অনেক অভ্যাস ও সখ বিসর্জন দিলেন।

তাঁহার দাবাখেলা ও মাছধরা বন্ধ হইল, আড্ডা ও মজলিসে তিনি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিলেন, আদরের ভেলু ও পোষা পাখীর প্রতিও উদাসীন হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে সুরাপানও তিনি বর্জন করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনে ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক অন্তঃপুরচারিণী মহিলা দেশবন্ধুর কাছে স্বদেশ সেবার সুযোগ প্রার্থনা করিলেন। দেশবন্ধু মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ভার শরৎচন্দ্রকে দিলেন। সেদিন যে-সব মহিলা স্বদেশের কাজে আগাইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উর্মিলা দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, মোহিনী দেবী, হেমপ্রভা মজুমদাব, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশবন্ধু ভবানীপুরে নারীকর্মমন্দির স্থাপন করেন। নারীকর্মীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য কিন্তু এই মুষ্টিমেয় নারীবাহিনীই বিলাতী কাপড়ের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিয়া আন্দোলনের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা ও উন্মাদনা সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অব ওয়েলস কলিকাতায় আগমন করিলেন। কলিকাতা মহানগরীতে সেদিন পূর্ণ হরতাল পালিত হইল। সরকার কঠোর দমননীতি চালাইলেন। চারিদিকে ধরাপাকড় ও কারাদণ্ড আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মতিলাল, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতাগণ কারারুদ্ধ হইলেন। শরৎচন্দ্র জেলে গেলেন না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের কাজ যথারীতি করিয়া যাইতে লাগিলেন। ডিসেম্বরের শেষে আহমাদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু কারাগারে ছিলেন বলিয়া হাকিম আজমল খাঁ সভাপতিত্ব করিলেন। কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে আইনঅমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং মহাত্মা গান্ধীকে ঐ আন্দোলন চালাইবার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইল। স্থির হইল গুজরাটের বারদোলী তালুকে গবর্ণমেণ্টের খাজনা বন্ধ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। সমস্ত ভারত তখন এক প্রবল রাজনৈতিক ভূমিকম্পে কম্পমান। এই অবস্থায় হঠাৎ একটা ঘটনায় সব কিছু ওলট-পালট হইয়া গেল। গোরক্ষপুর জেলাব চৌরীচৌরা গ্রামে উত্তেজিত জনতার হাতে থানার সিপাহীরা নিহত হয়। মহাত্মাজী এই সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হন এবং আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। দেশের বহুলোকের মত শরৎচন্দ্রও হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার ফলে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

তাঁহার নিশ্চিত আশা ছিল যে, এই আন্দোলনের ফলে দেশের স্বরাজ-লাভ হইবে। গভীর দুঃখ ও হতাশায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'গোটা কতক কনস্টেবল. Infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারদিকে—সেই শোণিতপ্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্ত-কমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?··· non-violence খুব noble idea কিন্তু Achievement of freedom is nobler—hundred times nobler,'[১]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অভিনন্দন জানান হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রই সেই অভিনন্দনপত্র রচনা করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত প্রীতি ও ভক্তি এই অভিনন্দনপত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, যথা, 'বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি, তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল।'

দেশবন্ধু গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। গয়া কংগ্রেসে তিনি কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাঁহার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের পর তিনি দেশের প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের মত প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন। বাংলা দেশের বেশির ভাগ কংগ্রেসকর্মী ও সংবাদপত্রই দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে ছিলেন। দেশবন্ধু যখন একা সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন তখন এই নিঃসঙ্গ লোকটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন শরৎচন্দ্র। আশা দিয়া, উৎসাহ দিয়া, সেদিন তিনি দেশবন্ধুর ভগ্নপ্রাণে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পর দেশবন্ধুর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০

শরৎচন্দ্র নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, 'গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাংলাদেশে ইংরাজী বাংলা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তব-গান সুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি, তাহার আর তুলনা নাই।'

১৯২২ সালে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসকমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। হাওড়াবাসীদের নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা ও স্বার্থমগ্নতার জন্য বিরক্ত হইয়াই যে শরৎচন্দ্র পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিদায়ী ভাষণ হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, 'হাবড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্তত এ জেলার লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও একথা সত্য। কেউ কিছু কোরব না। কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার একতিল বাহিরে যেতে পারব না—আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ীর উপর বাড়ী, গাড়ীর উপর গাড়ী, আমার দোতলার উপর তেতলা এবং তার উপর চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত থাক—কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরেসুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না। আসল কথা, এরা বিশ্বাস করতেই পারে না, স্বরাজ নাকি আবার কখনও হতে পারে। তার জন্য আবার নাকি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চায়? নিবানো দীপশিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একবার হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে কিছুতে!'

শরৎচন্দ্র সভাপতির পদত্যাগ করিলেও পুনরায় অল্পদিনের মধ্যেই দেশবন্ধুর অনুরোধে ঐপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। একটানা প্রায় দশবৎসর তিনি হাওড়া জেলার সভাপতির কাজ চালাইয়াছিলেন।

১৯২৩ সালে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইল। দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও ঐ সম্মেলনে যোগদান করিতে গেলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। সভাপতির একটি বিধান সম্বন্ধে দেশবন্ধু কিছু বলিতে উঠিলে তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'I won't hear that man'. শরৎচন্দ্র সভাপতির এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে তিনি বলিলেন, 'I can't stand your face'. শরৎচন্দ্র এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শরৎচন্দ্র উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 'যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানিত হতে হয়, তাতে আর আমি নেই—I have had enough of it and I would have none of it any more.'

দেশবন্ধু সস্নেহে শরৎচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তাই করুন, শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ, আপনার অনুভূতি বড ডেলিকেট। এত ব্যথা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না। এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।'

শরৎচন্দ্র বেদনা ও সহানুভূতিসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধাবিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কি ক'রে?…… নাঃ আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না।'[১]

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইল। ঐ অধিবেশনে কংগ্রেসকর্মিদিগকে আইন-সভায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য দেশবন্ধুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রও দিল্লী গিয়াছিলেন। দিল্লীকংগ্রেসে আইনসভায় প্রবেশের নীতি সমর্থিত হইবার কিছুকাল পরেই আইনসভার নির্বাচনের সময় আসিল। দেশবন্ধু তাঁহার সমর্থকদের লইয়া নির্বাচনযুদ্ধের জন্য বিপুল উদ্যমে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি হাওড়া হইতে শরৎচন্দ্রকে নির্বাচনপ্রার্থী হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কোন পদের জন্য কোনদিন লালায়িত ছিলেন না, তিনি সবিনয়ে দেশবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। স্বরাজ পার্টি

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন-শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৩৮-৪০

গঠিত হইবার পরে দেশবন্ধুর প্রধান সহযোগী ছিলেন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র অক্লান্ত উদ্যম লইয়া দেশবন্ধুকে সাহায্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে দেশবন্ধুর অজস্র বাংলা বিবৃতি তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। দেশবন্ধুর পল্লীসংগঠনের কাজের জন্য চাঁদা তুলিতে এবং Forward পত্রিকার জন্য শেয়ার বিক্রী করিতে শরৎচন্দ্র সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি দেশবন্ধুর যেমন অনুরাগী সহকারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতা। দেশবন্ধু যখন ক্লান্তিতে ও অবসাদে কাতর হইয়া পড়িতেন শরৎচন্দ্র তখন নূতন আশা ও উৎসাহ দিয়া পুনরায় তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেন, দেশবন্ধুর আঘাতজর্জরিত প্রাণে তিনি শান্তি ও সান্ত্বনার মধুর প্রলেপ লাগাইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র কঠিন আঘাতে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পরে তিনি শোকে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বেশ করেছেন। কাঁদতে কাঁদতে সেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন ত তার সঙ্গে আমরা কাঁদিনি, হাত ধ'রে বলিনি ত তাঁকে, ওগো আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি, আমরা তোমাকে চাই, আমরা শুধু তোমারি। তাইত তিনি শোধ নিয়েছেন। বেশ করেছেন। We didn't deserve him.'[১]

শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গৃহে সকল প্রকার বিপ্লবীদের সমাগম হইত। বিপ্লবীদের মধ্যে একদল অহিংস আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন, একদল হিংসাত্মক আন্দোলন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না, ইহা মনে করিতেন। এই উভয় প্রকার বিপ্লবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং শরৎচন্দ্রও দেশবন্ধুর গৃহেই ইহাদের সঙ্গে যোগস্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। ইহাদের চরম স্বার্থত্যাগ ও অশেষ দুঃখকষ্টবরণের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তিনি মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যাইতেন। সুগভীর আগ্রহ লইয়া তিনি ইহাদের মুখে রোমাঞ্চকর কীর্তিকলাপ ও অবিস্মরণীয় আত্মদানের কাহিনী শুনিতেন। তিনি নিজে নৈষ্ঠিক কংগ্রেসকর্মী হিসাবে কংগ্রেসের অহিংস কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেন, কিন্তু

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন-শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩-৫৪

গোপনে গোপনে শিবপুর, ডোমজুড়, সালখিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের বিপ্লবী দিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল ছিলেন। বিপিন গাঙ্গুলীর অনেক বিপ্লবী শিষ্যকে শরৎচন্দ্র সস্নেহ সাহায্য করিয়া যাইতেন।

১৯২০ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র যেসব রচনা লিখিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক চেতনার সর্বাপেক্ষা সার্থক রূপায়ণ হইয়াছিল 'পথের দাবী' উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র নিজে অহিংস কংগ্রেসকর্মী হইলেও এই উপন্যাসে তিনি বিপ্লববাদ ও শ্রমিক আন্দোলনই সমর্থন করিয়াছিলেন। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী চরিত্রটি তিনি কয়েকজন অসমসাহসিক বিপ্লবীচরিত্রের ক্রিয়াকলাপ অবলম্বনে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহপ্রবণতা ও ক্ষমতাশীলতা—এইগুলি নিয়েছেন যতীন মুখার্জীর জীবন থেকে, ছদ্মবেশধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ান ও বৈপ্লবিক কেন্দ্রসংগঠনের দিকটা নিয়েছেন রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (এম. এন. রায়) জীবন থেকে। নানা দেশের নানা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তারকনাথ দাস প্রভৃতির জীবন থেকে, দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলভার ছোঁড়ার দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজনের ছাপ আছে।'[১]

কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলিয়া শরৎচন্দ্র জনসাধারণের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রমিকদের দাবী তিনি যেমন 'পথের দাবী' উপন্যাসে সমর্থন করিয়াছিলেন, কৃষক সমাজের অধিকারও তিনি 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে ও 'মহেশ' গল্পে স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বরাজের কথা তখন অনেকে বলিতে শুরু করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও এই অর্থনৈতিক স্বরাজের দাবী সমর্থন করিয়াছিলেন। 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয়ের সময় অনেকেই বলিষ্ঠ ও বিদ্রোহী কৃষকসমাজের রূপ দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। শচীনন্দন

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬০-৬১

চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'এ সময়ে বাঙলার অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মীরা জমিদারী প্রথা বিলোপের কথা চিন্তা করতে ও প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কৃষকের উপর জমিদারী প্রথাকে তাঁরা শোষণের জগদ্দল পাথর বলেই অভিমত প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। এই অভিমতে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা ষোড়শী অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।'

## দেনা-পাওনা

'দেনাপাওনা' উপন্যাসখানি ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র, ১৩২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র, ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ হইল ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ( ভাদ্র, ১৩৩০)

শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিবার সময় এই উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই বিক্ষুব্ধ জনমানসের উত্তাপ এই উপন্যাসের কাহিনীকে স্পর্শ করিয়াছে। অবশ্য 'দেনা-পাওনার' মূল সমস্যাটির সঙ্গে রাজনৈতিক উত্তেজনার কোন সম্পর্ক নাই, তবে মূল সমস্যাটির সঙ্গে যোগ রাখিয়া লেখক সমসাময়িক উত্তেজনার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়া উপন্যাসের একটি উত্তপ্ত পার্শ্বসমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামের কোন রূপ অবশ্য শরৎচন্দ্র দেখাইতে চাহেন নাই, কিন্তু বিদেশী শাসনের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অত্যাচারী শক্তির শোষণের বিরুদ্ধেও যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বাস্তব চিত্রই তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। বাংলা-দেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা কিছুকাল পরেই একটি সুস্পষ্ট রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এই চিন্তাধারার সঙ্গেশরৎ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস রচিত হইবার সময় সমাজতান্ত্রিকআন্দোলন শুরু হয় নাই সত্য, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মনে তখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার উদয় হইয়াছিল এ অনুমান করা যাইতে পারে। কয়েক বছর পরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কিরূপ যোগ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'জমিদারী-বিলোপ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নূতন মনোভাব ও আদর্শ কর্মীদের মনে এ-সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগল, শরৎচন্দ্রের কাছে

মনোভাব ও আদর্শ উৎসাহ পেতে লাগল। শত শত কর্মী প্রতি সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করতে লাগলেন এবং নূতন আদর্শ ও আলোকের প্রেরণা লাভ করতে লাগলেন।...... ...এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে হাওড়া-শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী, সন্তোষকুমার মিত্র, ডাঃ সুবোধ বসু এই বৈঠকগুলিতে যোগদান করেছিলেন। ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আর ছিলুম আমরা কয়েকজন তাঁর নিত্যসঙ্গী—আমি, প্রবোধ বসু এবং শিবপুরের অগম দত্ত, জীবন মাইতি। এই বৈঠকগুলিতে তিনি বাংলাদেশে একটি সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা ঠিক করে দেন এবং আমাদের অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন। বাংলা দেশে প্রথম সোস্যালিস্ট নিউক্লিয়াস এইরূপে তিনিই সৃষ্টি করে দেন।'[১]

'দেনা-পাওনা' রচনাকালে সমাজতন্ত্রবাদের বীজ শরৎচন্দ্রের মনে ছিল বলিয়াই এই উপন্যাসে তিনি জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ সংঘাতের চিত্র আঁকিয়াছেন এবং দরিদ্র প্রজাদের বৈপ্লবিক সঙ্ঘশক্তির রূপও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'দেনা-পাওনা'র পূর্বে শরৎচন্দ্র যে-সব গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন সেগুলিতে বর্ণবৈষম্য এবং সামাজিক নীতি ও সংস্কারের উৎপীড়নের দিকই দেখাইয়াছেন। 'পল্লী-সমাজে'র মধ্যে জমিদার ও প্রজাদের বিরোধ দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই বিরোধ একটি অর্থনৈতিক সংগ্রামের সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। 'দেনা'-পাওনা'র মধ্যেই সর্বপ্রথম এই সংগ্রামের একটি বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দরিদ্র ও দুঃস্থ ভূমিজ প্রজাদের বাস্তব সমস্যা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। একদিকে জীবানন্দের ন্যায় দুর্দান্ত জমিদারের দুঃসহ অত্যাচার এবং অন্যদিকে জনার্দন রায়ের ন্যায় হৃদয়হীন কারবারী মহাজনের নিষ্ঠুর শোষণ—ভাগ্যহীন দুর্বল প্রজাদের অবস্থা অতি শোচনীয় পর্যায়ে পরিণত হইয়াছিল। প্রতিকারের কোনই পথ না দেখিয়া যখন তাহারা নিরুপায়ভাবে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল তখন তাহারা ভগবানের আশীর্বাদরূপে মন্দিরের ভৈরবী ষোড়শীকে মুক্তিদাত্রীরূপে তাহাদের মধ্যে পাইল। ষোড়শীর সঙ্গে জীবানন্দের সংঘাতের

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৬-৭৭

প্রধান কারণ হইল এই প্রজাগণ। এই প্রজাশক্তি ব্যক্তিগত ভাবে যত দুর্বল ও পরাজেয় হউক না কেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রবল ও দুর্জয় ছিল বলিয়াই ষোড়শী একাকিনী, সহায়সম্বলহীনা নারী হওয়া সত্ত্বেও অমিত-পরাক্রমশালী জীবানন্দ ও জনার্দন রায়ের সঙ্গে যুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জমিদার জীবানন্দ যখন প্রজাদের পুরুষানুক্রমে ভোগ করা জমি এক মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রী করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন তখন ষোড়শীর তিরস্কার ও উদ্দীপনাতেই প্রজারা নিজেদের জমির জন্য লড়াই করিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। জমিদার ও গ্রামের সকল মাতব্বর লোকের সম্মুখে সে কিছুদিন পরেই নিজের আশ্রিত প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'এই লোকগুলো তোরা দেখে রাখ, এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিসনে—শুধু গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি।' এইসব নিঃস্ব প্রজাদের একদিন জমিজমা সব ছিল, কিন্তু জমিদার ও জোতদারের মিলিত চক্রান্তে আজ তাহারা ভূমিহীন জন-মজুরের স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে। হয়তো ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও প্রবল ভূস্বামীর অনুগ্রহ উদ্রেক করিবার ব্যর্থ আশায় রহিয়াছে কিন্তু সাগর সর্দারের মত লোকও ইহাদের মধ্যে আছে যে ষোড়শীর একটি ইঙ্গিতে নিষ্ঠুর ঘাতকের রুদ্র মূর্তি ধারণ করিয়া জমিদারের কঠোর শাস্তি বিধান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। সাগর ও তাহার অনুবর্তীদের প্রজ্বলিত ক্রোধহুতাশন অবশেষে জমিদারের প্রমোদ-ভবন ভস্মীভূত করিয়া যেন কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল।

জমিদার ও প্রজাদের পারস্পরিক সংঘাতের পরিণতিতে জমিদারের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু প্রত্যাঘাত না করিয়া নির্বিরোধ মৈত্রীর পথই গ্রহণ করিলেন। শরৎচন্দ্র এখান হইতে শ্রেণীসংঘাতের রূপটি শ্রেণীসামঞ্জস্যে পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। চণ্ডীগড় হইতে ষোড়শী চলিয়া যাইবার পর দুর্দান্ত অত্যাচারী জমিদারটি যেভাবে হঠাৎ প্রজাদরদী জনসেবক হইয়া উঠিলেন তাহা মানিয়া লইতে কষ্ট হয়, কিন্তু এ-কথা সত্য যে, এই উপন্যাসের শেষ দিকে জমিদার ও প্রজার মিলিত প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্র একটি আদর্শ পল্লীসমাজ গঠন করিবার আদর্শ ব্যক্ত করিয়াছেন। জীবানন্দ উপন্যাসের শেষ অংশে 'পল্লীসমাজে'র রমেশের ভূমিকাই যেন গ্রহণ করিয়াছে। Resurrection উপন্যাসের নায়ক নিজের জমি-জমা সব প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, আর 'দেনা পাওনা'র নায়ক জীবানন্দ প্রজাদের

উত্তেজিত করিয়া জনার্দন রায় ও তাহার নিজের বিরুদ্ধেই নালিশ করাইয়াছে। নিগৃহীত প্রজাদের হাতে চরম শাস্তি পাইবার জন্ত যখন সে প্রশান্ত চিত্তে প্রস্তুত হইয়া আছে তখনই ষোড়শী আসিয়া তাহাকে হঠাৎ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। নবলব্ধ কর্মজগৎ হইতে জীবানন্দ যেমন আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তেমনি তাহার স্বয়ংআয়োজিত শাস্তিভোগের শেষ পর্বটিও যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। যে ষোড়শী প্রজাবিদ্রোহের মূল প্রেরণা ছিল সেই শেষ পর্যন্ত প্রজা ও জমিদারের শক্তিপরীক্ষার চূড়ান্ত পরিণতিটি যেন ঠেকাইয়া দিল, অলকার প্রেম ষোড়শীর রুদ্ররোষ হইতে জীবানন্দকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া বসিল। শরৎচন্দ্র অন্যান্য উপন্যাসে দুঃখ ও দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের জন্য অশ্রুসিক্ত সহানুভূতি উজাড় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের রুদ্রকঠোর মূর্তিটি দেখাইয়াছেন।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের বিশিষ্টতা হইল এই যে, ইহার কাহিনী একটি ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। চণ্ডীগড়ের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই এই কাহিনীর যত জটিলতা দেখা গিয়াছে। একদিন ছিল যখন দেবতাই ছিলেন সব সম্পত্তির মালিক, গ্রামের সকল জমিই মন্দিরের অধিকারে ছিল। কিন্তু মানুষ দেবতার প্রতি বাহিরে ভক্তি দেখাইয়াও কিভাবে দেবতাকে ঠকাইতে দ্বিধা করে না তাহার একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে এই উপন্যাসের কাহিনীতে। জমিদার ও জোতদার মন্দিরের রক্ষক হইয়া মন্দিরের সকল ভূসম্পত্তি কুক্ষিগত করিয়া দেবতাকে প্রতারণা করিয়াছে এবং দেবতার আশ্রিত অসহায় ভূমিজ প্রজাগুলিকেও উৎসাদন করিবার আয়োজন করিয়াছে। শুধু কেবল তাহাই নহে, জনার্দন রায়, শিরোমণি মহাশয়, এককড়ি নন্দী প্রভৃতি পাষণ্ড দেবদ্রোহীর লুব্ধ দৃষ্টি দেবীর মূল্যবান রত্ন-অলঙ্কারের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে।

মন্দিরের দেবী গড়চণ্ডীর সেবিকার সাধারণ উপাধি হইল ভৈরবী। মন্দিরের নিয়ম এই যে, ভৈরবীকে সধবা হইতে হইবে। কিন্তু বিবাহের তিন রাত্রি পরেই তাহাকে স্বামীসংস্পর্শ ত্যাগ করিতে হইবে! ভৈরবীদের মধ্যে অনেকেই গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিলেও প্রকাশ্যভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হয়। মন্দিরের ভৈরবী অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী এ-ধারণা গ্রামের লোকেদের মধ্যে বদ্ধমূল। সেজন্য ভৈরবীর চরিত্রদোষ সম্বন্ধে অনেকে কানাঘুষা করিলেও প্রকাশ্যভাবে কেহও তাহার বিরুদ্ধতা করিতেও

সাহস পায় না। ভৈরবীর অনুগ্রহে লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এ-সংস্কার গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবল বলিয়াই তাহারা মন্দিরের এই পূজারিণীকে প্রায় দেবতার আসনে বসাইয়াই তাহাকে ভয় ও ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করে। হৈমর মত উচ্চশ্রেণীভুক্তা ব্যারিস্টার-পত্নীরও মনে এই ধারণা ছিল যে, ভৈরবীর কৃপাতেই তাহার পুত্রলাভ হইয়াছে। ধর্মবিশ্বাসী লোকেদের মনে ভৈরবী সম্বন্ধে এরূপ ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত মনোভাব ছিল বলিয়াই মন্দিরসংলগ্ন ভূমির অধিবাসী সাধারণ প্রজাবৃন্দ তাহাকে তাহাদের দেবীনিয়োজিত মুক্তিদাত্রী বলিয়া মনে করিত এবং জনার্দন রায় ও শিরোমণি মহাশয়ের মত গ্রামের প্রবীণ ও প্রবল নেতারাও তাহার ঘোর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে মন্দিরের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে সাহস করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের অভ্যন্তরে ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভৈরবীর ক্ষমতা ছিল প্রায় নিরঙ্কুশ ও নিরবচ্ছিন্ন। অর্থ ও প্রতাপ মন্দিরসীমানার বাহিরে প্রমত্ত আস্ফালন করিয়াছে, কিন্তু সেই সীমানার চতুষ্পার্শ্বস্থ অটল অবরোধ ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিতে সক্ষম হয় নাই।

ষোড়শী শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে অনন্য এই কারণে যে, দেহে ও মনে এরূপ পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও কঠোরতা অন্য কোন নারীচরিত্রে দেখা যায় নাই। সীতারামের স্ত্রী শ্রীকে লোকেরা যেমন সাক্ষাৎ চণ্ডী বলিয়া মনে করিয়াছিল, চণ্ডীগড়ের প্রজারাও ষোড়শীকে তেমনি মূর্তিমতী চণ্ডী বলিয়াই মনে করিত। শরৎসাহিত্যে কিরণময়ী, অভয়া, কমল প্রভৃতি বিদ্রোহিণী ও প্রবলব্যক্তিত্বশালিনী চরিত্র আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদের শক্তি ও দৃঢ়তা মানসিক ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত এবং ব্যক্তিসম্পর্কের মধ্যেই তাহাদের চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়াছে কিন্তু ষোড়শীর ব্যক্তিত্ব তাহার স্বাভাবিক নারীসত্তার সর্বপ্রকার স্নিগ্ধতা ও কোমলতাকে সজোরে অস্বীকার করিয়া উদ্ধত স্পর্ধায় যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তাহার চরিত্র সীমাবদ্ধ নহে, সমাজের একটি বৃহৎ জনশক্তির নেত্রীর স্থান লইয়া আর একটি প্রবল শক্তির সঙ্গে সে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, সেজন্য তাহার শক্তিও কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া এক রুক্ষ, আচারনিয়মনিয়ন্ত্রিত জীবনের পথেই অগ্রসর হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন নিষেধ ও বঞ্চনার খরতাপে তাহার নারী-হৃদয়ের সহজাত স্নেহকোমল বৃত্তিগুলি শুকাইয়া গিয়াছিল এবং তাহার দেহ ও মন এক অগ্নিদগ্ধ অঙ্গারখণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। সে প্রজাদিগকে জমিদারের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করিয়াছে, দুর্দান্ত জমিদারের প্রমোদগৃহে দৃপ্তপদে প্রবেশ করিয়াছে, এক জাঁদরেল ব্যারিস্টারকে অঙ্গুলী হেলনে চালিত করিয়াছে। কখনও ভয় তাহাকে বিচলিত করে নাই, দ্বিধা তাহাকে বিভ্রান্ত করে নাই এবং কোন মানসিক দুর্বলতা তাহাকে পথচ্যুত করে নাই।

সংসারের মধ্যে নিত্য কত অদ্ভুত ঘটনা মানুষের বিচারবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিবার জন্যই বুঝি অপেক্ষা করিয়া থাকে। ষোড়শীর জীবনের মধ্যেও এরূপ একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল যাহা তাহার অবলুপ্ত নারীসত্তাকে এক ধাক্কায় যেন জাগাইয়া দিল। যাহার প্রতি সুতীব্র ঘৃণা লইয়া সে আসিয়াছিল তাহার নিরুপায় রোগাক্রান্ত দেহের অসহায় করুণাভিক্ষায় তাহায় স্বাভাবিক করুণার উৎসপথে নির্বাসিত নারীসত্তার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটিল। মানুষের প্রকৃত সত্তা যে তাহার সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের দুর্ভেদ্য দুর্গের গোপন তলে লুক্কায়িত থাকে শরৎচন্দ্র ষোড়শী চরিত্রের মধ্যে তাহা দেখাইলেন। নিভৃত কক্ষে মৃত্যুপথযাত্রী জীবানন্দকে সেবাশুশ্রূষার দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিবার সময় তাহার অবদমিত নারীসত্তার অজ্ঞাত আনন্দ-শিহরন তাহার ভৈরবী জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হঠাৎ অকাল বসন্তের মত জাগিয়া উঠিল। জীবানন্দের দেহস্পর্শে এই যে রহস্যময় পরিবর্তন তাহার মধ্যে ঘটিল, ইহারই ফলে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে জীবানন্দের পক্ষে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ভৈরবী তাহার ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্রসাধনার শতপ্রকার ব্রতনিয়মের শাণিত শূলের দ্বারাও অলকাকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে পারে নাই। মদ্যপায়ী, লম্পট জমিদারটির মধ্যে যখন সে তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইল তখন তাহার ভিতরে সেই অলকাই আবার বহুদিন পরে বাঁচিয়া উঠিল। এই অলকাই তাহার স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য স্বামীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু এই সাক্ষ্যদানের ফলেই ষোড়শীর জীবনে যত অনর্থ ও বিপত্তি ঘনাইয়া আসিল।

ষোড়শী যখন জমিদারের বিলাসভবন হইতে বাহির হইয়া গেল তখন তাহার মধ্যে অনেকখানি পরিবর্তনই ঘটিয়া গিয়াছিল। তখন হইতে সে আর ষোড়শী মাত্র নহে। তাহার মধ্যে ষোড়শী আর অলকা এই দ্বৈতসত্তা বিরাজ করিতেছে। এই দ্বৈতসত্তার যে দ্বন্দ্ব সে অন্তরের মধ্যে নিরন্তর অনুভব করিয়াছে তাহার তুলনায় বাহিরের প্রবল বিরোধিতাও অনেক কম ক্লেশকর মনে হইয়াছে। হৈমর সুখসৌভাগ্যময় জীবন তাহার মনের তুষিত

কল্পনাকে উদ্বোধিত করিয়াছে। নিভৃত রাত্রির একক শয্যায় শুইয়া সে সংসারের গৃহিণী ও জননীর শতপ্রকার কাজের রোমাঞ্চিত কল্পনায় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনের যে সুখসৌভাগ্য তাহারও হইতে পারিত সে-সব হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া আজ তাহাকে নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বহিয়া চলিতে হইতেছে। ষোড়শীর মধ্যে নারীহৃদয়ের তৃষিত বাসনা-কামনার উদ্ভব হইলেও, সেই বাসনা-কামনা জীবানন্দের প্রতি সুগভীর প্রেম ও আত্মনিবেদনে কোথাও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। বরঞ্চ জীবানন্দের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধিতার মধ্যেই তাহার সত্তা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অত্যাচারিত প্রজাদিগকে সে জীবানন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছে। এমনকি এক বিস্মৃত মুহূর্তে সে জীবানন্দকে হত্যা করিবার জন্যও সাগরকে আদেশ করিযাছে। প্রকৃতপক্ষে এ-কথা মানিতেই হইবে যে, ষোড়শীর মধ্যে দ্বৈতসত্তার অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার অলকাসত্তার কোমলতা, বেদনা ও প্রেমের তীব্রতা কোথাও প্রাধান্য পায় নাই। জীবানন্দ যখন একাকী তাহার পর্ণকুটিরে যাইয়া করুণভাবে নিজেকে তাহার কাছে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছে তখনও ষোড়শীর অটল সংযমে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের স্পর্শ লাগে নাই। সে জীবানন্দকে যত্ন করিয়াছে, কিন্তু তাহার কাছে নিজের হৃদয়ের কোন গোপন দুর্বলতার ঈষৎ আভাসও দেয় নাই। জীবানন্দের মুখে অলকা ডাক শুনিয়া ষোড়শীর কিছুটা চিত্তচাঞ্চল্যের কথা লেখক বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া জীবানন্দ সম্পর্কে ষোড়শীর কোন অনুরাগজনিত আবেগ ও ভাবোচ্ছ্বাস উপন্যাসের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। চণ্ডীগড় হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে ফকির সাহেবকে লেখা জীবানন্দের চিঠি পড়িয়া সর্বপ্রথম ষোড়শীর কিছুটা চিত্তচাঞ্চল্য ধরা পড়িয়াছে। সেই চাঞ্চল্য জীবানন্দকে 'তুমি' সম্বোধন এবং তাহার বিবাহপ্রসঙ্গ-উত্থাপনের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জীবানন্দের প্রতি তাহার সুস্পষ্ট প্রেমের আবেগ পরিস্ফুট হয় নাই।

ষোড়শী যে শুধু বাহ্যশক্তির প্রবল তাড়নার ফলেই চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া গেল তাহা নহে, এ-যেন কিছুটা তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্ম-নির্বাসনও বটে। মন্দিরের ভৈরবীর স্বামীস্পর্শ করা নিষেধ এবং তাহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্যের ক্ষুরধার পথে চলিতে হয়, এ-সংস্কার ষোড়শীর রক্তবিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সে স্বামীকে স্পর্শ করিয়াছে এবং ভৈরবী-জীবনের

নিষিদ্ধ অনুভূতি তাহার অন্তরে স্থান পাইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া সে নিজেকে ব্রতচ্যুতা এবং ভৈরবীর কাজে অনুপযুক্তা ভাবিয়াছে। বাহিরের শক্তির সঙ্গে সে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম করিয়াছে, বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভৈরবীর পদ আঁকড়াইয়া থাকিবার মত যথেষ্ট শক্তি সে খুঁজিয়া পায় নাই। তাহার ধর্মসংস্কারের অঙ্কুশ-আঘাতে সে নিরন্তর জর্জরিত হইয়াছে। যে উৎসাহ ও আসক্তি ভৈরবীর কাজে সে আগে পাইত এখন সে-সব আর তাহার নাই। জীবনের বস হইতে বঞ্চিত হইয়া এই নিত্তনৈমিত্তিক শুষ্ককঠোব ধর্মীয অনুষ্ঠানপালনের মধ্যে সে আর শান্তি পাইতেছিল না। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। সেজন্য ফকির সাহেবের কুষ্ঠাশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়া সে যেন তাব দুঃসহ সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

শেষ পরিচ্ছেদে ষোড়শী ও জীবানন্দের সাক্ষাৎকারদৃশ্যে ষোড়শী-চরিত্রের যে পরিবর্তন আমবা লক্ষ্য করিলাম তাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। এ-যেন ষোড়শী নামধারী আর একটি চবিত্র জীবানন্দের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রজাবিদ্রোহের নাযিকা ষোড়শী এখন প্রজাদের দিয়া মোকদ্দমা প্রত্যাহাব কবিয়া লইতেছে, সকল কুকর্মের মাথা জনার্দন রায়কে বাঁচাইবার চেষ্টা কবিতেছে এবং জীবানন্দকে প্রজাসেবার ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইয়া যাওয়ার উদ্‌যোগ করিতেছে। যে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে একদিন ষোড়শী তাহাব অমিত শক্তি ও অপরিমিত উৎসাহ লইয়া যোগ দিয়াছিল সেখান হইতে সে যেন ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগের নিভৃত অন্তঃপুরে পলায়ন করিল। ইহাতে অলকার অন্তিম জয় ঘটিল বটে, কিন্তু ইহা যে ষোড়শীর শোচনীয় পরাজয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আসলে চণ্ডীগড়ের মন্দির হইতে ফকির সাহেবের কুষ্ঠাশ্রমে যাইবার পরেই যেমন তাহার ভিতরকার ভৈরবী-জীবনের সংস্কারের মৃত্যু ঘটিল, তেমনি প্রজা-সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার ফলে প্রজাদের প্রতি কর্তব্যবোধও যেন শিথিল হইয়া পড়িল। ফকির সাহেবের কুষ্ঠাশ্রমে থাকিবার সময় ষোড়শীর মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু ইহা অনুমান করা যায় যে, সেখানে ধীরে ধীরে তাহার মন হইতে ষোড়শীর সংস্কার অন্তর্হিত হইতেছিল এবং সেখানে অলকা তাহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিল।

সেই মানসিক পরিবর্তনের স্তর আমরা দেখি নাই বলিয়াই শেষ পরিচ্ছেদে তাহার পরিবর্তিত রূপ অসঙ্গত ও বিস্ময়কর বোধ হইয়াছে।

এই উপন্যাসের নায়ক জীবানন্দ যেন নীতিশাস্ত্রের সকল প্রকার বিধানেরই এক উদ্ধত প্রতিবাদ। সে মদ্যপায়ী, উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট ও উৎপীড়ক জমিদার। শরৎচন্দ্র জমিদারসমাজের এক বাস্তব ও বীভৎস প্রতিনিধিরূপে জীবানন্দকে খাড়া করিয়াছেন। এমন কোন দুষ্কৃতি নাই যাহা জীবানন্দ করে নাই, ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুইয়ের মতই সে নিত্যনূতন অত্যাচারে মজা ভোগ করিত। কিন্তু তাহার এই যে Sadism অথবা পরপীড়নবিলাস, ইহা আসিয়াছে জীবনের এক অনাসক্তি ও শূন্যতাবোধ হইতে। সে একক, নিঃসঙ্গ, নিরুদ্যম ও নিরালম্ব। নিজের জীবনের ব্যর্থতা ও অবসাদ সে নূতন স্নায়বিক উত্তেজনার দ্বারা ভরিয়া রাখিতে চাহে, মানবতার বিরুদ্ধে এক একটি অপরাধজনক কাজ করিয়া সে যেন নিজের বিবেক ও মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। অপরের জীবনের প্রতি তাহার যেমন দরদ নাই, নিজের জীবনের প্রতিও তেমনি তাহার কোন মমতা নাই। তাহার এই অনাসক্তি ও ঔদাসীন্যের জন্য তাহার চরিত্রে যেমন নির্লজ্জ সত্যভাষণের প্রবণতা দেখা যায়, তেমনি আবার এক অসঙ্কোচ ব্যঙ্গপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্যও লক্ষিত হয়। তাহার ব্যঙ্গ এত স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ যে সেই ব্যঙ্গবিদ্ধ ব্যক্তিগুলি আত্মগোপন করিবার পথ পায় না, আবার সেই ব্যঙ্গ তাহার নিজের প্রতিও অনেক সময় নিবদ্ধ থাকে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ করিবার ভাষাও খুঁজিয়া পায় না।

জীবানন্দের দুর্দান্ত ও ভয়াবহ রূপ উপন্যাসের সূচনাতেই যেরকম আমরা দেখিয়াছি সেরকম আর উপন্যাসের পরবর্তী অংশে দেখি নাই। তাহার জীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রমোদভবনের মধ্যে সে অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর এক ভগ্ন ও ভয়ঙ্কর প্রতিনিধিরূপেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নির্লজ্জ কথাবার্তা, নির্দয় অত্যাচারে তাহার প্রচণ্ড উল্লাস, চতুর্দিকে মারণাস্ত্রে বেষ্টিত হইয়া তাহার উচ্ছৃঙ্খল পানভোজন প্রভৃতি এই শ্রীহীন, পরিত্যক্ত বিলাস-অট্টালিকার মধ্যে এক সন্ত্রাসের বিভীষিকা রচনা করিয়াছিল। এই নীতি ও ধর্মজ্ঞানহীন পাষণ্ডের কাছে সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকিনী যখন ষোড়শী প্রবেশ করিল তখন মনে হইল যেন এক মাংসলোলুপ হিংস্র শ্বাপদের পিঞ্জরে একটি নিরীহ ও দুর্বল প্রাণী স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতেই

আসিল। ষোড়শী ও জীবানন্দের কথোপকথনের সময় একটি ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া যেন কয়েকটি তীব্র উত্তেজনাময় মুহূর্ত নিরুদ্ধ নিশ্বাসে আমাদিগকে যাপন করিতে হয়। কিন্তু আকস্মিক ব্যাধিতে জীবানন্দ আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আতঙ্কপীড়িত পরিবেশটি মুহূর্ত মধ্যেই পরিবর্তিত হইয়া গেল, নৃশংস শিকারী যেন এক অলক্ষ্য স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহারই পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত শিকারের কাছে লুটাইয়া পড়িল। ইহার পরে জীবানন্দের শক্তিমত্ত, অত্যাচারকঠিন রূপ আমরা আর দেখি নাই, ষোড়শী তাহার মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন দেহটিকে পুনরায় যে জীবনের আলোকে নিয়া আসিল শুধু তাহা নহে, সে তাহাকে হিংসালালসাকবলিত এক ভয়াবহ অন্ধকার গহ্বর হইতে এক স্নিগ্ধঅনুভূতিময় চেতনার নবপ্রত্যূষে জাগ্রত করিয়া দিল। ষোড়শীর সঞ্জীবনীস্পর্শ, তাহার অমৃতময় সেবাযত্ন জীবানন্দের ভিতরকার দৈত্যটিকে যেন এক ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় দূরীভূত করিয়া দিল এবং তখন বহুদিনকার বন্দী মানুষটি যেন তাহার সমগ্র সত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। হরণ ও হননে যাহার প্রমত্ত আসক্তি ছিল সেই এখন একবিন্দু জীবনরসের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া উঠিল, তাহার রিক্ত ও ক্ষতবিক্ষত জীবনটি অপরের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িল।

ইহার পরে জীবানন্দ চরিত্রটিকে দেখিয়া আর ঘৃণা ও আতঙ্ক হয় না, বরঞ্চ অনুকম্পা ও সহানুভূতিই উদ্রিক্ত হয়। জীবানন্দকে আর উদ্ধত, বেপরোয়া ও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দেখিতে পাই না, তাহার জীর্ণদেহ, আকণ্ঠ ঋণজালে জড়িত জীবন এবং স্নেহপ্রেমের আশায় কাতর চিত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি এক অপরিসীম করুণা বোধ না করিয়া পারি না। সে গ্রামের অন্যান্য প্রবল শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া ষোড়শীর বিরোধিতা করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই বিরোধিতায় তাহার যেন কোন আগ্রহ ও উৎসাহ নাই, সেই বিরোধিতার মূলে ষোড়শীর প্রেমলাভে তাহার ব্যর্থতার বেদনা ও অন্ধ অকারণ ঈর্ষার জ্বালাই ছিল ইহা অনুমান করা যায়। ষোড়শী ও জীবানন্দের সংঘাতের মধ্যে ষোড়শীর দিক হইতে যেমন তীব্রতা ও প্রবলতা ছিল, জীবানন্দের দিক হইতে তাহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। জীবানন্দ যেন ষোড়শীর রুক্ষকঠোর সত্তার মাঝে কোথাও একবিন্দু স্নেহ ও করুণার রস সঞ্চিত হইয়া আছে কিনা তাহাই সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

জীবানন্দ চরিত্রের আরও একটি পরিবর্তন ঘটিল সেদিন, যেদিন যোড়শী তাহার ভূমিজ প্রজাদের ভার জীবানন্দকেই সমর্পণ করিয়া গ্রাম হইতে বিদায় লইবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিল এবং তাহার সযত্নে রক্ষিত মন্দিরের সিন্ধুকের চাবী বিদায়ের আগে এই অর্থলোভী, ধর্মদ্রোহী জমিদারের হাতেই গুঁজিয়া দিল। জীবানন্দের প্রতি যোড়শীর এই একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা জীবানন্দের জীবন হইতে একটি কালো যবনিকা যেন অপসারিত করিয়া দিল। যে প্রজাপীড়নেই একমাত্র আনন্দ পাইত সেই এখন প্রজাদের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিল এবং যে মন্দিরেব ধনসম্পদের লুব্ধ আশায় ছিল, সেই এখন মন্দিরের ধনসম্পদরক্ষায় ব্রতী হইল। জীবানন্দচরিত্রের এই পরিবর্তিত শেষ পর্বে তাহাকে বড বেশি আদর্শায়িত ভালোমানুষরূপে দেখিতে পাই। সে মদ ছাড়িল। তাহাব বিশ্বস্ত সঙ্গী পিস্তলটিকে শত্রুজ্ঞানে ত্যাগ কবিল, সাধাবণ লোকেব সুখদুঃখের অংশীদার হইল এবং দরিদ্র কৃষকদেব সমস্যা প্রতিকাবে তাহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিল। তাহার এই অতিমাত্রায় আদর্শরঞ্জিত চরিত্র অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে এবং আদর্শবাদের দিকে শরৎচন্দ্রেব অতিরিক্ত প্রবণতাব জন্য কেহ কেহ তাঁহার সমালোচনাও কবিতে পারেন, কিন্তু জীবানন্দেব এই আদর্শায়িত পরিবর্তন যে যোড়শীর অপ্রত্যাশিত বিশ্বাস ও নির্ভরতার ফলেই ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখ কবা প্রয়োজন।

চণ্ডীগড হইতে যোড়শীব বিদায় লইয়া যাইবার দিন জীবানন্দ তাহার শতপ্রকাব অনুনয় বিনয ও কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও যোড়শীকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। যোড়শীর প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে জীবানন্দের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বার বার পরাজিত হইয়াছে। এই শেষবারেও জীবানন্দেব পরাজয় ঘটিল। সে অলকাকে পাইবার জন্য তাহার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল কিন্তু তবুও সে অলকাকে পাইল না। সে উত্তেজিতভাবে তাহার হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিল, 'এখানে আমি বাঁচতে চাই, মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই।' কিন্তু তাহার এই প্রবল জীবনতৃষ্ণা আর মিটিল না। যোড়শী চলিয়া গেল আর তাহার শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ধু-ধু করা প্রান্তরের মধ্যে নিষ্ফল হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ষোড়শী চলিয়া যাইবার পরে জীবানন্দ চরিত্র সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক কৌতূহল আর তেমন থাকে না। সে সমাজসংস্কারে মন দিল, প্রজাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই কর্মব্যস্ত জীবনের অন্তরালে তাহার শূন্য ও অতৃপ্ত অন্তর-সত্তাটি কিভাবে ষোড়শীবিহীন দিনগুলি কাটাইতেছিল তাহার পরিচয় আমরা পাই নাই। জীবানন্দ অবশেষে ষোড়শীর চিরসান্নিধ্য লাভ করিল। যাহাকে পাইবার জন্য সে সর্বস্ব পণ করিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিল সে যেন হঠাৎ আসিয়া সবটুকু দিয়া তাহাকে ধরা দিল। এ-ঘটনা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মনে হইতে পারে, তবে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, জীবানন্দ ষোড়শী চলিয়া যাইবার পরে একব্রত সাধকের মত ষোড়শীর অভিপ্রেত কাজ করিয়া পূর্ব অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সে হয়তো ষোড়শীর অকুণ্ঠ প্রেমলাভের যোগ্য হইয়া উঠিল।

'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি ইহার গঠনকৌশলের শিথিলতা। মূল কাহিনীর সঙ্গে নির্মল-হৈমবতীর আখ্যানের কোন অনিবার্য যোগ উপন্যাসে দেখা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে নির্মল-হৈমবতীর উপকাহিনী উপন্যাসের মধ্যে অতিরিক্ত স্থান জুড়িয়া উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। নির্মল-হৈমবতীর পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে এমন কোন গুরুতর সমস্যা এবং রসগভীরতা দেখা যায় নাই যাহাতে এই কাহিনীটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করিতে পারে। নির্মলের সঙ্গে ষোড়শীর সম্পর্কের কথা উপন্যাসের মধ্যে অনাবশ্যক প্রাধান্য পাইয়াছে। ষোড়শীর হাস্যপরিহাস, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা এবং সাহায্যপ্রার্থনা প্রভৃতি নির্মলের গোপন অন্তরে নিষিদ্ধ আসক্তির বীজ বপন করিয়াছে এবং ষোড়শীকে সাহায্য করিবার জন্য সে যে এতখানি আয়াস স্বীকার করিয়াছে তাহা নিছক পরোপকারবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত নহে, তাহার পিছনে লুব্ধ কামনার দুর্নিবার তাড়নাও ছিল। ষোড়শী যে তাহার সহিত নিছক ঠাট্টাতামাসা করিয়াছে, তাহার অন্তরস্থ কোন দুঃখজনক সমস্যা যে নির্মলের প্রতিকারের বাহিরে তাহা এই ব্যারিস্টার সাহেব বুঝিতে পারেন নাই। বৃথাই তিনি কেবল ছুটাছুটি করিয়া ষোড়শীর কাছে এবং সম্ভবত শেষকালে নিজের কাছেও হাস্যাস্পদ হইয়াছে।[১] ষোড়শী ও নির্মলের

১। 'ব্যারিস্টার সাহেবের এই অর্থহীন অনাবশ্যক চেষ্টা কাহিনীর একমাত্র কমেডি।'
শরৎচন্দ্র—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ঘন ঘন সাক্ষাৎকার জীবানন্দের মনে কিছুটা ঈর্ষা উদ্রেক করা ছাড়া উপন্যাসের আর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে নাই, বরঞ্চ এই সব সাক্ষাৎকারের দীর্ঘ বিবরণ পাঠকের কাছে শুধু কেবল নীরস ও ক্লান্তিকরই মনে হইয়াছে। এই উপন্যাসের আর একটি অপ্রয়োজনীয় চরিত্র হইল ফকির সাহেব। ফকির সাহেবকে উপন্যাসের মধ্যে এতখানি প্রাধান্য কেন দেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার চরিত্র একটু রহস্যময় রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সেই চরিত্রে দেখা যায় নাই, ষোড়শীর উপরেও যে তিনি কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন তাহাও মনে হয় না।

ষোড়শী চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই উপন্যাসের প্রকৃত রসসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার পরবর্তী অংশ একটু অকারণ টানা হইয়াছে মাত্র। ফকির সাহেবের কুষ্ঠাশ্রমে ষোড়শীর যোগ দেওয়াও একটা আকস্মিক ঘটনা। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে ষোড়শীর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ এবং হঠাৎ আসিয়া নিমেষের মধ্যে জীবানন্দকে লইয়া তাহার আবার চলিয়া যাওয়া আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে যেন একটু রূঢ়ভাবে আঘাত করে।

দেশবাসীকে শরৎচন্দ্র যে অমূল্য সাহিত্যসম্পদ দান করিয়াছিলেন সেজন্য কৃতজ্ঞ দেশবাসিগণ তাঁহাকে নানা স্থানে প্রকাশ্য অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা জানাইতে শুরু করিল। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখা তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিল। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি বক্তা নই। কিছু বলতে আমি আদপেই পারিনে। ঘরে ব'সে কাগজকলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি একমত ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যসেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে করতে পারচি নে।......

'এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। সিডিশন ( Sedition ) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে,

ধর্মে, সামাজিক আচারব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা-গুটানো আর থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার সাহিত্যসৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।'

উপরিউক্ত ভাষণ হইতে বুঝা যায়, শরৎচন্দ্র সে-সময় অবিচ্ছিন্ন সাহিত্য-সাধনায় আর নিজেকে নিরত রাখিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার চিত্তে রাজনৈতিক চেতনা অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া ছিল।

শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। নজরুল এই সময়ে হুগলীজেলে অনশন শুরু করিয়াছিলেন। অনশন হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি ১৯২৩ সালের ৭ই মে তারিখে একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, 'হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়িতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া আর বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।'

১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্যসভায় তিনি যে ভাষণ দেন তাহা পরে 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আদর্শগত পার্থক্য কোথায় তাহাই তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে, মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।'

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের অসামান্য দানের কথা বিবেচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক' দিয়া সম্মানিত করেন। ১৩৩০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' এই সংবাদটি এ-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, 'অতি সুসংবাদ। আমাদের শ্রীমান শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় এবার জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন।...সর্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করায় স্বর্ণপদকেরই সম্মানবৃদ্ধি হইল।'

ধর্ম ও আচরণের সর্বপ্রকার অতিশয্যই শরৎচন্দ্রের চোখে বিসদৃশ ও নিন্দনীয় ছিল। স্বধর্মদ্রোহিতা ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহার যেমন তিনি পছন্দ করিতেন না, তেমনি ধর্ম লইয়া অসঙ্গত বাড়াবাড়ি এবং বাহ্য ভেক ও ভড়ং-এর আতিশয্যও তিনি সমর্থন করিতেন না। শান্ত ও সংযত ভাবে স্বধর্ম আচরণই তাঁহার বিশেষ মনঃপূত ছিল। 'নববিধান' উপন্যাসের শৈলেশ ও বিভার বিজাতীয় রুচি ও পছন্দ এবং কৃত্রিম পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহারের অনুকরণপ্রচেষ্টার হাস্যকর অসঙ্গতি লেখক যেমন দেখাইয়াছেন, তেমনি শৈলেশের পরবর্তী কালের অতিরিক্ত ধর্মমাদকতা এবং বাহ্য ধর্মাচরণের বিকৃত আতিশয্যও তিনি বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছেন। উষাই এই চতুর্দিকব্যাপী মূঢ়তা ও মাদকতার মধ্যে যে নববিধান প্রবর্তন করিয়াছিল তাহাই সম্ভবত লেখকের মনঃপূত। এই নববিধানে ধর্মনিষ্ঠা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বিকৃত ধর্মমত্ততা কোন স্থান পায় নাই, ইহাতে আচার-আচরণে শুদ্ধি ও সংযম আছে, কিন্তু কৃত্রিম বিধির অন্ধ অনুবর্তন ও শুচিতার বিসদৃশ বাতিক নাই।

'নববিধানে'র কাহিনীর গ্রন্থি শিথিল এবং চরিত্রগুলিও অবিকশিত। শৈলেশ উষার প্রতি পূর্বে যে মনোভাবই পোষণ করুক না কেন, উষা তাহার সংসারে আসিবার পর তাহার আদরযত্নে উভয়ের সম্পর্ক বেশ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। বিভার সামান্য কথায় স্বামীস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নিমেষের মধ্যেই ফাটল ধরিয়া গেল এবং উষা স্বামীগৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া বসিল। ইহা অবিশ্বাস্য মনে হয়। শৈলেশও বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহার পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বভাব একেবারে ত্যাগ করিয়া কিভাবে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে মাতিয়া উঠিল তাহাও রহস্যময় মনে হয়। আবার শেষকালে উষাও কিভাবে সব সংবাদ পাইয়া, নিজের সকল মান অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বামীর সংসারে ফিরিয়া আসিল তাহাও অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। উপন্যাসের ঘটনার পিছনে যে অনিবার্য কারণপরম্পরা দেখান দরকার এই উপন্যাসের মধ্যে সে-সম্বন্ধে লেখকের দৃষ্টি যেন শিথিল।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যেও হৃদয়াবেগের কোন সুস্পষ্ট রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উষার হৃদয় এত শান্ত, সংযত ও সমাহিত যে সেখানে

ভাবাবেগের সামান্যতম কম্পনও কোথাও লক্ষিত হয় না। সে স্বামীর পরিত্যক্তা স্ত্রীরূপে দাদার সংসারে বাস করিতেছিল, স্বামীর সংসারে আকাঙ্ক্ষিত কর্ত্রীর আসন সে লাভ করিল, আবার সেই সংসার তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইল, এবং অবশেষে পুনরায় সে নিজের আসনে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই আসাযাওয়ার ফলে তাহার হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি, মান-অভিমান, ও বেদনাহতাশার কোন অনুভূতির মধ্যে কি আলোড়ন জাগে নাই? সে যেন সদা অবিচলিত চিত্তে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে। স্বামীর কাছে আসিয়াও তাহার উল্লাস নাই, স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতেও তাহার কোন বেদনা নাই, নিতান্ত যান্ত্রিক নিয়মেই যেন সে সব কিছু করিয়া যাইতেছে। শৈলেশের হৃদযভাবও অদ্ভুত। উষার সেবাযত্নচালিত সকল ব্যবস্থায় সে বেশ নিশ্চিন্ত মনে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সেই উষা যখন সংসার ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন সে বিন্দুমাত্র বাধা দিল না। মান-অভিমানমিশ্রিত কোন বোঝাপড়ার দৃশ্য তাহাদের মধ্যে ঘটিল না, সব কিছুই যেন খুব শান্ত ও নির্বিঘ্নভাবে ঘটিয়া গেল। এই ধরনের নিষ্ক্রিয় ও পৌরুষহীন ব্যক্তি সংসারের কোন অনর্থ রোধ করিতে পারে না। শৈলেশও পারে নাই। সে নামজাদা কলেজের বিলাতী ডিগ্রীধারী অধ্যাপক হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির স্থিরতা ও মানসিক দৃঢ়তা বলিতে তাহার কিছুই ছিল না।

১২৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা পরে 'সাহিত্য ও নীতি' এইনামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষণেও বঙ্কিমসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য যে সুনীতি ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে সে-মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'সুনীতিদুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতিপুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয়, এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে। কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি আধুনিক

সাহিত্যের পক্ষে জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। আধুনিক সাহিত্যিকগণ, যে সমাজকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, নারীজীবনের মূল্যবোধ যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে ইহাই তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কু-সংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পড়া-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপাকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে। এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই Propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্যসাধনার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না, কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ-সত্যও অস্বীকার করা যায় না।'

মুন্সীগঞ্জে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হয় তাহাতে ইতিহাসশাখায় সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। এই সম্মেলন উপলক্ষেই ডঃ মজুমদারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। ডঃ মজুমদারের আমন্ত্রণে শরৎচন্দ্র তাঁহার ঢাকার বাড়িতে গিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র সেখানে কিভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিয়া রমেশবাবু লিখিয়াছেন, 'আমার বাটীর মধ্যে একটি পুকুর ছিল। তাহার বাঁধান ঘাটের উপর দুই রোয়াকে বসিয়া আমাদের মজলিস চলিত। ……ঘাটের মজলিসে তিনি আসর জমাইয়া বসিতেন, আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত এবং ঘন ঘন হুঁকার কলিকা বদলি হইত।' (শরৎ-স্মরণিকা)

শরৎচন্দ্র রমেশবাবুর ঢাকার বাড়িতে গেলেও সম্ভবত তাঁহার থাকিবার প্রধান স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। কারণ শিবপুরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি

১৩৩২ সালের ৪ঠা বৈশাখ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'কি যত্নটাই তোমরা আমাকে করেছ। জীবনে এই দিনগুলোই শুধু মনে থাকে।…… তোমার গৃহিণী কিরকম করেই যে আমাদের সকল দিকে নজর রেখেছিলেন আমি তাই এখানে এসে গল্প করছি।

ডাক্তার রমেশ ও তোমার রমেশদিদি বোধ হয় চলে গেছেন। সবাই মিলে কত আদরই আমাকে করলে। ইচ্ছে ছিল তাঁহাদের একটা চিঠি লিখি। কিন্তু সে চিঠি কি আর পৌঁছবে। আর একবার ঢাকায় যেতেই হবে।'

উপরিউক্ত চিঠির ভাষা হইতে মনে হয়, রমেশচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী চারুচন্দ্রের বাড়িতেই ছিলেন[1] এবং তাঁহারা সকলে মিলিয়া শরৎচন্দ্রকে প্রচুর আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কিছুদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় কুকুর ভেলুর মৃত্যু ঘটিল এবং এই মৃত্যুতে তিনি শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল একটি পত্রে তিনি লিখেন, 'আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এত বড় ব্যাপারও যে আছে এ-আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয় তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিস টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে Objective কিছুই নয়, Subjective-টাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বই ত নয়। রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যা নয়।'

শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিন্নহৃদয় আত্মীয়-বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ২৮.৪.২৫ তারিখে ভেলুর কথা অপ্রাসঙ্গিক ভাষায় জানাইয়াছিলেন, 'বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা করেও ওষুধ তার পেটে গেল না, কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে, সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোরবেলায় সে কান্না তার থামলো।

১। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে শুনিয়াছি, শরৎচন্দ্র চারুচন্দ্রের বাড়িতে উঠিলেও দিনের অনেকখানি সময়, বিশেষত রাত্রির দিকে রমেশচন্দ্রের বাড়িতেই আড্ডা জমাইতেন।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কামড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগলো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা। তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্বে এত ব্যথা আমি আর পাইনি।'

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতা গ্রামে তাঁহার নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করেন। এই বাড়ি করিবার পরিকল্পনা কয়েক বৎসর আগেই তাঁহার মনে আসিয়াছিল। ১৩২৫ সালের ২১শে চৈত্র তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'অনেকদিন থেকে রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা মাটির বাড়ী করবার চেষ্টা করছি। খবর পেলাম আজই গেলে যা হোক একটা কিছু হয়। জমিটার দাম ১১০০৲ টাকা। এত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে বার করতে আমার ভারি মায়া হচ্ছে। তা ছাড়া বাড়ী করার খরচটাও বেশী থাকবে না। আপনার কাছে নিবেদন যে, সেদিনের টাকা থেকে নিজে ৭০০৲ টাকা দিই। আর আপনি যদি ধার দেন ৪০০৲ তাহলে সুন্দর সুবিধে হয়।'

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের আগেই বাড়ির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। ৩।৫।২৩ তারিখে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'কয়দিন হইল আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কে যথাসর্বস্ব ছিল, ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হওয়ায় সমস্তই বোধ হয় গেল। বাড়িটা শেষ হয় নাই। পুকুর শেষ হয় নাই, ভাবিয়াছিলাম এ বছর কিছুই আর ফেলিয়া রাখিব না, সমস্ত শেষ করিব। কিন্তু পুঁজি নিঃশেষ হওয়ায় সবই স্থগিত রহিল।'

শরৎচন্দ্রের পৈতৃক দেবানন্দপুরের বাড়ি পুনরুদ্ধারের কোন আশা ছিল না বলিয়াই সম্ভবত তিনি সামতায় নূতন বাড়ি তৈরী করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলাদেবীদের বাড়ি ছিল হাওড়া জিলার বাগনান থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। সামতা গ্রামটি গোবিন্দপুরের সংলগ্ন। দিদির বাড়ির কাছাকাছি থাকিতে পারিবেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি সামতায় বাড়ি করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাড়িটি একপ্রান্তে বা বেড়ে অবস্থিত, সেজন্য তিনি এই জায়গাটির নাম দিয়াছিলেন সামতাবেড়। সামতাবেড়ের বাড়ি, পুকুর প্রভৃতি তৈরী করিতে প্রায় 'বারো

হাজার টাকা পড়িয়াছিল। বাড়িটি মাটির হইলেও দোতলা এবং ইহার একতলা ও দোতলার মেঝে সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো। ইহার চারপাশ ঢাকা-বারান্দায় ঘেরা এবং উপরে টালির ছাউনি। বাড়িটি অনেকখানি ব্রহ্মদেশীয় বাড়ির ধাঁচে তৈরী। শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়িতে সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের মতই বাস করিতেন। তাঁহার কিছু ধানী-জমি ছিল এবং সেই জমির ধানে বছরের খোরাকের প্রয়োজন মিটিয়া যাইত। তাঁহার পুকুরে মাছও ছিল প্রচুর এবং তরিতরকারী ও দুধেরও কোন অভাব ছিল না। কলিকাতা হইতে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগী ভক্ত যাঁহারাই যাইতেন তাঁহাদিগকেই তিনি প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়া তবে ছাড়িতেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ 'হরিলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয়। 'হরিলক্ষ্মী'র মধ্যে হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ এই তিনটি গল্প রহিয়াছে। হরিলক্ষ্মী ১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে এবং মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। 'হরিলক্ষ্মী' গল্পটির মধ্যে হরিলক্ষ্মী ও মেজ বৌ কমলার একটি সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনাই মুখ্য হইয়াছে। এ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে, স্ফীত অহঙ্কার ও শান্ত আত্মমর্যাদার মধ্যে, নিষ্ঠুর পীড়ন এবং নীরব প্রতিরোধের মধ্যে। হরিলক্ষ্মী কমলাকে ভালোবাসিয়াছিল, এবং সেই ভালোবাসার দাবীতেই সে কমলার স্নেহ ও সান্নিধ্য একটু বেশী পরিমাণেই কামনা করিয়াছিল। কিন্তু কমলার হৃদয় হরিলক্ষ্মীর প্রবল ভালোবাসায় আশানুরূপ সাড়া না দেওয়ায় তাহার ভালোবাসা অবারণ অভিমান ও প্রতিশোধ-স্পৃহায় রূপান্তরিত হইল। তবে তাহার বর্বর স্বামী মেজ-বৌকে জব্দ করিবার জন্ত একটির পর একটি যে সব অমানুষী কাণ্ড করিয়া যাইতে লাগিলেন সে সবের প্রতি তাহার কোন সমর্থনও ছিল না। কিন্তু নীচ ও নির্দয় স্বামীকে তাহার অত্যাচার থামাইবার জন্ত অনুরোধ জানাইতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেজন্ত একটির পর একটি অন্তায় ব্যাপার ঘটিয়া যাইতে লাগিল। আর হরিলক্ষ্মী কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া শুধু কেবল নীরব আত্মযন্ত্রণায় জলিয়া যাইতে লাগিল। হরিলক্ষ্মীর একটি মুখের কথাতেই যখন সকল অত্যাচার প্রশমিত হইতে পারিত তখন সে নীরব থাকিয়া কেন তাহার অবাঞ্ছিত অত্যাচারগুলি ঘটিতে দিল সে-প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। তাহার নীরব অভিমান, স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক

অশ্রদ্ধা ও প্রতিকার সম্বন্ধে একপ্রকার নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের ফলেই বোধ হয় এরূপ ঘটিয়াছিল। অবশ্য শেষকালে সে নিজের ঔদাসীন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া কমলাকে সাদরে কাছে টানিয়া লইল, কিন্তু অপমান ও লাঞ্ছনাক্ষত কমলার জীবনে তখন কিই বা আর বাকি ছিল।

কমলা চরিত্রটিকে লেখক একটু রহস্যময়তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। হরিলক্ষ্মীর স্বামী যত নীচ ও নিষ্ঠুরই হউক না কেন, হরিলক্ষ্মীর স্নেহে ত কোন খাদ ছিল না। তবে কমলা হরিলক্ষ্মীর স্নেহের বাঁধনে ধরা দিল না কেন? হরিলক্ষ্মী ধনীর সৌভাগ্যবতী গৃহিণী ছিল বলিয়াই কি কমলার বাহ্য বিনীত ও শান্ত ব্যবহারের তলায় একটি নীরব প্রতিবাদ ছিল, সেজন্যই কি ইচ্ছা করিয়াই হরিলক্ষ্মীর সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে সে চাহে নাই? হরিলক্ষ্মী যখন নির্দোষ স্নেহের আবেগেই তাহার পুত্রের গলায় হার পরাইয়া দিয়াছিল তখন কমলা তাহা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া হরিলক্ষ্মীকে যে অপমান করিয়াছে তাহাও সত্য। হরিলক্ষ্মীর যদি একটু ঐশ্বর্যের অহঙ্কার থাকে কমলারও যে দারিদ্র্যের একপ্রকার অতিশয়িত অহঙ্কার ছিল তাহাও সত্য। তবে স্বল্পপরিসরের মধ্যে তাহার শিক্ষা, রুচি, সৌজন্য ও তেজস্বিতার যে চিত্রটি ফুটিয়াছে তাহা আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লেখার সময় জাতীয় আবেগে উদ্দীপিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় কমলার হাতে বোনা তিলকমহারাজের প্রতিকৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় তিলক মহারাজের কাছ হইতেই কমলা চারিত্রিক দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার প্রেরণা পাইয়াছিল। কিন্তু সংসারে কাহারও ক্ষতি না করিলেও আঘাত সহিতে হয়, কোন অন্যায় না করিলেও শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ইহাই সংসারের বিধান। সেই বিধানের ফলেই কমলাকে তাহার নামের পরিহাস সহ্য করিয়া তাহারই সর্বনাশকারীর গৃহে রাঁধুনীর কাজ নিতে হইল।

'মহেশ' শরৎচন্দ্রের একটি বহু-প্রশংসিত অনবদ্য ছোট গল্প।[১] মহেশ গল্পটির মর্মস্পর্শী আবেদনের মূলে রহিয়াছে মানুষের সহিত অবোধ গৃহপালিত প্রাণীর এক সুনিবিড় স্নেহ-করুণ সম্পর্করস। গ্রাম্যজীবনে মানুষের সহিত তরুলতা, পশুপাখীর সুগভীর স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠে। পশুপাখীর মধ্যেও যে মানবীয় চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে,

১। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'পৃথিবীর সাহিত্যে খুব কম ছোট গল্পেরই নাম করা যায় যাহার মধ্যে অনুরূপ বিস্তৃতি ও নিবিড়তা আছে।'

মানুষের মতই যে তাহারা ভালোবাসিতে ও ভালোবাসা অনুভব করিতে জানে তাহা তাহাদের আচরণ এবং নানা প্রকার বোবা আবেগের অভিব্যক্তি হইতে বুঝা যায়। যেদিন গফুর ফুলবেড়ের চটকলের কাজে ভর্তি হইল সেদিন হইতে বহু মানুষের কোলাহলমুখর সান্নিধ্যের মধ্যে তাহার অতীত জীবনের পশুপ্রীতিজাত যে রসটুকু সে হারাইয়া ফেলিল তাহা আর কোনদিন অনুভব করিতে পারে নাই। গফুরের মত আমরাও অনেকে গ্রাম্য-জীবন হইতে নির্বাসিত হইবার পর মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর শান্ত স্নেহলীলার মাধুর্য হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছি।

শরৎচন্দ্র যে সময়ে 'মহেশ' গল্পটি লিখিয়াছিলেন তখন সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁহার মনকে বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল। কৃষকের সমস্যার এক অগ্নিদীপ্ত রূপ আমরা দেখিয়াছি 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে। এই গল্পটিতেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অত্যাচারপীড়িত কৃষক সমাজের এক বাস্তব ও মর্মান্তিক চিত্র দেখিতে পাইলাম। গফুর কৃষক সমাজের খাঁটি প্রতিনিধি। তাহার চালে খড় নাই, মাটির দেওয়াল ভাঙিয়া পড়িতেছে, নিজের ও মেয়ের মুখে দু'বেলা দুইটি অন্ন দিবার সংস্থান তাহার নাই। ইহার পর আছে জমিদার ও উচ্চবর্ণ সমাজের কাছে নিত্য নিত্য অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলদটিকে সে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে না, নিজের ভাতের থালাটি তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরে। কিন্তু তাহার এই স্নেহমমতার সঙ্গে তাহার যে হিংস্র, গোঁয়ার ও অন্ধপ্রবৃত্তিময় কৃষক সত্তাটি মিশিয়াছিল তাহারই আকস্মিক প্রকাশ দেখা গেল মহেশকে নিষ্ঠুর আঘাত করার মধ্যে। কৃষক যে তাহার খেতখামার, ভিটামাটি ছাড়িয়া কারখানার শ্বাসরোধকারী জাঁতাকলের মধ্যে কেন ধরা দেয় শরৎচন্দ্র তাহা এই গল্পটির মধ্যে সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন।

'অভাগীর স্বর্গ' আর একটি নিখুঁত ছোট গল্প। এই গল্পটির মধ্যে দুলে সমাজের একটি করুণ কাহিনী লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। জমিদার ও তাহার কর্মচারীদের নিষ্ঠুর শোষণ ও পীড়নের চিত্র এই গল্পটিতেও তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অভাগী শুধু চাহিয়াছিল মরিবার পর ছেলের হাতের একটু আগুন। এই সামান্যতম একটি ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল না হৃদয়হীন সমাজের নৃশংস প্রতিকূলতার জন্য। দুর্বল, নিঃস্ব ও ঘৃণিত শ্রেণীর মানুষের নিজের কুটির-প্রাঙ্গণের গাছ কাটিবার অধিকার নাই, করুণ আবেদনের

বিনিময়ে তাহাকে পাইতে হয় নিষ্ঠুর গলাধাক্কা এবং দয়াভিক্ষা করিয়া লাভ করিতে হয় মর্মান্তিক অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের আঘাত। শরৎচন্দ্র এই গল্পের মধ্যে নির্যাতিত নিম্নসমাজ এবং বলোদ্ধত, অত্যাচারী উচ্চ সমাজের দুইটি রূপ পাশাপাশি রাখিয়া বৈপরীত্যের আঘাত দিয়া নিম্নশ্রেণীর মানুষের বেদনা ও অসহায়তা যেমন অতিশয়িত করুণরসাশ্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর মানুষের নির্দয়তা ও হৃদয়হীনতাও তেমনি অসহনীয় কঠোরতার স্তরে লইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের সমাজে একদিকে উচ্চবিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারের স্ত্রী মারা গেলে জাঁকজমক, আড়ম্বর ও উৎসবের বন্যা বহিয়া যায় এবং অন্যদিকে ভাগ্যহীন, ধনবঞ্চিত পরিবারের কোন নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাকে দাহ কবিবার কয়েকখানি কাঠও জোটে না। মানুষ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইয়াও কতখানি মনুষ্যত্বহীন হইতে পারে তাহা কবিরাজ মহাশয়, অধর রায়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভট্টাচার্য মহাশয় প্রভৃতিব চরিত্র হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই উচ্চ সমাজেব পাশে লেখক আর একটি সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, যেখানকার মানুষ দবিদ্র ও ভাগ্যবঞ্চিত হইয়াও মনুষ্যত্বের দুর্লভ সম্পদে সমৃদ্ধ। সেই সমাজে অভাগীর মত স্নেহশীলা ও পতিব্রতা নারী বাহিরেব স্বীকৃতি ও সম্মান হইতে দূরে থাকিয়াও তাহা চারপাশে এক পবিত্র স্বর্গের ছবি উজ্জ্বল করিয়া রাখে। সেখানে নিরুপায় ও নিঃসহায় প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ স্নেহ ও সহানুভূতি লইয়া পরস্পরের উপকারে আগাইয়া আসে এবং অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া করুণ কাতর মিনতিতে লুটাইয়া পড়ে।

অভাগীর স্বর্গপ্রাপ্তির (অথবা অপ্রাপ্তি) ঘটনা অবলম্বনেই গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। গল্পটির প্রথম অংশে সেই স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা কিভাবে অভাগীর মনে প্রবেশ করিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণীর সাড়ম্বর শবশোভাযাত্রার দৃশ্য দেখিবার ফলেই অভাগীর গোপন মনে এই কামনা এক বিচিত্র রোমাঞ্চিত অনুভূতির সঙ্গে স্থান লাভ করিল। মাথায় সিঁদুর ও পায়ে আলতা মাখিয়া যে ভাগ্যবতী নারী পুত্রের হাতে আগুন লাভ করিবার জন্য শ্মশানের পথে জয়যাত্রায় চলিয়াছে ইন্দ্রের রথ যে তাহাকে স্বর্গ হইতে লইতে আসিবে, এ-বিশ্বাস অভাগীর সংস্কারাচ্ছন্ন মনে দৃঢ়বদ্ধমূল ছিল। সেজন্য তাহার উত্তেজিত কল্পনাদৃষ্টিতে ইন্দ্রের অদৃশ্য রথটি প্রত্যক্ষ

হইয়া উঠিয়াছিল। অভাগীর স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, পুত্র কাঙালীচরণও বড় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহকালের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে। পরকালে স্বর্গলাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অভাগী ভাবিল, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণীর মত সেও তো স্বামী-পুত্রবতী, তিনি যখন স্বর্গে যাইতেছেন তখন তাহারও তো স্বর্গে যাইবার আশা রহিয়াছে। এক মুহূর্তেই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণীব সহিত নিজেকে সে একাত্ম করিয়া ফেলিল। কিন্তু স্বর্গে যাইতে হইলে আগে মরিতে হইবে। সুতরাং, অভাগীর জীবনে মরিবার উদ্‌যোগ-আয়োজনই গল্পের দ্বিতীয় অংশে দেখা গিয়াছে। শ্মশান হইতে ফিরিবার পর অভাগী আর সে অভাগী রহিল না। তাহার দেহটি মর্ত্যের মাটিতে পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার মন কাল্পনিক স্বর্গের রঙে রসে একেবারে মজিয়া রহিল। কিভাবে স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহিণীব মতই মাথায় সিঁদুর পায়ে আলতা মাখিয়া শ্মশানের দিকে যাত্রা কবিবে এবং তাহার অতি আদরের পুত্রের হাতে আগুনের পরশ লইয়া স্বর্গের পথে রওনা হইবে, সেই রোমাঞ্চিত কল্পনাই তাহার সমগ্র সত্তা জুড়িয়া রহিল। তাহার অসুখ হইল। এ অসুখ তাহার একান্ত ঈপ্সিত, ইহা মর্ত্য হইতে স্বর্গে যাইবার পরম কাঙ্ক্ষিত উপায়। গল্পটির তৃতীয় ও শেষ অংশে অভাগীর স্বর্গপ্রাপ্তি অথবা অপ্রাপ্তির ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। অভাগী যেভাবে স্বর্গে যাইতে চাহিয়াছিল তাহা তাহার ভাগ্যে জুটিল না, ছেলের হাতের আগুন সে পাইল না। শরৎচন্দ্র দেখাইলেন, হৃদয়হীন সমাজের নিষ্ঠুর প্রতিকূলতায় সমাজের একটি সাধ্বী, পুণ্যবতী নারীর সামান্যতম ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হইল না। স্বর্গে যাইবার সকল পথ বোধ হয় তাহার মত ভাগ্যহীনা নারীর পক্ষে অবরুদ্ধ। কিন্তু গল্পের শেষে আর একটি ইঙ্গিত আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গ বলিয়া যদি কোন জায়গা থাকে এবং সেখানে যদি ধর্মপ্রাণা পুণ্যবতী নারীদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে অভাগীর নিশ্চয়ই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। ছেলের হাতের আগুন সে পায় নাই, যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাহার সম্পন্ন হয় নাই, তাহাতে কি যায় আসে? যিনি স্বর্গের প্রকৃত অধিপতি তিনি তাঁহার পরম আদরের স্থানটি নিশ্চয়ই অভাগীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

## সামতাবেড়ে বাস—পথের দাবী

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস শুরু করিলেন। স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি গ্রামের বাড়িতে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী হরিদাস শাস্ত্রীকে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার যথাপূর্বং। যদি না ঢের বেশী বেড়ে গিয়ে থাকে। Constipation আমাকে নিয়ে তবে যাবে এইটেই অবশেষে স্থির হয়েছে—যাক, একটা কিছু এতদিনে বোঝা গেছে। অথচ দেশে গিয়ে জলবায়ুর গুণেই হোক বা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি বলেই হোক-এ রোগটা ঢের কম থাকে। অতএব শেষ চেষ্টার জন্য সপরিবারে শিবপুর ছেড়ে রূপনারায়ণ নদের তীরেই বছর খানেক বাস করব ঠিক করেছি। খুব সম্ভব, এই ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই সকলে চলে যাব।'

শিবপুর হইতে গ্রামের বাড়িতে চলিয়া যাইবার ফলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক সমাজ হইতে একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শহরে বহুবিচিত্র লোকের সংস্পর্শে থাকিবার পরে গ্রামের শান্ত ও লোকবিরল নির্জনতার মধ্যে তিনি নিজেকে নিমগ্ন করিয়া রাখিলেন। বাং ১৩৩৩ সালের ৮ই বৈশাখ তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'কিছুই আর করি না, রূপনারায়ণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি,—একটা ইজিচেয়ারে দিনরাত পড়িয়া থাকি।'

ঐ পত্রে আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, সেদিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন দ্বীপান্তরে চালান করে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ করে বসে আছেন—তাঁর ঠিকানা জানিনে তুমি নিশ্চয়ই জানো, অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে যেখানেই থাকুন সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি।'

প্রাচীন কালে পঞ্চাশোর্ধে বনে যাইবার রীতি ছিল। শরৎচন্দ্রও যেন পঞ্চাশ বছর বয়সে স্বেচ্ছা-বনবাস বরণ করিয়া লইলেন। সংসারের আশানিরাশার পরপারে এক শান্ত, উদাসীন ও বৈরাগ্যময় জীবনের মধ্যেই তিনি নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, সহরেই

থাকি বা পাড়াগাঁয়ে বাস করি আমি সংসারের জোয়ার-ভাঁটার উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে—মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য করা আছে, আর বড় তার বিলম্ব নাই। বছর দেড়েক—জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।'

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট (ভাদ্র, ১৩৩৩) শরৎচন্দ্রের যুগান্তকারী রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার আগে ইহা ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গবাণীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বঙ্গবাণী' পত্রের পরিচালনায় ছিলেন নির্ভীক জাতীয়তাবাদী বাঙালী বীর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রগণ। শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর একজন ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া একদিন শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাড়িতে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের কাগজে লিখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। স্যার আশুতোষ ও তাঁহার পুত্রগণের ন্যায় অকুতোভয় স্বদেশপ্রেমিক পরিচালকগোষ্ঠীর কাগজে যদি 'পথের দাবী' প্রকাশিত না হইত তবে ইহা অন্যত্র প্রকাশের সুযোগ পাইত কিনা সন্দেহ।[১]

'পথের দাবী' যখন 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হইতেছিল তখন এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বইখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত সমগ্র অংশ প্রকাশ করিতে তিনি সাহস করিলেন না। কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র কোন অংশ বর্জন করিতে সম্মত হইলেন না। শরৎচন্দ্র অতঃপর হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে 'পথের দাবী' প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু তিনিও ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। অবশেষে শরৎচন্দ্র রমাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলেন। তাঁহারা বইখানি প্রকাশ করিতে সম্মত

১। 'তাঁর (আশুতোষের) কাগজ না হ'লে বাংলা দেশ কোন দিন পথের দাবীর আলো পেত না। সে কথা শরৎচন্দ্র অনেকবার বোলেছেন।'

শরৎ-পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৫৬

হন। প্রথমে কোন প্রেস বইখানা ছাপিতে রাজি হয় নাই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কটন প্রেসে ছাপা হয়।

'পথের দাবী' প্রকাশিত হইলে জনসাধারণ যেন উন্মত্ত আগ্রহে ইহা লুটিয়া লইল। শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'পথের দাবী যখন প্রকাশিত হল তখন গ্রন্থখানি যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোন গ্রন্থ কোনদিন এরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কিনা সন্দেহ। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত কপি বিক্রী হয়ে নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। শুনেছি নাকি গ্রন্থখানি পাঁচ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। বিক্রী শেষ হতে সাতদিন লেগেছিল কিনা সন্দেহ। কোন কোন দোকানদার তিনটাকা মূল্যের গ্রন্থখানি দশটাকা মূল্যেও বিক্রী করেছেন, পাঠক পাঠিকারা তাই দিয়ে নিয়ে গেছেন।'[১]

'পথের দাবী' প্রকাশিত হইবার কয়েকদিনের মধ্যেই ইহা বাজেয়াপ্ত হয়। ১৩৩৩ সালের ১৯শে ভাদ্র শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'বইটার সম্বন্ধে নানা গুজব যে বাজেয়াপ্ত হবেই কিংবা হয়েই গেছে। কিছু জানো?'

'পথের দাবী' যে-সময় বাজেয়াপ্ত হয়, সে-সময় প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত রেভাঃ জেঃ টিঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড রচিত India in Bondage বইখানি সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। রামানন্দবাবু এই বাজেয়াপ্তির জন্য সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। কিন্তু তিনি মোকদ্দমায় হারিয়া গেলেন। শরৎচন্দ্রও 'পথের দাবী'র নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার বন্ধু নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নির্মলচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে মামলা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

'পথের দাবী' নিষিদ্ধ হওয়াতে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হউক, ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রতিবাদ জানাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'পথের দাবী' পড়িয়া যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহা শরৎচন্দ্রের অনুকূলে মোটেই গেল না, বরং তাহা সরকারের নিষেধাজ্ঞা সমর্থনই করিল। 'পথের দাবী' সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৬১-৬২

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হইল—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।……আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গবর্ণমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়।…শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হ'লে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে। রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না। এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে, তা হলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হ'ত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে- দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে, সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এ পত্রখানি শরৎচন্দ্রকে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করিয়াছিল। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হ'য়ে যাবে।'

১৩৩৩ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই প'ড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।'

রবীন্দ্রনাথের পত্রখানির আঘাত শরৎচন্দ্র যে দীর্ঘকাল ভুলিতে পারেন নাই তাহা উমাপ্রসাদকে লিখিত ১৩৩৪ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি। কোনদিন পারবো ব'লেও ভরসা হয় না।'

'পথের দাবী'র সঙ্গে জড়িত আর একটি কাহিনীর কথা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'একদিন কে এক প্রেন্টিশ সাহেব শরৎচন্দ্রকে ডেকে বোললেন, তুমি সরকারের পক্ষ থেকে পথের দাবীর মতো একখানি বই লিখে দাও, ভালো টাকা পাবে।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, সাহেব। ছেলেবেলা আমার ঘুড়ি উড়িয়ে, লাটুগুলি খেলে কেটেচে। যৌবনটা গাঁজাগুলি খেয়ে, তারপর রেঙ্গুনে গিয়ে চাকরি কোরেছি। আর চার অধ্যায় লেখার বয়স নেই। আমায় ক্ষমা কর।'[১]

রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে উত্তেজিত হইয়া শরৎচন্দ্র একখানি চিঠি

১। শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ১৫৭

লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের কাছে আর পাঠান হয় নাই। চিঠিখানি উমাপ্রসাদের কাছেই ছিল। ১৩৬০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' উমাপ্রসাদ 'শরৎচন্দ্রের পথেবদাবী ও রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং শরৎচন্দ্রের ঐ চিঠিখানিও প্রকাশ করেন।[১]

এই চিঠিখানা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'সামতায় গিয়ে দেখি শরৎচন্দ্র রাগে ফুঁসছেন। কি একটা চিঠি দিয়েছেন শ্রীমান্ উমাপ্রসাদের কাছে রাগের মাথায় রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবার জন্য। সে চিঠি আমি কোনদিন দেখিনি।

সব কথা বলার পর—শুনে বোললাম—তুমি কি তাঁকে বইখানির সুপারিশ করতে অনুরোধ করেছিলে? না, তাঁর ঠিক মতামতটি চেয়েছিলে?

হাঁ, মতামতই চেয়েছিলাম—উত্তরে বোললেন তিনি।

তবে? মতামত চেয়েছিলে। দিয়েছেন তিনি। লেঠা তো সেইখেনে চুকে গেল। তারপর আর কিছু হোলে সেই ফের 'মেয়ে কোঁদল'।

তখন তুলসী ছুটলেন—চিঠিটা পাঠান বন্ধ করতে। এ-কথা উমাপ্রসাদবাবু জানেন, তুলসী জানেন।'[২]

শরৎচন্দ্রের সেই অপ্রেরিত পত্রখানি তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ জানার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য নীচে তাহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হইতেছে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু সে কিছু নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বন্ধে আমার দুএকটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরাজরাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ-যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার

১। শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্র', পৃঃ ২৪০-২৪১ দ্রষ্টব্য।
২। শরৎ-পরিচয়. পৃঃ ১৫৬-১৫৭

চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হ'ত, কিন্তু বই হ'ত না। নানা কারণে বাঙ্গলা ভাষায় এ-ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ-দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা মুখ- বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি। কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে, এ-সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হল কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ, ছানা, মাখন পায় না ব'লে, কিংবা মুসলমান কয়েদীরা মহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে আমরা দুর্গোৎসবের পয়সা পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে, তখন হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি। কিন্তু ঘাসের ডালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা উচিত ব'লে মনে করি তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা।

নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গবর্ণমেন্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ-আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজশক্তির এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার জাস্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেষ্ট করার জাস্টিফিকেশনও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ ক'রে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি বহু দিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ-বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই। সেই আমার সান্ত্বনা হ'ত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে, সামর্থ্যে, সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশত এ-পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং, কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।

ইতি ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'পথের দাবী'র নিষেধাজ্ঞামুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে, অর্থাৎ, শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পরে। রাজরোষের রাহুমুক্ত এই প্রিয় গ্রন্থখানিকে শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, হয়তো এই ক্ষোভ ও বেদনা তাঁহার অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়াছিল। মনে পড়ে, শরৎচন্দ্রের শব-শোভাযাত্রায়, 'পথের দাবী'র উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য সম্মিলিত শোভাযাত্রীদের সোচ্চার দাবী উঠিয়াছিল। সেই দাবী যেদিন পূর্ণ হইয়াছিল সেদিন হয়তো শরৎচন্দ্রের বিক্ষুব্ধ আত্মা পরলোকে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিয়াছিল।

'পথের দাবী' এক অগ্নিদীপ্ত রাজনৈতিক বিপ্লব লইয়া রচিত মহৎ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক বিপ্লব অবলম্বনে কয়েকখানি স্মরণীয় উপন্যাস। রচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র কথা প্রথমেই মনে আসিবে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা,' 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', '১৯৪২,' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা,' 'রাধা', গোপাল হালদারের 'একদা', হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইরাবতী', প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা' প্রভৃতি উপন্যাসের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র অবশ্য তুলনা নাই, কিন্তু ঐ বইখানি বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে ক্রুদ্ধ অগ্নিঝটিকার অন্তঃস্থলে সুখদুঃখ তাড়িত মানুষের অন্তর্জীবনের সুরম্য নিকেতনই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ডিকেন্সের A Tale of Two Cities এবং গোর্কির Mother-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। A Tale of Two Cities-এর মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের হিংস্র পরিবেশের মধ্যে প্রেমের জন্য এক করুণ আত্মত্যাগের কাহিনী অনুপম অশ্রুসিক্ত মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। Mother-এর মধ্যে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ উত্থান যে প্রচণ্ড অগ্নিবিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল তাহারই ফাঁকে ফাঁকে এক স্নেহময়ী মাতার উদ্বেগকাতর স্নেহধারা নিজের পুত্র ও তাহার বিপ্লবী সহকর্মীদের উপর কিরূপ অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল তাহারই আকর্ষণীয় চিত্র ফুটিয়াছে। 'পথের দাবী'র মধ্যেও শরৎচন্দ্র উপন্যাসের রাজনৈতিক দাবী ও ঔপন্যাসিক দাবী,—উভয় দাবীই অতি চমৎকারভাবে মিটাইয়াছেন। ইহাতে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী ও তাহার অগ্নিবাহী বিপ্লবীর দল চতুর্দিকে যে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে

তাহারই নিরাপদ অভ্যন্তরে অপূর্ব, ভারতী, শশীকবি, নবতারা প্রভৃতির আবেগ ও বেদনামিশ্রিত হৃদয়লীলার স্নিগ্ধ আসর রচিত হইয়াছে। পথেরদাবীর সভানেত্রী সুমিত্রা কঠিন প্রস্তরে নির্মিত নারীমূর্তি, কিন্তু মাঝে মাঝে এই প্রস্তরমূর্তির বিদীর্ণ অন্তর হইতে বিগলিত অশ্রুধারা বাধাবন্ধহীন আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এমনি ভাবে 'পথের দাবী' তাহার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সার্থকভাবে পরিস্ফুট করিয়াও ঔপন্যাসিক ধর্মচ্যুত হয় নাই।

'পথের দাবী' উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমি লইয়া আলোচনা করিতে হইলে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদের কথা পুনরায় একটু উল্লেখ করিতে হয়। বাংলা দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর গৃহে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে অহিংস আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল বিপ্লবীদের অনেকেই তাহাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য দেশবন্ধু সকল বিপ্লবী কর্মীরই বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন। বিপ্লবীদেব প্রতি শরৎচন্দ্রের কতখানি স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল তাহা শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, 'বিপ্লবীদের শরৎচন্দ্র বড় শ্রদ্ধা করতেন, স্নেহ করতেন। মতের হাজার পার্থক্য থাকলেও তিনি এঁদের চরিত্রমুগ্ধ ছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা নিজের প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন, অমানুষিক ও চরম নির্যাতন যাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন তবু নতি স্বীকার করেন নি বা একটি স্বীকারোক্তি মুখ থেকে বার করেন নি, দেশকে যাঁরা আপন অস্থিমাংস অপেক্ষাও বেশী ভালোবেসেছেন তাঁদের তিনি অকপটে অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের মত ও পথ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, সম্ভব কি অসম্ভব, বাস্তব কি অবাস্তব তার চুলচেরা বিচারের তুলাদণ্ড যাচাই ক'রে তাঁদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতেন না, সন্তান কাণা হোক, খোঁড়া হোক ফর্সা হোক কাল হোক, ভাল হোক মন্দ হোক, মা যেমন তাকে ভালবাসেন, শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের তেমনি ভালবাসতেন।

এ বিষয়ে দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র উভয়ের মনের মিল ছিল ষোল আনা। শরৎচন্দ্র বিপ্লবীদের কাছে তাঁদের বিগত জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী সব নির্বিষ্টচিত্তে শুনতেন। তাঁদের দেশকে স্বাধীন করবার আশা ও স্বপ্ন, তাঁদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সফলতা ও বিফলতার ঘটনাবলী ও তার কারণ-পরম্পরা, বিপ্লবীদের প্রতি দেশের লোকের ধারণা ও ব্যবহার, ইংরেজের

হাজত ও কারাগারে বিপ্লবীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতনের কথা সবই শরৎচন্দ্র তাঁদের নিজমুখ থেকে শুনতেন। যাঁরা ফাঁসী গিয়েছিলেন তাঁদের অমর আত্মদানের কথা শরৎচন্দ্র নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শুনতেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে যেতেন, চোখ তাঁর সজল হ'য়ে উঠত।'

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন না যে, চরকা ও খদ্দরের মধ্য দিয়া স্বরাজ আসিবে। একবার মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিলে সারভেণ্ট কার্যালয়ে চরকায় সুতা কাটিবার সময় তাঁহার সহিত শরৎচন্দ্রের চরকা ও স্বরাজ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

'মহাত্মাজী বললেন, Sarat Bubu, You have no faith in Charka ?

শরৎচন্দ্র বললেন, No, not a jot.

মহাত্মাজী। But you spin better than many lovers of Charka.

শরৎচন্দ্র। I have learnt spinning because I have love for you though not for the Charka.

মহাত্মাজী মৃদু হেসে বললেন, But why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning ?

শরৎচন্দ্রও হেসে বললেন, No, I don't believe. I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders.[১]

পথের দাবীর নায়কের মুখে মুহুর্মুহু বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ শুনা গিয়াছে। অহিংসা, শান্তি, আপোষ প্রভৃতি কথা তাঁহার মুখনিঃসৃত জলন্ত অগ্নিস্রাবে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সব্যসাচী বলিয়াছেন, 'বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্য দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ, একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হাঙ্গেরীতে তাই হয়েছে, রুশিয়ায় বার বার এমনি ঘটছে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে।.... মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।'

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ১০১-১০২

আমাদের জাতীয় নেতাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে শাসনসংস্কারের উপরেই শুধু যাঁহাদের দাবী সীমাবদ্ধ ছিল সব্যসাচী তাঁহাদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপের বাণী নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, 'আর তোমার নমস্য নেতাদের ভয় নেই দিদি! আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময় নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকি কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজি হয় না এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে।'

বিপ্লবীর সম্মুখে মাত্র দুইটি পথ খোলা আছে। সব্যসাচীর কথায়, 'ভারতী আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্মবঞ্চনার অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।'

শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মতবাদ সব্যসাচীর মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সব্যসাচীর বিরুদ্ধ মতবাদও তিনি প্রবল যুক্তি ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই বিরুদ্ধ মতবাদের প্রবক্তা হইল সব্যসাচীরই একান্ত প্রিয়পাত্রী ভারতী। সব্যসাচী হিংসাত্মক, রক্তস্নাত পথের দুঃসাহসী অভিযাত্রী কিন্তু ভারতীর পথ হইল শান্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির কল্যাণাশ্রিত পথ। ভারতী সব্যসাচীকে তাহার হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ ও ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছে কিন্তু তবুও সব্যসাচীর হিংসাত্মক আদর্শ সে মানিয়া লইতে পারে নাই। সে বলিয়াছে, 'আমি নিশ্চয়ই জানি তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসের পথে কিছুতেই কল্যাণ নেই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্মবিশ্বাসের পথ, সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য'।

ভারতী নিজের মত যে শুধু দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তাহা নহে, সব্যসাচীকে সে নিজের মতে আনিতে চাহে। সে বলিয়াছে, 'যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এতো বর্বরতার দিন থেকেই চলে আসছে। এর চেয়ে মহৎ কিছু বলা যায় না?'

সব্যসাচী ও তাঁহার গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির কাছে পথের দাবীর মত ও

পথের কথা আমরা যত শুনিয়াছি সক্রিয় কর্মধারার পরিচয় ততখানি পাই নাই। কিন্তু তবুও সব্যসাচী ও তাঁহার সহকর্মীদের সঙ্গে কথোপকথনে আমরা তাঁহাদের কর্মপন্থার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে ভারত ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার গুপ্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে। সব্যসাচী চীনের বিপ্লবী নেতা সান ইয়াত সেন হইতে শুরু করিয়া সমস্ত দেশের বিপ্লবী নায়কদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিপ্লব-আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে মিল কোথায় এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু এশিয়ার পরাধীন ও শোষিত দেশগুলির রাজনৈতিক সমস্যা ও জনগণের বৈপ্লবিক উত্থানের মধ্যে একটা গূঢ় ঐক্য বিদ্যমান ছিল। দেশগুলি বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ জাতির কবলিত ছিল এবং শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি শুধু কেবল রাজনৈতিক নির্যাতন নহে, অর্থনৈতিক শোষণের মধ্য দিয়া এশিয়ার জাতিগুলির সম্পদ ও সমৃদ্ধি লুণ্ঠন করিয়া লইতেছিল। এই শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এশিয়ার জনগণের যে বিপ্লব-আন্দোলন শুরু হইয়াছিল তাহার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যথা, বিদেশী শাসকদের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লওয়া, শেতাঙ্গ জাতিগুলির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা উদ্রেক করা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা। সব্যসাচীর মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে এই তিনটি উদ্দেশ্যই সুষ্ঠুভাবে চোখে পড়িবে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক আদর্শ ও সংগ্রামের একটা ঐক্য ছিল তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠনের সময়। নেতাজী কংগ্রেসী নেতাদিগকে যখন তাঁহার বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে আনিতে পারিলেন না তখন তিনি এই সংগ্রাম পরিচালনার জন্যই ভারত ত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছিল ভারতের বাহিরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম এলাকায়। জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের লোকেদের কাছে তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত ও উদ্দীপনাময় সমর্থন পাইয়াছিলেন তাহা আমরা সকলেই জানি। শরৎচন্দ্র নিজে দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশে ছিলেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় রাখা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং সব্যসাচী ও তাঁহার বহু-বিস্তৃত বিপ্লব-আন্দোলন কাল্পনিক নহে, তাহা সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

'পথের দাবী'তে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দাবীও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। সব্যসাচী ও তাঁহার দলে পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণীর কবল হইতে মুক্তিলাভের সংগ্রামের মধ্যে রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। সব্যসাচী বলিয়াছেন, 'ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রীপুত্র-পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে; অর্থ বল, সৈন্য বল, অস্ত্র বল সবই তার হাতে—সেই ত রাজশক্তি।'

সব্যসাচীর কথাগুলি 'Mother' উপন্যাসের বিচারদৃশ্যে অভিযুক্ত প্যাভেলের অগ্নিময় বাক্যগুলি মনে করাইয়া দেয়, 'We want to fight and will fight against all the forms of physical and moral slavery enforced on the individual by such a society, against all means of crushing human beings in the interests of selfish greed. We are workers, people by whose labour all things are made, from children's toys to massive machines, yet we are people deprived of the right to defend our human dignity. Any one is able to exploit us for his own personal ends. At present we want to achieve a degree of freedom which will eventually enable us to take all power into our own hands'

প্যাভেল ও তাহার সহকর্মীদের সোস্তাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে যেভাবে পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় তাহারা বিপ্লবের জয়গান করিয়াছিল,

'Arise to the struggle, oh workers, arise.'
Arise, all who labour and hunger.'

তেমনি কবার মাঠে পুলিশের উদ্ধত অত্যাচারের সম্মুখে নির্ভীক ভাবে পথের দাবীর পক্ষ হইতে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রামদাস তলোয়ারকার

তাহার অগ্নিবর্ষী ভাষণে বলিয়াছিল, 'শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই,—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,—জৈন, শিখ, কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালীক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।'

সব্যসাচী যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন তাহাতে গ্রামের কৃষকদের কোন স্থান নাই। তাঁহার বিপ্লব শ্রমিকদের লইয়া এবং ধর্মঘট ও সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক প্রতিরোধই তাঁহার বিপ্লবের বড় হাতিয়ার। ভারতী একদিন সব্যসাচীকে অনুযোগ জানাইয়া বলিয়াছিল 'কিন্তু বরাবরই আমি দেখেছি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু সহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নও, তোমার দু'চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলিমজুর কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে।'

সব্যসাচী উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'কতবার ত বলেচি তোমাকে, পথের দাবী চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা-অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই পাবে আমাকে কুলি-মজুর কারিগরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারাকে। কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ের চাষার কুটীরে।'

সব্যসাচীর কথায় বুঝিতে পারা যায় যে, পথের দাবী যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে চায় তাহার সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তিও অনিবার্যভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কৃষিনির্ভর সমাজের দ্রুত শিল্পায়ন এবং শিল্পোৎপাদান ও বণ্টন ব্যবস্থার উপরে সকলের যৌথ অধিকার প্রবর্তন একান্ত আবশ্যক। এজন্য সব্যসাচীর সংগ্রামের ক্ষেত্র শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে, গ্রামে কৃষকদের মধ্যে নহে। শ্রমিকদের শুধু সংগ্রামী রূপ নহে, তাহাদের দারিদ্র্যপিষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট কদর্য ও গ্লানিকর

জীবনের শোচনীয় চিত্রও শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অপূর্ব ও ভারতী ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সব শ্রমিকের জীবনযাত্রার যে চেহারা দেখিয়াছে তাহা গোর্কির The Lower Depths নাটকের নীচের তলাকার ক্লেদাক্ত মানুষগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সব্যসাচী শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বলেন নাই, তিনি সামাজিক মুক্তির কথাও জোরের সঙ্গে বার বার বলিয়াছেন। অবশ্য অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসিতে বাধ্য কিন্তু সামাজিক মুক্তির জন্য অতীতের মোহপাশ ছিন্ন করিয়া বুদ্ধি ও চিন্তার যে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা বিধান করা প্রয়োজন তাহা সব্যসাচীর কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। একস্থানে তিনি শশীকবিকে বলিয়াছেন, 'রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সমস্ত ভেঙেচুরে ধ্বংস হ'য়ে যাক,—আর কিছু না পারো শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়।'

পথের দাবীর বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সম্বন্ধে হয়তো খুব স্পষ্ট ও বিশদভাবে আলোচনা হয় নাই। কিন্তু উপন্যাস হইতে এই বৈপ্লবিক সমিতির যে ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাময় কার্যধারা, ভয়াবহ হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ ও বিপ্লবীদের ইস্পাতকঠিন সঙ্কল্প এবং মৃত্যুপণ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে পথের দাবী সম্বন্ধে আমাদের স্তম্ভিত ও চমৎকৃত মনে একটি চিরস্থায়ী অলঙ্ঘ্য স্মৃতি মুদ্রিত হইয়া যায়। লেখক মাঝে মাঝে এমন এক একটি রহস্যঘন ও ভয়স্তব্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন যে রুদ্ধ নিশ্বাসে আমাদিগকে প্রতিটি মুহূর্ত যেন অতিবাহিত করিতে হয়। সব্যসাচীর লোমহর্ষণ অতীত অভিজ্ঞতাবর্ণনায়, অভিযুক্ত অপূর্বের বিচারদৃশ্যে, সব্যসাচী ও ব্রজেন্দ্রর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং ঝটিকাতাড়িত দুর্যোগনিশীথে সব্যসাচীর বিদায়দৃশ্যে এই ধরণের শ্বাসরোধকারী উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিপ্লবের পথ বন্ধুর, প্রতিরোধকণ্টকিত এবং ঘোর বিপদসঙ্কুল। ইহাতে বাঁকে বাঁকে নাটকীয় উদ্বেগ ও উত্তেজনা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইবার

জন্য অপেক্ষা করিতেছে। 'পথের দাবী'তে এই পথের সন্ধান আমরা পাইয়াছি।

এই হিংসা ও বিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে অপূর্ব ও ভারতীর স্নিগ্ধ হৃদয়লীলা আমাদিগকে এক আশ্বাসভরা, সান্ত্বনাপূর্ণ জগতের সন্ধান দেয়। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের নায়কনায়িকার পরিচয় তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়াছে। ষোড়শী-জীবানন্দ, অচলা ও সুরেশের প্রথম পরিচয়ের কথা সকলেরই মনে আসিবে। অপূর্ব ও ভারতীর পরিচয়ও এভাবে ঘটিয়াছিল। কিন্তু অপূর্বর অপটুতা, অসহায়তা ও একান্ত পরনির্ভরতার ফলেই ভারতী এই ভীরু ও দুর্বল লোকটির সকল ভার যেদিন হইতে নিজের পরে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইল সেদিন হইতেই উভয়ের পারস্পরিক অনুরাগের পথে আর কোন বাধা রহিল না। কিন্তু ভারতী যে পরিবারে ও প্রতিবেশে মানুষ হইয়াছে তাহাতে খাঁটি বাঙালী মেয়ের মতই অতখানি সেবা যত্ন, স্নেহ ও করুণায় নিজের সমগ্র সত্তাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত মনে হয়। ভারতী অপূর্বকে ভালোবাসিয়াছিল এ-কথা সে নিজেই একাধিকবার স্বীকার করিয়াছে। সব্যসাচীকে সে একদিন বলিয়াছিল, 'অপূর্ববাবুকে আমি যথার্থই ভালোবাসি। ভাল হোক, মন্দ হোক, তাঁকে আর আমি ভুলতে পারবো না।' তাহার ভালোবাসা শুধু কেবল একটি হৃদয়ের আবেগ হইয়া হৃদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, তাহা অকৃত্রিম সেবাযত্নে, আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় এমন কি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে প্রেমাস্পদকে রক্ষার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অতুলন ভালোবাসার বিনিময়ে ভারতী কি পাইয়াছিল? অপূর্ব—নীচ স্বার্থপরের মত ভারতীর স্নেহসিক্ত হৃদয়ের উদার অপ্রমেয় দান শুধু দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এই অনুরাগময়ী, মহতী নারীটির জন্য সে কখনও বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করে নাই, এমন কি কৃতজ্ঞতার দুই একটি বাক্য পর্যন্ত তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। অপূর্বর হৃদয় জুড়িয়া শুধু কেবল তাহার মায়ের স্নেহময়ী মূর্তিটিই বিরাজিত ছিল। মায়ের প্রতি একান্তনির্ভরতার জন্য সে বালকের মতই অবোধ, অপটু ও দুর্বল ছিল, তাহার মধ্যে স্বনির্ভরশীল, পৌরুষদীপ্ত যৌবন জাগিয়া উঠিতে পারে নাই; যে সুন্দরী তরুণী নারীটি অনুরাগের ডালাপালাটি

তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল তাহা স্পর্শ না করিয়া সে শুধু নিজের তুচ্ছ সুখ, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের কথাতেই মগ্ন হইয়া রহিল। ভারতীর মধ্যে সে জননীকেই পাইতে চাহিয়াছিল, তাহার ভিতরকার কামিনীকে সে দেখিতে পায় নাই। এই অক্ষম ও অশক্ত লোকটিকে ভারতী শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই, ইহাকে সে না ভালোবাসিয়াও পারে নাই। সব্যসাচী বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার সময় অপূর্বকে বলিয়াছিলেন, 'প্রার্থনা করি, সত্যকার দাতাকে যেন একদিন তুমি চিনতে পারো অপূর্ববাবু। অপূর্ব তাহার জীবনদাতাকে শেষ পর্যন্ত চিনিতে পারিয়াছিল কিনা এবং তাহার প্রতি নিজের অপরিশোধ্য ঋণ কিছুটা শোধ করিতে পারিয়াছিল কিনা তাহা অবশ্য আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু সেই জীবনদাতার অপরিমিত ও অপুরস্কৃত প্রেমের মাধুর্য ও মহিমা গ্রন্থমধ্যে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্য দিয়া নারীপ্রেমের বিচিত্র প্রকৃতি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ভারতীর মধ্যে যেমন প্রেমের নিষ্ঠা ও গভীরতা দেখিয়াছি, নবতারার মধ্যে তেমনি প্রেমের চাপল্য ও ছলনা দেখা গিয়াছে। নবতারা তাহার স্বামীকে ছাড়িয়া আসিয়াছে এবং শশীকে ছলনা করিয়া তাহারই টাকা আত্মসাত করিয়া অপর আর একজনের কণ্ঠলগ্না হইয়াছে। শশী কবি। বেহালা বাজায়, মদে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু জীবনের একটুকরা স্বপ্ন ক্ষণকালের জন্য তাহার চোখে মায়াঞ্জন আঁকিয়া দিয়াছিল। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রহিয়া গেল, তারাহীন হইয়াই শশীকে নিঃসঙ্গ আকাশে ঘুরিতে হইল। সুমিত্রা পথের দাবীর সভানেত্রী, তাহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সে সভানেত্রী হইলেও তাহার কথা ও আচরণ উপন্যাসের মধ্যে খুব বেশি পাওয়া যায় নাই। সব্যসাচী ও ভারতীর নানাপ্রকার উক্তি ও মন্তব্য হইতেই তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তাহার ব্যক্তিত্ব যত বলিষ্ঠই হউক না কেন, সব্যসাচীর অনেক বেশি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পাশে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সব্যসাচীর সঙ্গে সুমিত্রার সম্বন্ধটি শেষ পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। সব্যসাচী সুমিত্রাকে একবার বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীরূপে তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে ছিল না। সব্যসাচী অপূর্ব-ভারতীর মিলনের আন্তরিক

সহায়ক ছিলেন, শশী ও নবতারার বিবাহে ছিল তাঁহার সোৎসাহ সমর্থন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কোন নিভৃত কোণে সুমিত্রার জন্য কোন গোপন দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন ছিল কিনা তাহা বুঝা যায় নাই। সুমিত্রা একদিন সব্যসাচী সম্বন্ধে বেদনাক্লিষ্ট অনুযোগ জানাইয়াছিল, 'দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই—এই পাষাণমূর্তি আমি চিনি ভারতী।' সব্যসাচীর যে দয়ামায়া যথেষ্টই ছিল তাহা আমরা অপূর্ব, ভারতী, শশী প্রভৃতির প্রতি আচরণের মধ্যে দেখিয়াছি। সুতরাং, সুমিত্রার এ-অনুযোগ তাহার অনুরাগপীড়িত প্রত্যাখাত হৃদয় হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল। সব্যসাচী সুমিত্রাকে বাঁধিতে চাহেন নাই, কিন্তু সুমিত্রা নিজেকে পূজার নৈবেদ্যের মত এই পাষাণদেবতার চরণতলে উৎসর্গ করিতে সতত উন্মুখ হইয়া ছিল। এই কুলিশকঠিনা নারী বিপ্লবের ভয়াবহ উদ্‌যোগ আয়োজনের মধ্যেও নিজের নারীহৃদয়ের কোমল করুণ রূপটি গোপন রাখিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে তাহা অদম্য অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। সব্যসাচী সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়ার সময় তাহার হৃদয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছিল এবং যে অবিরাম অশ্রুপ্রবাহ তাহার সর্বাঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছিল তাহা সেই দুর্যোগময়ী রাত্রির ঝড়জল অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না।

'পথের দাবী' উপন্যাসের আলোচনা সব্যসাচীর কথাতেই শেষ হওয়া উচিত। সব্যসাচী শরৎসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। তাঁহার অনন্য স্বদেশপ্রেম, অসামান্য সাহস ও অতুলনীয় শক্তি, বহুবিস্তৃত বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা, অসাধারণ জ্ঞান ও মনীষা ও বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি তাঁহাকে এক অতিলৌকিক স্তরে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছে। সর্বপ্রকার কাঠিন্যের উপাদানে তাঁহার সমগ্র সত্তা গঠিত, কিন্তু তবুও তিনি মানবিক হৃদয়বত্তা হইতে বঞ্চিত নহেন। কঠিন শিলাময় পর্বতের অন্তরদেশে যেমন গোপন ঝরণা ধারা বহিয়া চলে, তাঁহার অতিকঠোর বহির্ভাগের গভীরেও তেমনি স্নেহ ও করুণার অন্তঃশীল প্রবাহ নিরন্ত সচল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সুখ ও শান্তির স্বর্গ হইতে তিনি চিরনির্বাসিত। অপরের সুখে তিনি উল্লসিত হন, কিন্তু নিজের সুখের পুষ্পদল ছিন্ন করিতে করিতে তিনি চলেন, অপরের শান্তিময় জীবনের উপরে তিনি প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, কিন্তু নিজের শান্তির নীড়টি ভাঙিয়া চুরিয়াই তিনি আনন্দ পান। সব্যসাচী সম্বন্ধে একদিন শ্রদ্ধাপূত চিত্তে অপূর্ব মনে

মনে বলিয়াছিল, 'তুমি, আমাদের মত সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়া তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়, কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই ত তোমার গৌরব।' গ্রীক বীর প্রমিথিউসের মতই সব্যসাচী প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বহন করিয়া চলিয়াছেন। সেই শিখা বিপ্লবের পথকে চির-আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে,— 'মুক্তিপথের অগ্রদূত। পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী তোমাকে শত কোটি নমস্কার!'

১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার শিলচর ছাত্রসংঘ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়া একটি মানপত্র দিয়াছিল।

১৩৩৩ সালের ১০ কার্তিক শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র বা স্বামী বেদানন্দের মৃত্যু হয়। তিনি বহু বৎসর বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া গেলেও মাঝে মাঝে দাদার কাছে আসিয়া থাকিতেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে দিল্লী গিয়াছিলেন, দিল্লী হইতে তিনি প্রভাসচন্দ্রকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং প্রভাসচন্দ্রের আশ্রমে কয়েকদিন কাটাইয়া আসিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কাজে প্রভাসচন্দ্রকে মাঝে মাঝে ভারতের বাহিরেও যাইতে হইত। ১৩৩৩ সালে তিনি একবার রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন। রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া তিনি সামতাবেড়ে দাদার কাছে কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময়েই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পরলোকগমন করেন।

স্নেহাস্পদ ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। ১৩৩৩ সালের ২২শে কার্তিক তিনি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি চিঠিতে লেখেন, 'কেদারবাবু, বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না তাহার বলিবার আছেই বা কি। একবার আপনাদের কাছে গিয়া বলিবার বড় ইচ্ছা করে,

আর ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এতবড় দুর্বল ছিলাম একথা তো জানিতাম না। এ-ব্যথা (ভ্রাতৃবিয়োগের) আমার সহিবে কি করিয়া?'

এই তারিখে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন, বাড়ীর একটা পশুপক্ষীর মৃত্যু পর্যন্ত সহিতে পারি না, এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এতবড় থাকে এ আমি জানিতাম না। কে জানিত ভিতরে ভিতরে আমি এতখানি দুর্বল ছিলাম। কত কি লিখিয়াছি—সকলই মনগড়া, কে ভাবিয়াছিল আমার জীবনেই তাহা এমন সত্য হইয়া উঠিবে। আজ আর একটা সত্য উপলব্ধি করিয়াছি। তাই, বাকি জীবনটা যেন সকলেরই শুভ কামনা করিয়া শেষ করিতে পারি।'

শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণের তীরে প্রভাসচন্দ্রের মৃতদেহ সংকার করিয়া সেখানে একটি সমাধি-বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতিসন্ধ্যায় নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া তিনি সমাধিস্থানে রাখিয়া আসিতেন। প্রতিবৎসর প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুদিবসে তিনি সমাধিস্থানে কীর্তন গানের আয়োজন করিতেন এবং সেই উপলক্ষে গ্রামের লোকজনকে আহার করাইতেন। প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুর আট বছর পরে শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই মৃত্যুদিবস পালনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'কালিয়া (যশোর) থেকে পরশু রাত্রে ফিরেছি, আজ বাড়ী যাচ্ছি। কাল আমার লোকান্তরিত মেজভাই বেদানন্দের মৃত্যুর দিন। তার সমাধির কাছে দু'পাঁচজনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্তন করে। এই জন্যে যাওয়া।'

১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র হাওড়ার শিবপুর সাহিত্য সংসদ এক সভায় শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার। এই উপলক্ষে শিবপুর সাহিত্য সংসদ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বাংলার কয়েকজন লেখক-লেখিকার রচনা লইয়া একটি পুস্তক সম্পাদনা করিয়া শরৎচন্দ্রকে তাহা উপহার দেয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল (চৈত্র, ১৩৩৩) 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে ইহা ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন

ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের শেষে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বলিয়াছিল, 'তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী!' শ্রীকান্তের এই কথাতে মনে হইয়াছিল যে, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধ বুঝি একটি দ্বন্দ্বহীন সমাধানে পৌঁছিয়াছে এবং রাজলক্ষ্মীকে স্ত্রীর স্বীকৃতি দিবার পর শ্রীকান্তের কাহিনীও সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে 'শ্রীকান্তে'র কাহিনী যে শেষ হইয়া যায় নাই, 'শ্রীকান্তে'র তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বই তাহার প্রমাণ শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী যে স্বামী-স্ত্রীরূপে পরস্পরকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, একটি সূক্ষ্মপ্রাচীর যে উভয়েব মধ্যে এখনও বিরাজ করিতেছে, যাহার ফলে তাহারা পরস্পরের অতি কাছে থাকিয়াও পরস্পরকে পাইতেছে না। তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম তৃতীয় পর্বে।

তৃতীয় পর্বে অসুস্থ শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বলিয়াছিল, 'আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভালমন্দর ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার। কিন্তু অসুস্থ ও অপটু শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সেবাযত্ন পাইবার জন্য যাহা বলিয়াছিল তাহা যে তাহার অন্তরের সবটুকু কথা নহে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল কিছুকাল পরেই। রাজলক্ষ্মীর গঙ্গামাটির আবাসের দিকে যাত্রা করিবার সময় শ্রীকান্তের বিরূপ ও বিরক্ত মন ভাবিয়াছিল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমার ভালবাসিতেই হইবে; কোথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এত বড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে।' আসলে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে যত গভীরই ভালবাসুক না কেন এবং তাহার চরিত্র যতই নীতিবিচ্যুত হউক না কেন, তাহার মধ্যে এমন একটা তীক্ষ্ণ ও সচেতন সম্ভ্রমবোধ ছিল যাহার জন্য সে সামাজিক জীবনে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার মিলিত জীবনযাত্রা মানিয়া লইতে পারে নাই। এমনিভাবে শ্রীকান্তের মধ্যে রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনুকূল ও প্রতিকূল দুই বিরুদ্ধ ভাবের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। গঙ্গামাটিতে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী এক সঙ্গে একই ঘরে বাস করিয়াছে। এই অবস্থাতেও দুইটি যুবক যুবতী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও দৈহিক শুচিতা বজায় রাখে কি করিয়া তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

অথচ শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর কথাবার্তায় বুঝা যায় যে, উহাদের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম ও অনতিক্রম্য ব্যবধান রহিয়াছে যাহা একঘরে শয়ন করিবার বিপজ্জনক সম্ভাবনাকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' ১ম ও ২য় পর্বে রাজলক্ষ্মীর অন্তরবেদনাই শরৎচন্দ্রের বেদনাসিক্ত ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে, কিন্তু তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্তের মর্মপীড়াই কাহিনীটির করুণরসের প্রধান উৎস হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর জমিদারীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর পাশে থাকিয়া সে রাজলক্ষ্মীকে দেওয়া সম্মান ও মর্যাদার কিছুটা অংশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে তো জানে যে সে-সবের অংশীদার সে নহে। সেজন্য প্রতিমুহূর্তেই তাহার পৌরুষ ও আত্মসম্মান তাহার কাছে ধিকৃত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর অখণ্ড ভালোবাসা যদি তাহার প্রতিই অবিচলিতভাবে সমর্পিত থাকিত তাহা হইলেও হয়তো সে ভালোবাসার অধিকারে রাজলক্ষ্মীর উপর তাহার একান্তনির্ভরতার অসম্মান ভুলিতে পারিত। কিন্তু যখন সে দেখিল, রাজলক্ষ্মীর মন তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে, অথচ তবুও সে উপেক্ষিত ভাবে তাহারই আশ্রয় আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে তখনই তাহার আত্মসম্মান রূঢ়ভাবে আহত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী তাহার নূতন ধর্মসঙ্গীদিগকে লইয়া ধর্মসাধনায় মাতিয়া উঠিযাছে আর শ্রীকান্ত দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত তাহার নিঃসীম নিঃসঙ্গতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীকান্তের যে খাওয়াপরার দিকে রাজলক্ষ্মীব সদাজাগ্রত দৃষ্টি সেদিকেও সে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকান্তের মন এ-সব কারণে অপরিসীম বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে চিরকালই শান্ত, সহিষ্ণু ও বিচারশীল, জোর করিয়া দাবী জানাইতে কখনও সে চাহে নাই, কোন বিক্ষুব্ধ অভিযোগও সে প্রকাশ করে নাই। সে একাকী গ্রামের বিজন পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, রোগাক্রান্ত লোকেদের সেবায় তাহার কর্মহীন, নিরালম্ব জীবন খানিকটা ভরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর হাতে কিছুদিন আগেই সে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর উদাসীন অবহেলা তাহাকে এতখানি মর্মপীড়িত করিয়াছে যে, সে তাহার সুখময় দুরবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্রহ্মদেশে পুনরায় কর্মপ্রার্থী হইয়া পত্র লিখিয়াছে। গঙ্গামাটির দিনগুলি শ্রীকান্তের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ব্যথা

ও বিড়ম্বনাপূর্ণই ছিল এবং গঙ্গামাটি ত্যাগের পরেও যে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষীর পূর্বেকার উত্তাপময় সম্বন্ধ ফিরিয়া আসিল তাহা নহে। গঙ্গামাটিবাসের পর দুইজনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল এবং যে বিচ্ছেদ উভয়ের মধ্যে গঙ্গামাটিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অদর্শনের ফলেও আর ঘুচিল না। বিদেশযাত্রার আগে শ্রীকান্ত রাজলক্ষীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার জন্য তাহার কাশীর বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখিল তাহার বহুবাঞ্ছিতা রাজলক্ষী কঠোর ধর্মের ব্রত নিয়ম ও আচারের দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে এমন ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে সেখানে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার তাহার নাই। শ্রীকান্ত বুঝিল, রাজলক্ষীর জীবনে তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে রাজলক্ষীর হৃদয়প্রান্তে ভর করিয়া দাঁড়াইবার মত সামান্য স্থানটুকুও বুঝি তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই বিরাট বিশ্বে আজ সে নিতান্তই একা। সে রাজলক্ষীকে তাহার অন্তরের সকল শুভ ইচ্ছা জানাইল বটে, কিন্তু তাহার বেদনাবিদ্ধ অন্তরের নীরব অভিমান অবিরল অশ্রুধারায় সকলের অগোচরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বে রাজলক্ষীর এক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ দেখিতে পাই। যে রাজলক্ষী তাহার পিয়ারী জীবনের সকল কলুষকামনা ধুইয়া মুছিয়া তাহার প্রণয়দেবতার চরণে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়াছে সে এই পর্বে এক কঠোর নিয়মব্রতচারিণী তপস্বিনীর সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রাখিয়াছে। অথচ গঙ্গামাটিতে আসিবার পূর্বে শ্রীকান্তের প্রতি তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের স্নিগ্ধ সেবাযত্নে অসুস্থ শ্রীকান্তকে সর্বদা ঘিরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গামাটিতে পা দিবার পরই রাজলক্ষীর মন শ্রীকান্তের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। ইহার কারণ কি? হয়তো শ্রীকান্তকে অতি কাছে পাইয়া শ্রীকান্তকে বাঁধিবার কোন সযত্ন প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল না, শ্রীকান্ত নিকটলভ্য হওয়াতেই বোধ হয় স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বসম্মত কারণেই তাহার মূল্য রাজলক্ষীর কাছে কমিয়া গিয়াছিল। আর একটি কারণ বজ্রানন্দ ও সুনন্দার প্রভাব। বজ্রানন্দের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই রাজলক্ষী এই পরহিতব্রতী সন্ন্যাসীর প্রতি এক প্রবল স্নেহাকর্ষণ অনুভব করিল এবং ধীরে ধীরে এই সন্ন্যাসীর ধর্মাদর্শ তাহাকে তাহার জীবনের নির্দিষ্ট পরিধি হইতে এক অপরিজ্ঞাত ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে টানিয়া আনিল। তবে ধর্মসাধনায় দিকে

রাজলক্ষীর এই প্রবণতা একেবারে আকস্মিক বলা যায় না। রাজলক্ষী পিয়ারী বাইজী ও শ্রীকান্তের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হওয়া সত্বেও তাহার মধ্যে যে এক শুদ্ধাচারিণী বিধবা নারী বিরাজিত ছিল তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এই নারীটি তাহার বদ্ধমূল সংস্কার ও দৃঢ়নিষ্ঠ ধর্মবোধ লইয়া তাহার হৃদয়বৃত্তির সকল প্রকার বাসনাকামনার দাবী সজোরে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। এই নারীটিই গঙ্গামাটিতে অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া তাহার বাসনাকামনাময়ী সত্তার উপরে প্রাধান্যবিস্তার করিয়াছিল। সুনন্দার সান্নিধ্যে আসিয়া পূজা-অর্চনা ব্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারে সে এতখানি মাতিয়া উঠিল যে, শ্রীকান্তের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাহার আর রহিল না। মাঝে মাঝে সে অনুভব করিত যে, তাহার ক্রমবর্ধমান শৈথিল্য ও উদাসীনতা শ্রীকান্তকে পীড়া দিতেছে, কিন্তু ধর্মের মাদকতায় সে এমনি বিভোর হইয়া ছিল যে, নিজেকে সে আর শ্রীকান্তের দিকে টানিয়া আনিতে পারে নাই। গঙ্গামাটি ছাড়িবার পরও গঙ্গামাটির ধর্মীয় আবেগ তাহাকে ছাড়িল না। বরং কাশীতে পৌছিবার পর তাহা একটি উৎকট আত্মনিগ্রহের রূপ ধারণ করিল। সে তাহার সকল সাজ ও আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া তাহার দীর্ঘবিলম্বী কেশদাম ছাঁটিয়া একেবারে সর্বরিক্তা সন্ন্যাসিনীর রুক্ষকঠোর মূর্তি ধারণ করিল। শ্রীকান্তের প্রয়োজন তখন তাহার কাছে একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে। সেজন্য তাহার বহুকাঙ্ক্ষিত শ্রীকান্ত যখন স্বল্পসময়ের মধ্যেই বিদায় চাহিল তখন সে কোন আপত্তি করিল না! শ্রীকান্ত দূরদেশে রওনা হইতে চলিয়াছে, আগে এই অবস্থায় রাজলক্ষী কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইয়া পড়িত কিন্তু সেদিন রাজলক্ষীর চোখ হইতে এক ফোঁটা জলও বাহির হইল না, এক নিরুত্তাপ ঔদাসীন্যে সে শ্রীকান্তকে শেষ বিদায় জানাইল।

'শ্রীকান্তে'র অন্যান্য পর্বের মত এই পর্বেও কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী উজ্জ্বল চরিত্র কাহিনীর উপর ক্ষণিক অথচ তীব্র আলোকপাত করিয়া নেপথ্যে সরিয়া গিয়াছে। প্রথমেই বজ্রানন্দের কথা মনে পড়ে। বজ্রানন্দ, অথবা সংক্ষেপে আনন্দ সাধারণ সন্ন্যাসী নহে। সম্ভবত শরৎচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই চরিত্রটি চিত্রিত করিয়াছিলেন, সেজন্য দেখিতে পাই আনন্দ সেবাধর্মকেই জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বামিজীর

মতই পরাধীন, হতভাগ্য ভারতের জন্ত এক প্রবল ও বেদনাময় অনুরাগ বোধ করিয়াছে। আনন্দ সংসারসম্পর্কমুক্ত, অথচ বৃহত্তর সংসারের সকল মা-বোনের স্নেহের বাঁধন সে অস্বীকার করতে পারে না। সন্ন্যাসী হইলেও ভোজনে তাহার অনাসক্তি নাই, সংসারী মানুষের হৃদয়লীলা সে বুঝিতে পারে এবং গাম্ভীর্যের মুখোশ ধারণ না করিয়া প্রীতিকর কৌতুকদীপ্ত কথাবার্তার দ্বারা তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ রমণীয় করিয়া তুলিতে জানে। সে আসিয়াই রাজলক্ষ্মীর স্নেহযত্নের একটি মোটা অংশের উপরে যখন দাবী জানাইয়া বসিল, তখন শ্রীকান্তের মন ঈর্ষা-অভিমানে ঈষৎ পীড়িত হইলেও এই সরস, উদার, প্রাণ-খোলা নবীন সন্ন্যাসীটিকে সেও পছন্দ না করিয়া পারে নাই।

আনন্দের মত সুনন্দাও এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। শ্রীকান্ত নিজে বলিয়াছে, 'যে কয়টি নারী চরিত্র আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহার একটি সেই কুশারী মহাশয়ের বিদ্রোহী ভ্রাতৃজায়া।' প্রাচীন ভারতের বিদুষী, তেজস্বিনী নারীর আদর্শে লেখক সুনন্দা চরিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন। সে শুধু আচার্যানী নহে, স্বয়ং আচার্যাও বটে, শিষ্যকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের মত কঠিন গ্রন্থও সে পড়াইয়া থাকে। শোচনীয় দারিদ্র্য বরণ করিয়াও সুনন্দা ন্যায় ও ধর্মের গৌরবদীপ্ত ভূষণে নিজেকে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। অন্যায়ের দ্বারা অর্জিত সম্পদ সে কিছুতেই ভোগ করিতে চাহে নাই এবং তাহার ভাসুর ও জায়ের সকল কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও নিজেকে অটল কঠোরতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ, স্নেহপ্রীতির অমূল্য দান সবই সে তাহার অত্যাজ্য আদর্শের জন্ত অম্লানচিত্তে বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু সুনন্দার কথা আমরা অন্তের মুখেই বেশি শুনিয়াছি, তাহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের বেশি হয় নাই। তাহার সহিত রাজলক্ষ্মীর কি কি কথা হইয়াছে, কিভাবে সে রাজলক্ষ্মীর উপরে অতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার বিবরণ আমরা পাই নাই। তাহার ন্যায়-ধর্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়বৃত্তির কোন নিদর্শন আমাদের চোখে পড়ে নাই। সেজন্ত চরিত্রটির প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা জাগ্রত হইলেও সে আমাদের অন্তরে কোন রসানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে না। বরং তাহার তুলনায় অন্যায়কারিণী ও অনুতপ্ত স্নেহে

বিগলিতা কুশারীগৃহিণী চরিত্রটি আমাদের অন্তরের কাছে অধিকতর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। ন্যায়ধর্মের গর্বে যে অভিমানিনী নারীটি তাহাদের যৌথ গৃহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল সে ন্যায়ধর্মের মর্যাদা রাখিল বটে কিন্তু স্নেহান্ধ কুশারীদম্পতির প্রাণে সে যে কি দারুণ আঘাত হানিয়া গেল তাহা সে বিন্দুমাত্র চিন্তা করিল না। কুশারীগৃহিণী এই তেজস্বিনী, কঠিনহৃদয়া নারীটিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য যে কাতর মিনতি ও অশ্রুসজল অনুযোগ জানাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি এক বিস্ময়াভিভূত সমবেদনা বোধ না করিয়া আমরা পারি না। এই গ্রন্থের আর দুইটি সজীব স্মরণীয় চরিত্র হইলেন চক্রবর্তী ও তাঁহার স্ত্রী। দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ ও নিষ্ঠুর সমাজনিগ্রহ সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে সদাশয় ও অতিথিবৎসল পল্লীমানুষের যে পরিচয় পাইলাম তাহা কখনও ভুলিবার নহে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভাব-অনটনজনিত তিক্ত ঝগড়া-বিবাদ সত্ত্বেও স্নেহমমতার যে স্নিগ্ধসরস ধারা উভয়ের অন্তরে প্রবাহিত ছিল তাহা এক অনুপম মাধুর্যে চরিত্র দুইটিকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রোগ-শোক ও মৃত্যু কবলিত পল্লীসমাজের এক ভয়াবহ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। অবশ্য এই ধরণের চিত্র পূর্বে 'পণ্ডিত মশাই' প্রভৃতি উপন্যাসে আমরা পাইয়াছি। সতীশ ভরদ্বাজের শুশ্রূষা করিতে আসিয়া শ্রীকান্ত তাহার জীবনের এক তিক্ততম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল। ঔষধ-পথ্য ও সেবাশুশ্রূষার অভাবে মানুষ যে কিভাবে পশুর মত অসহায় ভাবে মরিতে থাকে তাহা শরৎচন্দ্র নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইসব মানুষগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীকান্ত নিষ্ফল ক্ষোভ ও অসহ্য বেদনায় পীড়িত হইয়া বলিয়াছে, 'আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা—দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।' মানুষের মৃত্যু অপেক্ষাও মনুষ্যত্বের মৃত্যুই শ্রীকান্তকে অধিক বিচলিত করিয়াছে। ধনীর অপরিমিত ধনলোভ দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষগুলিকে এক শোচনীয় জান্তব অবস্থায় টানিয়া আনিয়াছে। তাহারা দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রমের পর তাহাদের স্বল্প বিশ্রামের সময়টুকু সামাজিক শাসন ও নীতিসম্পর্কহীন উদ্দাম প্রবৃত্তিবিলাসের পঙ্কে ডুবিয়া

থাকে। তাহাদের আশা নাই, ভরসা নাই, ভবিষ্যতের কোন স্বপ্ন নাই। এমনিভাবে দিন কাটাইতে কাটাইতে একদিন নিদারুণ সংক্রামক ব্যাধির অতর্কিত আক্রমণে পার্থিব জীবনের হিসাব নিকাশ চুকাইয়া হঠাৎ পরলোকের দিকে যাত্রা করে। একটি নয়, দুইটি নয়, দলে দলে মানুষ কীটপতঙ্গের মত মরিতে থাকে, অথচ তাহাদের মৃত্যু সংসারের নিয়মে একটুও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না, সমাজের বুকে একটি চাঞ্চল্যের তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে না।

এই উপন্যাসে সমাজের আর একটি স্তরের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রামের ডোম সমাজের আচার ব্যবহার, তাহাদের শিথিল ও খেয়ালনিয়ন্ত্রিত জীবন এখানে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ডোম নরনারী লইয়া অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস লিখিয়াছেন। তারাশঙ্করেব বর্ণনীয় জগতের পূর্বাভাস যেন আমরা এই উপন্যাসে পাইলাম। এই সমাজের চিত্রে শরৎচন্দ্র অনেকখানি কৌতুকরস সঞ্চার করিয়াছেন। ডোমেদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের অনুকরণে মন্ত্রোচ্চারণের দিকে কি অসাধারণ আগ্রহ! সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চাবণ করিতেই হইবে। সেই সংস্কৃতভাষার অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, যথা, 'মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ,' 'ভগবতী ডোমায় পুত্রায় নমঃ,' 'মধু ডোমায় কন্যায় ভুজ্যপত্রং নমঃ', 'যুগলমিলনং নমঃ'। এই ধরণের বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়া বর ও কন্যার বিবাহবন্ধন একেবারে পাকাপাকি সিদ্ধ হইয়া গেল। নবীন ও মালতীর জীবনযাত্রার যে বর্ণনা লেখক করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, পাহাড়ী নদী যেমন নাচিয়া গাহিয়া নিজের খুশিতে পথ চলে, এইসব তরুণ ডোম-ডোমনীরাও তেমনি প্রবৃত্তির রাশ আলগা করিয়া দিয়া জীবনের নিত্য বৈচিত্র্যের সন্ধান করিয়া চলে। সমাজের শান্ত ও পোষমানা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গকুটিল হাসি নিক্ষেপ করিয়া তাহারা অশান্ত জীবনের উত্তেজক মদিরাতেই আসক্ত হইয়া থাকে।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য নহে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষীর রহস্যময়, স্নিগ্ধমধুর প্রেমসম্পর্কই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আগ্রহজনক বিষয়। কিন্তু এই পর্বে সেই সম্পর্কের মধ্যে এক বড় রকমের ফাটল দেখা দিয়াছে। মানঅভিমানের ফলে এই ফাটল দেখা দিলে ইহা খুবই চিত্তাকর্ষক হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ফাটল ক্লান্ত হৃদয়ের

অবসাদ ও ঔদাসীন্য হইতেই ঘটিয়াছে। সেজন্য ইহাতে আমাদের রসপিপাসা উদ্দীপিত হয় না। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী এখানে পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের স্বতন্ত্র কর্ম ও ভাবনার ক্ষেত্রে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য উপন্যাসের রসের আবেদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর চরিত্র ছাড়া এই পর্বে এমন কোন পার্শ্ব চরিত্র নাই যে তাহার নিজস্ব চরিত্ররসের দ্বারা পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, দ্বিতীয় পর্বের অভয়ার মত কোন চরিত্রও এখানে নাই যাহার স্বতন্ত্র চরিত্র-ঔজ্জ্বল্য কাহিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারে। শ্রীকান্তের দৃষ্টিভঙ্গি (অর্থাৎ, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি) এই পর্বে আবেগধর্মী ও রসসন্ধানী না হইয়া অনেকটা যেন মননধর্মী, বিচারশীল ও তত্ত্ববিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকান্তের নিঃসঙ্গতার ফলেই এখানে তাহার মধ্যে একপ্রকার অন্তর্মুখীনতা ও নিভৃত দুঃখবিলাসের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পর্বে কৌতুকের উজ্জ্বলতা ও কারুণ্যের গভীরতা কোনটাই নাই। ইহার সর্বত্র একটা ধূসর, বিবর্ণ ও অবসন্ন জীবনের ছায়া ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি প্রবন্ধ লইয়া শরৎচন্দ্র আর একবার রবীন্দ্রনাথের সহিত বাদ-প্রতিবাদে জড়িত হইয়া পড়েন। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যধর্ম' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সাহিত্যের নগ্নতা ও অশ্লীলতাই প্রবন্ধটির মধ্যে একটু কঠোর ভাষায় নিন্দিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্যপদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রুতা আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।'

কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামে 'বিচিত্রা'র পরবর্তী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন।

ঐ সময়ে শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্ত দাস আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্র একদিন তাঁহার কাছে কি মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করেন। তখন অনেকেই শরৎচন্দ্রকে তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান। ১৩৩৪ সালের ১০ই ভাদ্র শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিলেন, 'নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি, ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন পাছে আমি ততটা পেরে না উঠি।'

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রতিবাদ করিয়া এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বক্তব্য সমর্থন করিয়া শরৎচন্দ্র ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে 'সাহিত্যের রীতিনীতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করা হইয়াছে এ-অভিযোগ শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গজনদের মধ্যে কেহ কেহ করিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তিনি রাধারাণী দেবীকে একখানি পত্রে লিখিলেন, 'আমার লেখা সাহিত্যের রীতিনীতি প'ড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেছ। তোমার মনে হয়েছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি, আমার গুরু স্থানীয় তিনি। এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর একরকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হ'য়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।'

১৩৩৪ সালের ২১শে আশ্বিন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও তিনি অনুরূপ একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, 'কেউ কেউ অতিশয় দুঃখিত হয়ে জানিয়েছেন রবিবাবুকে আমার ওরকম কঠিন কথা লেখা উচিত হয়নি। আমার লেখার মধ্যে নাকি শ্লেষ পর্যন্ত আছে। তাঁর অতি ভক্তদের প্রতি হয়ত আছে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোথায়—অযথা বিদ্রূপ বা আক্রমণ আছে আমি ত আরও

একবার পড়েও খুঁজে পেলাম না। তুমি পেয়েছ? মানুষগুলো কি নির্বোধ। তাই ভাবি।'

শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধটি পড়িয়া সকলেরই মনে হইবে যে, শরৎচন্দ্র হয়তো রবীন্দ্রনাথের মতামত লইয়া সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু কবিগুরুর প্রতি কোথাও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধটির শেষ অংশ উদ্ধৃত করিলেই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাইবে, 'বিশ্বকবির এই সাহিত্যধর্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙলা সাহিত্যসেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই; আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে গুরুদেব বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।'

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ঐ বছর সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারাও একই জেল হইতে ছাড়া পান। একই সময়ে ১৯২৪ সালের রেগুলেশন আইন ও বেঙ্গল অর্ডিনান্স আইনে ধৃত রাজবন্দীগণও জেল হইতে বাহিরে আসেন। কিন্তু এই সব রাজবন্দী মুক্তিলাভ করিয়াও সুখ ও স্বস্তির মুখ দেখিতে পারিলেন না। আত্মীয়স্বজনের দ্বার তাঁহাদের সম্মুখে অবরুদ্ধ হইল, পরিচিতজন ভয় ও সন্দেহের চোখে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল এবং পুলিশের গুপ্তচর দিনরাত শাণিত দৃষ্টি লইয়া তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিল। কংগ্রেসের লোকেরাও তাঁহাদিগকে খুব সুনজরে দেখিত না। এই সব কারণে মুক্তিলাভ করিয়াও রাজবন্দীদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল।

শরৎচন্দ্র এই সব বিপ্লবী রাজবন্দীকে তাঁহাদের যোগ্য সম্মান দিবার জন্য প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা জানাইবার আয়োজনে তিনি মাতিয়া উঠিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইল। শরৎচন্দ্র

সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন। শরৎচন্দ্র সভাসমিতি সম্বন্ধে স্বভাবত কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু এই সম্বর্ধনার ব্যাপারে তিনি তাঁহার সকল কুণ্ঠা সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ উদ্যমে প্রকাশ্যভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে লাগিলেন।

সম্বর্ধনা-সভায় মুক্ত রাজবন্দীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গবর্ণমেণ্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিরচঞ্চল চিরজীবী চিরতরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি, তোমাদের এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।'

এই সম্বর্ধনাসভা রাজবন্দীদের সম্পর্কে দেশের লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিল। যাঁহারা মাত্র কিছুদিন আগেই ছিলেন সকলের উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত, এখন তাঁহারাই সর্বত্র সম্মানিত ও সম্বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার অগ্নিময় বাণী, দুঃসাহসী সংগ্রাম এবং সর্বস্বত্যাগের প্রদীপ্ত আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। বিপ্লবী বাংলা আবার বজ্রমন্ত্রে জাগিয়া উঠিল এবং কিছুকালের মধ্যেই নানা অসমসাহসিক সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মত বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে এই বিপ্লবী বাংলার অগ্নিময় বিস্ফোরণ ঘটিল।

শরৎচন্দ্রের আয়োজিত এই সম্বর্ধনা-সভা দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি পরিবর্তন আনিল তাহা বর্ণনা করিয়া শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'একটি সাধারণ জনসভা মাত্র, কিন্তু গুরুত্ব তার কম নয়,—অসাধারণ। প্রতিক্রিয়া তার সুদূরপ্রসারী। অনেক কিছুর বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ। গবর্ণমেণ্টের ভীতিপ্রদর্শন নীতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ, দেশের লোকের ভীতিবিহ্বলতার প্রতি চ্যালেঞ্জ, নৈষ্ঠিক গান্ধী-বাদীদের ভায়োলেন্স শুচিবায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জ, ধনিক প্রধান স্বরাজীদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ। ব্যারিস্টার এটর্নী না হলে

মোটরে চড়ে সভায় বক্তৃতা করতে না এলে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স না থাকলে লীডার হয় না এই মনোভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ।'১

## নাট্যজগতের সংস্পর্শে

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে 'ষোড়শী' নাটক রচিত হয়। নাটকটি রচিত হইবার পর তিনি রবীন্দ্রনাথের মতামত চাহিয়া একখানি কপি তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ মতামত প্রকাশ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার উত্তরে শরৎচন্দ্র লিখিলেন, 'এই নাটকখানা লিখেচি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সংকীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কিভাবে যে হ'তে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয় কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই।'

উপরের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র স্বয়ং এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কাহারও কাহারও উক্তি হইতে জানা যায় যে, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রথমে শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী দিয়াছিলেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সরলা দেবী দিলেন আমার হাতে শিবরাম চক্রবর্তীর কৃত দেনাপাওনার নাট্যরূপ। ষোড়শী নামে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। সরলা দেবী বললেন—শরৎ চাটুয্যের লেখা পেয়েছি—ছাপাবো? আমি বললুম—বহু বাধা আছে। ষোড়শীর মালিক শরৎচন্দ্র...এ নাট্যরূপ তাঁর বিনানুমতিতে ছাপালে কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হতে হবে—infringement of copyright—সেজন্য ক্রিমিনাল

১। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৭০—৭১

কেস এবং হাইকোর্টে ড্যামেজ স্যুট!...উপায়? আমি বললুম...তা ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ অপরের দেওয়া—এর কমার্শিয়াল মূল্য কতই বা! আমি বললুম—শিবরামের সামনেই বললুম—শরৎ যদি এ লেখা দেখে শুনে দেন এবং তাঁর নামে ছাপতে দেন, তা হ'লে ছাপা হ'তে পারে। তখন সে ছাপার দাম অনেকখানি। পরের দিন শিবরাম এসে জানালেন, শরৎচন্দ্র রাজী। তবে টাকা চান। তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিবরাম এবং আমি দেখা করি এবং কথা হয়, শরৎচন্দ্র সে লেখাটি ভালো করে দেখে সংশোধন এবং পরিমার্জনা করে দেবেন এবং এ নাট্যরূপ তাঁর দেওয়া বলে ছাপা হবে—শিবরামের নাম এতে থাকবে না এবং এর জন্য পাছে কেউ কখনো বলে, শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাট্যরূপ নয়—সেজন্য to safeguard ভারতীর reputation তিনি লেখা স্বীকৃতি দেবেন যে, তাঁর দেওয়া নাট্যরূপ এর জন্য তাঁকে দেওয়া হবে তিনশো টাকার চেক।

এই প্রস্তাব মতো কাজ হলো। শরৎচন্দ্র সে-লেখা আগাগোড়া দেখে পরিমার্জনা করে দিলেন এবং তাঁর নামেই ষোড়শী ছাপা হলো ভারতীর এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে। তাঁকে দিলেন সরলা দেবী ভারতীর তরফ থেকে তিনশো টাকার চেক। এ-টাকা থেকে শরৎচন্দ্র অবশ্য শিবরামকে একশো টাকা দিয়েছিলেন।'[১]

রবীন্দ্রনাথ 'ষোড়শী' সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কাছে লিখিত পত্রে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা 'ষোড়শী'র অনুকূলে নহে। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েছ এবং তার দানও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ। যে-ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হ'তে পারে না—কিন্তু হতে গেলে যে ভাবা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হ'তে পারত সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে-কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে

১। 'ষোড়শী'র নাট্যরূপ যে শিবরাম চক্রবর্তীর দেওয়া তাহা শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁহার 'সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রে'র মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন।

একান্ত সত্য করা। লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী একটি রচনা করা নয়।' শরৎচন্দ্রের উক্তিতে জানা যায় যে, 'ষোড়শী'র কাহিনী একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত অথচ তাহা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ষোড়শীচরিত্রটিকে 'ফরমাসের মনগড়া জিনিস' বলিয়াছিলেন। ইহাতে শরৎচন্দ্র ব্যথিত হইয়াছিলেন। কবির চিঠির উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয় নি, বিকৃত করেছে। সত্যঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হ'তে পারে কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।'

শরৎচন্দ্রের চিঠির উত্তরে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'তোমার নাটকে যে Perspective এর কথা বলেছি সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েছ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে বলতে তা হ'লে ভাষায় ঘটনায় অন্যরকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হ'লে তবেই সেটা সত্য হয়।'

রবীন্দ্রনাথ হয়তো ষোড়শীর ভৈরবীরূপটি যথাযথ বাস্তবধর্মী হয় নাই বলিয়াই অভিযোগ করিয়াছেন। ষোড়শীর অলকা ও বিদ্রোহিণী প্রজ্ঞানেত্রী

সত্তা তাহার ধর্মীয় ভৈরবী সত্তাকে কিছুটা হয়তো আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু ষোড়শীর পরিবেশ ও আচরণের মধ্যে তাহার বাস্তব রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য নাই এ-কথা বলা চলে না। ষোড়শী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সুবিচার করেন নাই।

'ষোড়শী'র কাহিনী একমাত্র জীবানন্দচরিত্রের পরিণতি ব্যতীত 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের কাহিনীই অনুসরণ করিয়াছে। উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটি বৃহদাকার এবং তাহাতে বহু ঘটনার শিথিল সমাবেশ রহিয়াছে। কিন্তু নাট্যকার উপন্যাসের নাটকীয় অংশগুলিই নির্বাচন করিয়া নাটকের মধ্যে উপস্থিত করিয়াছেন। ঘটনাসংস্থাপনেও ঋজুতা, সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতাব রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। যে সময়ে 'ষোড়শী' রচিত হইয়াছিল তখন নাটকের মধ্যে পঞ্চাঙ্কবিভাগ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক দৃশ্যের অবতারণা করা হইত। কিন্তু এই নাটকে অঙ্ক সংখ্যা চার এবং দৃশ্য সংখ্যা মোট নয় মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে মাত্র একটি করিয়া দৃশ্য রহিয়াছে। দৃশ্যগুলি ইবসেনীয় রীতিতে দীর্ঘ বলিয়া ঘটনার মধ্যে ঘনীভূত নাট্যরস জমিয়া উঠিতে পারিয়াছে। নাটকের মধ্যে চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাত এবং আকস্মিক ভাবে অবস্থার বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া তীব্র নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। মদ্যপায়ী দুর্দান্ত জমিদারের গৃহে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ষোড়শীর আগমন, আবার ঐ ভয়সন্ত্রস্ত দুর্বল নারীর কাছে উচ্ছৃঙ্খল নরপশু জমিদারটির কাতর আত্মসমর্পণ এবং ষোড়শীর আকস্মিক চিত্তপরিবর্তন, অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সাগরসর্দার ও তাহার দলবলের প্রচণ্ড প্রতিশোধের আয়োজন, ষোড়শী ও জীবানন্দের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ-বিকর্ষণের হৃদয়লীলা প্রভৃতি অবলম্বনে নাট্যকার তীব্রগতিশীল নাট্যক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

নাটকের নাম 'ষোড়শী' রাখা হইয়াছে বটে, কিন্তু নাটকের প্রধান চরিত্র ষোড়শী নহে, জীবানন্দ। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে ষোড়শী জীবানন্দের সম্বন্ধ-নির্মল-হৈমবতীর কাহিনী দ্বারা অনেকখানি বিঘ্নিত ও আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু নাটকে নির্মল-হৈমবতীর কাহিনী প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থান গ্রহণ করে নাই। নাটকে ষোড়শী-জীবানন্দের সম্বন্ধটি নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্য দিয়া গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ষোড়শীর মধ্যে ষোড়শী ও

অলকার অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ঘটনাস্থল হইতে ষোড়শীর আকস্মিক অন্তর্ধানের ফলে চরিত্রটির নাটকীয় সুপরিণতি ঘটে নাই। কিন্তু জীবানন্দ চরিত্রটির উপস্থাপনাতেই নাটকের আরম্ভ এবং চরিত্রটির মৃত্যুতে নাটকের শেষ। উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ ভিতরে ভিতরে যে কত দুর্বল ও জীবনরসপিপাসু নাট্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। অলকার সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাহার বাহিরের দুর্দান্ত ভয়ঙ্কর রূপটি কিভাবে অন্তর্হিত হইল এবং ভিতরের মানবিক স্নেহকরুণ রূপটিই কিভাবে উদার ও মহৎ পরোপকারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল তাহা নাটকের মধ্যে ভাল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'দেনা পাওনা' উপন্যাসের সঙ্গে 'ষোড়শী' নাটকের প্রধান পার্থক্য হইল জীবানন্দ চরিত্রের পরিণতিতে। উপন্যাসে আছে, 'সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।' নাটকে কিন্তু পরিশেষে জীবানন্দের মৃত্যুই ঘটানো হইয়াছে। মৃত্যুতে হয়তো নাট্যচমৎকারিত্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে কিন্তু এই মৃত্যু আখ্যানভাগের অনিবার্য পরিণতি নহে, এবং ইহা ঘটিয়াছে নিতান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে।[১] জীবানন্দ দীন ও দুঃস্থ লোকেদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার পূর্ব পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, ষোড়শীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিয়া সে অলকার ভালোবাসার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, অনুতপ্ত চিত্তের আঙ্গিনায় বিরহী প্রেমের আলো জ্বালাইয়া রাখিয়া সে অলকার প্রত্যাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে। এই চিরবঞ্চিত ও সর্বরিক্ত লোকটিকে অলকা আসিয়া হাত ধরিয়া লইয়া যাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। লোকসেবার মধ্য দিয়া তাহার যে পুনর্জন্মের সূচনা হইল মৃত্যুতে তাহার যেন আকস্মিক সমাপ্তি ঘটিয়া গেল। জীবানন্দের মৃত্যু ঘটাইতে হইয়াছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ইচ্ছা অনুসারে। শরৎচন্দ্র এই মৃত্যুঘটনা দেখাইতে চাহেন নাই, কিন্তু শিশিরকুমারের আগ্রহাতিশয্যে শরৎচন্দ্র অবশেষে এই মৃত্যুর দৃশ্য নাটকের মধ্যে আনিয়াছেন। শিশিরকুমার

১। উইলিয়াম আর্চার তাঁহার 'Play Making' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নাটকের সমাপ্তিতে মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'We must, in other words believe that he dies because he can not live, and not merely to suit, the playwright's convenience and help him to an effective curtain.'

Play Making (Dover)—P. 234.

নিজেই বলিয়াছেন, 'দেনা পাওনার চেয়ে ষোড়শীতে জিনিসগুলো গুছিয়ে বলা আছে তা সত্যি, কিন্তু সবইত ওতে ছিল নইলে আমি পেলুম কোথা থেকে ? ওতে জমিদারি চ'লে যাবে একথা পরিষ্কার লেখা আছে। জীবানন্দের মৃত্যুর কথাটা অবশ্য আমি বলি। বললুম—জমিদারি চলে যাবে আর জমিদার থাকবে, তা হয় না।

প্রথমে ত কিছুতেই মানবেন না। তারপর অনেক তর্ক ক'রে অনেক বুঝিয়ে তবে মেনে নেওয়াতে পারি।'[১] শিশিরকুমার যাহাই বলুন না কেন জীবানন্দের মৃত্যু সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের পূর্বমতই যে ঠিক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

'ষোড়শী' ১৩৩৪ বাং সালের ২১শে শ্রাবণ শনিবার নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হয়। প্রধান ভূমিকাগুলিতে যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন,—জীবানন্দ—শিশিরকুমার ভাদুড়ী, জনার্দন রায়—যোগেশ চৌধুরী, সাগর সর্দার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ষোড়শী—চারুশীলা ইত্যাদি। নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী'র অভিনয় অভিনয়-জগতে নূতন যুগ প্রবর্তন করিয়াছিল। এ-বিষয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য 'নাট্যমন্দিরের প্রথম স্মরণীয় দান হচ্ছে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'। মেলোড্রামার দ্বারা সমাচ্ছন্ন বাংলা রঙ্গালয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী নাটক বলতে ষোড়শীকেই বুঝায়। আজ পর্যন্ত বর্তমান যুগের আর কোন নাটকই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেনি। বাহুল্যহীন তার সৌন্দর্য, সূক্ষ্ম তার ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত, অপূর্ব তার মনোবিজ্ঞানের আলো-ছায়া। 'ষোড়শী'র প্রধান পুরুষ ভূমিকায় (জীবানন্দ) শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে তখন আমরা যা বলেছিলুম, এখানে তারই কতক আবার শুনিয়ে রাখি।

শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান আমরা এই জীবানন্দের ভূমিকার মধ্যে লাভ করেছি। শরৎচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সঙ্গে শিশিরকুমারের অভিনয়-প্রতিভার মিলনে যে কি মধুর সুধার আস্বাদ লাভের সুযোগ উপস্থিত, না দেখে তা ধারণা করা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব! শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এ হচ্ছে আর এক অভিনব সৃষ্টি, নূতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখা ভাবের মূর্তি।

১। শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু।

রঙ্গালয়ের জীবানন্দ কোথাও কর্ণভেদী গর্জন বা হস্তপদের প্রচণ্ড আস্ফালন করেনি কিংবা মুখ বিকৃত ক'রে কোলের ছেলেদের ককিয়ে তোলেনি ; অথবা চলচ্চিত্র ও বিলাতী অভিনয়ের সচিত্র কেতাব থেকে হরেকরকম ভঙ্গি চুরি ক'রে আমাদের চোখকে চমকে দিতে পারেনি।......পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম দৃশ্যে শিশিরকুমারের অভিনয়ে বিশেষ ক'রে যে সৌন্দর্য, যে ভাববৈচিত্র্য ও যে হাসি কান্নার প্রশান্ত ইঙ্গিত ফুটে ওঠে, দর্শকদের হৃদয় তাতে মৌন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত না হ'য়ে পারে না। জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয়,—অভিনয় বললে তাকে যেন ছোট করা হয়—আসলে তা' হচ্ছে সৃষ্টি, স্বাধীন সৃষ্টি—যা নাটকের মুখাপেক্ষা করে না। আমাদের বিশ্বাস শিশিরকুমার জীবানন্দের স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেও অতিক্রম করেছেন।'[১]

'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় দেখিয়া শরৎচন্দ্রও যে খুশি হইয়াছিলেন তাহা বারবার তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ২৭. ৮. ২৭ তারিখে মণীন্দ্রনাথ রায়কে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, 'ষোড়শী' অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি, এবং তারই জের চলছে। জলে ভিজে, কাদায় হেঁটে এই influenza। তুমি পারো ত একবার গিয়ে দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির এবং চারুর অভিনয় দেখবার মত বস্তু।' ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আপনি ষোড়শীর কথা শুনলেন কার কাছে? শিশিরের অভিনয় দেখেছেন? কি চমৎকার করে। বইটা আমার উপন্যাস দেনাপাওনার গল্প থেকে নেওয়া। থিয়েটারের মত কোরে একটা বইও (নাটক) ছাপানো হয়েছে। পড়েছেন? বই যা হোক, অভিনয় বড় ভালো হয়।'

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট 'পল্লীসমাজে'র কাহিনী অবলম্বনে 'রমা' নাটক রচিত হয়। 'ষোড়শী' নাটকে যে নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল 'রমা' নাটকে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। নাট্যকার এখানে নাটকের প্রয়োজনে পুনর্বিন্যাস করেন নাই। তিনি উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলিই পর পর যথাযথভাবে সংলাপমূলক দৃশ্যে সাজাইয়াছেন। উপন্যাসের পরিচ্ছেদ-সংখ্যা উনিশ এবং নাটকেও চার অঙ্কে মোট উনিশটি দৃশ্য রহিয়াছে। ইহার ফলে নাটকের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট নাটকীয় পরিকল্পনা দেখা যায় না। ঘটনার

১। বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, পৃঃ ৭৯-৮১

ক্রমবর্ধমান গতিবিধান ও ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির দিকে নাট্যকার দৃষ্টি দেন নাই, দৃশ্যগুলির মধ্য দিয়া ঘটনা ঔপন্যাসিক রীতিতে অগ্রসর হইয়াছে। দৃশ্যগুলি 'ষোড়শী'র দৃশ্যের ন্যায় দীর্ঘ নহে, সেজন্য নাট্যরস ঘনীভূত হইবার পূর্বেই দৃশ্য শেষ হইয়া যায়।

কিন্তু এ-সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও 'রমা' রঙ্গমঞ্চে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, আজও পর্যন্ত এই জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নাই। ইহার কারণ, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর এমন একটি আকর্ষণীয়তা রহিয়াছে এবং তাঁহার চরিত্রগুলির এমন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আপাতবৈপরীত্য রহিয়াছে যে তাঁহার নাটক দর্শকদেব মর্মমূল স্পর্শ করে। রমেশ ও রমার সম্বন্ধের মধ্যে এমন অদ্ভুত আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা রহিয়াছে যে তাহা চমৎকার নাটকীয় উপাদান জোগাইয়াছে। এই নাটকের নায়ক-নায়িকা রমেশ ও রমা যেমন প্রবল অবরুদ্ধ আবেগে পরস্পরেব দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে তেমনি আবার প্রচণ্ড প্রতিরোধী শক্তিরূপে পরস্পরের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হইয়াছে। রমেশকে বমার মত কেহ ভালোবাসে নাই এবং রমার মত কেহ আঘাতও করে নাই। যখন সে তাহার সীমাহীন প্রেমের অর্ঘ্য সাজাইয়া রমার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখনই রমার রূঢ় আঘাতে সেই অর্ঘ্য ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। আবার যখন অভিমানে ঔদাসীন্যে নিজের একাকিত্বের মধ্যে সে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে তখনই রমার গহন হৃদয়ের হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত প্রেম বাঁধভাঙা তরঙ্গের মতই তাহার পায়ে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়াছে। রমা চরিত্রের এই বিপরীতমুখী লীলাই নাটকটিকে এক অবিচ্ছিন্ন আগ্রহ ও কৌতূহলের ধারায় জমাইয়া রাখিয়াছে।

নাটকের মধ্যে রমা ও রমেশের পারস্পরিক সম্পর্কের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে এবং উপন্যাস অপেক্ষাও নাটকের মধ্যে এই সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড় ও আবেগতপ্ত রূপ লাভ করিয়াছে। রমেশের সমাজসংস্কারক ও আদর্শবাদী রূপ নাটকের মধ্যে একটু গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সমাজের সংস্কার ও উন্নয়ন সম্বন্ধে উপন্যাসের মধ্যে যে সব দীর্ঘ বর্ণনা ও বিস্তৃত কথোপকথন রহিয়াছে নাটকে সে-সব নীরস ও ক্লান্তিকর হইয়া পড়িত। নাটকের সমাপ্তিও উপন্যাস অপেক্ষা অনেক বেশি চমৎকারজনক। উপন্যাসে রমেশ ও জ্যাঠাইমার কথোপকথনে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু নাটকের

শেষ পরিণতিতে রমা ও রমেশের করুণ বিদায় দৃশ্যই দেখিতে পাই। শেষ বিদায় লইবার সময় রমা বার বার রমেশের মুখে তাহার বড আদরের 'রাণী' ডাকটি শুনিবার জন্য করুণ মিনতি জানাইয়াছে। রমার সকল অব্যক্ত কথা ও অবরুদ্ধ বেদনা ঐ করুণ মিনতির মধ্যে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই অশ্রুসজল বিদায়ের দৃশ্যটি দর্শকের হৃদয়ে মর্মরিত কাতর ক্রন্দন জাগাইয়া তোলে।

'রমা' ১৩৩৫ বাং সালের ১৯শে শ্রাবণ আর্টথিয়েটাব কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় ইহা নাট্যমন্দিরে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বিভিন্ন রজনীতে শিশিরকুমার রমেশ, বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

## সভা ও সম্বর্ধনা

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এ এক মহতী সভায় সম্বর্ধনা জানান হয়। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা-সভায় বাঙ্গলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে সে-কথা স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না। এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখানকার প্রদোষান্ধকাব থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত ক'রে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয় শিখরে আপন প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করছেন।'

সম্বর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, 'হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন

দিন যেন না এতবড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তো আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে। আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড এই অভিযোগ।

এ ভালো কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার ক'রেও দেখিনি—শুধু সেদিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ-সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়। কালে যদি সে মিথ্যা হ'য়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।'

সাহিত্যের চিরন্তনত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অভিভাষণে বলেন, 'কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাডা তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানবচিত্তই তো একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে পায় না! তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে, তার রসবোধ ও সৌন্দর্যবিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুসী হ'য়ে দেয় আর এক যুগে তার অর্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।'

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র ঢাকা জেলার মালিকান্দা অভয়-আশ্রমে পশ্চিম দিনাজপুর যুবক ও ছাত্র-সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে তিনি যে লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন তাহা পরে 'সত্যাশ্রয়ী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ইস্টারের ছুটিতে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের সভাপতিরূপে শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দেন তাহাই পরে 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে কংগ্রেসের সতর্ক, সঙ্কুচিত ও আপসকামী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন এবং যুবসমাজের বিপ্লবী, অগ্নিদীক্ষিত মতবাদকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কংগ্রেস অনেকদিনের—আমারই মত সে বৃদ্ধ; কিন্তু যুব-সংঘ সেদিনের—তার শিরায় রক্ত এখনও উষ্ণ, এখনও নির্মল। কংগ্রেস দেশের মাথাওয়ালা

আইনজ্ঞ রাজনীতি-বিশারদগণের আশ্রয়কেন্দ্র, কিন্তু যুব-সংঘ কেবলমাত্র প্রাণের ঐকান্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরি।' বাংলার যুবশক্তি কিভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়াছে জলন্ত ভাষায় তাহার বর্ণনা দিয়া তিনি সেই যুবশক্তিকে বাহিরের নেতৃত্বের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের উপর নির্ভীক বিশ্বাস রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যুবশক্তির সম্মুখে তিনি বিপ্লবের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিপ্লব হইল সচিন্ত সর্বাত্মক বিপ্লব। তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতেব আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে! কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধ'রে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদেব প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।'

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রের ৫৪তম জন্ম-তিথি উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন জানান হয়। এই অভিনন্দন-সভার বিবরণী ২৪. ৯. ২৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল—

'গতকল্য ৭ই আশ্বিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম শরৎ সমিতি ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার ৫৪তম জন্ম-তিথি উপলক্ষে ফিজিক্স থিয়েটারে অভ্যর্থনা করেন।

সভায় ছাত্র, তরুণ সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। একটি উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সমিতির সেক্রেটারী অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলে এবং উক্ত পত্রে তরুণ গল্পসাহিত্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে শরৎচন্দ্র বলেন যে, তরুণ গল্পসাহিত্যের বিরুদ্ধে আজ যে অভিযোগ উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছেন। তিনি গত একবৎসর অধিকাংশ তরুণ সাহিত্য মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন এবং ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়াছেন যে, তরুণ সাহিত্যে শক্তির পরিচয় থাকিলেও রসবস্তুর একান্ত অভাব।'

## সমাজবিদ্রোহের চূড়ান্ত রূপ—শেষপ্রশ্ন

'শেষপ্রশ্ন' 'ভারতবর্ষের ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ও ফাল্গুন; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ-ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে (২রা মে, ১৯৩১) ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকাকারে মুদ্রিত উপন্যাসের সর্বত্র মিল নাই।

ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল তাহাই লেলিহান অগ্নিশিখা রূপে 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। কয়েক বছর ধরিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন, বিতর্ক ও সংশয় তাঁহার মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছিল। সেগুলি উৎকট প্রকাশ্যতা ও ক্ষমাহীন তীক্ষ্ণতা লইয়া 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হইল। সেজন্য এ-বইয়ের নাম খুবই সার্থক। আগেকার বইগুলিতে যে-সব প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করিয়াছেন সেগুলি আবেগ-অনুভূতির স্পর্শে কোমল এবং শিল্পের রূপ ও রঙের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ-বইয়ের প্রশ্ন শুধুমাত্র প্রশ্ন। তাহা স্পষ্ট, উদ্ধত ও অনাবৃত, তাহা শেষবারের মত উচ্চারিত হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে তীব্রতা ও প্রবলতা সর্বাধিক। ইহার পরে শরৎসাহিত্যে যেন **Anti-climax**, কিংবা শ্লথ, বিপরীতগামী গতি দেখিয়াছি। 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) ও 'বিপ্রদাসে'র মধ্যে বিক্ষুব্ধ প্রশ্ন এবং প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালা অনেকখানি স্থির ও শান্ত হইয়া আসিয়াছে এবং বিদায়বেলাকার স্নিগ্ধ ও করুণ আলোকে তিনি জীবনকে দেখিতে চাহিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর ও ব্রহ্মদেশের সাহিত্যপর্বে হৃদয়বৃত্তিরই একাধিপত্য দেখিয়াছি। দেশে প্রত্যাগমনের পর শেষ পর্বে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য দেখিয়াছি। 'চরিত্রহীনে' বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল রচনার সূচনা এবং 'শেষপ্রশ্নে' তাহার

পরিণতি। 'চরিত্রহীনে' বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সুমিত সামঞ্জস্য, 'পথের দাবী'তে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য এবং 'শেষপ্রশ্নে' বুদ্ধিবৃত্তির নিরঙ্কুশ একাধিপত্য।

'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশিত হইলে ইহা সাহিত্যসমাজে প্রচণ্ড বিতর্ক ও প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিল। মধুমত্ত সাহিত্যপাঠক ও সমালোচকগণ এতকাল সাহিত্যের যে শাশ্বত মধুচক্রে পরিতৃপ্ত চিত্তে মগ্ন হইয়াছিলেন শরৎচন্দ্র যেন হঠাৎ তাহার প্রতি সজোরে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সব পাঠক ও সমালোচক ক্ষিপ্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় আসিয়া শরৎচন্দ্রকে দংশন করিতে শুরু করিল। পুনঃ পুনঃ বহু দংশনের জ্বালা সহ্য করিয়া যেন ইহাতে তিনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী ... সেনকে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'হাঁ, শেষ প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁচেছে। অন্ততঃ, যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায় যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি।' চতুর্দিকব্যাপী সমালোচনা ও প্রতিবাদের মধ্যে দুই একজন অনুরাগী পাঠকপাঠিকার প্রশংসা ও অভিনন্দন পাইলে তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিতেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে তিনি ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'শেষপ্রশ্ন তোমার ভাল লেগেচে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ-বই ভালো লাগবার মানুষ বাঙ্‌লা দেশে হয়ত পাবো না, শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখছি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে।'

'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে যে নূতন সাহিত্যের পথনির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন তাহা শরৎচন্দ্র একাধিক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। রাধারাণী দেবীকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, 'অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত। বুড়ো হয়ে এসেছি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ—ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে বড় ক'রে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকি রইল।' ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত আর একখানি পত্রেও শরৎচন্দ্র অনুরূপ ভাব

ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 'শেষপ্রশ্নে অতি-আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। খুব কোরবো, গর্জন ক'রে নোঙরা কথাই লিখবো, এই মনোভাবটাই অতি-আধুনিক সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া।'

আধুনিক সাহিত্যের গতিনির্ধারণ শরৎচন্দ্র কিভাবে করিতে চাহিয়াছেন তাহা 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই চাহিয়াছিলেন যে, আধুনিক উপন্যাসকে শুধুমাত্র আবেগধর্মী হইলেই চলিবে না, তাহাকে মননধর্মী হইতে হইবে। আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা, তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক শতপ্রকার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, মানুষের ক্রমবর্ধমান সার্বিক মুক্তিপ্রচেষ্টা প্রভৃতি বর্তমান উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। আধুনিক ঔপন্যাসিক মানুষকে শুধু কেবল তাহার ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে না দেখিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশের এক একটি সজাগ ও সক্রিয় শক্তিরূপেই দেখিয়া থাকেন। সেই প্রতিবেশের সহিত আকর্ষণ ও সংঘর্ষণের মধ্য দিয়া তাহার মননশীল ও ক্রিয়াশীল সত্তার কিরূপ উন্মোচন হয়, তাহাই এখনকার উপন্যাসের মধ্যে দেখান হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের গলসওয়ার্দি, হাক্সলী, জেমস জয়েস, ভারজিনিয়া উলফ প্রভৃতির উপন্যাসে এই মননশীল বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতি দেখা গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রভৃতির উপন্যাসও এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

উপন্যাসের মধ্য দিয়া স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে সমাজবিদ্রোহ প্রচার করা হয়ত শরৎচন্দ্র আধুনিক ঔপন্যাসিকের কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভিক্টোরীয় যুগের অনেক আদর্শও নীতিই জীর্ণ পাতার মত খসিয়া পড়িল। রাজনৈতিক সমস্যার প্রবল আঘাতে আমাদের বহুদিনকার লালিত সংস্কার ও নীতিধর্মের ধারণা বেগবান তরঙ্গের মুখে ভাসমান শৈবালদামের ন্যায় বিলুপ্তির পথে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইবসেন, ভিক্টর হিউগো, শেকভ প্রভৃতির নাটক-উপন্যাসে সমাজবিপ্লবের সূচনা দেখা গিয়াছিল এবং বর্তমান শতাব্দীতে বার্নার্ড শ-এর নাটকে এবং হামসুন, বোয়ার, গোর্কি, কুপরিন প্রভৃতির

উপন্যাসে এই বিপ্লবের প্রকাশ্য সমর্থন দেখা গেল। বাংলা সাহিত্যে 'শেষপ্রশ্নে'র সময়ে ও পরবর্তীকালে অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র শৈলজানন্দ-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুর উপন্যাসে শরৎচন্দ্রপ্রদর্শিত সমাজবিপ্লবের পথই অনুবর্তন করা হইয়াছে।

'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ও ক্ষুরধার পথে চলিয়াছেন। কলাকৈবল্যবাদী (Art for art's sake সমর্থক) পাঠক ও সমালোচকগণ অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, এই বইতে তিনি শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া উগ্র প্রচারবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। এই ধরণের সমালোচনা সম্পর্কে তিনি সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী· · সেনকে একটু উষ্মার সঙ্গে লিখিয়াছিলেন, 'পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art's sake—এসব যেন ওদের নখাগ্রে। গল্পের গল্পত্বই মাটি কারণ চিত্তরঞ্জন হোলো না যে। কার চিত্তরঞ্জন? না আমার। গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা।' শরৎচন্দ্র যে অন্তত 'শেষপ্রশ্ন' লেখার সময় art for art's sake অথবা কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তাহা দিলীপকুমার রায়কে ১৩৩৮ সালের ৪ঠা কার্তিক একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'কতকটা তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানিনে। যেমন art for art's sake, ধর্ম for ধর্মের sake, truth for truth's sake ইত্যাদি। Art এর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, ওর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যাওয়া এবং তারই পরে এক ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ।'

কলাকৈবল্যবাদের বিরোধিতায় শরৎচন্দ্রকে বর্তমান শতাব্দীর সেরা প্রচারধর্মী নাট্যকার বার্নার্ড শ-এর সমগোত্রীয় বলিয়া মনে হয়। তিনি যে নিজেই বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে তাঁহার মতের সাধর্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন তাহা এক স্থানে নিজের সমর্থনে শ-এর উল্লেখ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীমতী· সেনকে লিখিত পত্রের একস্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'তুমি চিত্তরঞ্জন কথাটি নিয়ে অনেক লিখেচো। কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দুটো শব্দ। শুধু রঞ্জন নয়, চিত্ত বলেও একটা বস্তু রয়েছে। ও পদার্থটা বদলায়। চিৎপুরের দপ্তরীখানায় গোলে-বকাওলির স্থান আছে। ও অঞ্চলে চিত্তরঞ্জনের দাবী সে রাখে। কিন্তু সেই দাবীর জোরে বার্নার্ড শকে· গাল দেবার তার অধিকার জন্মায় না।' বার্নাড শ বলিয়াছিলেন, 'for art's-

sake alone, I would not write a single line.' অবশ্য বার্নার্ড শ যেমন জোরের সঙ্গে Art for art's sake এর বিরুদ্ধে বলিয়াছেন, তেমনি আবার বিশুদ্ধ শিল্পের পক্ষেও অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি বলিষ্ঠ যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিশুদ্ধ শিল্পসৌন্দর্যের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। রাস্কিন বলিয়াছেন, The most beautiful things of the earth are the most useless, the peacock and the lily for example.' যাঁহারা সাহিত্যকে মত ও তত্ত্বপ্রচারের বাহনরূপে ব্যবহার করিতে চান তাঁহারা সাহিত্যের নিত্যতায় বিশ্বাসী নহেন। কিন্তু এই নিত্যতাই তো সাহিত্যের ধর্ম এবং ইহার দ্বারাই সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ধারিত হইয়া যায়। সমাজের পরিবর্তন হয়, বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিবর্তন ঘটে, কিন্তু মানুষ ও শিল্পের মূলধর্ম মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। Aspects of the Novel-এর মধ্যে ই. এম. ফরস্টারের উক্তি উল্লেখযোগ্য, 'We may land on the moon, we may abolish or intensify warfare, the mental process of animals may be underst‹ od ; but all these are trifles, they belong to history not to art. History develops, art stands still'. বার্নার্ড শ তাঁহার নাটকে যেসব তত্ত্ব ও সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন আজ সেগুলির অনেক কিছুই পুরাতন ও অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। সেইসব তত্ত্ব ও সমস্যাই তাঁহার নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাটকের আবেদনও আজ কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁহার গুরু ইবসেনের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। ইবসেন শ-এর পূর্ববর্তী নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও আজও তাঁহার প্রভাব কমে নাই। কারণ তিনি তত্ত্ব ও সমস্যাকে জীবনের অধীন করিয়াছিলেন এবং মতপ্রচার উদ্দেশ্য হইলেও শিল্পের দাবীকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। বড় সাহিত্যিক প্রচারক নহেন, তিনি দ্রষ্টা; তত্ত্ব অপেক্ষা সত্যকেই তিনি প্রাধান্য দেন। ফরস্টার তাঁহার সমালোচনাগ্রন্থে এ-সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি জর্জ এলিয়টের Adam Bede এবং ডস্টয়ভস্কির The Brothers Karamazov হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, Now the difference between these passages is that the first writer is a preacher and the second prophet'.

শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে উগ্র প্রচারবাদী হওয়া সত্ত্বেও ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না যে, তিনি বরাবর সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ প্রচারবাদী ছিলেন। 'শ্রীকান্ত', 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'পণ্ডিতমশাই', 'চরিত্রহীন', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি পূর্ববর্তী বহু উপন্যাসে তিনি সমাজসমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সেইসব উপন্যাসে তিনি বিতর্কের তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিয়া প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করেন নাই, এবং বিচারের সূক্ষ্ম জালবিস্তার করিয়া তাহাকে বন্দী করিতেও চাহেন নাই, কিন্তু তাঁহার সহানুভূতিসিক্ত কথা ও কাহিনী পাঠকের চোখে জল ঝরাইয়াছে এবং মনে আগুন জ্বালিয়াছে। কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে জীর্ণ ও অচল সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য তিনি নিজে অস্ত্রসজ্জিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাঠকসমাজ এখানে নিরুদ্যম ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই শুধু গ্রহণ করিয়াছে। এখানে মুখের কথার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়াছেন বলিয়া হৃদয়রহস্যের দিকে নজর দিবার সময় পান নাই। সেজন্য কমল-শিবনাথের সম্বন্ধ অস্ফুট, কমল-অজিতের সম্পর্ক অবিশ্লেষিত, মনোরমা-শিবনাথের প্রণয় আকস্মিক, আশুবাবুর প্রতি নীলিমার অনুরাগ অপ্রত্যাশিত ও হাস্যকর। 'শেষপ্রশ্নে' শরৎচন্দ্র বহু উত্তপ্ত বিতর্কসভার আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু শান্ত ও নিভৃত অন্তঃপুরের চিত্র দেখান নাই। কোন চরিত্র ক্লান্ত হইয়া অন্তঃপুরের দিকে রওনা হইলেই তিনি তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া বিতর্কসভায় বসাইয়া দিয়াছেন। কমল যে লেখকের মুখপাত্রী তাহা এত স্পষ্ট যে, পাঠককে ভাবিবার, সংশয়ে দোলায়িত হইবার কোন অবকাশ রাখেন নাই। এজন্য কমলের যুক্তিতর্ক শুনিতে শুনিতে পাঠক ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়ে। পাঠক শিখিতে চাহে না, আলোকিত হইতে চাহে। কমল পাঠককে জোর করিয়া ধরিয়া তত্ত্বশিক্ষা দিবার চেষ্টা করে। সেজন্য তাহার কথা বুদ্ধিতে চমক আনে, কিন্তু হৃদয়ে আলোড়ন আনে না। কমলকে লেখক বুদ্ধি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু হৃদয় দিয়া জীবন্ত করিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহার মুখের কথাগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত অনর্গল নির্গত হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের উৎস উত্তপ্ত বালুচরে শুকাইয়া গিয়াছে।[১] কমলের শিক্ষাদীক্ষা কোথায় কিভাবে হইয়াছে

---

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 'কমল একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মতবাদের স্পষ্ট ও জোরালো অভিব্যক্তি মাত্র, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ নহে। একটা ইঞ্জিনের বাঁশি, হৃদয়স্পন্দন নহে।'

জানি না, কিন্তু আগ্রার বাঘা বাঘা অধ্যাপককে সে যুক্তিতর্কের মুখে হারাইয়া একেবারে চীট করিয়া দিয়াছে। অক্ষয় তো শেষ পর্যন্ত কাঁচুমাচু হইয়া তাহার করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। বিলাতফেরত আশুবাবু, ইঞ্জিনিয়ার অজিত প্রভৃতি সকলেই যেন সম্মোহিত হইয়া তাহার কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে। কমলের প্রতি লেখকের এই যে অনুচিত ও অতিশয় পক্ষপাতিত্ব, তাহাব মতবাদের এই যে উগ্র, অসহিষ্ণু জবরদস্তি—এখানেই শিল্পের ভারসাম্য এবং শিল্পীর উদার, অপক্ষপাতী ভূমিকা নষ্ট হইয়াছে।

কমলেব মুখ দিয়া লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে, সেজন্য কমলের উক্তিগুলি বিচার করিলে লেখকের মতবাদ অনেকখানি স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। কমল নোরা, মিসেস অ্যালভিং ও মিসেস ওয়ারেনের সমগোত্রীয়া। তাহার চোখ হইতে অগ্নিবাণ ছুটিয়াছে এবং মুখের বাক্যগুলি এক একটা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত নির্গত হইয়াছে। যাহা কিছু প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত ও চিরমানিত তাহার বিরুদ্ধেই তাহার ভ্রূকুটিল কটাক্ষের তীব্র রোষ বর্ষিত হইয়াছে। সে বলিয়াছে, 'কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তাব পরিবর্তনেও লজ্জা নেই—এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতেব বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও।' কমলের মনে ভারতীয় আদর্শের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নাই। সে ইংরেজের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছে ইংরেজ পিতার কাছে। সেজন্য ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাহার এই অশ্রদ্ধা নিছক বুদ্ধিগত নহে, সহজাতও বটে। সে নিজেকে ভারতের সন্তান না বলিয়া বিশ্বসন্তান বলিতে চাহে, নিজের দেশের বিশিষ্ট ভাবচেতনায় উদ্বুদ্ধ না হইয়া সমগ্র বিশ্বমানবতার সঙ্গে সে আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে চাহে। সে বলিয়াছে, 'বিশ্বের সকল মানব একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধিনিষেধের ধবজা হ'য়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না, এই ত ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন ব'লে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?'

কমল দেহদেবতার অকুণ্ঠ পূজারিণী, যৌবনসঙ্গীতে আকণ্ঠ মগ্ন থাকাই তাহার কাম্য। নিজের দেহযৌবনের দ্বিধাহীন প্রশস্তি জানাইয়া সে বলিয়াছে, 'আমার দেহমনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব

প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে —এ মরেচে।' সম্ভোগের লাগামহীন অশ্ব ছুটাইতেই তাহার অপরিমিত উল্লাস, সেজন্য সংযমের শাসন সে গ্রাহ্য করে না। হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধনা সেজন্য তাহার কাছে উপহাসের সামগ্রী। আশুবাবুর একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের মূল্য তাহার কাছে কানাকড়িও নহে। আশুবাবু যতবার তাঁহার পরলোকগত পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাইতে চাহিয়াছেন ততবারই কমল তীক্ষ্ণ শ্লেষবিদ্রূপের খোঁচা দ্বারা এই আদর্শ ও একনিষ্ঠ প্রেমকে বিদ্ধ করিয়াছে।

কমলের সর্বাপেক্ষা বেশি রাগ বোধ হয় বিবাহেব বন্ধনেব উপবে। এদিক দিয়া তাহাকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও বার্নার্ড শ-এর যোগ্য শিষ্যা মনে হয়। বার্নার্ড শ তাঁহার Man and Superman নাটকে বলিয়াছেন, 'Property and marriage, by destroying Equality and thus hampering sexual selection, with irrelevant conditions, are hostile to the evolution of the Superman, it is easy to understand why the only generally known modern experiment in breeding the human race took place in a community which discarded both institutions.' বিবাহের প্রতি কমলের সুতীব্র অবজ্ঞা বলিয়াই শিবনাথের সহিত বিবাহবন্ধনের কোন গুরুত্ব যেমন সে স্বীকার করে নাই, অজিতের সঙ্গে বিবাহের কোন নূতন বন্ধনেও তেমনি নিজেকে জড়াইতে সে চাহে নাই। তাহার মতে, পুরুষ ও নারীর আসল বন্ধন নিহিত রহিয়াছে তাহাদের মনে। যেখানে সেই বন্ধন আছে, সেখানে বিবাহবন্ধনের কোন প্রয়োজন নাই। যেখানে ভিতরের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে সেখানে বাহিরের কোন অনুষ্ঠানের বন্ধন দিয়া পরস্পরকে ধরিয়া রাখার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। অজিতকে সে একদিন বলিয়াছিল, 'ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিচ্ছিদ্র ক'রে বাড়ি গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরী হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।' শুধু কোন বিবাহপ্রথায় যে সে অবিশ্বাসী তাহা নহে, দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের প্রতিও তাহার কোন বিশ্বাস নাই। সে মনে করে, ক্ষণিকের আসনেই প্রেমের সত্যকার প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্বের আসনে ঘটে প্রেমের মৃত্যু। সেজন্য শিবনাথের কাছ হইতে মুক্তি পাইয়া সে

যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। অজিতের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের প্রতিশ্রুতিও সে দিতে রাজি হয় নাই। অজিতকে সে বলিয়াছে, 'চিরদিনের দাসখত লিখে যে বন্ধন নেবে না তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোডাটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, আয়ু একটা বেলার নয়, ও নিত্যকালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে মশলা পিষে দেবে—ভাল গেলবার তরকারীর উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে। ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে।' কমলের কথার তীক্ষ্ণ শ্লেষ লক্ষণীয়।

কমলের বক্তব্য লইয়া আলোচনা করা হইল। এবার তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্। কমলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আর একটি চরিত্রের তুলনা করা যায়। সে হইল কিরণময়ী। কিরণময়ীর মতই কমলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রদীপ্ত বৈদগ্ধ্য ও ক্ষুরধার যুক্তিতর্কের অসামান্য নিপুণতা। কিন্তু কিরণময়ীর দুর্বশ প্রবৃত্তিপরায়ণতা, তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের অনির্বাণ বহ্নিজ্বালা প্রভৃতি কিছুই কমলের মধ্যে নাই। কিরণময়ী যেমন অপরকে হারাইয়াছে, তেমনি নিজেও সে হারিয়াছে। এই হারের জন্যই তাহার চরিত্র সুগভীর ট্র্যাজেডির বেদনার্ত মহিমা লাভ করিয়াছে কিন্তু কমলের কখনও হার হয় নাই, কোন সত্যকার বেদনার স্পর্শ তাহাতে নাই। কঠিন ইস্পাতের ফলার মত সে ঝকমক করিয়াছে, কিন্তু ছোট একটি নমনীয় লতার প্রাণশক্তি তাহাতে নাই। অবিচ্ছিন্ন জয়ের বিশুষ্ক গৌরব সে বোধ করিয়াছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের নিভৃত পরাজয়ের দুঃখময় আনন্দ সে লাভ করিতে পারে নাই। সে যৌবনসম্ভোগের উচ্ছ্বসিত জয়গান করিয়াছে, কিন্তু সম্ভোগের পাত্র ত দূরে থাক, এক চামচ পানীয়ও সে ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করে নাই। সে মাস্টারণীর মত কেবল বক্তৃতা দিয়াছে, কিন্তু কোন নৃত্যগানমুখরিত আনন্দ-আসরে তাহাকে যাইতে দেখি নাই। কমল নারী, কিন্তু তাহাকে শুধু কেবল প্রকাশ্য বিচারসভাতেই দেখিলাম, অবগুণ্ঠিত অন্তঃপুরে কখনও তাহাকে দেখিলাম না। সেজন্য শিবনাথের সঙ্গে তাহার মিলনবিচ্ছেদের সব নাট্যলীলাই দর্শকের নেপথ্যে ঘটিয়া গেল। অজিতকে সে কি ভালোবাসিয়াছিল? সন্দেহ হয়। কারণ ভালোবাসার একটি কথাও তাহার মুখে শুনি নাই। বোধ হয় সে কখনও কাহাকে ভালোবাসিতে পারে নাই, নিজের কঠিন আত্মমর্যাদা ও

নিঃসম্পর্ক স্বাতন্ত্র্যবোধের কণ্টকিত বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে চির-নিঃসঙ্গ রাখিয়াছে।

'শেষপ্রশ্নে'র সরোবরে কমল তাহার শতদল পূর্ণবিকশিত করিয়া শোভা পাইতেছে, আর যে সমস্ত ফুল এই সরোবরের আনাচে কানাচে ফুটিয়াছে তাহারা অস্ফুট, প্রচ্ছন্ন অথবা বিশীর্ণ। নীলিমার বঞ্চিত হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসার মধু কিভাবে সঞ্চিত ছিল এবং কিভাবে আশুবাবুর রুগ্ন, পঙ্গু দেহটির সেবা করিতে যাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল উপন্যাসের মধ্যে তাহা অব্যক্তই রহিয়া গেল।

প্রেমের গোপন ফাঁদ কোথায়, কিভাবে কাহার জন্য পাতা রহিয়াছে তাহা কেহ জানে না, যখন কোন অসতর্ক মানুষ আকস্মিক ভাবে তাহাতে ধরা পড়ে তখন সংসার বিস্মিত হইয়া বলে, 'এ-টি তো ভাবি নাই'। শরৎচন্দ্র হয়তো প্রেমের এই দুর্জ্ঞেয়, অচিন্তিতপূর্ব রহস্যই এখানে উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যথোপযুক্ত বিস্তার ও বিশ্লেষণের অভাবে ইহা সুপরিস্ফুট হয় নাই। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রেমের সরল ও স্বাভাবিক গতি তেমন দেখান নাই, ইহার কুটিল ও বিপরীত গতিই বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন। ফ্রয়েডীয় অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের (Abnormal Psychology) বিচার বিশ্লেষণের আলোকেই এই প্রেমের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। শিবনাথের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণাই মনোরমার হৃদয়ে এক অনির্দেশ্য অনুরাগে রূপান্তরিত হইল। আবার মনোরমার ভাবী স্বামী অজিত কন্দর্পের অদৃশ্য প্রভাবে শিবনাথের স্ত্রী কমলের প্রতি আকৃষ্ট হইল। উপন্যাসের গোড়ায় কমল ও শিবনাথের বিবাহ তুমুল চাঞ্চল্য জাগাইয়াছিল উপন্যাসের শেষে সেই দম্পতীই আবার পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে যুক্ত হইল। শরৎচন্দ্র আমাদের আদর্শবাদী প্রেমের ধারণা ও সংস্কারে রূঢ় আঘাত হানিয়া জানাইয়া দিলেন, প্রেমের ব্যাপারে কিছুই স্বতঃসিদ্ধ নহে, কিছুই অনিবার্য ও অপরিবর্তনীয় নহে। এ-যেন শেক্সপীয়রের সেই Midsummer Night's Dream-এর জগৎ। এখানে প্রেমের পাত্রপাত্রীর অনবরত অদল বদল হইতেছে, এ-যেন কন্দর্পদেবের আচ্ছা এক মজার খেলা!

উপন্যাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য চরিত্র হইলেন আশুবাবু। আশুবাবু তাঁহার বিরাট দেহের মধ্যে এক বিরাটতর প্রাণ

লইয়া আগ্রার বাঙালী সমাজে অবারিত আনন্দচাঞ্চল্যের উদার, উন্মুক্ত আসর পাতিয়া বসিলেন। তাঁহার আসরে অনেক তর্কবিতর্কের বাণ পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অনেক তিক্ততার গ্লানি পরিবেষিত হইয়াছে, কিন্তু নিজে তিনি অফুরন্ত মধুভাণ্ড সকলের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার কোন বিদ্বেষ নাই, জ্বালা নাই, অভিযোগ নাই। কমল তাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশি আঘাত করিয়াছে, কিন্তু কমলকে তিনি সকলের অপেক্ষা বেশি ভালোবাসিয়াছেন। এই বিলাত-ফেরত, ভূয়োদর্শী, স্থিতপ্রজ্ঞ লোকটি প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াছেন এবং পরলোকগত স্ত্রীর স্মৃতি অচঞ্চল নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করিয়া চলিয়াছেন। নানা দিক দিয়া আঘাত আসিয়াছে, প্রসন্নচিত্তে সেগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজের মত ও মন পরিবর্তন করেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে হরেন্দ্র ও তাহার আশ্রম বিরক্তিকর প্রাধান্য পাইয়াছে। হরেন্দ্র কমলের সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কমলের যুক্তির কাছে মনে মনে নতিস্বীকার করিয়া আশ্রম তুলিয়া দিয়াছে। অক্ষয়ের পরিবর্তন আরও বিস্ময়জনক। কোমল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত কমলাস্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের নিঃসঙ্গ একাকিত্ব হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া তিনি কমলের একখানা চিঠির জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু কমল পরিবর্তন করিতে পারে নাই একটি চরিত্রকে, সে হইল রাজেন। রাজেনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের ছোটবেলাকার ঘনিষ্ঠতম বিপ্লবীবন্ধু রাজেন্দ্রর স্মৃতি হয়তো মিশিয়া রহিয়াছে। সে খুব কমই কথা বলে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিপ্লবের প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। সে চিরকাল সকলের নাগালের বাহিরেই রহিয়া গেল। সংসারের সকলে যখন তুচ্ছ বিষয় লইয়া মাতামাতি ও মারামারি করিতেছে, তখন মৃত্যুর অগ্নিরথে চড়িয়া সে বহু উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার আয়োজন করা হইল। এই জয়ন্তী-উৎসবের মানপত্রটি শরৎচন্দ্র রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা কল্যাণ ও ঐশ্বর্য, তোমার সাহিত্যে পূর্ণবিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ

করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতার্থ হইয়াছি।' জয়ন্তী-উৎসবের সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র। টাউন হলে আয়োজিত সেই বিরাট সম্মেলনে তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা যে কত গভীর এবং রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে তিনি যে কতখানি অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন তাহা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কবির সঙ্গে কোনদিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহনে সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথাসাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধাবিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এসব বড় কথা কখনও চিন্তা করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথাসাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এল, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় গিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন। সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।'

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ শরৎচন্দ্রের সাতান্ন বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে দেশবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার আয়োজন হইয়াছিল। টাউন হলে ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু এক অপ্রীতিকর রাজনৈতিক দলাদলির জন্য ঐদিন সভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সেই সময়ে বাংলা দেশে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল, একটি হইল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'ব্যাডভাসে'র দল, আর একটি

হইল সুভাষচন্দ্রের 'ফরোয়ার্ডে'র দল। শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় দলভুক্ত ছিলেন।[১] সম্বর্ধনার উদ্যোক্তাদের মধ্যে 'ফরোয়ার্ড' দলের প্রাধান্য ছিল, এজন্য, বিরোধী দল একই দিনে টাউন হলে আর একটি রাজনৈতিক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। আর একটা কারণেও কয়েকজন সাহিত্যিক ঐ সময় শরৎ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন আগে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এজন্য যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক এই জয়ন্তী-উৎসব বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কাগজে একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, গণ্ডগোলের জন্য ৩১শে ভাদ্র তারিখের সভা স্থগিত রাখা হইল। শরৎচন্দ্র সভার দ্বারদেশ পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। স্থগিত সভাটি ২রা আশ্বিন অনুষ্ঠিত হইল। সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি 'উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনা'র জন্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্বর্ধনা উপলক্ষে শরৎ-বন্দনা সমিতি বিভিন্ন সাহিত্যিকদের নিকট হইতে সম্বর্ধনাসূচক লেখা সংগ্রহ করিয়া 'শরৎ-বন্দনা' নামক একটি পুস্তকে সংকলন করেন এবং শরৎচন্দ্রের হাতে পুস্তকটি উপহার দেওয়া হইল।[২] ইহা ছাড়া তাঁহাকে সোনার দোয়াত কলম, গরদের জোড়, চন্দনকাঠের খড়ম এবং কয়েকটি মানপত্রও উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাণীতে বলিয়াছিলেন,'...পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যেসব নবীন ফুল ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার। অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক।

১। শরৎচন্দ্র যে সুভাষচন্দ্রের দল ভুক্ত ছিলেন তাহা ১৩৩৪ সালের ৫ই আষাঢ় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'নইলে আমাদের, অর্থাৎ সুভাষী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মত।'

২। শরৎবন্দনা সমিতির সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্র দেব এবং সভ্যগণ ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশীষ গুপ্ত, রাধারাণী দেবী, সোমনাথ মৈত্র, সুশীলচন্দ্র মিত্র, গিরিজাকুমার বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অবনীনাথ রায়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ও মৃণাল সর্বাধিকারী।

আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে, তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাক, পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি।'

শরৎচন্দ্রকে স্বদেশবাসিগণ এবং স্বদেশবাসিনীগণের পক্ষ হইতে দুইটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছিল। স্বদেশবাসিগণের অভিনন্দন পত্রে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে লেখা হইয়াছিল। 'হে দুঃখ বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত স্নেহ এবং উপেক্ষিত প্রেমের নির্দয় আঘাতে বিপর্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছ। আমাদের জীবনের যত কিছু বঞ্চিত লজ্জা, ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ! তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙ্গালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।' স্বদেশ-বাসিগণের অভিনন্দনপত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা হইয়াছিল 'আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই, তবুও আজিকার এই বিশেষ দিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে আসিয়াছি। তোমার প্রতিভাকে আমরা বরণ করি। তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তোমাকে আমরা ভালবাসি, তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি, হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমার বন্দনা করি।'

## সাহিত্যের শেষ অধ্যায়

'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের মননশীলতা ও তত্ত্বপ্রিয়তা এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে শরৎসাহিত্যের শেষ অধ্যায়ে তাঁহাকে এক রূপান্তরিত শিল্পীরূপেই দেখিতে পাইলাম। দেশবাসীর কাছে তিনি তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পাইয়াছিলেন। সম্মান ও সম্পদের আকাঙ্ক্ষিত শীর্ষস্থানে তিনি উঠিতে পারিয়াছিলেন। জীবনগোধূলিতে তখন বিদায়ের পূরবীরাগিণী বাজিতে শুরু করিয়াছে। তখন তিক্ত অসন্তোষ ও শাণিত প্রতিবাদ উদার সহনশীলতা ও ক্ষমাসুন্দর প্রীতির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'চরিত্রহীন' থেকে 'শেষপ্রশ্ন' পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে এক যুধ্যমান সেনাপতির ভূমিকায় দেখিয়াছি, একটির পর একটি আক্রমণ চালাইয়া গোঁড়ামি, অন্যায় ও অবিচারের দুর্গের উপর তিনি বিরামহীন আঘাত হানিয়াছেন। কঠিনতম আঘাত দেখা গিয়াছে 'শেষপ্রশ্নে'। কিন্তু তারপর তিনি সংগ্রাম হইতে হঠাৎ যেন অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রান্ত মুহূর্তগুলি মধুময় শান্তিনিকেতনে কাটাইতে চাহিলেন। এতদিন যুদ্ধের অস্ত্রঝনকিত ক্ষেত্রে তিনি শুধু কেবল অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, এখন পরিচিত ও পুরাতন মমতাভরা মাটির দিকে ফিরিতে হইল। সেই মাটির উপরকার সবুজ ও শ্যামল শোভা যেমন তাঁহার মন হরণ করিল, তেমনি সেই মাটির নাড়িতে নাড়িতে যে রসের ধারা প্রবাহিত ছিল তাহার স্পর্শ তিনি অনুভব করিলেন। 'শেষপ্রশ্নে'র প্রদীপ্ত অগ্নিজ্বালার উপরে তিনি 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) ও 'বিপ্রদাসে'র শান্তিবারি বর্ষণ করিলেন। শরৎসাহিত্যের সমাপ্তি এই শান্তিপর্বে।

'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের তারিখ হইল ১৩ই মার্চ, ১৯৩৩। ১৩৪০ সালের ১০ই ভাদ্র শ্রীদিলীপকুমার রায়কে একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে,—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যই। তোমার মত একটি পাঠকও যে শ্রীকান্তের ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ, অন্য পাঠক আর চাইনে। অন্তত না হ'লেও দুঃখ নেই।'[১] শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) রচনা সম্বন্ধে শ্রীকালিদাস রায় লিখিয়াছেন—

'শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হইলে শরৎচন্দ্রকে বলিয়াছিলাম—

এ কি হলো, দাদা আপনি শেষে সমাজভীরু গোঁড়া হিন্দুর মতো রাজলক্ষ্মীকে কাশীবাসিনী ক'রে গুরুর চরণে সমর্পণ করলেন, তাকে একেবারে থেরী অম্বপালী বানালেন, আর শ্রীকান্তকে দিলেন বিদায়?

শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—আমি তোমাদের বর্ণাশ্রমী হিন্দু নই, কিন্তু সমাজের বাহিরের লোকও নই। শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী এটা, তোমরাই ত

১। 'শ্রীকান্তে'র পঞ্চম পর্ব লেখার ইচ্ছা শরৎচন্দ্রের ছিল। ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছিলেন, 'পঞ্চম পর্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেব। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব ভাল হয়নি, তবে থাকলো এই খানেই রথ।'

বলো। এটা মামুলি ধরণের নভেল নয়। ভ্রমণকাহিনীই যদি হয়, তবে ভ্রমণকাহিনীর শেষ দেখাতে হয়। (অবশ্য যদি বেঁচে থাকি কিছুদিন) শেষ দেখাতে হবে—এখানেই শেষ হ'ল না। তাতে দেখবে আমি কোন্ শ্রেণীর হিন্দু।

আমি বলিলাম, দাদা আমার মনে হয়, শ্রীকান্ত নভেলও নয় ভ্রমণকাহিনীও নয়। এটা কাব্য -এটা রীতিমত একটা এপিক কাব্য। এটা যদি না বুঝে থাকি—তবে শ্রীকান্ত বুঝিনি।

শরৎচন্দ্র—হ্যাঁ হে ভায়া, নিজ মুখে সেটা আর বললাম না। সেটা বলা আমার স্পর্ধার কথাই হ'ত, কাব্যের শেষ পরিচ্ছেদ এখনো লেখা হয় নি।

তারপর চতুর্থ পর্ব শ্রীকান্ত শেষ হইলে একখানি বই আমার নামে স্নেহোপহার লিখিয়া দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—এই নাও তোমার শেষ পর্ব। এ-বই বিশেষ ক'রে তোমার মত ডুবন্ত পাঠকের জন্য লেখা। তোমার কথা আমার খুব মনে ছিল।'

'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) লেখার পিছনে শরৎচন্দ্রের কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা জানাইয়া তিনি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ লিখিয়াছিলেন, 'আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ-পর্বটা শেষ করবো এবং নানাদিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্যে দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী-অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানিনে তবে উপন্যাসসাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে, যদি আর কিছুই ভালো না পেয়ে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসি নি।' শরৎচন্দ্রের উপরের কথাগুলি হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি বহির্মুখীনতা অপেক্ষা অন্তর্মুখীনতার দিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন, ঘটনার সামান্যতা ও লিখনভঙ্গির সংযমের প্রতিই তিনি তাঁহার মনোযোগ দিয়াছেন।

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের ঘটনা প্রধানত ঘটিয়াছে শ্রীকান্তের অর্থাৎ শরৎচন্দ্রেরই নিজস্ব গ্রাম এবং তাহার সন্নিহিত অঞ্চলে, ভাগলপুরে যে-কাহিনী আরম্ভ

হইয়াছিল তাহা প্রধানত বিহারের নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মদেশ পরিক্রমা শেষ করিয়া গঙ্গামাটি ঘুরিয়া অবশেষে দেবানন্দপুরে শেষ হইয়াছে। শরৎচন্দ্র একদিন শ্রীকালিদাস রায়কে বলিয়াছিলেন, 'শ্রীকান্ত বইখানা যদি ভ্রমণ-কাহিনীই হয়, গ্রামের যে বৈঁচিফলের বনে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর জীবন-পথের যাত্রার সূত্রপাত, সেই বৈঁচিবনেই তাদের ফিরিয়ে না আনলে কি ক'রে ভ্রমণকাহিনীর উপসংহার হয়?' চতুর্থ পর্বে লেখক কাহিনীর সূচনা ও পরিণতি এক সূত্রে গাঁথিয়া দিলেন। শুধু কেবল শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর শেষ পর্বের কাহিনীই নয়, দুই জনের বাল্যকালে যে প্রীতিসম্পর্ক এই গ্রামেই গড়িয়া উঠিয়াছিল স্মৃতিসঞ্চারী দৃষ্টি দিয়া শরৎচন্দ্র তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব লেখার সতের বৎসর পরে তিনি চতুর্থ পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যে হৃদয়াবেগের প্রবলতা ও দুঃসাহসিক ঘটনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ স্বাভাবিক তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল প্রথম পর্বে কিন্তু পরিণত বয়সে মানুষের মন মগ্ন থাকে অতীতের স্মৃতিরোমন্থনে, অতিক্রান্ত জীবনের স্নিগ্ধ-করুণ মাধুর্যরস আস্বাদনায়। চতুর্থ পর্বে পরিণত বয়সের সেই জীবনদৃষ্টিই পরিস্ফুট। সেজন্য শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের কত ঘটনা ও চরিত্রই স্মৃতিরসে সিক্ত হইয়া এই উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে! ছোটবেলায় কৃষ্ণপুর গ্রামে যে রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়ায় শরৎচন্দ্র যাতায়াত করিতেন তাহার অবিকল রূপটি চিত্রিত হইয়াছে চতুর্থ পর্বের মুরারিপুরের আখড়ার মধ্যে।

শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের চিত্র অনেক গল্প ও উপন্যাসেই আঁকিয়াছেন, কিন্তু পল্লীপ্রকৃতির রসসিক্ত চিত্র এই উপন্যাসের ন্যায় আর কোথাও আঁকেন নাই।[১] বাংলার পল্লীপ্রকৃতির গাছপালা, লতা-গুল্ম, ফুল-ফলের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই উপন্যাসে রহিয়াছে তাহার তুলনা একমাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ছাড়া বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কবি গহরের বাড়ি আসিয়া শ্রীকান্ত যখন গহরের সহিত বসন্তপ্রকৃতির শোভা

১। 'তাঁহার কবিপ্রাণের মাধুর্য এখানকার শ্যামসুন্দরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া উৎসারিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পটভূমিকায় শরৎচন্দ্রের আরও অনেক রচনা আছে—কিন্তু তাহাতে মানুষের দুর্গতির সঙ্গে পল্লীপ্রকৃতির অশুভঙ্করী মূর্তিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্বে সেই প্রকৃতিই কল্যাণময়ী মাধুর্যময়ী মূর্তিতে অভিন্নরূপ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ এই পর্বেই পল্লীপ্রকৃতিকে তিনি সম্পূর্ণ কবিদৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছেন।'

—শরৎসাহিত্য—কালিদাস রায়

দেখিতে বাহির হইল তখন শরৎচন্দ্র যে প্রকৃতিচিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে—'পথের দুধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোকা চড চড পট পট শব্দে আম্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটু গাছের কুঞ্জ। মুকুলিত বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড।' নিছক সৌন্দর্যচিত্র এই বর্ণনায় পাওয়া যায় না, ইহাতে প্রকৃতির বাস্তব রূপটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে, প্রকৃতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়েব ফলেই লেখকের পক্ষে এরূপ বর্ণনা করা সম্ভব হইয়াছে।

এই উপন্যাসে প্রকৃতির শুধু বর্ণনা দেওয়া হয় নাই, প্রকৃতির সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য প্রেমের বেদনাকরুণ অনুভূতিই কবিব হৃদয় দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছিলেন—

**These beauteous forms**
**Through a long absence have not been to me**
**As is a landscape to a blind man's eye :**

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতই শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে এক নিবিড় প্রাণের সম্পর্কই অনুভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'বনবাণী' কাব্যের ভূমিকায় বলিয়াছিলেন, 'গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তা হ'লে আমাদের মিলনসংগীতে বদসুর লাগে না।' শরৎচন্দ্রও এখানে গাছের মধ্যে প্রাণের সেই বিশুদ্ধ সুর শুনিয়াছিলেন। মুরারিপুরের আখড়া হইতে ফিরিবার সময় শ্রীকান্ত তাহার ছোটবেলাকার বহুস্মৃতিবিজড়িত তেঁতুল গাছটির সঙ্গে তাহার গভীর স্নেহসিক্ত সম্পর্কটির কথা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছে, আজ দেখিলাম সে-বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই। আর পাঁচটা তেঁতুল গাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে

মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হ'য়ে গেল। চললাম বন্ধু।' যশোদা বৈষ্ণবীর পরিত্যক্ত ভিটা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতির বর্ণনায় এই অনুভূতিসজল করুণ রসের ধারাই প্রবাহিত হইয়াছে। যশোদার নিঃসঙ্গ কুকুরটির বর্ণনাও যেন এক রোদনভরা মাধুর্যে অভিষিক্ত হইয়া রহিয়াছে।

পরিণত বয়সে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটি লিখিয়াছিলেন, সেজন্য পরিণত বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক মৃত্যুভাবনার এক খণ্ড বাষ্পাচ্ছন্ন মেঘের ছায়া যেন মাঝে মাঝে ইহাব কাহিনীপথে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপন্যাসের ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন শ্রীকান্তেব বয়স বত্রিশ কি তেত্রিশ। মৃত্যুভাবনা তখন তাহার মনে আসা স্বাভাবিক নহে। সেজন্য ইহা স্পষ্ট যে, শ্রীকান্তের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রেরই নিজস্ব ভাবনা রূপ পাইয়াছে। কিন্তু এই মৃত্যুভাবনা এখানে তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে নাই, ইহা প্রকৃতির রূপরসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হইয়া এক অপূর্ব কাব্যময় রূপ লাভ করিয়াছে। মৃত্যুব চিত্র এখানে বৃষ্টিধারাবেষ্টিত রঙীন ইন্দ্রধনুব ন্যায় করুণ কিন্তু সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্মরণ' নামক কবিতায় বলিয়াছিলেন—

যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের মত শ্রীকান্তের মধ্য দিয়া কামনা করিয়াছেন, 'ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনদিন বা দেবে সে এক মুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত কেউ যদি কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুন গোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা-কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।' এখানে শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি।

পল্লীবাংলার মজ্জায় মজ্জায় যে বৈষ্ণবরসধারা প্রবহমাণ শরৎচন্দ্র

এ-উপন্যাসে তাহার সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিংড়াইয়া পান করিয়াছেন। মুরারিপুরের আখড়ার পটভূমিতে কাহিনীর একটি প্রধান অংশ ঘটিয়াছে, শুধু সেজন্য নয়, জীবনকে দর্শন ও উপলব্ধির মধ্যেও এই বৈষ্ণবরসের স্নিগ্ধ করুণ অভিষেক হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সারাজীবন বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবপদাবলীর অনুরাগী ছিলেন। নিজেও ধর্মমতে বৈষ্ণব ছিলেন। ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় তিনি যে কীর্তন গানে কতখানি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠে যে তাঁহার কতখানি আগ্রহ ছিল তাহা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে লিখিত একখানি পত্রে জানা যায়—'আপনি আমাকে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়িতে দিয়াছিলেন……এ ছাড়া আরও অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সমস্ত বইগুলি যে কতবার পড়িয়াছি ( এমন কি রোজই প্রায় পড়ি ) তা বলিতে পারি না।' শেষ জীবনে তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তের ন্যায় দিন যাপন করিতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে একটি রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দিয়াছিলেন। নিত্য তিনি অশেষ ভক্তিসহকারে সেই মূর্তি পূজা করিতেন। শুধু কেবল তাহাই নহে, নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের মত তিনি গলায় তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ফলে শরৎচন্দ্রের অনেক গ্রন্থের নায়ক বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃন্দাবন, নীলাম্বর, সৌদামিনীর স্বামী প্রভৃতি চরিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের মধ্যে বৈষ্ণবপ্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র দ্বারিকাদাসের সংকীর্ণচেতা ও হৃদয়হীন গুরুর চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন। মুরারিপুরের আখড়ার মধ্যে ভক্তিরসাপ্লুত কৃষ্ণপ্রাণ বৃন্দাবনেরই একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে সেই গৃহকর্মে ব্যগ্র পরব্যসনিনী নারীর মতই 'তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্', অর্থাৎ হৃদয়ে কান্তরস সুখ আস্বাদন করে। কমললতা হইতে আশ্রমবাসী সকলেই দৈনন্দিন কাজকর্ম করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অন্তরে তাহাদের সেই অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণ সতত বিরাজমান। হৃদয়ে স্থিত হইয়া তিনি যাহাতে নিযুক্ত করিতেছেন, তাহারা যেন তাহাই করিয়া যাইতেছে। চৈতন্য-চরিতামৃতে রহিয়াছে—'নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণে সুখ দিতে করে

সঙ্গমবিহার।' মুরারিপুরের আখড়ায় মেয়েদের একমাত্র সাধনা হইল কৃষ্ণের সুখ, সেই সুখের জন্য তাহারা সেবাপূজা, ভক্তি-আরাধনার মধ্য দিয়া নিজেদেব জীবনকে নৈবেদ্যের মতই উৎসর্গ করিয়াছে। বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে কি যে অন্তহীন আকুতি রহিয়াছে কমললতার মুখে পদাবলী শুনিয়া তাহা আমাদের নূতন করিয়া মনে হইয়াছে। আলো-অন্ধকার ভরা প্রত্যুষে পাখীর কাকলীতে যখন নতুন দিনের বৈতালিক শুরু হইয়াছে তখন পুষ্পবীথিকায় চলিবার সময় কমললতা গান ধরিয়াছে—'চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী পিরীতি না কহে কথা, পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পিরীতি মিলয়ে তথা।' চণ্ডীদাসের বেদনবাণী যে এত মধুব, এত সত্য তাহা এই পরিবেশে যেমন আমরা অনুভব করিলাম, তেমন আর কোথায় অনুভব করিয়াছি? 'পিরীতি লাগিয়া পবাণ ছাড়িলে পিরীতি মিলয়ে তথা'—কথাগুলি কম্পমান বাতাসেব মতই যেন সুগন্ধ পুষ্পরেণু বহন করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বৈষ্ণব রস ছানিয়া যেন কমললতার মূর্তিটি নির্মাণ করা হইয়াছে। গোপীপ্রধানা রাধিকাব মতই কমললতাব কিছুটা ব্যক্ত, কিছুটা অব্যক্ত, কিছুটা মানবিক, কিছুটা যেন আধ্যাত্মিক। রাধার মত সেও তো কলঙ্কিনী। রাধা বলিয়াছিলেন, 'কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুঃখ, তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিয়া সুখ',—কমললতাও তাহার সকল কলঙ্কের ডালি কৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। দিবারাত্র বসের চর্চা করিতে করিতে তাহার সমগ্র সত্তাটি যেন রসে স্নাত হইয়া আছে। শ্রীকান্ত কমললতা সম্বন্ধে বলিয়াছে, 'ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষায় ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি-আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।' শ্রীকান্তকে যখন সে প্রথম দেখিয়াছে তখনই অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছে, অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাতের পরের দিনেই সে বলিয়াছে, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেচ, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি এ-সংসারে তোমাকে

কেউ ভালবাসে না। পূর্ব জন্ম সত্যি না হ'লে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখন একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে।' শ্রীকান্ত এই অসঙ্কোচ ভালোবাসায় বিব্রত ও আশঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু কোন দ্বিধা ও আবিলতা কমললতাকে বিচলিত করে নাই। কারণ, তাহার ভালোবাসা কোন বাসনাকামনা, কিংবা পার্থিব প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে তাহা, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'রই নামান্তর। শ্রীকান্ত উপলক্ষ মাত্র, শ্রীকান্তের মধ্য দিয়া সে তাহার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পায়েই নিজেকে নিবেদন করিয়া দিতে চাহিয়াছে। তাহার ভালোবাসা কোন বন্ধন মানে না বলিয়া কোন কিছু প্রত্যাশাও করে না। শ্রীকান্তকে সে ভালোবাসিয়াছে। অথচ শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীকে যখন সে দেখিয়াছে তখন সাধারণ প্রণয়িনীর মত কোন ঈর্ষা ও অভিমানের স্পর্শ অনুভব করে নাই। তাহার মুক্ত প্রেম যেমন সহজেই টানিতে পারে, তেমনি সহজে ছাড়িতেও পারে। কৃষ্ণপ্রেমে নিজেকে সে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়াছিল বলিয়াই কোন মানুষী শাসন কিংবা সাম্প্রদায়িক নিয়ম তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। সেজন্যই মুমূর্ষু গহরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিতে সে কোন দ্বিধা করে নাই। গহর তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল, সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়াছিল সে নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের অকৃত্রিম প্রীতি দ্বারা। তাহার এই নিঃস্বার্থ ও উদার মানবিক প্রীতির জন্য অমানুষী ধর্মধ্বজী মানুষের কাছে পাইল নিষ্ঠুর শাস্তি। সেই শাস্তিও সে মাথায় পাতিয়া লইল। যে আশ্রমকে সে এত গভীরভাবে ভালোবাসিয়াছিল, একদিন তাহাকেই সে অনায়াসে ছাড়িয়া গেল। যে শ্রীকান্ত তাহার এত প্রিয় ছিল তাহাকেও তেমনি সহজে ছাড়িল। কমললতা সব ছাড়িয়া শুধু এককেই আশ্রয় করিয়া রহিল—'সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।' শ্রীকান্ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, শ্রীকান্তকে শেষ বিদায়ের সময় সে বলিল, 'আমি জানি। আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস ক'রে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্য ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।' সকল অগতির গতি, অনাশ্রয়ের আশ্রয়, পরম প্রেমময়ের পায়ে কমললতার মত যে শরণ নিতে পারে তাহার আর ভয় কোথায়? বৃন্দাবনের পথে কমললতা অভিসারে

চলিয়াছে। বহু দূর পথ চলিতে হইবে, সংসারের পঙ্কে তাহার পদযুগল বিভূষিত, নিষ্ঠুর মানুষ তাহাকে কণ্টকে বিদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু যেদিন তাহার প্রাণবঁধুর পায়ে সে স্থান পাইবে সেদিন তাহার চিরদুঃখ দূরীভূত হইবে।

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর সম্পর্কও চতুর্থ পর্বে একটি মধুর সমাপ্তির স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর বিচ্ছেদ এবং চতুর্থ পর্বে তাহাদের পুনর্মিলন। রাজলক্ষ্মী তেইশ বছর বয়সে যৌবনের পূর্ণ মধুবনে শ্রীকান্তের কাছে আসিয়াছিল, তারপর মধুবনের পুষ্পসুরভিত পথে চলিবার সময় কখনও শ্রীকান্তকে কাছে টানিয়াছে এবং কখনও বা দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে, কিন্তু সাতাশ বছর বয়সে যৌবনের শেষ বসন্তের রাগিণী যখন তাহার জীবনে বাজিয়া উঠিল তখন সে তাহার প্রিয়পাত্রকে ব্যাকুল আবেগে আশ্রয় করিতে চাহিল। কাশী হইতে ফিরিবার সময় শ্রীকান্ত বুঝিয়া আসিল যে রাজলক্ষ্মী বিসর্জিত প্রতিমার মতই আজ তাহার গৃহের আঙিনা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, অতঃপর শূন্য গৃহেই অতীতের স্মৃতি সম্বল করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু পুঁটুর সঙ্গে প্রস্তাবিত বিবাহের জটিলতার মধ্যে যখন সে আবদ্ধ হইয়া পড়িল তখন রাজলক্ষ্মীকে একবার না জানাইয়াও সে পারিল না। তবে তাহার ধারণা ছিল যে, রাজলক্ষ্মীর উদাসীন, ধর্মগত মন হইতে এ-বিবাহ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ কিংবা আপত্তি আসিবে না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তর আসিল। এ-যেন সেই গঙ্গামাটি ও কাশীর ধর্মাচরণে একনিষ্ঠচিত্তা রাজলক্ষ্মী নহে? এ-রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তেরই রাজলক্ষ্মী, গুরুর উপদেশ, সুনন্দার শিক্ষা, ধর্মের অন্ধ মাদকতা সবকিছু ছাড়িয়া সে যেন শ্রীকান্তকেই সব দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এমনিভাবে পুঁটুর সঙ্গে শ্রীকান্তের বিবাহের সম্ভাবনায় রাজলক্ষ্মীর আচ্ছন্ন প্রেমময় সত্তা পুনরায় জাগিয়া উঠিল। অবশ্য শ্রীকান্তের চিঠি পাইবার পূর্বেই ধর্মাচরণে রত রাজলক্ষ্মীর অস্বস্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গিয়াছিল। নিজের সেই অবস্থা জানাইয়া সে শ্রীকান্তকে একদিন বলিয়াছিল, 'খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ডু নেই— গুরুদেব তখনো বাড়িতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু পারলুম কই? মনের মধ্যে হু হু করে পুজোয়

বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়ল।' যে রাজলক্ষ্মী মাঝে মাঝে শ্রীকান্তকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে সে যে এতদিন পরে সত্যই মরিয়া গিয়াছে তাহা রাজলক্ষ্মীর স্বীকারোক্তিতেই একদিন জানা গিয়াছে, 'না, তাকে আর ভয় করো না, সে রাক্ষুসী মরেচে।' রাজলক্ষ্মী চার বছর ধরিয়া জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বুঝিয়াছে শ্রীকান্তের প্রতি ভালোবাসা সে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না এবং শ্রীকান্ত ছাড়া তাহার আর কোন অবলম্বনও নাই। সে বাইজী জীবনের মধ্যে শান্তি পায় নাই। বঙ্কুকে মানুষ করিয়া তাহাকে প্রচুর ধনসম্পদ দিবাব বিনিময়ে সে তাহার নিকট হইতে শুধু কেবল অকৃতজ্ঞতার আঘাতই পাইয়াছে, সুনন্দার কাছে ধর্মশিক্ষা এবং গুরুর কাছে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া সে মুক্তির পথ সন্ধান করিয়াছে। কিন্তু সেই পথও সে খুঁজিয়া পায় নাই। সেজন্য জীবনের আর সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও হতাশা বরণ করিয়া শ্রীকান্তের কাছেই শেষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাইজী বঙ্কুর মা ও তপস্বিনী সকলেই এক এক করিয়া মরিয়া গেল, বাকি রহিল রাজলক্ষ্মী, প্রেমময়ী রাজলক্ষ্মী, শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী।

চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর গৃহলক্ষ্মীরূপ দেখিলাম। যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে উদ্‌ভ্রান্ত কবিয়াছে, কিন্তু ধরা দেয় নাই, এ যেন সে নহে। এ শ্রীকান্তকে নিশ্চিন্ত করিয়া কল্যাণবাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর সম্পর্ক এই পর্বে দৈনন্দিন রসরসিকতা ও সেবাযত্ন-প্রেমের মধ্য দিয়া নিবিড় ও অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানে শ্রীকান্তের ঘনিষ্ঠ দেহসান্নিধ্যে রাজলক্ষ্মী ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে। সঙ্কোচের সামান্যতম ব্যবধানও যেন তাহাদের ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তের সঙ্গে এখন সে সংসারের খুঁটিনাটি সম্পর্কে নানা আলোচনা উৎসাহের সঙ্গে করে। সে বাড়িঘর সংস্কার করিয়াছে, গঙ্গামাটিতে নূতন বিষয়সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, কিন্তু সব শ্রীকান্তকে উদ্দেশ্য করিয়া। মোট কথা সাংসারিক স্ত্রীর সব রকম ভাব ও আচরণই রাজলক্ষ্মীর মধ্যে দেখা গিয়াছে। ভবঘুরে শ্রীকান্ত এতদিন পরে সত্যই একটি ঘর পাইল। এই পর্বে দুইটি নারীর ভালোবাসা তাহার শূন্য হৃদয়কে ভরিয়া তুলিয়াছে। শ্রীকান্তের কথায়, 'একটি আমার রাজলক্ষ্মীর কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমললতার—অপরিস্ফুট,

অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।' রাজলক্ষ্মীর কল্যাণহস্তে শ্রীকান্ত নিজেকে সমর্পণ করিয়া এতদিন পরে নিশ্চিন্ত শান্তির সন্ধান পাইয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে সেই বৃন্দাবনের দূর পথযাত্রিণী বৈষ্ণবী তাহার নিস্তরঙ্গ সুখের জীবন-ধারায় বেদনায় আলোড়িত দুই একটি তরঙ্গ যে জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'অনুরাধা-সতী ও পরেশ' গল্পসংকলন গ্রন্থটি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ প্রকাশিত হয়। 'অনুরাধা' গল্পটি ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] 'অনুরাধা'ই হইল শরৎচন্দ্রের লেখা শেষ গল্প। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি, শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যের শেষ অধ্যায়ে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের দাহ ও জ্বালা হইতে শান্ত, কোমল ও মধুর জীবনেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী ও কমললতার চরিত্রচিত্রণে তিনি বাঙালী নারীর চিরন্তন স্নেহপ্রেম, সেবাযত্নের অপরিসীম মাধুর্যই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 'অনুরাধা' গল্পের নায়িকাচরিত্রের মধ্যেও তাঁহার পূর্ববর্তী গল্পগুলির স্নেহশীল মাতৃত্বরূপই অঙ্কন করিয়াছেন। অনুরাধা গল্পটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও শিষ্য অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল লিখিয়াছেন, 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের অনুরাধা গল্পটি সবে প্রকাশিত হয়েছে। যে-সময়ে এটি প্রকাশিত হয় সে-সময়ে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের দেহসর্বস্ব প্রেমের বন্যা ব'য়ে চলেছে, সেই কারণে এই গল্পটিকে যেন তার প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদরূপেই অনেকেই মনে করেন। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একদিন কথা হয়।

তিনি বললেন: 'দেখ, কোনো কিছুর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অনুরাধা লিখিনি। এতে নায়িকার যে মাতৃমূর্তি, সেবাপরায়ণতা, চরিত্রের মাধুর্য নায়ককে মুগ্ধ করলে—তার ফলে নায়কের চিত্তে যে অনুরাগের রঙ রঞ্জিত হ'ল, তা তো অলীক নয়—সে-ই তো প্রেম। নারীচরিত্রের এই বিভিন্ন রসধারাকে যে শিল্পী উপভোগ করতে না পেরে তার দেহকেই সর্বস্ব মনে করে, তার সাহিত্যসৃষ্টি কখনও সার্থক হ'তে পারে না। প্রেমে দেহের

১। 'অনুরাধা-সতী-পরেশের নামকরণ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র একখানি পত্রে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন, 'প্রকাশের মুখে শুনলাম আমার অনুরাধা-সতী ও পরেশ 'এই নামটি আপনার ঠিক মনোমত হয়নি, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে—এ বইখানির নামকরণ এমনিই হয়। শুধু অনুরাধা নয়। আমি ইংরিজি কয়েকখানা বইয়ে এই ধরণের নাম দেখেছি ব'লে মনে হয়।'

যে স্থান নেই তা নয়, কিন্তু তার স্থান ঠিক গাছের শেকড়ের মত—মাটির নীচে।'

শরৎচন্দ্র দেহের উর্ধ্বস্থিত প্রেমের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই গল্পে দেহাশ্রিত অথবা দেহাতীত কোন গভীর প্রেমের চিত্রই স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বিজয়ের সঙ্গে অনুরাধা প্রায় নেপথ্যস্থান হইতেই কথা চালাইয়াছে। এতখানি দূরত্বের মধ্য দিয়া প্রেমের আবেগ কিভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিল তাহা অনুমান করা শক্ত। বিজয়ের সঙ্গে অনুরাধার পরিচয় গড়িয়া উঠিয়াছে পারস্পরিক সংশয় ও বিরোধের মধ্য দিয়া। উহাদের মধ্যে একজন হইল উদ্ধত, অবিচারী মনিব আর একজন হইল সহায়সম্বলহীনা, সদাকুন্ঠিতা এক সামান্য নারী। এ-দুইজনের মধ্যে প্রেমের বিকাশ হওয়া কিভাবে সম্ভব? অনুরাধার প্রতি অনুতপ্ত ও বিপত্নীক বিজয়ের দুর্বলতা স্বাভাবিক, কিন্তু বিজয়ের কোন গুণে অনুরাধা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল? বিজয়ের পুত্র কুমারের বাৎসল্যের ফলেই কি অনুরাধার মনে বিজয়ের পত্নীত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল? কিন্তু নারী আগে প্রণয়িনী, তারপরে তাহার জননীত্বের আকাঙ্ক্ষা। অনুরাধার পক্ষে কুমারের প্রতি মাতৃভাবাপন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সে কারণেই বিজয়ের প্রতি তার হৃদয়ের আনুগত্য অস্বাভাবিক। অনুরাধা ও কুমারের সম্পর্কও কোন নিবিড় স্নেহ ও অভিমানের আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলায় ঘনীভূত রসাত্মক নহে। অনুরাধা ও বিজয়ের শেষ পরিণতিও গল্পটির মধ্যে একটু অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। মোট কথা, গল্পটির মধ্যে হৃদয়বৃত্তির কোন দিকই তেমন সরস ও আকর্ষণীয়রূপে ফুটিয়া উঠে নাই।

'সতী' গল্পটি 'অনুরাধা' গল্পটির অনেক আগে, অর্থাৎ ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। যে সময়ে এই গল্পটি লেখা হইয়াছিল সে-সময়ে শরৎচন্দ্রের মনে 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্নে'র বিপ্লবাত্মক চিন্তাই অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। নারীর সংস্কার সম্বন্ধে তখন তিনি নানা প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপন করিয়াছিলেন। 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে সমস্যাটির গুরু দিকটি তুলিয়াছিলেন আর সমস্যাটির লঘু হাস্যরসাত্মক দিকটি তুলিয়া ধরিলেন 'সতী' গল্পটির মধ্যে। কোন ভালো গুণের অতিশয্য কিরূপ দোষাবহ ও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে পারে

গল্পটির মধ্যে শরৎচন্দ্র তাহাই দেখাইলেন। নারীর একনিষ্ঠতা প্রশংসনীয় গুণ, কিন্তু সেই একনিষ্ঠতা যখন উৎকট সতীত্বের মদান্ধতায় পরিণত হয় তখন তাহা কিরূপ অসহনীয় হইয়া উঠে গল্পটির মধ্যে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীর পক্ষে সতী স্ত্রী অবশ্যই নিশ্চিন্ত শান্তির কারণ, কিন্তু হরিশের পক্ষে সতীমায়ের সতী কন্যা নির্মলা কি মর্মান্তিক অশান্তির কারণই না হইয়া উঠিয়াছিল! বৈষ্ণব পদকর্তারা খণ্ডিতা নায়িকার মান-অভিমানের কি মধুর বর্ণনা করিয়াছেন, আব এই গল্পটির খণ্ডিতা নায়িকার যে খাণ্ডারিণী মূর্তি আমরা দেখিলাম তাহাতে মান-অভিমানের সরস উপভোগ্যতা কোথায় উড়িয়া যায় তাহার হদিস পাওয়া যায় না। অকারণ ঈর্ষা ও সন্দেহ মানুষের জীবনকে পদে পদে কিভাবে বিপর্যস্ত করিতে পারে, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও আচরণকে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে কিরূপ শোচনীয় মানসিক অবস্থায় টানিয়া আনিতে পারে এই গল্পেব হরিশ তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। প্রকৃত পক্ষে হরিশ এখানে একটি হাস্যরসোদ্দীপক ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। লোকে মনেপ্রাণে সতী স্ত্রী কামনা করে, আর হরিশ অহরহ এই সতী স্ত্রীর হাত হইতে মুক্তির চিন্তাই করিয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' নাটকে বেচারা স্বামী পদ্মলোচন দুই সতী স্ত্রীর জ্বালায় বৃন্দাবন পলাইয়াছিল, আর এই গল্পের নায়ক হরিশ তাহার সতা স্ত্রীর অত্যাচারে বোধ হয় মথুরায় পলাইতে চাহিয়াছিল। কৃষ্ণ কেন বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গিয়াছিলেন তাহার এক অপূর্ব মৌলিক ব্যাখ্যা সতী-স্ত্রীপীড়িত হারশ করিয়াছে—'আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশ বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি। কংস টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম……তবু ত তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল, মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলতো। কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন। না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া ক'রে অধীনকে একটু শীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।' পরিস্থিতিরচনা, চরিত্রসৃষ্টি ও গূঢ় কৌতুক ও ব্যঙ্গরসসঞ্চারে গল্পটি অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'পরেশ' গল্পটি ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত পূজাবার্ষিকীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম 'পরেশ' হইলেও পরেশের নীচ ও অকৃতজ্ঞ চরিত্র ইহাতে গৌণ অংশই গ্রহণ করিয়াছে।

সমস্ত গল্পের কাহিনী জুড়িয়া রহিয়াছে পরেশের জ্যাঠামহাশয় গুরুচরণের চরিত্র। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের জ্যাঠামশাই চরিত্রটির মতই গুরুচরণও অতিশয় সৎ, স্নেহশীল ও তেজস্বী চরিত্র। সংকীর্ণ ও স্বার্থপর সংসারে গুরুচরণের মত লোক খুবই বিরল। তবুও সংসারের মধ্যে কখনও কখনও এ-রকম দুই একজন লোক দেখা যায়। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীন সংসারের কাছ হইতে তাহারা শুধু কেবল অমানুষী আঘাতই পাইয়া থাকে। গুরুচরণও সকলকে ভালোবাসিয়া, সকলের ভালো করিয়া প্রায় সকলের কাছ হইতেই অতি নির্মম প্রতিদান পাইয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র সমাজবিরোধী অমানুষ চরিত্র, যাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়াছেন সেই শিক্ষিত নরাধম ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে অকারণ কৃতঘ্নতার নিষ্ঠুরতম আঘাত লাভ করিয়াছেন, ছোট ভাই ও ছোটবধূমাতার কাছে অতি নীচ ব্যবহার পাইয়াছেন এবং যে মেজবৌমার জন্য তিনি সর্বস্বপণ লড়াই করিয়াছেন, কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনিও এই দেবোপম লোকটির বিরুদ্ধে গিয়াছেন। যে গুরুচরণের নামে দেশের সকলে শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে মাথা নত করিত তিনি অবশেষে সকলের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। আঘাতের পর আঘাত পাইয়া গুরুচরণের সকল চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন গয়লানীকে লাথি মারিয়াছেন, কিংবা খ্যামটার আসরে বসিয়া কদর্য আমোদে লিপ্ত হইয়াছেন তখন তাঁহার আসল সত্তা তাঁহার মধ্যে ছিল না, এক নিঃসাড় নিশ্চেতন জড়সত্তায় তখন তিনি পরিণত হইয়াছেন। গুরুচরণের চরিত্রচিত্র অনবদ্য হইলেও গল্পটির মধ্যে কয়েকটি দুর্বল অংশ রহিয়াছে। পরেশ চরিত্র গল্পটির মধ্যে নিতান্তই অস্পষ্ট ও অস্ফুট। সে কেন জ্যাঠামহাশয়ের বিরুদ্ধে গেল, আবার জ্যাঠামহাশয়কে হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার আগে তাহার মানসিক পরিবর্তন কিভাবে আসিল তাহা কিছুই বুঝা গেল না। গুরুচরণের মেজবৌমাও কেন যে হঠাৎ আদালতে আসিলেন না, হরিচরণ ও পরেশের দলে ভিড়িয়া পড়িলেন তাহাও বোধগম্য নহে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র বালিগঞ্জের অশ্বিনী দত্ত রোডে তাঁহার নবনির্মিত বাড়িতে প্রবেশ করেন। বাড়িটি তিনি হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছা অনুসারেই নির্মাণ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বাড়ি করিলেন। গাড়িও একখানা ক্রয়

করিলেন। তাঁহার বইয়ের প্রচুর জনপ্রিয়তা যেমন তাঁহাকে সম্মান দিয়াছিল, তেমনি অর্থও দিয়াছিল। অর্থের দিক দিয়া তাঁহার মত ভাগ্যবান লেখক একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। জীবনের শেষ পর্বে তিনি কলিকাতার নাগরিক জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলেন। অবজ্ঞাত, ধূলিধূসরিত সমাজের লোক অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কিন্তু এই নাগরিক জীবন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, সেজন্য যখন সময় পাইতেন তখনই চলিয়া যাইতেন রূপনারায়ণের তীরবর্তী তাঁহার নিরালা বাংলো বাড়িতে। দরিদ্র, নিরক্ষর গ্রামবাসীরা আসিয়া তাঁহার চারপাশে ভিড় জমাইত। তাহাদের মধ্যেই নিজেকে তিনি স্বাভাবিক ও সন্তুষ্ট মনে করিতেন।

'দত্তা' উপন্যাস অবলম্বনে লেখা 'বিজয়া' নাটকটি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। নাটকটি কাহিনীর দিক দিয়া মোটামুটি উপন্যাসকে অনুসরণ করিয়াছে। উপন্যাসের সংলাপগুলি প্রায় অবিকল নাটকের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। তবে উপন্যাসের বর্ণনা-অংশ পরিত্যক্ত হওয়াতে নাটকের সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতা আরও অনেক বাড়িয়াছে। কয়েকটি দৃশ্যে সাধারণ গ্রামবাসীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়া সংলাপবহির্ভূত ঘটনার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। নাটকের আরম্ভ হইয়াছে বিশেষ নাটকীয় ভাবে। কলিকাতার বাড়িতে কোন দৃশ্য না দেখাইয়া বিজয়ার গ্রামের বাড়িতেই নাটকের আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রথম দৃশ্যে বিজয়া ও বিলাসের কথোপকথনের মধ্য দিয়া অতীত ঘটনার কিছু উল্লেখ করিয়াই নাটকের সংঘাত অর্থাৎ নরেন ও বিলাসের বিরোধিতার সূত্রপাত করা হইয়াছে। যে নরেনের প্রতি বিলাসের প্রবল উষ্মার বিরুদ্ধে বিজয়া কোন প্রতিবাদ জানায় নাই সেই যখন কিছুক্ষণ পরে আসিল তখন বিজয়া তাহার পক্ষই অবলম্বন করিল। অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে দৃশ্যের আরম্ভ হইয়াছিল দৃশ্যের সমাপ্তিতে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া গেল। এমনি ভাবে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে পরিস্থিতির রূপান্তর ও বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বিজয়াকে লইয়া নরেন ও বিলাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই নাটকের মূল সংঘাতটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার

পরিণতি ঘটিয়াছে নরেনের জয়ে ও বিলাসের পরাজয়ে। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, নাটকের আসল সংঘাতটি বাধিয়াছে বিজয়া ও রাসবিহারীর মধ্যে। বিজয়া সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও রাসবিহারী হইলেন তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিজয়ার অভিভাবক। বিজয়া রাসবিহারীর অসাধু উদ্দেশ্য বুঝিয়াও পিতৃবন্ধুর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও ভদ্রতাবোধ বশত অনেকদিন পর্যন্ত রাসবিহারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা করে নাই। রাসবিহারী তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কপট ধার্মিক ও একান্ত হিতৈষীরূপ ধারণ করিয়া বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহের প্রায় সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। বিজয়ার মনের মধ্যে ক্ষোভ ও বিরক্তি আস্তে আস্তে ধূমায়িত হইতে থাকে কিন্তু তবুও সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিজেকে সংযত রাখিয়াছিল। তবে নরেনের প্রতি রাসবিহারী ও বিলাসের যতই বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতে লাগিল, ততই তাহার প্রতি বিজয়ার আকর্ষণ বাড়িতে লাগিল। বিজয়া সম্পত্তির মালিক, তাহার মাথাব উপরে আর কেহ নাই, তবে সে নরেনকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না কেন? তাহার কারণ, বিজয়ার নারীসুলভ লজ্জা, সঙ্কোচ ও শালীনতাবোধ। এই সবগুলিই এই তেজস্বিনী, বুদ্ধিশালিনী, আত্মনির্ভরশীলা নারীটির চরিত্রে স্নিগ্ধ মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে। বিজয়ার সঙ্গে রাসবিহারীর প্রকাশ্য সংঘর্ষ বাধিয়াছে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে। বলা যাইতে পারে, এখানেই নাটকের ক্লাইম্যাক্স, ইহার পরে রাসবিহারীকে একটি নিষ্প্রভ পরাজিত শক্তিরূপেই দেখি। রাসবিহারীর সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়া সাহসী হইল কেন? নরেনের প্রতি একমাত্র তাহার অনুরাগ হইতেই সে এ সাহস লাভ করে নাই। যখন সে জানিল যে নরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহে পিতার সাগ্রহ সম্মতি ছিল, তখনই সে নিজের অনুরাগের দৃঢ় সমর্থন খুঁজিয়া পাইল এবং তাহার ফলেই রাসবিহারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস পাইল। তৃতীয় অঙ্কের শেষে রাসবিহারীর পরাজয় সত্ত্বেও বিজয়া ও নরেনের মিলন সহজে ঘটিল না। তাহার কারণ, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে নলিনী কাহিনীর মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে এবং না জানিয়া সে নরেন ও বিজয়ার সম্বন্ধের মধ্যে একটি সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। অবশেষে সকল বাধা ও ভুলবোঝাবুঝির অবসানে নরেন ও বিজয়ার মিলন ঘটিয়াছে।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে রাসবিহারীর অংশ বড়ই ম্লান ও দুর্বল হইয়া গিয়াছিল, নাটকে রাসবিহারীকে একটু গুরুত্ব দিবার জন্য কিছু সংলাপ দেওয়া হইয়াছে। 'বড় জ্যাঠা মেয়ে'—রাসবিহারীর এই শেষ সংলাপটি বলিবার সময় নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী যথেষ্ট তেজ ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহাতে চরিত্রটির মর্যাদা কিছুটা রক্ষিত হইত।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয় প্রকার নাটকেই সংঘাত সৃষ্টি করা দরকার। ট্র্যাজেডির সংঘাত শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ইহার পরিণতিতে নায়কের পরাজয় ঘটে, কিন্তু কমেডির সংঘাত অবশেষে মিলনে সমাপ্তি লাভ করে এবং ইহার পরিণতিতে নায়ক ও নায়িকার জয়ই ঘটিয়া থাকে। 'বিজয়া' কমেডি সেজন্য ইহার পরিণতিতেও প্রতিপক্ষের পরাজয়ের পরে নায়ক ও নায়িকার জয় ও মিলন ঘটিয়াছে। বিজয়াকে বিশুদ্ধ রোমান্টিক কমেডির শ্রেণীভুক্ত করা চলে। রোমান্টিক কমেডির মধ্যে হাস্যরস মৃদু, অনুচ্চ ও স্নিগ্ধ এবং ইহাতে হাস্যরসের সঙ্গে প্রণয়রসের সুমধুর যোগ থাকে। 'বিজয়া' নাটকেও এই হাস্যদীপ্ত প্রণয়রসাত্মক ধারা সাময়িক সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া আকাঙ্ক্ষিত মিলনে সমাপ্ত হইয়াছে, এজন্য নাটকটি এত উপভোগ্য ও জনপ্রিয় হইয়াছে।

'বিজয়া' নাটকটি রচনা করিয়া শরৎচন্দ্র কথাপ্রসঙ্গে একদিন অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলিয়াছিলেন, 'বিজয়া যদিও দত্তা থেকে নেওয়া কিন্তু আমি অনেক কিছু বদলে, একরকম একখানি নতুন নাটক লিখে দিয়েছি। আমার মনে হয়, আমার ষোড়শীকে দেশের লোকেরা যেভাবে নিয়েছিল বিজয়া তার চেয়েও আদর পাবে—অবশ্য অভিনয় যদি ভাল হয়। আমার বিশ্বাস, শিশির যদি একটু পরিশ্রম করে, তা হ'লে বিজয়া নিশ্চয়ই তাকে বাঁচিয়ে দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকে যে যাই বলুক, শিশির যে একজন সত্যিকারের আর্টিস্ট সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ নাই।[১]

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বিজয়া নাটকটি ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৪, নবনাট্য মন্দিরে মঞ্চস্থ করেন।[২] নাটকের অভিনয় এ-ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল—'মঙ্গলঘট স্থাপিত। অভিনেতৃগণ শুদ্ধচিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে বিজয়ার

১। শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, পৃঃ ৬১

২। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল আগে আর্ট থিয়েটারের জন্য শরৎচন্দ্রকে 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র নাটকটি লিখিতে সময় পাইতেছিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া

আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সাফল্য সুনিশ্চিত।' বিজয়ার অভিনয় ও প্রযোজনা দুই-ই অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ—রাসবিহারী—শিশিরকুমার, নরেন—বিশ্বনাথ, বিলাসবিহারী—শৈলেন চৌধুরী, দয়াল—শীতল পাল, বিজয়া—শ্রীমতী কঙ্কা, নলিনী—রাণীবালা ইত্যাদি। শিশিরকুমারের নরেনের ভূমিকায় প্রথমে অভিনয় করিবার ইচ্ছা ছিল। সংবাদপত্রে এবং অনেক নাট্যমোদী লোকেদের মধ্যে ইহাতে নানা বিরূপ মন্তব্য উত্থিত হইয়াছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমার রাসবিহারীর ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার যে সব নাটকে অভিনয় করিতেন সেগুলি অভিনয়ের প্রয়োজনে একটু আধটু কাটছাঁট করিয়া লইতেন। শরৎচন্দ্রের নাটকে এরূপ অদল-বদল করিতে যাইয়া একাধিকবার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। 'বিজয়া' নাটকের বেলাতেও পুনরায় তাহাই ঘটিল। শিশিরকুমার নিজেই বলিয়াছেন, 'নাটকটাকে ভাল ক'রে ফোটানোর জন্য একটা সিন লেখাতে চেয়েছিলুম, বিজয়া কেন সই করল। ও যে দয়ালকে বলছে—আমি যে নিজের হাতে সই ক'রে দিয়েছি।

তাতে দয়াল বলছেন—নলিনী আমায় সব কথা বলেছে। তোমার হাত সই করেছে, মন সই করেনি।

ওখানে বিলাসের অ্যাকটিংএরও স্কোপ থাকত। বিলাসকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলুম—বাবার কি ইচ্ছে তা আমি জানি না। আমি কিন্তু তোমার সম্পত্তি চাই না! আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমাকেই চাই। আমাদের আচার ব্যবহার একরকম, আমরা ছোট থেকে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, পরস্পরকে আমরা চিনি কাজেই পরস্পরকে পেয়ে আমরা সুখীই হব।

তারপরেই বিজয়া সই ক'রে দিলে।

এ দৃশ্যটা শরৎদাকে অনেকবার লিখতে বলেছি। কিন্তু উনি বলেন,—Not a line more. কিছুতেই লেখাতে পারলুম না।'[১]

রাসবিহারীর ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় হইয়াছিল অনবদ্য।

---

১৩৪০ সালের ৭ই আষাঢ় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন, 'আপনি দত্তার অভিনয়স্বত্ব চেয়েছিলেন অতএব আমি খুশি হয়েই দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এতদিনে শেষাশেষি ক'রে আনতাম।'

১। শিশির সান্নিধ্যে—১৩০

'নাচঘর' পত্রিকা লিখিয়াছিল, 'ঘটনা ও অবস্থাভেদে তাঁর চাহনি ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন এবং মধ্যে মধ্যে শ্মশ্রুতে হস্ত-সঞ্চালন ভণ্ড, কূটবুদ্ধি, প্রভাবশালী ব্যক্তিটিকে দর্শকদের চোখের সামনে এমন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়িয়ে দেয় যে, সমস্ত প্রেক্ষাগার শিশিরকুমারের অভিনয়কে সারাক্ষণ ধরে রীতিমত উপভোগ করে। তাঁর কথা বলবার ধরণ, বিলাসের প্রতি কপট দৃষ্টি নিক্ষেপ, মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্যে প্রণামের ভান দর্শক মহলে হাসির হর্‌রা ছুটিয়ে দেয়। রূপসজ্জারও প্রশংসা করি।' শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিশিরকুমারের অভিনয় সম্বন্ধে অপূর্ব বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিয়াছেন—'রাসবিহারীর বাইরের মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতি-ধর্মবোধের নীচে তাহার এই স্থূলতা দেখানই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে ব্রাহ্মধর্মের নামে যতই সূক্ষ্ম ধর্মবোধ ও রুচিবৈদগ্ধ্যের ভান করুক না কেন আসলে সে একজন অর্ধশিক্ষিত পাটোয়ারির পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি।—ভণ্ড মাত্রেই স্থূল। এই গোপন সংরক্ষিত ইতরতার বহিঃপ্রকাশই হাস্যরসসৃষ্টির বিশেষ হেতু হইয়াছে।······শিশির তাহার অভিনয়ে এই স্থূলতাকেই সূক্ষ্মভাবে প্রকট করিয়াছে। তাহার চেয়ারে বসিবার ভঙ্গি, তাহার দুগ্ধশুভ্র পরিচ্ছদের মাঝে মধ্যে যেন বিস্মৃতিবশে হাঁটুর উপর উঠিবার অশালীন প্রবণতা, এই জাতীয় দুই একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে শিশির এই চরিত্রটির প্রকৃতরূপ ফুটাইয়াছে।'

'বিজয়া' নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া শরৎচন্দ্র 'নববিধানে'র নাট্যরূপ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শিশিরকুমার অসুস্থ হইয়া পড়ায় সে-কাজ আর অগ্রসর হইল না। শিশিরকুমারের অনুরোধে পরে তিনি 'গৃহদাহে'র নাট্যরূপ রচনা করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই অঙ্ক লেখার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শিশিরকুমারও নাছোড়বান্দা, তিনি নিজেই বাকি দুই অঙ্ক শেষ করিবার দায়িত্ব নিতে চাহিলেন। অবশেষে শিশিরকুমারের জেদই বজায় রহিল। নবনাট্য মন্দিরে তিনি 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'অচলা' মঞ্চস্থ করিলেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল—'শরৎচন্দ্রের অচলা শিশিরপ্রতিভার সচলা দেখে যান।' শরৎচন্দ্র কিন্তু 'অচলা' সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'আমার অচলার শেষের আকার লোপ ক'রে দিয়েছে।' বলা বাহুল্য 'অচলা' রঙ্গমঞ্চে মোটেই সফল হয় নাই।

শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমারের প্রতিভার সংযোগ বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের

ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা। শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের যে-সব চরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলেন সেগুলি হইল—জীবানন্দ (ষোড়শী), যাদব (বিন্দুর ছেলে), রমেশ, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী (রমা), নীলাম্বর (বিরাজ বৌ), রাসবিহারী, নরেন (বিজয়া) কেদার, সুরেশ (অচলা), বিপ্রদাস (বিপ্রদাস)। শরৎচন্দ্রের নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়া যেমন শিশিরকুমার সামাজিক নাটকে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বমূলক অভিনয়ের সুযোগ পাইলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তাও জনসাধারণের মধ্যে অসম্ভবভাবে বাড়িয়া গেল। সেজন্য উভয়ে উভয়ের কাছে ঋণী, বলা যায়।

শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমারের আবির্ভাব হইয়াছিল একই সময়ে, অর্থাৎ মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে। শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার—কথাশিল্পী ও অভিনয়শিল্পী। একজন কথা বলান আর একজন কথা বলেন। একজন চরিত্র গড়িয়া তোলেন, আর একজন চরিত্র হইয়া ওঠেন। এই দুইজনের ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে বোধ হয় একটি ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু ইহাতে একটি বাধা আছে। শরৎচন্দ্রকে আমরা জানি তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে। কিন্তু শিশিরকুমারকে কি পাওয়া যায় তাঁহার অভিনয়ের মধ্যে। একজন নিজের সত্তাকে প্রকাশ করিতে চাহেন, আর একজন নিজের সত্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন। শিশিরকুমারকে আমরা কোথায় পাইব?—জীবানন্দ, রমেশ, বেণী ঘোষাল, নরেন, রাসবিহারী—কাহার মধ্যে? এই সব বিচিত্র-রসের চরিত্রকে তিনি সমান সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করিয়াছেন। প্রশ্ন জটিল বটে, কিন্তু সমাধানের পথ যে একেবারে নাই তাহা নহে। সুনিপুণ অভিনেতা যে কোনো প্রকার চরিত্রকেই সার্থক রূপ দিতে পারেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, কোন বিশেষ ধরণের চরিত্ররূপায়ণে, তিনি যেন অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন। সেখানে অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার অন্তরতম সত্তা যেন এক হইয়া যায়, সেখানে সচেষ্ট শিল্পসাধনা অপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশই যেন অভিনয়কে এত স্বাভাবিক ও জীবন্ত করিয়া তোলে। শিশিরকুমার বিভিন্ন প্রকৃতি ও রসের চরিত্রে অনুপম অভিনয়-কলার পরিচয় দিলেও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে মানবচরিত্রের সীমাহীন বেদনা ও অন্তর্ভেদী হাহাকার রূপায়ণে। রাম, আলমগীর, চাণক্য, নাদির, কর্ণ, নিমচাঁদ, যোগেশ, জীবানন্দ, মধুসূদন—এইগুলিই হইল শিশিরকুমারের সার্থকতম অভিনয়ে রূপায়িত চরিত্র।

এই চরিত্রগুলির অভিনয় যখন তিনি করিতেন তখন যেন তাঁহার সমগ্র বহিঃসত্তা ও অন্তরসত্তা অভিনয়ের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইত। সেজন্ত মনে হয়, শিশিরকুমারের জীবনে এমন একটি অন্তঃশায়ী বেদনা সঞ্চিত ছিল, এমন একটি অতৃপ্ত জীবনপিপাসা ও প্রতিকূল পরিবেশের নিষ্ঠুর আঘাতের ফলে এমন একটি অন্তহীন নিষ্ফলতাবোধ ছিল যেগুলি তাঁহার অভিনীত চরিত্রের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঞ্চারিত হইয়া যাইত। শিশিরকুমারের এই সত্তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। একই বেদনা ও অতৃপ্তি, জীবনকে সম্ভোগ করিবার গভীর আকাঙ্ক্ষা ও সেই আকাঙ্ক্ষার গভীরতর ব্যর্থতা এই দুই শিল্পের শিল্পীকে যেন এক অভিন্ন জীবনরসচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

আর এক দিক দিয়া এই দুই শিল্পীর জীবনদৃষ্টিতে সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দুই জনেই জীবনের বহির্ঘটনা অপেক্ষা অন্তঃপ্রবাহকেই বেশী মূল্য দিয়াছেন। যাহা স্থূল ও দৃশ্যমান তাহা নহে, যাহা সূক্ষ্ম ও গোপনচারী তাহাকেই ইহারা যেন ইহাদের শিল্পকলায় মূর্ত করিয়া তুলিতে চাহিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কতটুকু ঘটনাই বা পাই! কিন্তু সামান্য ঘটনার গভীরে যে বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সংঘাত ও যে প্রচণ্ড বিপর্যয় রহিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন। তেমনি শিশিরকুমারের অভিনয়েও মানবজীবনের অন্তর্বিপ্লব ও আত্মিক সঙ্কটের রূপই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রাম, আলমগীর, চাণক্য ও জীবানন্দের অভিনয়ে মানবজীবনের বাহিরের ঘটমান দিক যতখানি প্রকাশিত হইত, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি প্রকাশিত হইত তাহার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন দিকটি—যে সব পাইয়াও কাঙাল, যে অমিত শক্তির অধিকারী হইয়াও কতখানি দুর্বল ও অসহায়!

জীবনযাত্রা ও জীবনাদর্শের দিক দিয়াও উভয় শিল্পীর মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। সংযমশাসিত ও নিয়মনিয়ন্ত্রিত পথে ইহারা চলিতে শেখেন নাই। যে-পথ অশান্তি ও অনিশ্চয়তা আনে, যে-পথে নিন্দা ও গ্লানির কণ্ঠ মুখরিত হইয়া উঠে, সেই অভিশপ্ত পথেই ইহারা চলিয়াছেন। কিন্তু জীবনের পিচ্ছিল পথে শিথিল পদে চলিলেও ইহারা দুইজনেই ইহাদের চোখে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন জলন্ত বিদ্রোহের আগুন। সেই আগুনে ইঁহারা অতীতের বন্ধন ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতের পথ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার জীবনসমুদ্র হইতে উত্থিত শুধু বিষই

গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অমৃতসাধনার ফল রাখিয়া গেলেন পরবর্তী মানুষের জন্য।

শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমার পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। শরৎচন্দ্র যেমন শিশিরকুমারের অভিনয়ে মুগ্ধ ছিলেন, শিশিরকুমারও তেমনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নাটকগুলির অভিনয়ে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। 'ষোড়শী', 'রমা', 'বিজয়া', 'বিরাজবৌ', 'বিন্দুর ছেলে' ইত্যাদি নাটক শিশিরকুমারের প্রয়োগকুশলতা ও অভিনয়-দক্ষতার ফলেই এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

শিশিরকুমার যেমন শরৎচন্দ্রের নাটকগুলির জনপ্রিয়তা অনেকখানি বর্ধিত করিয়াছেন, তেমনি আবার অন্য দিক দিয়াও বলা যায়, শরৎচন্দ্রের সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়া শিশিরকুমারের অভিনেতৃ-জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক পরিস্ফুট হইবার সুযোগ লাভ করে। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকেরই অভিনয় রঙ্গমঞ্চে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির অভিনয় রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সামাজিক নাটকগুলিতে সমাজের বিভিন্ন বাস্তব চরিত্রের রূপায়ণ থাকিলেও সেই সব চরিত্রের মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত জটিলতা এবং নিষিদ্ধ বাসনাকামনার সমবেদনাসিক্ত অবতারণা ছিল না, কিন্তু শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিতে নানা বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির বিস্ময়কর লীলা এবং মানুষের নীতি ও ধর্মের নব মূল্যায়ন দেখা যায়। অভিনয়ের মধ্যে এইসব চরিত্রের রূপ দিতে হইলে অভিনেতাকে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞ ও অন্তর্মুখী দ্বন্দ্বময় ভাব পরিস্ফুটনে বিশেষ কলানিপুণ হইতে হয়। শিশিরকুমার পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রাভিনয়ে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করিলেও এই সামাজিক নাটকের অভিনয়েই তাঁহার প্রতিভার অভাবনীয় কুশলতার পরিচয় দিতে পারিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে একটু বাহ্য জাঁকজমক ও ক্রিয়াচঞ্চল ঘটনার সহজ মাদকতায় দর্শক চিত্তকে আকর্ষণ করা সহজ কিন্তু জটিল মনস্তত্ত্বধর্মী নাটকের অভিনয়ে গভীর রসজ্ঞান ও সুনিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি থাকা প্রয়োজন। এই রসজ্ঞান ও বিশ্লেষণী শক্তি শিশিরকুমার শরৎচন্দ্রের নাটকে দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের পরে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অনেক বছর ধরিয়া শরৎচন্দ্রের নাটকগুলি

প্রায় একচেটিয়া জনপ্রিয়তালাভ করিয়াছিল। তাঁহার অনেক নাটক বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনীত হইয়া দর্শকদের চিত্তকে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নাট্যনিকেতনে 'পথের দাবী' মঞ্চস্থ হইয়াছিল এবং সব্যসাচীর ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। 'চরিত্রহীন' আর একটি মঞ্চসফল নাটক। আজও পর্যন্ত এই নাটকটি মাঝে মাঝে অভিনীত হইয়া থাকে। নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা অভিনেতাই ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন। নাট্যকাব শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়াছেন, যথা, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুব ছেলে,' 'কাশীনাথ,' 'নিষ্কৃতি', 'পরিণীতা,' 'শ্রীকান্ত'। রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেকটি নাটকই জনসম্বর্ধনা লাভ কবিয়াছে।

রঙ্গমঞ্চের মত চিত্রজগতেও শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া একচ্ছত্র সম্রাটের ন্যায়ই রাজত্ব করিয়াছেন। এখানেও শিশিরকুমারই সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্রের বই চিত্রায়িত করেন। এ-সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার রায়েব উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে, 'তাজমহল চিত্রপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাবর পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীর চিত্ররূপ—আঁধারে আলো। ঐ চিত্রাভিনয়ের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন শিশিরকুমারই। এদেশে তার আগে আরো তিন চারখানি চলন্ত ছবি পর্দার গায়ে ফুটে উঠেছি' বটে, কিন্তু সেগুলির কাহিনী ও নাটকীয় মুল্য একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল কেবলমাত্র আজব নূতনত্বের জন্য। লোকে তখন চলন্ত বিলাতী ছবি দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু চলন্ত বাংলা ছবির আবির্ভাব তখনও ছিল একটা অভিনব বস্তুর মত, তাই চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অচলও হ'ত চলমান।...বাংলা চিত্রজগতে শিশিরকুমারই সর্বপ্রথমে প্রতিভাবান আধুনিক লেখকের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেন। কেবল তাই নয়, আজ বিভিন্ন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শরৎচন্দ্রের গল্পের ভাণ্ডার আক্রমণ করে প্রায় খালি করে এনেছেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে চিত্রজগতের প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ করে দেন তিনিই। এবং বাংলা চিত্রজগতে যাঁরা সর্বপ্রথমে গম্ভীর ও উচ্চতর শ্রেণীর নাট্যরসাশ্রিত অভিনয়-ভঙ্গির সূত্রপাত করেন তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার ও নরেশ মিত্রের নামই সর্বাগ্রে মনে আসে। একালের অধিকাংশ চিত্রদর্শকই এই সত্যের

সঙ্গে পরিচিত নন।'[১] শরৎচন্দ্রের বইয়ের সার্থক চিত্ররূপায়ণ করিয়াছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁহার পরিচালিত 'দেবদাস' বাংলা চিত্রজগতের প্রথম যুগে বিপুল সাড়া জাগাইয়াছিল। দেবদাসের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছিলেন আজও তাহা তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালিত 'গৃহদাহ' অবশ্য 'দেবদাসে'র মত জনপ্রিয় হয় নাই। নিউথিয়েটার্স শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি বই চিত্রে রূপায়িত করিয়াছিল। এ-প্রসঙ্গে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'এক সময়ে আপনি বলেছিলেন আপনার উপন্যাস কেউ ছবি করতে সাহস পাবে না। কিন্তু নিউথিয়েটার্স পরপর আপনার উপন্যাস তো ছবি করে দেখিয়ে দিলে যে শক্তি থাকলে কত ভাল ছবি আপনার উপন্যাস থেকে করা যায়।' শরৎচন্দ্র উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'তা যা বলেছ—এখন দেখছি আমার উপন্যাসও ছবি করা যায়।'[২] চিত্রজগতে শরৎচন্দ্রের বইয়ের সমাদর যে এখনও কমিয়া যায় নাই, সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'গৃহদাহ'ই তাহার প্রমাণ। শরৎচন্দ্রের বহু বই হিন্দী চিত্রে রূপায়িত হইয়াও জনপ্রিয় হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র মাত্র তিনখানি বইয়ের নাট্যরূপ দিয়াছিলেন এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি নাটক লেখেন নাই তাহা একজায়গায় বলিয়াছেন। শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে একখানি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমি নাটক লিখিনা, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তা হলেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়। এ-সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রে সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাবলিশারের অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্তত, শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গাটার অ্যাকশন কম,—দর্শকে নেবে না। কিংবা এ-বই অচল, ত তাকে সচল করার

১। বাংলা রঙ্গালয়ে শিশিরকুমার, পৃঃ ৭৯-৮১
২। শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, পৃঃ ৭৫

কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ীনক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামাকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হ'য়ে বসে, সে-কৌশল জানিনে, তা নয়। এ-ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা-সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্রসৃষ্টির জন্যেই। দু'রকমের হতে পারে—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রীরা, তাই ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। ...আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই। নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা—তাও হয়তো চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি। ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোয়িন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী তো নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি, একদিন বর্তমান রঙ্গমঞ্চের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা' হয়ত চোখে দেখে যেতে পারব না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়তো লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে।' শরৎচন্দ্রের চিঠিখানার মধ্যে নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁহার সুগভীর সচেতনতার সুস্পষ্ট নিদর্শনই পাওয়া যায়। যদি তিনি অধিকসংখ্যায় নাটক লিখিতেন তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটিও তিনি যে অনেকখানি সমৃদ্ধ করিয়া যাইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নাটক লিখিতে হইলে যে, রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা দরকার সে-সম্পর্কে একদিন তিনি অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলিয়াছিলেন, "লোকে বলে, নাটক লিখতে হলে স্টেজ সম্বন্ধে খুব জ্ঞান থাকা দরকার।

আমার তো মনে হয়, এ জ্ঞান এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়। যার একটু কমনসেন্স আছে তার কাছে এটা কোন বাধাই হতে পারে না। যে কথনও স্টেজে নাটকের অভিনয় দেখেনি, আমি তার কথা বলছি না। বলি, আমি নিজেও তো অভিনয় করেছি—স্টেজের অন্য অভিনয়ও তো দেখেছি। নাটকে কিভাবে ঘটনাকে সাজাতে হবে, সে-বোধ কি আমার নেই ?'

'বিপ্রদাস' শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪০ সালেরবৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন, ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ ভাদ্র, ও কার্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটির ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের ( ১৩৩৬-৩৮ ) 'বেণু'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

'শেষপ্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস' প্রায় একই সময়ে লিখিত হইয়াছিল, অথচ উভয় উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কতই না পার্থক্য। 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে বিপ্লবের প্রজ্বলিত হুতাশনে তিনি সমাজের নীতি সংস্কার সব আহুতি দিয়াছিলেন আর 'বিপ্রদাসে'র অবিচল নিষ্ঠা ও অকপট বিশ্বাসের আলোকে প্রাচীন সমাজের জীর্ণরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে পুনরায় বুঝা যায় যে, শরৎচন্দ্রের দ্বিধাবিভক্ত সত্তা বরাবর একই সঙ্গে ধ্বংস ও রক্ষার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে। তাঁহার এক পদ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আর একপদ দৃঢ়ভাবে পশ্চাৎভূমির উপরেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের বহু গল্প-উপন্যাসের চরিত্রে তাঁহার আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের নাম ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বিপ্রদাস চরিত্রটির নাম তিনি তাঁহার ছোটমামা বিপ্রদাসের নাম অনুসারেই রাখিয়াছিলেন। শুধু কেবল নাম নহে, তাঁহার ছোটমামার শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাব ও আচরণও উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রটির মধ্যে অনেকাংশে পরিস্ফুট হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন, ''বিপ্রদাস ছিলেন স্বধর্মপরায়ণ, আচারনিষ্ঠ, গুরু ও দেবতায় ভক্তিমান, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক এবং পূজাপাঠ না ক'রে তিনি জলগ্রহণ করতেন না, সুখাদ্য বলতে বুঝতেন একমাত্র সেই খাদ্য যা দেবতার ভোগে নিবেদন করা চলে, অখাদ্য যা চলে না ; ধর্মঅর্থে তিনি বুঝতেন সনাতন হিন্দু ধর্ম, ভ্রমণ অর্থে বুঝতেন তীর্থভ্রমণ।'[১]

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে কৃষক-মজুরের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের

১। শরৎ-স্মরণিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১৩৫৭

আভাসে। অর্থাৎ, 'দেনাপাওনা' ও 'পথেরদাবী'র অগ্নিদীপ্ত সমস্যাতে এই উপন্যাসেরও সূচনা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদের পর ঐ-সমস্যাটি আর উপন্যাসে দেখা যায় নাই। বিপ্রদাসের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন আদর্শের কোন সংঘাত পরিস্ফুট হয় নাই। জমিদার ও প্রজাশক্তির কোন দ্বন্দ্বও ইহাতে নাই। যে দ্বিজদাসকে প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষকদের বিদ্রোহী নেতা রূপে দেখি, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে তাহার সেই ভূমিকা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বরং উপন্যাসের শেষ অংশে তাহাকে বেশ পাকাপোক্ত জমিদারের পদেই অধিষ্ঠিত হইতে দেখি। সুতরাং মনে হয়, শরৎচন্দ্রের যে বিদ্রোহী মন হইতে 'দেনা পাওনা' 'পথের দাবী', শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, সেই মনের দীপ্তি ও জ্বালা দুই-ই নিভিয়া শান্ত হইয়া গিয়াছিল। 'শ্রীকান্ত' ( ৪র্থ পর্বে ) আমরা ইহা দেখিয়াছিলাম, 'বিপ্রদাসে' পুনরায় ইহা দেখিতে পাইলাম। সমসাময়িক জীবনের বহির্বিক্ষোভ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া তিনি যেন যাহা ধ্রুব, যাহা সনাতন এবং যাহা চিরমঙ্গলময় তাহার দিকেই প্রশান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে নায়কের নামাঙ্কিত একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহা হইল 'দেবদাস'। সেই উপন্যাসে তিনি এক নীতিভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বে তাঁহার শেষ সম্পূর্ণ একটি উপন্যাস ঠিক বিপরীত একটি চরিত্র অবলম্বনে ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। আদর্শ চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় শরৎচন্দ্র তাহা কোথাও সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ চরিত্র তাঁহার অনেক উপন্যাসে অঙ্কন করিয়াছেন, এইসব চরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বিস্তর আপত্তি ছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার শেষ নায়ক চরিত্রটি আদর্শের গাঢ় রঙে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। বিপ্রদাস চরিত্রটির স্রষ্টা কে তাহা জানা না থাকিলে অনেকেই বলিবেন ইহার স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেহই নহেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক নায়ক পরিশেষে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের পথে শান্তির সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। বিপ্রদাসও শেষ পর্যন্ত এই পথই অবলম্বন করিয়াছে। সে বন্দনাকে বলিয়াছে, 'তোমার মনকে বুঝিয়ে বোলো যা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে নেই। তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।'

বিধাতার দেওয়া অনেক সম্পদ লইয়াই বিপ্রদাস পৃথিবীতে আসিয়াছিল। এই দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠগঠন, সুপুরুষ লোকটির ভিতরে একটি অনন্যসুলভ উদার ও মহৎ প্রাণই বিরাজিত ছিল। বিরাট জমিদারী সে যেমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিত, তেমনি তাহার কর্তব্যসচেতন, স্নেহশীল দৃষ্টি সংসারের সকলের উপরেই সমানভাবে প্রসারিত ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার ক্ষমাহীন রোষ দীপ্ত অগ্নির মতই জ্বলিয়া উঠিত আবার তাহার বিগলিত করুণার ধারা সকলের জন্যই উচ্ছ্বসিত আবেগে বহিয়া যাইত। ধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাশীল চিত্তের অবিচল নিষ্ঠা সে চিরজাগরূক রাখিয়াছিল, অথচ সংকীর্ণ গোঁড়ামির ক্ষুদ্রতা তাহার চরিত্রকে কখনও মলিন করিতে পারে নাই। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে তাহার দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত, অথচ একদিন সব ছাড়িয়া সে অসীমের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সংসারে যাহারা মহাসত্ত্ব ব্যক্তি ভগবান তাহাদের মাথায় শুধু কেবল দুঃখের বোঝাই চাপাইয়া দেন। বিপ্রদাসও সারাজীবন এই দুঃখের বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। সে অনেকের কাছেই আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পাইয়াছে মায়ের নিকট হইতে। বিপ্রদাস দেবীর আসনে বসাইয়াই বিমাতাকে পূজা করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিমাতার স্বরূপ বুঝা গেল আসল সংকটমুহূর্তে। তখন স্পষ্ট হইয়া উঠিল বিমাতা কোনদিন মাতা হইতে পারেন নাই। ভগ্নীপতিকে সাহায্য করিয়া বিপ্রদাসকে সর্বরিক্ত হইতে হইল এবং তাহার পরমারাধ্যা বিমাতার কাছে প্রতারক, জুয়াচোর জামাইয়ের আদর ও মর্যাদাই বড় হইয়া উঠিল এবং তাহারই প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়া গড়া সংসার হইতে তাহাকে বিদায় লইয়া যাইতে হইল।

বিপ্রদাস ও বন্দনার সম্পর্কই উপন্যাসের মধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং বন্দনার প্রতি বিপ্রদাসের হৃদয়ভাব কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। বন্দনা বিপ্রদাসকে বারবার শ্লেষের খোঁচা দিয়া এবং বক্রোক্তির হুল ফুটাইয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রশান্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিপ্রদাস সব কিছু সহ্য করিয়াছে এবং বিনিময়ে তাহার ক্ষমাশীল অন্তর হইতে শুধু কেবল স্নিগ্ধ মাধুর্যই নিঃসৃত হইয়াছে। বন্দনার সেবাযত্ন এবং তাহার অনুরাগতপ্ত হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ হয়তো এই চিরপ্রশান্ত লোকটির প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবাহিত শোণিতধারা কিছুটা

চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। তাহার কাছে প্রেয়বোধ সব সময়েই শ্রেয়বোধের অধীন। বন্দনার ভালোবাসা স্বীকার করিয়াও সে বলিয়াছে, 'পেয়েচো বই কি বন্দনা, তুমি অনেকখানিই পেয়েচো। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি ক'রে? তোমার রাত্রিদিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে, অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু ক'রে আছে সমস্ত ভেঙ্গে চুরে তাদের হেঁট করে দেব? এই কি তুমি বলো?' যে-শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে দেহজ ভালোবাসার অকুণ্ঠ প্রশস্তি জানাইয়াছিলেন তিনিই আবার এখানে দেহাতীত সূক্ষ্ম, সর্বত্রসঞ্চার ভালোবাসার কথাই বলিলেন। বিপ্রদাস বন্দনাকে বলিয়াছে, 'ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইল তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে—এখন থেকে সে দেবে আমাকে দুঃখে সান্ত্বনা, দুর্বলতায় ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো তোমাকে ডাক। সেও রইল আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে ত তখন? বিপ্রদাস মুখে ভালোবাসার এই স্বীকারোক্তি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পরবর্তী ভাবে ও আচরণে এই ভালোবাসার কোন অস্তিত্ব প্রকাশ পায় নাই। বিপ্রদাসের চরিত্র একটু বেশি রকমের আদর্শায়িত হইবার ফলে তাহার মানবিক দুর্বলতা কোথাও ধরা পড়ে নাই এবং আবেগ-উত্তাপের সজীব সক্রিয়তা কখনও প্রকাশ পায় নাই। বন্দনা একদিন বিপ্রদাসকে বলিয়াছিল, 'আপনি পালন করেন শুধু ধর্ম, মেনে চলেন শুধু কর্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি—কাউকে ভালোবাসতে জানেন না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।' বন্দনা অভিমানে উত্তেজিত হইয়া উপরের কথাগুলি বলিলেও কথাগুলির মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত রহিয়াছে। যাহারা ধর্মনিষ্ঠ, সত্যব্রত ও আদর্শবাদী তাহারা আপনাদিগকে অনেকখানি বঞ্চিত করে, বিপ্রদাসও নিজেকে অনেকখানি বঞ্চিত করিয়াছে। সেজন্য সে ধর্ম ও কল্যাণের হোমাগ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়া বাসনা-কামনার নিত্য আহুতি দিয়াছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়, বিপ্রদাস কাহিনীর প্রথম দিকে সাংসারিক ব্যাপারে যতখানি সক্রিয়তা দেখাইয়াছে শেষ দিকে তাহা মোটেই দেখা যায় না। বন্দনার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের পরে তাহাকে বড়ই

ক্লান্ত, রিক্ত ও উদাসীন দেখাইয়াছে। দ্বিজদাসের উপরে সকল ভার দিয়া সে যেন নিশ্চিন্ত মুক্ত হইয়াছে। তাহার সাময়িক অসুখ করিয়াছিল বটে কিন্তু বাহিরের দিক দিয়া এমন কোন কারণ ঘটে নাই যাহাতে সে এরূপ বৈরাগ্যময় মনোভাব গ্রহণ করিতে পারে। কাহিনীর শেষে তাহাকে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার ত্যাগ করিতে দেখি বটে, কিন্তু এই বৈরাগ্য সংসারের সব কিছু বজায় থাকিবার সময়েও তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। ইহার কারণ কি? বন্দনার প্রতি কোন গোপন ও নিষিদ্ধ দুর্বলতার ফলেই কি তাহার জীবনে এরূপ ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছিল? তাহা ঘটিতেও পারে, কিন্তু বিপ্রদাস এতখানি আত্মসংযমী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন যে তাহার কথা ও আচরণে কোন দিন তাহার অতলস্পর্শী সমুদ্র সদৃশ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত কোন ঘূর্ণ্যাবর্তের কিঞ্চিৎ আভাসও পাওয়া যায় নাই।

বন্দনা সাহেবীভাবাপন্ন পরিবারের আধুনিক, প্রগতিশীলা নারী। তাহার বেশভূষা, কথাবার্তা, চলাফেরা সব কিছুই বিদেশী রুচি ও ফ্যাসানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে যখন বিপ্রদাসের প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারে আসিয়া পড়িল তখন পদে পদে অসঙ্গতি ও বিরোধের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে দেখিতে পাইল। অন্ধ কুসংস্কার ও ছোঁয়াছুঁয়ির কদর্য নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ বার বার ব্যক্ত হইল। দয়াময়ীর নীচ নির্দয়তার বিরুদ্ধে তাহার যত নালিশ তীব্র শ্লেষের আকারে বিপ্রদাসের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু বিপ্রদাসের স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতা ও উদার ধর্মনিষ্ঠা বন্দনার অন্তরকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করিয়া দিল। বিপ্রদাসের ধ্যানমূর্তি দেখিয়া শুধু যে সে বিপ্রদাসের প্রতি আকৃষ্ট হইল তাহা নহে, যে ধর্মের ধ্যানে বিপ্রদাস নিমগ্ন হইয়াছিল সেই ধর্মের প্রতিও সে অনুরক্ত হইয়া পড়িল। বিপ্রদাসের সেবাশুশ্রূষার সময় বন্দনার এক সম্পূর্ণ নূতন মূর্তি আমরা দেখিলাম। সব বিজাতীয় ছদ্মবেশ বর্জন করিয়া সে এক শুদ্ধাচারিণী কল্যাণী নারীমূর্তিতেই আত্মপ্রকাশ করিল। সে নিজে যে সমাজভুক্ত সেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কৃত্রিমতা, নির্লজ্জতা ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিবাদে সে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাসীর বাড়ির আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে তাহার ক্ষোভ ও নালিশের অন্ত নাই। অবশেষে এই উগ্র আধুনিকা তরুণীটি তাহার বহুনিন্দিত প্রাচীনপন্থী জমিদার পরিবারের সঙ্গেই স্বেচ্ছায় নিজের অদৃষ্টকে যুক্ত করিয়া দিল।

শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নারীচরিত্রের মধ্যে যে স্থির সঙ্কল্প ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব দেখা যায় বন্দনার মধ্যে যেন তাহার অভাবই চোখে পড়ে। তাহার মধ্যে অব্যবস্থিতচিত্ততা ও আত্মনির্ভরহীনতাই প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের গোড়ার দিকে দ্বিজদাসের প্রতি যেন তাহার কিঞ্চিৎ অনুরাগের লক্ষণ দেখা দিল, কিন্তু তারপরেই জানা গেল, সে সুধীরের কাছে বাগ্‌দত্তা। আবার সুধীরের সঙ্গে নিমেষের মধ্যেই সে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পুনরায় তাহার প্রণয়প্রার্থী আর একজন যুবক দেখা দিল। সে হইল অশোক। এমনিভাবে বিবাহের আর্জি লইয়া একের পর একজন যুবক যখন তাহার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল তখন একদিন দেখা গেল যে, সে বিপ্রদাসের প্রতি ভয়ঙ্করভাবে আসক্ত। এই আসক্তি সম্বন্ধে বিপ্রদাস যাহা বলিয়াছে তাহা অনেকাংশে সত্য, 'সুধীরকে ভালোবাসার মতো এও তোমার একটা খেয়াল—মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভোলানো। তার বেশি নয়।' বিপ্রদাসের প্রতি তাহার আসক্তি যে একটা সাময়িক খেয়াল মাত্র তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এখানে যে, বন্দনা পরে কখনও বিপ্রদাসের প্রতি তাহার কোন দুর্বলতা অনুভব করে নাই। বরং উপন্যাসের শেষ দিকে সে বিপ্রদাসকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে এবং নিজের অপরাধের জন্য মার্জনা চাহিয়াছে। দ্বিজদাসের প্রতিও তাহার ভালোবাসা জন্মিয়াছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। তাহার প্রতি কোন অনিবার্য আকর্ষণের তাগিদেই বন্দনা যে শেষ পর্যন্ত তাহার কাছে আসিল তাহা নহে, যেন দ্বিজদাসের বিপর্যস্ত সংসারের হাল ধরিবার জন্যই সে তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল। দ্বিজদাসের কাছে আসিবার আগে সে অশোককে বিবাহ করিবার সম্মতি একপ্রকার দিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং দ্বিজদাসের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত করিবার যে ইচ্ছা সে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করিল তাহাও আকস্মিক এবং পূর্ব ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন। বন্দনার মত শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর পক্ষে বরাবর এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ততা ও অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা অশ্রদ্ধেয় চরিত্র হইল দয়াময়ী। দয়াময়ীর ভিতরে বিন্দুমাত্র দয়া ছিল কিনা তাহাতে ঘোর সন্দেহ হয়। তাহার উৎকট আতিশয্যপূর্ণ আচারবিচার তাহাকে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অমানুষিক করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহার আচারবিচার কোন দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে যে

প্রতিষ্ঠিত তাহাও মনে হয় না। বন্দনাকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা মনে আসাতে তিনি তাহার সাত খুন মাপ করিয়া খুব উদারতা দেখাইলেন, আবার যে মুহূর্তে তিনি জানিলেন, সে অপরের বাগদত্তা তখনই তাহার প্রতি এত বিতৃষ্ণা জন্মিল যে তিনি আর এক বাড়িতে থাকিতেই পারিলেন না। তাঁহার নির্দয়তার সর্বাপেক্ষা কদর্য রূপ প্রকাশ পাইয়াছে বিপ্রদাসের সঙ্গে তাঁহার আচরণের মধ্যে। তিনি প্রথমে এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিজের পুত্র অপেক্ষা সপত্নীপুত্র বিপ্রদাসকেই অনেক বেশি স্নেহ করেন। কিন্তু পারিবারিক সঙ্কটের মুহূর্তে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁহার মহাপ্রাণ সপত্নীপুত্রকে ত্যাগ করিয়া মেয়ে জামাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। আবার যখন জানা গেল যে, যে জামাইয়ের জন্য তিনি সপত্নীপুত্রকে বর্জন করিলেন তাহার বিপদে নিজের পুত্রের সম্পত্তি বিপন্ন করিতে চাহেন নাই। সুতরাং নিজের পুত্রের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বরাবরই ছিল। কাহিনীর শেষে আবার তাঁহাকে বিপ্রদাসের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার জন্য উদ্যোগী হইতে দেখি। কিন্তু যে গুরুতর অপরাধ তিনি করিয়াছিলেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিনি কেমনভাবে করিলেন তাহা গ্রন্থ মধ্যে বর্ণিত হয় নাই। দয়াময়ী শরৎসাহিত্যের মাতৃচরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসের অনেকস্থলে ঘটনার অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের গভীর মনোযোগের অভাব ও রচনার শিথিলতা অনেকস্থলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বন্দনা এই উপন্যাসের কাহিনীতে বোম্বাই হইতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার আর বোম্বাই ফেরা হইল না। কেবল তাহাকে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে দেখি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হইয়া উঠে না। অবশেষে সে একদিন বোম্বাইয়ের পথে গেল বটে, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে আবার এক মাসীর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এইসব ঘটনা কষ্টকল্পিত মনে হয়। গ্রন্থের শেষ ভাগে বন্দনা একবার বোম্বাই গিয়াছে বটে. কিন্তু মাত্র একটি পরিচ্ছেদের সময়টুকুই তাহাকে বোম্বাই থাকিতে হইয়াছে। বিপ্রদাসের সঙ্গে দয়াময়ীর বিরোধ ও বিচ্ছেদও হইয়াছে নিতান্ত অতর্কিত এবং অবিশ্বাস্যভাবে। বিপ্রদাসের মত এরূপ সংযত, স্থিতধী ও উদারচেতা ব্যক্তি হঠাৎ সম্পত্তির কারণে শশধরের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হইবে ইহা যেমন অস্বাভাবিক, দয়াময়ীর মত বুদ্ধিশালিনী নারীর পক্ষে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া দেবোপম পুত্রের প্রতি ঐরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করাও

অপ্রত্যাশিত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক হইল দ্বিজদাসের আচরণ। মুখে তো দ্বিজদাস দাদাকে দেবতার অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সেই দাদা যখন তাহারই মায়ের দ্বারা অপমানিত হইয়া নিজের হাতে গড়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে তখন সে একটি কথাও বলিল না, কিংবা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না। দ্বিজদাস শশধরের সঙ্গে লড়াই করিবার সময় যথেষ্ট দৃঢ়তা ও কঠিন ন্যায়নিষ্ঠা দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু দাদা চলিয়া যাইবার সময় তাহার এ-সব চারিত্রিক গুণ কিছুই দেখা যায় নাই। বিপ্রদাস ও বন্দনা চলিয়া যাইবার পর মৈত্রেয়ীর পথ যখন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইল, তখন সে দ্বিজদাসকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল কেন? দ্বিজদাস মৈত্রেয়ীর চলিয়া যাওয়ার একটি ব্যাখ্যা দিয়া বন্দনাকে লিখিয়াছিল, 'মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারে না বোঝা বইতে।' মৈত্রেয়ী সম্পর্কে দ্বিজদাসের এ-উক্তি বিশ্বাস্য মনে হয় না, অন্তত মৈত্রেয়ীকে যতটুকু দেখা গিয়াছে তাহাতে তাহার সম্পর্কে ভিন্ন ধারণাই হয়। বিপ্রদাস স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং দ্বিজদাসকেই শ্রাদ্ধাদির ভার দিল, ইহাও বিপ্রদাসের চরিত্রের পক্ষে অমর্যাদাসূচক বলিয়াই মনে হয়।

## প্রতিষ্ঠার স্বর্ণশিখরে

শরৎচন্দ্রের খ্যাতি যখন উচ্চতম শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছিল তখন তাঁহার অনুরাগী সুহৃদদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার গল্প-উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিতে আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র নিজেও পাশ্চাত্য দেশের পাঠকদের কাছে তাঁহার বইয়ের প্রচার কামনা করিতেছিলেন। দিলীপকুমারকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ তারিখে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'মন্টু, এই অতি তুচ্ছ নিষ্কৃতি নিয়ে সমরাঙ্গণে নেমে পড়া আর টিনের খাঁড়া নিয়ে মোষ কাটতে যাওয়া প্রায় এক কথা। নিজের মধ্যে সত্যিই বিশেষ ভরসা পাইনে। শুধু একটা কথা এই মনে করি যে, তোমার গুরুদেবের আশীর্বাদ আছে এবং তোমার নিজের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে যে কিছুই নেই মনে হয় ভাই।

তুমি শ্রীকান্ত তর্জমা করতে সঙ্কোচ বোধ করচো কেন? যদি হয় ত

তোমাকে দিয়েই হবে। ভবানীকে ডেকে ৪র্থ ভাগ শ্রীকান্ত দিয়ে বলেছিলাম, এর যে কোন একটা অধ্যায় তর্জমা ক'রে নিয়ে এসো। আট দশ দিন পরে সে নিজে ত এলই না, চিঠিতে জানালে তার সাহস হয় না। এবং সে যে ইংরেজি চিঠিটুকু পাঠালে তার থেকে তার কথাটাকে মিথ্যে বিনয় ব'লেও ভাবতে পারলাম না। সে সত্যিই লিখেচে। তাকে দিয়ে হবে না। হ'লে খবরের কাগজের ভাষা হবে।

সোমনাথ মৈত্র যে 2nd part translation করতে উদ্যত হয়েছে এ খবর আমি নিজেও জানি নে। বিচিত্রার উপেন নিজে যদি এ-ব্যবস্থা ক'রে থাকে ত সে আলাদা। খবর নেবো। আমি ত খুঁজেই পাচ্ছিনে কে এ-কাজে হাত দিতে পারে তুমি ছাড়া। নিষ্কৃতির যে-তর্জমা তুমি করেছো তার চেয়ে ভালোই বা কে করতো? তবে, তোমাকে শ্রীকান্ত তর্জমা করতে বলতে আমার ইচ্ছে হয় না। কারণ এতবড় পরিশ্রমের কাজে হাত দিলে তোমার অন্য কাজের ক্ষতি হবে।

নিষ্কৃতির সম্বন্ধে তোমার যে-রকম ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হয় কোরো। ছোট গল্পগুলোর তর্জমা এখানে করাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু লোক পাইনে। আমার নিজের কাছেই রয়েছে পণ্ডিত মশাইয়ের তর্জমা। কিন্তু সে-দেখলেও তোমার হয়ত দুঃখ হবে।'

'নিষ্কৃতি'র অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাও শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রে জানা যায়। ৩রা মাঘ, ১৩৪১ তারিখে তিনি দিলীপকুমারকে লিখিয়াছিলেন, 'অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দের ভালো লাগলো জানি নে। অন্ততঃ না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না, ক্ষুণ্ণও হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্পলেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ-অসম্ভবও হয়ত একদিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।

শরৎচন্দ্র ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইউরোপে যাত্রা করিবেন, ঠিক করিয়াছিলেন। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্ত তদ্বির করিতেই ইউরোপে যাইতেছেন। কিন্তু

শরৎচন্দ্র এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, 'কিছুদিন ধ'রে মণ্টু (দিলীপকুমার রায়), কানাই (ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী) প্রভৃতি আমাকে একবার ইউরোপটা দেখে আসবার জন্তে অনুরোধ করে—আমারও শেষ পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে হয়—এমন কি passport পর্যন্ত নেওয়া হ'য়ে গেছে।' শরৎচন্দ্রের ইউরোপে রওনা হইবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়া সত্বেও শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার জন্ত তাঁহার যাওয়া হইল না। এ-সম্বন্ধে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার 'শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা'য় যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল,—'আগস্ট মাসে শরৎচন্দ্রের ইউরোপযাত্রার কাল আসন্ন হ'য়ে উঠেছে। ইউনাইটেড প্রেস খবর দিয়েছেন যে লণ্ডনের বাঙালীরা তাঁর ইউরোপযাত্রার কথা শুনে ঠিক করেছেন যে লণ্ডনে আসবার জন্তে তাঁরা তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করবেন এবং তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেবার জন্তে বিদেশস্থিত ভারতীয় বার্তাজীবী সমিতির সম্পাদক শ্রী বি. বি. রায়চৌধুরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য শ্রী এন. সি. দত্তকে (তদানীন্তন ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীঅখিল দত্তের পুত্র) একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করবার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এবং যাতে এই সংবর্ধনায় মিঃ বার্নার্ড শ. মিঃ এইচ. জি. ওয়েলস, মিঃ অল্ডুস হাক্সলি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন তার জন্তে বিশেষ চেষ্টা করা হবে।

এই সংবাদটি পড়ে খুব প্রফুল্লচিত্তে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, কিন্তু কিরকম নিরাশ হই তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যাবে।

বললেন: যাবার জন্তে তো সবই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু রোগটা হঠাৎ এত বেড়েছে যে এখন বিদেশে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তার উপর, সেখানে গেলে ছ'মাসের মধ্যেই যে ফিরে আসতে পারব তারও সম্ভাবনা নেই। অথচ শীত পড়তেও দেরি নেই—এ-অবস্থায় বাইরে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই—ও idea আমি ত্যাগ করেছি। আসছে বছরে যা হয় দেখা যাবে।' অবশ্য পরে আর তাঁহার বিদেশযাত্রা হইয়া উঠে নাই।

শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকিলেও রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানাইয়া পারেন নাই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে জনগণের প্রবল বিক্ষোভ জানাইবার জন্ত টাউন হলে একটি মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। সভায় উদ্বোধন করিতে যাইয়া শরৎচন্দ্র

বলিয়াছিলেন, 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাস কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড ? আর মানুষ হলো ছোট ? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, যাতে কোনও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগা দেশে তাই কি হল special and peculiar circumstances ? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া ?···নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলার হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাদের ছোট করা হল চিরদিনের মতো।·· তাঁদের বলতে চাই—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হইলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির - কারও মঙ্গল হয় না।' কয়েকদিন পরে ঐ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত আর একটি সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট. উপাধিপ্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েব তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ডঃ এ. এফ রহমান। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তখন ছিলেন ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক। শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে ডঃ মজুমদারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং শরৎচন্দ্রকে ডি লিট দিবার ব্যাপারে ইনি একজন প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। ডঃ রহমানের পর ডঃ মজুমদাব যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হন তখন শরৎচন্দ্র তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্রের আর একজন অকৃত্রিম অনুরাগী অধ্যাপক ছিলেন —প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। চারুবাবুর চিঠিতে ডি. লিট. উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া উত্তরে শরৎচন্দ্র ১৩৪২ সালের ২৮শে মাঘ লিখিয়াছিলেন, যাঁরা আমাকে উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সব চেয়ে বড উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভরে যায়।' শরৎচন্দ্র চারুবাবুর বাড়িতেই উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ১৩৪৩ সালের ২রা শ্রাবণ লিখিলেন, 'তোমার ওখানে গিয়ে থাকবো না ত বিদেশে যাই কোথায় ? তোমাদের দেশে ( ঢাকায় ) গিয়ে যেখানে যেখানে যে-সব সভা সমিতিতে আমাকে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান এসেছে, আমি সকলকেই এই জবাব দিয়েছি যে সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তারিখ নির্দিষ্ট হ'তে পারে না। এ-কথাও তাঁদের জানিয়েছি যে, আমি চারুর বাড়িতে গিয়ে উঠবো।' কনভোকেশনের গাউন সম্বন্ধে তিনি চারুবাবুকে ঐ-পত্রে

লিখিলেন, 'আমাকে কি একটা গাউন তৈরি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে? জীবনে আর কখনো প্রয়োজন হবে না শুধু একটা দিনের জন্যে একি বিপদ। সঙ্গে একটা তৈরি করিয়ে নিয়ে যাবো?'

শরৎচন্দ্র ঢাকায় গেলে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, জগন্নাথ হল, ঢাকা হল ও মুসলীম হল এই চারটি ছাত্রসংসদ কর্তৃক তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানান হইয়াছিল। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও জগন্নাথ হলের সম্বর্ধনা-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্যার যদুনাথ সরকারও সমাবর্তনে উপাধিলাভ করেন।

শরৎচন্দ্র যখন ডি লিট উপাধি নিতে ঢাকায় যান তখন দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ চলিতেছিল। সেজন্য অনেকেই শরৎচন্দ্রের এই উপাধিগ্রহণ ব্যাপারটিকে ভালো চোখে দেখিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া আর একটি কারণে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কিছুটা ক্ষোভ ব্যক্ত হইয়াছিল। ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজের সম্বর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর তিনি মুসলমান সমাজ অবলম্বনেই গল্প-উপন্যাস রচনা করিবেন। শরৎচন্দ্রের ঘোষিত এই সিদ্ধান্তে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে কাগজপত্রে গালিগালাজের যে বন্যা বহিল তাহার কিছুটা নিদর্শন দেওয়া হইতেছে, যথা—

১। 'বহুবাঞ্ছিত ডি. লিট যখন নভেল লিখেই পাওয়া গেল এবং তা যখন রহমান সাহেবের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার) হাত দিয়েই এলো তখন এই ব্রাহ্মণ বটু আতিশয্যে বলে ফেললেন, তিনি অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়েই নভেল চালাবেন।'

২। 'হায় শরৎচন্দ্র, তোমার এই প্রাণের দায়ে কাঙালপনা দেখিয়া সত্যই তোমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়।'

শরৎচন্দ্র তাঁহার অনুরক্ত সুহৃদ্ অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, 'উপাধিবিতরণের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলার লাট মহোদয়। যখন তাঁর সঙ্গে আহার করছি তখন কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্যের কথা ওঠে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি যদি আমার সাহিত্যে মুসলমান সমাজের কথা দরদের সঙ্গে লিখি, তা' হ'লে এই মনোমালিন্যের অনেকটা সুরাহা হবে এবং তাতে দেশের কল্যাণ হবে। আমি তাঁর এ-কথায় সম্মতি জানাই। ভেবে দেখলুম তিনি কিছু অন্যায় বলেননি।

বাস্তবিকই, আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে আমাদের বিরুদ্ধবাদী ব'লে মনে করিনা কেন, আসলে ওরা আমাদের দেশেরই—এখানেই ওদের সব। আমাদের যা মাতৃভাষা ওদের মাতৃভাষাও তাই। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়ে যদি তাদের কথা লিখি, তারা তা শুনবেই—না শুনে পারে না।'

১৩৪৩ সালের ১১ই আশ্বিন দমদমে 'অলকাভবনে' রবিবাসরে শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐসভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে জানাইয়াছিলেন যে ২৫শে আশ্বিনে যদি সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় তবে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন। সেজন্য ১১ই আশ্বিনের সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানের পর পুনরায় ২৫শে আশ্বিন রবিবাসরের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। রবিবাসরের অন্যতম সদস্য অনিলকুমার দেবের বেলেঘাটার বাগানবাড়িতে ঐ সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ঐ সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন

'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন। তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

আজ শরতের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম, যদি তাঁকে বলতে পারতুম, তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয় নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির

বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা, সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হ'য়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য ক'রে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে, ভালোয় মন্দয়—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।'

এই অভিনন্দনে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যে-রকম উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করিলেন সে-রকম আর কোনদিন লাভ করেন নাই। সেজন্য শরৎচন্দ্রের মন হইতে সকল অভিমান ও অভিযোগ দূর হইয়া গিয়াছিল এবং খুশিতে তাহা ভরিয়া উঠিয়াছিল। শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি ১৩৪৩ সালের ১১ই কার্তিক একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, 'আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্বাদ করেছেন। অকৃপণ ভাষায় মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন, তুমি এলে তাঁর অন্যান্য পত্রের মতো এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।'

'রসচক্র' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবিশেখর কালিদাস রায় ছিলেন 'রসচক্রে'র সম্পাদক। পরে তাঁহার ভাই রাধেশ রায় সম্পাদক হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র কলিকাতায় থাকার সময় এই রসচক্রের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দিতেন। বৈঠকে সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে নানাপ্রকার আলোচনা হইত। শরৎচন্দ্র রসচক্রের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রসচক্রের বৈঠকে শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিতেন। অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'শরৎচন্দ্র রসচক্রে এলেই আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম, আর তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনের ছোট খাটো নানা ঘটনার কথা আমাদের শোনাতেন। সে সব কথা শুনে আমরা সত্যই অবাক হয়ে যেতাম; আর মনে মনে ভাবতাম, কত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সঙ্গে তিনি মিশেছেন। তাদের সমাজ তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ধ্যান-ধারণা, বাসনা-কামনার সঙ্গে

কি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এইখানে শরৎ-প্রতিভার ভিত্তিমূল।'

শরৎচন্দ্র ডি. লিট. উপাধিপ্রাপ্তির পর রসচক্রের সভ্যরা শিল্পী অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের বন হুগলীস্থ বাগানবাড়িতে এক উদ্যান-সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইয়া বলা হইল, 'আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই। আমরা কোন মামুলি বচন-বিন্যাসের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়া করিয়া আনি নাই, আমরা অভিনন্দন-পত্র রচনা করি নাই—আমরা ফুলের মালা পর্যন্ত পরাই নাই আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু জানাইতেছি। রসস্রষ্টা হইতে পারা বহু জন্মের সাধনার ফল—রসস্রষ্টা হইত না পারি, যেন রসের পরিপূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করিয়া রসচক্রের নাম সার্থক করিতে পারি—এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।'

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'তিনি রসচক্রের চক্রবর্তীরূপে ইহার একজন অভিভাবক এবং আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। তিনি রসচক্রকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। আমি যেমন মনে করিয়া থাকি তিনি আমাকেই খুব ভালবাসিতেন, রসচক্রের সকল সভ্যই ঠিক তেমনি মনে করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁহার কাছ হইতে অসীম ভালোবাসা ও প্রীতি পাইয়া আসিয়াছি। সেই আদর পাইয়া আমরা তাঁহার উপর অনেক অত্যাচারও করিয়াছি। কিন্তু তিনি কোনদিন সেজন্য তিলমাত্র বিরক্ত হয়েন নাই। মোট কথা, তিনি আমাদের সকল সাহিত্যিককেই আপন ঘনিষ্ঠ পরিজন জ্ঞানে আমাদের সর্বপ্রকার অত্যাচার, উপদ্রব নীরবে সহ্য করিতেন। হয়ত সেজন্য মনে মনে কখনও তাঁহার একটু দুঃখ হইত। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইত না। এই ভাবিয়া সে দুঃখ দূর করিতেন যে, ইহাদের লইয়া করি কি? এরা সব যে আমার ঘরের পরিজন—এদের যে ফেলিতে পারি না।'[১]

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য কোনদিন ভালো ছিল না। তাঁহার সারাজীবনের চিঠিপত্রগুলি পড়িলে দেখা যাইবে, সেগুলির মধ্যে প্রায় সব সময়েই নানা অসুখবিসুখের উল্লেখ থাকিত। জীবনের সমাপ্তিপর্বে তাঁহার শরীর একেবারে

১। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে, পৃঃ ৮৩

ভাঙিয়া পড়ে। চিকিৎসকেরা বায়ু-পরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি দেওঘর গেলেন। দেওঘরে তিনি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। দেওঘরবাসের স্মৃতি 'দেওঘর-স্মৃতি' নামক একটি গল্পে লিখিয়া রাখিয়াছেন। গল্পটির মধ্যে মানুষচরিত্রের ভূমিকা খুবই সামান্য। তাঁহার নির্জনতাবিলাসী, ক্লান্ত, ধূসর মন পশুপাখীদের জগতে এক শান্ত আনন্দ সন্ধান করিয়া পাইয়াছিল। গল্পের নায়ক হইল একটি কুকুর। কুকুরের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রীতি সর্বজনবিদিত। 'শ্রীকান্তে'র চতুর্থ পর্বে একটি পোড়ো বাড়ির বিষণ্ণ প্রহরী কুকুরের নিকট হইতে শ্রীকান্তের বিদায়ের সময় যে করুণরসের অবতারণা আমরা দেখিয়াছিলাম দেওঘরের ক্ষণিক বন্ধু কুকুরটিকে ছাড়িয়া যাইবার সময় শরৎচন্দ্রের লেখনী ঠিক সেই রকম কারুণ্যে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

৩১শে ভাদ্র আবার ফিরিয়া আসিল। শরৎচন্দ্রের অনুরাগী ভক্তের দল তাহার জন্মোৎসব পালনের নানা আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র জীবিত শরৎচন্দ্রের শেষ জন্মোৎসব পালিত হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োতে একটু ঘটা করিয়া শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইবার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্টেশন-ডিরেক্টার মিঃ স্টেপলটন এই সম্বর্ধনায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হইয়াছিল শরৎ-শর্বরী। এই অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'কোলকাতা বেতারের সেদিনকার শরৎ-শর্বরী সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা কোরে কিছু কিছু বক্তৃতা দান করেন। সকলেরই ভাষণ খুব আন্তরিকতাপূর্ণ হোয়েছিল। সকলের বলা শেষ হ'লে, শরৎচন্দ্র তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে, অল্প কথায় কিছু বলেন। তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তার মোটামুটি কথা এই যে দীর্ঘজীবন বাইরে থেকে সাধারণত দেখতে ভাল হ'লেও সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে উহা কাম্য নয়। যদি স্বাস্থ্য, শান্তি ও কর্মশক্তি অটুট থাকে, দেশ, সমাজ ও লোকসেবা করবার ক্ষমতা থাকে, কোনও দিকে কোনরূপ অশান্তি না থাকে, তবেই দীর্ঘজীবন কাম্য। কিন্তু মানসিক অশান্তি ও দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘজীবন—তেমন

দীর্ঘজীবনকে তিনি ভাগ্যের অভিসম্পাত বলেই মনে করেন। ব্যাধিপীড়িত হ'য়ে কর্মশক্তি হারিয়ে তিনি একদিনও বাঁচতে চান না।'

'বেতার-জগৎ'-এ অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইল,—'গত ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শরৎ-শর্বরীর অধিবেশন অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হোয়ে গেছে। এই অধিবেশনে নাটোরের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, রায়বাহাদুর জলধর সেন, রায় বাহাদুর এন. কে সেন, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, কাজি নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তনরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত হোয়ে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন অতি সংক্ষেপে ও প্রাণস্পর্শী ভাষায়। স্বয়ং শরৎচন্দ্র ও সমাগত সুধী ব্যক্তিরা খুবই খুশী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র রচিত 'সতী' গল্পের নাট্যরূপ ও অভিনয় দর্শনে।'

শরৎচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে শেষ যে সম্বর্ধনা-সভাটিতে যোগ দিয়াছিলেন তাহা আয়োজিত হইয়াছিল বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের দ্বারা। ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমি সেই সভাটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলাম। সেজন্য সভাটির বিবরণ দিতে যাইয়া সসঙ্কোচে কিছুটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি। বিদ্যাসাগর কলেজে আমরা বাংলা বিভাগের ছাত্রদের পক্ষ হইতে বাণীতীর্থ নামে একটি সাহিত্য-সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম। আমাদের উৎসাহদাতাদের মধ্যে ছিলেন বাংলা বিভাগের পূজনীয় অধ্যাপকবৃন্দ, যথা, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শ্রীহেমন্তকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। আমরা, অর্থাৎ বাণীতীর্থের সভ্যবৃন্দ ঠিক করিলাম, শরৎচন্দ্রকে আনিয়া সম্বর্ধনা দিতে হইবে।

শরৎচন্দ্র তখন থাকিতেন সামতাবেড়ের বাড়িতে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য একদিন তাঁহার সামতাবেড়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার দুই সতীর্থ বন্ধু, শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত (ঝাড়গ্রামনিবাসী—বর্তমানে অধ্যাপক), ও শ্রীবিশ্বতোষ সেন (ইনিও বর্তমানে অধ্যাপক)। চিরকাল শরৎচন্দ্রকে

হৃদয়ের প্রিয়তম আসনটিতে বসাইয়া পূজা করিয়াছি, দূর হইতে সভাসমিতিতে তাঁহার প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জানাইয়াছি, তাঁহার সঙ্গে একটু আলাপ করিবার জন্য কবিশেখর কালিদাস রায়, কবি নরেন্দ্র দেব ও শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়ির আনাচে কানাচে উঁকি মারিয়াছি, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোন দিন কাছে ঘেঁসিতে পারি নাই, আলাপ করা তো দূরের কথা। এতদিন পরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে যাইয়া তাঁহারই একান্ত সান্নিধ্যে বসিয়া কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল। আশায় উত্তেজনায় বুক তখন দুরুদুরু কম্পমান। দেউলটি স্টেশনে যখন ট্রেন হইতে নামিলাম সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছে। স্টেশনের গায়েই দুই একটি দোকান। শরৎচন্দ্রের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিতেই দোকানের লোকেরা একটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দেখাইয়া দিল। রাস্তার দুই ধারে দিগন্তছোঁয়া ধানের ক্ষেত। ধানক্ষেতে আশ্বিনের আগমনীর রঙ মাখানো। ধানগাছগুলি খুশির আবেগে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একজন পথচারী গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক গ্রামবাসীর মনে যে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা বাসা বাঁধিয়াছিল তাহা তাহাদের কথা হইতেই টের পাইলাম। পথ শেষ হইল, পরমতম লগ্নটি আসিল। দেখিলাম, বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে শরৎচন্দ্র তাঁহার ক্লান্ত, অসুস্থ দেহটি এলাইয়া দিয়া রহিয়াছেন। কাশ ফুলের মত শাদা এলোমেলো চুলগুলির মধ্যে ছন্দহীন অনিয়মের সুষমা, শীর্ণ মুখে অপার করুণার অমেয় লাবণ্য। চেহারা দেখিয়া চোখে জল আসিল। এ-যে অস্তগমনের মুখ পূর্ণচন্দ্র, পাণ্ডুর জ্যোতি এখনও বিকিরণ করিতেছে, কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়া বুঝি গ্রাস করিতে আসিতেছে।

আমরা প্রণাম করিতেই তাঁহার শীর্ণ মুখমণ্ডল একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কোত্থেকে আসছ হে?' আসিবার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলাম। তখন তিনি প্রথম প্রশ্ন করিলেন, 'রবিবাবু, কেমন আছেন, তোমরা জান? আমি তো এখানে নিয়মিত সংবাদপত্র পাই না, তাই তার খবর জানতে পারি না।' রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ ছিলেন, সেইজন্যই শরৎচন্দ্রের এতখানি উদ্বেগ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি কতখানি শ্রদ্ধা করেন সেদিন তাঁহার পরিচয় পাইলাম। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য লইয়া কিছু আলোচনা করিলেন। 'বলাকা'ই যে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ সে-কথাও বলিলেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক জানিয়াছিলাম, অনেক পড়িয়াছিলাম। তাঁহার সীমাহীন স্নেহ ও দরদ সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তাহা অনেক দৃঢ় হইল। কলেজের কয়েকটি নগণ্য তরুণ ছাত্র। অতি অল্প সময়ে মধ্যে তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি দেন নাই। পরম আগ্রহের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে সমবয়সী অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সেদিন বালকসুলভ চপলতায় কত না নির্বোধ প্রশ্ন করিয়াছি, কত না অসঙ্গত কৌতূহল দেখাইয়াছি কিন্তু তাঁহার অটল ধৈর্যের বাঁধন আলগা হয় নাই, মুখে একটিও বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠে নাই।

—আচ্ছা, শেষপ্রশ্নের কমলের কথাগুলি কি আপনার নিজের কথা? বোকার মত জিজ্ঞাসা করিলাম।

—অতবড় বইখানি পড়ে লোকে যদি তা না বোঝে তবে আর কি বলবো, বল।

—শ্রীকান্ত কি আপনার নিজের জীবনকাহিনী? আর একটি নির্বোধ প্রশ্ন ছুঁড়িয়া দিলাম। অবশ্য সে-প্রশ্নের উত্তরে তিনি একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

শরৎচন্দ্র কোনদিন বক্তা ছিলেন না, ছিলেন ঐন্দ্রজালিক কথক। সেদিন শুধু কথার পর কথা গাঁথিয়া তিনি আমাদের তরুণ চিত্তের উপর যে সম্মোহিনী-মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই। কথায় কথায় রাজবন্দীদের কথা উঠিল। রাজবন্দীদের প্রতি তাঁহার দরদ যে কত গভীর তাহার পরিচয় সেদিন পাইলাম।

শরৎচন্দ্র শুধু কেবল কথা দিয়া আপ্যায়ন করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে চা ও জলখাবার আসিল। সেগুলি নিমেষের মধ্যে সদ্ব্যবহার করিলাম। প্রয়োজনের কথা কখন ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপ্রয়োজনের কথা আর ফুরাইতে চাহে না। সেজন্য উঠিবার কথা আর মনে নাই। রসসমুদ্রের মধ্যে তখন ডুবিয়া গিয়াছি। উঠিবার শক্তি কোথায়? দেখিলাম, এক এক করিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহার কাছে আসিতেছে। নগ্নগাত্র, মলিনমুখ নিতান্তই সাধারণ লোক। 'পল্লীসমাজ', 'পণ্ডিতমশাই', প্রভৃতি বইয়ে তো ইহাদিগকেই দেখিয়াছি। লক্ষ্য করিলাম, শরৎচন্দ্র পাশে রক্ষিত একটি বাক্স হইতে হাতে যাহা উঠিতেছে—আনি, দু'আনি, সিকি লইয়া তাহাদিগকে

দিতেছেন। করুণায় দীপ্ত মুখে তিনি বলিলেন, 'এরাই আমার এখানকার বন্ধু। ধনী শিক্ষিত বন্ধু আমার নেই, এদের মধ্যেই থাকতে আমি ভালোবাসি। কলকাতা আমার ভালো লাগে না, তাই আমি এদের মধ্যেই চলে আসি।'

শরৎচন্দ্র আমাদিগকে লইয়া রূপনারায়ণ নদের তীরে গেলেন। পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন অস্তশিখরযাত্রী। রূপনারায়ণের জলে তখন বিদায়ের লালিমা। সেই লালিমার কিছুটা দীপ্তি তখন শরৎচন্দ্রের চোখেমুখে। ক্ষণকালের জন্য তিনি বিদায়ী সূর্যের পথের দিকে তাকাইয়া যেন একটু আনমনা হইয়া পড়িলেন। কেমন যেন এক কান্নাভরা বিষাদে মনটা ভরিয়া আসিল। মুখে আর কথা জোগাইল না। প্রণাম করিয়া স্টেশনের দিকে ফিরিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন চারিদিকে নামিয়া আসিয়াছে।

বিদ্যাসাগর কলেজের সভা অনুষ্ঠিত হইল আর্য-সমাজ হলে। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র হয়তো আসিবেন না। কিন্তু তিনি কয়েকটি ছাত্রের আহ্বানে সেদিন সত্যই আসিয়াছিলেন। বিদায়ের আগে শেষবারের মত তাঁহার জনসংযোগ। রেডিওর সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন সেগুলি তিনি পুনরায় আমাদিগকে শুনাইলেন, 'আমার সাহিত্যিক মৃত্যু যদি হয়ে থাকে, তবে আমি আর বাঁচতে চাই না।' শ্রীকান্ত একদিন শ্মশানে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিল। শ্রীকান্তের স্রষ্টাও কি মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহিলেন? সেদিন এই আশঙ্কাই আমাদের সকলের মনে জাগিয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের শেষ রচনা 'ভালমন্দ' নামে একটি উপন্যাসের সূচনা-অংশ ১৩৪৪ সালের শারদীয়া সংখ্যা 'বাতায়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র চিরকাল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নামে উপন্যাসের চরিত্রদের নাম রাখিতে ভালোবাসিতেন। আলোচ্য রচনাটি অবিনাশ ঘোষাল সম্পাদিত বাতায়ন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিয়াছিলেন, সেজন্য ইহার কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম রাখিলেন অবিনাশ ঘোষাল। 'ভালমন্দ' উপন্যাসটি দশজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের দ্বারা লিখিত হইয়া ১৩৫৯ সালের মাঘ মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে আরও দুইখানি উপন্যাস শরৎচন্দ্র অন্যান্য সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় লিখিয়াছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকায় বারোজন সাহিত্যিক 'বারোয়ারী' নামে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাসখানির ২১ ও ২২

পরিচ্ছেদ লিখিয়াছিলেন। উপন্যাসখানি ১৯২১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাসখানি হইল 'রসচক্র'। কাশী হইতে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসজ্যোতিঃ পত্রিকায় শরৎচন্দ্র 'বাড়ির কর্তা' নামে একখানি উপন্যাস আরম্ভ করেন। উত্তরা সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুরোধে 'রসচক্রে'র সদস্যবৃন্দ উপন্যাসখানি শেষ করেন। উপন্যাসখানির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ জগদীশ গুপ্ত, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ নরেন্দ্র দেব, নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবী, দশ হইতে চৌদ্দ পরিচ্ছেদ সরোজ রায়চৌধুরী, পনেরো হইতে উনিশ পরিচ্ছেদ মনোজ বসু, কুড়ি হইতে বাইশ পরিচ্ছেদ বিশ্বপতি চৌধুরী, তেইশ হইতে পঁচিশ পরিচ্ছেদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাব্বিশ হইতে আটাশ পরিচ্ছেদ রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং উনত্রিশ হইতে একত্রিশ পরিচ্ছেদ লেখেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে।

## দীপনির্বাণ

শরৎচন্দ্রের শেষ সময়কার অসুখ সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীকালিদাস রায় বাতায়নসম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিয়াছিলেন—

'গত আড়াই বছর ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ নিয়েই তিনি বেঁচেছিলেন। বহুদিন হতে তাঁর অর্শরোগ ছিল—এই সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। সামতাবেড় হ'তে একদিন রোদে স্টেশনে হেঁটে এসে তিনি গাড়ীর মধ্যেই অবসন্ন হয়ে পড়েন। সেদিন হ'তে একপ্রকার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। প্রায়ই মাথা ধরত—মাথাধরার জন্য কিছুদিন ধরে খুব কষ্ট পান। কপালের নিম্নভাগটায় সব সময়েই বেদনা অনুভব করিতেন। একদিন শ্যামবাজারে একটি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে জ্বর হতো। ঢাকায় Convocation-এর ডিগ্রী আনতে গিয়ে সাহিত্যিক অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে জ্বরে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন। সেখান হ'তে ফেরার পর মাঝে মাঝে জ্বরে পড়তেন—শেষে অবিচ্ছেদ্য জ্বরে কিছুকাল শয্যাগত থাকেন—তাঁর জ্বর বি-কোলাই ইনফেকশনের ফল বলে স্থির হয়। তাঁকে ম্যালেরিয়াও ধরেছিল। তিনি বলতেন—'সামতাবেড়ে

ম্যালেরিয়া নেই—ম্যালেরিয়া কিছুতেই হতে পারে না। ম্যালেরিয়া যদিই হয়ে থাকে তবে তোমাদের বালিগঞ্জেই ধরেছে।' যাই হোক—ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাতেই তাঁর জ্বর সেরে যায়। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাতেই তাঁর মাথাধরা ও রোগের বেদনাও দূর হয়ে যায়। change-এ যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। তবু ডাক্তারের পীড়াপীড়িতে কিছুদিনের জন্য তিনি দেওঘরে গিয়াছিলেন। ঔষধপত্রে তাঁর বিশেষ বিশ্বাস ছিল না—তবু ডাক্তারের নির্দেশে ঔষধপত্র যথেষ্টই খেয়েছিলেন—কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসাও করেছিলেন। তিনি বলতেন, এই দুই বছরে আমার শরীরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ডিসপেনসরি গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে জেদ করে বসতেন, আর ওষুধ কিছুতেই খাব না। কেউ তাঁকে ওষুধ খাওয়াতে পারত না। তাঁর বন্ধু ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল—শিশুকে আত্মীয়স্বজনেরা যেমন করে ভোলায় তেমনি করে তিনি শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়ে আবার ওষুধ খাওয়াতেন।

জ্বর সেরে গেল, মাথার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু শরীরের সে সামর্থ্য সে স্বাস্থ্য, মনের সে প্রফুল্লতা আর ফিরল না। তার পর গত আশ্বিন মাস হতে নূতন ব্যায়রামের সূত্রপাত হলো। তারই পরিণতির ফলেই তাঁর জীবনাবসান।

গত দুই বৎসর তিনি মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় এরূপ আভাস পাওয়া যেত। একটা মৃত্যুভয় তাঁর জীবনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতার ওপর ছায়াপাত করেছিলো। এই মৃত্যুভয় দমন করবার শক্তিও তাঁর ছিল অসাধারণ। কোনদিন কথাবার্তায় তিনি সে ভয় প্রকাশ করেন নি।

দুবৎসর আগে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, দেখ, যারা অনেক টাকাকড়ি খরচ করে নানাপ্রকার ধর্মাচরণ করে, তাদের বিশ্বাস স্বর্গ আছে—স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবে। আমার কোন ধর্মাচরণও নেই, স্বর্গও নেই, সেদিক হতে কোন আশ্বাস বা সান্ত্বনা পাইনা। আমার নরকও নেই—নরকভয়ই মৃত্যুভয়কে ভীষণ করে তোলে, আমার নরকভয়ও নেই। আমার পরলোকও নেই, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাই তাগিদও নেই।

শরৎচন্দ্রের শরীর দিন দিনই খারাপ হইতে লাগিল। তাঁহার চিকিৎসা

ও সেবাপরিচর্যার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তিনি তাঁহার আবাল্য সুহৃদ্ সম্পর্কীয় মামা সুরেন্দ্রনাথকে ভাগলপুর হইতে কাছে আনাইয়া রাখিলেন। সামতাবেড়ের বাড়িতে অসুখ বাড়িয়াই চলিল, তখন শরৎচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা স্থির হইল। বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। কোন সুনিয়মিত চিকিৎসাও হইতেছিল না। সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, কলিকাতায় না আনিতে পারিলে তাঁহাকে আর কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না। এক্সরে করা দরকার। তাহা না হইলে প্রকৃত অসুখ নির্ণয় করা যাইবে না। শরৎচন্দ্র সবই বুঝিলেন, তবুও এক অজানা ভয়ের হাত হইতে নিজেকে কিছুতেই যেন মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে তাঁহাকে রাজি করান গেল। হিরণ্ময়ী দেবী সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু তিনচার দিনের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন এই আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

রূপনারায়ণের তীরবর্তী তাঁহার প্রিয় বাড়িটি ছাড়িয়া যাইতে শরৎচন্দ্রের মন আর চাহে না। কথায় কথায় সুরেন্দ্রনাথকে তিনি বলিয়াছিলেন, বাড়িটা—আমায় যে কি মর্মান্তিক আকর্ষণে টানে! যেন আমাকে পেয়ে বসেছে! কিন্তু তবুও যাইতে হইবে। রওনা হইবার সময় গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া শরৎচন্দ্র গান ধরিলেন, 'পথের পথিক কোরেছ আমায়—সেই ভালো, ওগো সেই ভালো। আলেয়া জ্বালালে প্রান্তর ভালে সেই আলো মোর সেই আলো।' ঘর ছাড়িয়া পথিক পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই পথ অনন্তের দিকে বিস্তৃত। ক্ষুদ্র গৃহে আর তাঁহার ঠাঁই হইল না।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। ডাঃ রায় শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'কিং কিংস।' ডিকসানারী ঘাঁটিয়া বুঝা গেল 'কিং কিংস' হইল অন্ত্রের ব্যাধি—নাড়ি জট পাটকেল। এক্সরে করার পর ধরা পড়িল পেটের মধ্যে দুরারোগ্য ক্যান্সার বাসা বাঁধিয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, কিন্তু তাহাতে বিভ্রাট বাধিয়া গেল। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে ডাক্তারদের একটি বৈঠকে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত লওয়া হইল। কিন্তু শরৎচন্দ্র ডাঃ বিধান রায় ছাড়া আর কাহারও হাতে অস্ত্রোপচারে রাজী হইলেন না। ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচারের জন্য বারো শ টাকা চাহিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র অত টাকা বাহির করিতে রাজি হইলেন না, ডাক্তাররা আবার একটি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য কিছু দিনের জন্য মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন। সুতরাং অস্ত্রোপচার স্থগিত রহিল।

একদিন অধ্যক্ষ মুকুল দে ডাঃ ম্যাকেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, বাড়িতে রাখিয়া চিকিৎসা চলিবে না, নার্সিং হোমে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। ডাক্তারের জানা নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রকে লইয়া যাওয়া হইল। নার্সিং হোমটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চালিত, সেখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি। শরৎচন্দ্র ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। নার্সিং হোমের নিয়মকানুন যেমন তিনি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না, তেমনি এ-দেশীয় লোকেদের প্রতি নার্সদের ব্যবহারেও তিনি অতিশয় অপমান বোধ করিলেন। রাত্রে তো তাহাদের সঙ্গে খণ্ড-প্রলয় ঘটিয়া গেল। সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সেখানে থাকা পোষাইল না। সুরেন্দ্রনাথ অনেক খোঁজাখুঁজির পর আর একটি নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, নার্সিং হোমের ডাক্তার সুশীল চট্টোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয়।

নার্সিং হোমে অনেকেই শরৎচন্দ্রকে দেখিতে আসিতেন। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে দুইটি ক্যানেরি পাখী তাঁহার ঘরে আনিয়া রাখা হইল। তাহারা গান গাহিত আর তিনি শান্ত মনে সেই গান শুনিতেন। একটি গোলাপের টব আনিয়াও তাঁহার ঘরে রাখা হইল। একদিন বিকালে ডাঃ বিধান রায় শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অপারেশন না করিলে পরশুদিন তিনি মারা যাইবেন। অপারেশন করা স্থির হইল। ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানবাবু চারশ টাকায় রাজি করাইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও অবিনাশ ঘোষাল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ হইতে হাজার টাকা জোগাড় করিয়া আনিলেন।

শরৎচন্দ্রের গুরুতর অসুস্থতার কথা জানিয়া সমগ্র দেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সংবাদপত্রে প্রতিদিন নানা উদ্বেগজনক সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ পত্র লিখিয়া জানাইলেন, 'সমগ্র বঙ্গদেশ তোমার নিরাময় সংবাদ শুনিবার জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।'

শরৎচন্দ্রের পেটে অস্ত্রোপচার করা হইল। দেখা গেল যে যকৃৎটা একেবারে পচিয়া গিয়াছে। তরল খাদ্য শরীরের মধ্যে দিবার জন্ত সাময়িক ভাবে পেটের মধ্যে একটা নল বসাইয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্রের শরীরে রক্তের অভাব হওয়াতে তাঁহার ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র দাদার শরীরে নিজের রক্ত দিলেন। শরৎচন্দ্রের অবস্থা সামান্ত একটু ভালর দিকে গেল। ললিতবাবু

একদিন বলিলেন, 'বৃথা নার্সিং হোমে রেখে টাকা খরচের প্রয়োজন কি ? বাড়ি নিয়ে যান।' বাড়িতে তাঁহাকে নীচের ঘরে রাখার ব্যবস্থা হইল। ললিতবাবু রাত নটা দশটার সময় আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'কাল ভোর ছটার সময় অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে এসে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব।'

কিন্তু এসব ব্যবস্থা যখন হইতেছিল তখন বোধ হয় কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, সেই রাতই শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষ রাত। কিভাবে সেই ভয়ঙ্কর রাতটি কাটিল তাহা সুরেন্দ্রনাথের 'শরৎ-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত হইল—

'সব ঠিক হোল। সন্ধ্যের কিছু আগে আমি বাড়িতে খেতে যাবার সময় শরৎকে বোললাম, কাল সকালে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব। একটি কথা মনে রেখো মুখ দিয়ে কিছু খাবে না। শরৎ বোললেন, দেখ, তুমি আমাকে খুব চেন। কারণ না বোললে আমি কোন আদেশ উপদেশ মানিনে, বুঝিয়ে দাও কেন খাব না।

মুখ দিয়ে খেলে তোমার নিশ্চয় বমি হবে। যদি বমি হয় তো পেটের সব বাঁধন কেটে গেলে আর রক্ষা করা যাবে না। এ তো অতি সহজ কথা। শরৎ আদর কোরে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বোললেন, এবার আমাকে তুমি খাইয়ে দিয়ে যাও।

খাওয়ান, মানে টিউব কোরে আঙ্গুরের রস—খাইয়ে দিয়ে বোললুম—খেতে যাচ্ছি। নটা দশটার সময় ফিরবো।

শরৎ বোললেন, কেন কষ্ট কোরে আসবে ?

বাঃ সকালে ললিতবাবু এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, ঠিক হোয়ে গেছে, আজ তোমার খাট, বিছানা বাইরের ঘরে আনা হোয়েছে, এখেনে থেকে মিছে খরচপত্র হচ্ছে। তুমি একটু সারলে তোমাকে কুমুদবাবু ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে উচিত ব্যবস্থা কোরে ফিরিয়ে আনবেন।

বাড়ি এলাম। বড়মাকে বোললাম, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আজ, কাল সকালে শরৎচন্দ্রকে বাড়ি আনতে হবে।

খেতে বসলে ছোটমা (প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রী) বসে বসে বললেন,—তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন ?

আসার সময় তাঁকে দেখতে পাই নি। আমি হেঁটে এসেছি। এক্ষুনি খেয়েই ফিরবো। এমন সময় প্রকাশ এসে বললেন, দাদা বলে দিলেন—আপনি সকালে যাবেন। আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

বেশ,—আমি হেঁটেই যাব।

কি দরকার? প্রকাশ বললেন।

উত্তরে বললাম,—শেষ রক্ষা দরকার, হেঁটেই যাব।

হেঁটে যাবার সময় দুই বৌ আমার যাওয়ায় বাধা দিতে লাগলেন।

বোকা মানুষ তো,—তাঁদের তুষ্ট কোরলাম।

তখন রাত দুটো হবে। ফোন্ বেজে উঠলো।

কে?

রয়টার।

ইংরাজিতে প্রশ্ন হোল; ডাঃ চাটার্জি কেমন?

ভালই।

কোথা থেকে বোলছেন?

বাড়ি থেকে।

ফোন স্তব্ধ হোল।

বড়মা দৌড়ে এলেন। কি মামা?

কিছু না,—কাগজওয়ালারা জানতে চাচ্ছে।

শুনে মনে হোল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। রয়টার জানতে চায় কেন?

নার্সিং হোমে ফোন করতেই জবাব এল—ডাঃ চ্যাটার্জি বমি করছেন।

সর্বনাশ!

উঠে পোড়লাম। ছুটে পাইখানায় যাচ্ছি—বড়মা বেরিয়ে বোললেন, কি হয়েছে মামা?

আমাকে যেতে হবে।

চা কোরেছি? বোলে তিনি ষ্টোভ জ্বাললেন।

চা খেয়ে—তখনও বেশ অন্ধকার—ছুট দিলাম।

পৌঁছে দেখি শরৎচন্দ্র বমি কোরছেন এবং মৃত্যুঞ্জয় পাশে দাঁড়িয়ে। [illegible] ঢুকতেই তিনি অদৃশ্য হোলেন।

একি শরৎ?

আমি মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে—

চারিদিকে অন্ধকার দেখলাম!

ডাঃ সুশীলকে ডাকতে তিনি এলেন।

তিনি ফোন কোরলেন কুমুদবাবুকে। তিনি এলেন।

বমির পর বমি!

অবশেষে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান লোপ হল। আমাদের সকল প্রচেষ্টার শেষ হোল।

ললিতবাবু এলেন।

ফিরে গেলেন।'

সকাল হইতেই অক্সিজেন দেওয়া হইতেছিল। ডাক্তারেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী (বাং ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ) বেলা দশটার সময় ৬১ বৎসর ৪ মাস বয়সে শরৎচন্দ্র শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কথাসাহিত্যের দেউলে যে দীপটি এতদিন উজ্জ্বলতম শিখা বিকিরণ করিয়া জ্বলিতেছিল তাহা নির্বাপিত হইয়া গেল।

## মহাপ্রয়াণ

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সাত মিনিট পরে সেই সংবাদ টেলিফোন যোগে কলিকাতার নানা স্থানে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠান হয়। বেতার মারফত এই সংবাদ ভারত ও পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়। কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা দৈনিকপত্র বিশেষ শরৎ-সংখ্যা বাহির করিল। সমগ্র দেশ গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ক্যাপ্টেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এন-সি-চ্যাটার্জী, নরেন্দ্র দেব ইত্যাদি। তাঁহারা শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ মোটর যোগে শরৎচন্দ্রের বালীগঞ্জের বাড়ি, ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডে লইয়া আসেন। সম্মুখের দালানে একখানি পালঙ্কে সেই বিশীর্ণ, নিষ্প্রাণ দেহটি শায়িত হইল, নিস্পন্দ মুখে বেদনা ও করুণার ম্লান ছায়া। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার চারিদিক হইতে সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শেষ শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন। মর্মছেঁড়া আকুল শোকের যে ভাষাহীন মূর্তি সেদিন শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছি, স্মরণীয় কালের মধ্যে কোন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সেরকম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

যিনি সকলের জন্য এতদিন বেদনা বহন করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুতে সেই বেদনাই সকলের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইয়া জাগিয়া রহিল।

বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ও স্তবকে সজ্জিত শবাধারটি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহর পুকুর রোড, ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড হইয়া শোকযাত্রা কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাড়ি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ও খালসা স্কুলের শিখ গুরুদ্বারের সম্মুখে শবাধারটি থামাইয়া মাল্যদান করা হয়। শবশোভাযাত্রায় চলিবার সময় সেদিন এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখিয়াছি। শোভাযাত্রায় অংশকারীদের মধ্যে আমরা ছিলাম অধিকাংশই ছাত্র। যাঁহারাই পথপার্শ্ব হইতে তাঁহাদের প্রিয়তম সাহিত্যিকের অন্তিম যাত্রা দেখিলেন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে সেই শোভাযাত্রার অংশীভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। চলমান গাড়ি থামাইয়া সাহেবরা টুপি খুলিয়া সম্মান দেখাইতে লাগিলেন, সেই দৃশ্যও বারবার চোখে পড়িল। সেদিন শোভাযাত্রীদের মুখে অপরাজেয় কথাশিল্পীর জয়নাদ যেমন ধ্বনিত হইতে লাগিল, তেমনি 'পথের দাবী'র উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার জন্য ঘন ঘন সম্মিলিত দাবী উত্থাপিত হইল।

শরৎচন্দ্রের শেষকৃত্য সম্পর্কে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র বিবরণী হইতে উদ্ধৃত হইল, 'আদিগঙ্গার তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ চিতাগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে, যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, শাসমল, যতীনদাস প্রভৃতির নশ্বর দেহ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে শ্রীকান্তর অমর রচয়িতা, চিরদুঃখদরদী, আধুনিক কথা-সাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিদ্রবান্ধব শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট কঙ্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। সেই চিতাশয্যার চতুর্দিকে মহীশূর উদ্যানে, পথে ঘাটে; আদিগঙ্গার ওপারে নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে ঘটে নাই।... ...

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা, ৫-৪৫ মিনিটে শরৎচন্দ্রের চিতায় অগ্নিপ্রদান করা হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখাগ্নি করেন। উমাপ্রসাদ শবদেহের

বস্ত্রগ্রন্থিগুলি মোচন করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দনকাঠ সজ্জিত চিতা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠে। যে শিখায় পুড়িয়াছিল দেবদাস, শ্রীকান্তদিদি, জ্ঞানদার মা, দুর্গাসুন্দরী সেই শিখায় আধুনিক বাঙলার সমাজবিদ্রোহের মন্ত্রগুরু জ্বলিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।'

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার বাড়িতে অথবা শ্মশানে শেষ শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তৎকালীন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অনারেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জে. সি. গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কুমার মুণীন্দ্রদেব রায়, কে. আমেদ, মুকুল দে ও তাঁহার পত্নী. রায় বাহাদুর জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

## শোকসভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলা দেশের সর্বত্র এবং ভারতের বহু স্থানে অনুষ্ঠিত শোকসভায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হইয়াছিল। মৃত্যুর তিন দিন পরে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজনের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়! নিম্নোক্ত শোকপ্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

'প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী এবং সহজ সাধারণ বাঙালী সমাজের নিপুণ ও দরদী চিত্রকর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কর্পোরেশন গভীর দুঃখপ্রকাশ করিতেছে।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা মৃতের পরিবারবর্গকে জানান হইবে।'

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। কলিকাতার

জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি মহতী শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিও একটি সভায় শোক জ্ঞাপন করে। গুজরাটের হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৫১তম সম্মেলনের প্রথম দিনকার অধিবেশনে অন্যান্য পরলোকগত নেতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিলেন, 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্যগগন হতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল। যদিও বঙ্গবর্ষ তাঁর নাম বাঙলার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য-জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়।'

ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক, মান্য দেশনেতা ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাব্রতী শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিলে রবীন্দ্রনাথ শোকাভিভূত হইয়া বলেন, যিনি, বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সহিত আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিতেছি।' কয়েকদিন পরে কবি শরৎচন্দ্রের অমর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাইয়া তাঁহার বহুশ্রুত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রের যে শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে রবীন্দ্রনাথের শোকবাণী গোড়াতেই মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল, নিতান্ত অবিবেচকের মত শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পর শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উল্টোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে

অসহিষ্ণু হ'য়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময় মতো মরতে পারতুম, তা হ'লে নিঃসন্দেহেই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন।......

......আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমনি ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের দেশের এবং কালের।......

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হ'তে দেরি হোলো না। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হ'য়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি।'

সুভাষচন্দ্র শোকাভিভূত চিত্তে বলিয়াছিলেন, 'করাচীতে অবতরণ করবা মাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাসসম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোকসংবাদ পেলাম।...তাঁর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল তাহা কোন দিনই পূর্ণ হইবে না।'

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে শোকসন্তপ্ত হইয়া যাঁহারা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের শোকোচ্ছ্বাস উদ্ধৃত হইল :

### রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বঙ্গসাহিত্য তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁর পাঠকমহল ছিল সকলের অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাল। বাংলার সাহিত্যিকগণের এবং তাঁর পরিবারবর্গের এই শোকে আমরা সকলেই শোকার্ত।

### শরৎচন্দ্র বসু

বাংলা মায়ের নয়নের মণি হারাইয়া গেল। তিনি ছিলেন উদার, কোমল-হৃদয় ও আবেগময়। তাঁহার অন্তরে ছিল সর্বপ্রকারের অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। হৃতসর্বস্ব পদদলিতের জন্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল সীমাহীন করুণার স্রোতধারা।

### সি. এফ. এণ্ড্রুজ.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন মহিমময় সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলায় যে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমার সমবেদনা তাহার সহিত যুক্ত করিলাম।

### মাদ্রাজের মন্ত্রী বি. গোপাল রেড্ডী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে শুধু বাংলা দেশের বিরাট ক্ষতি হয়নি, সাহিত্য জগতেরও ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাংলার তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর বহু মনীষী পণ্ডিত ও সমালোচক শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কয়েকজনের মতামত উদ্ধৃত হইতেছে:

### শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যতদিন বাংলা ভাষা বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন বাঙালীর সুখদুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবে না। সাহিত্যজগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্পকথার মতই বিস্ময়কর। বিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী তাঁহার পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু সহজভাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অপরাজেয় কথাশিল্পীরূপে বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিলেন।

### নলিনীরঞ্জন সরকার

একবার জেনেভায় লীগ অব নেশন কার্যালয়ে জনৈক বাঙালী বন্ধুর নিকট আমি দুঃখের সহিত বলেছিলাম যে, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পাশ্চাত্য দেশে আর কোন বাঙালীর নাম শুনা যায় না। এই কথায় নিকটে উপবিষ্টা এক বিদেশিনী মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালী লেখকও তো পাশ্চাত্য দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর দু-একখানা বই নাটকরূপে রূপান্তরিত হয়ে ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং

বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে।—বলা বাহুল্য সুদূর পাশ্চাত্য দেশে এই সংবাদে আমি বাঙালী হিসেবে গর্ববোধ করেছিলাম।

### যদুনাথ সরকার

ভাষার উপর তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কখন কখন দরকার হয় বটে; কিন্তু যে-ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করে সেই ভাষায় তিনি অপরাজেয় ছিলেন। এণ্ডারসন সাহেব বিলাতের টাইমস পত্রিকার দেড় কলম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'ছোটবুলী' লেখায় শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠকের উপর তিনি ইন্দ্রজালের মত প্রভাব বিস্তার করিতেন। শরৎচন্দ্রের লেখা চন্দ্রকিরণের মতই স্নিগ্ধশীতল ছিল। তাহার ভিতর মদিরা ছিল না, ঘরের কথার মতই তাহা শীতল ছিল। সেই চন্দ্রকে হারাইয়া আজ বাংলার সাহিত্যগগন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।

### সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তাঁহার কতকগুলি গল্প যাহা মাসিক কাগজে ক্রমশ প্রকাশিত হইত—আদি নাই, অন্ত নাই, চরিত্র বিশ্লেষণ জানি না,—তাহার ৩।৪ পৃষ্ঠা পড়িয়াই বলিয়াছি বাংলাসাহিত্যে অমন লেখা দেখি নাই। যেখানে যে কথাটি প্রয়োগ করা আবশ্যক সে কথাটি যদি সেখানে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে সাহিত্য-প্রতিভা বলা হয়। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ভঙ্গী দ্বারা কবি কবি হন এবং সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন। শরৎচন্দ্রের যদি সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়, মাত্র তাহার ৩।৪ খানি পাতা থাকে এবং তাহা যদি বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের হাতে পড়ে ও তিনি তাহা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিবেন লেখক বাংলা-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়ার উপযুক্ত।...

কেহ কেহ বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পথে চালান। আবার কেহ কেহ বলেন রূপ ও আনন্দসৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। শরৎচন্দ্র যেভাবে মানুষের প্রেম উপলব্ধি করিতেন সেইভাবে প্রকাশ করিবার সৎসাহস তাঁহার ছিল। নীতিশাস্ত্রবিদ বা ধর্মশাস্ত্রবিদের ন্যায় এক পক্ষে ওকালতি করিবার

জন্ম তিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। জীবনের উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার জন্ম ছিল তাঁহার ব্যস্ততা। যেখানে দেখিয়াছেন, স্বচ্ছ প্রাণের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে তাহা পঙ্কিল হইলেও সমাজবিরোধী হইলেও উহা বলিবার সাহস তাঁহার ছিল। মানুষের কাছে যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে তিনি রূপ দিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন, রূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন—ইহাই শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কেহ কেহ মনে করেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কামগন্ধ ছিল। আমি তাহা মনে করি না। তাঁহার রচনার মধ্যে একটা অমোঘতা ছিল—সেইজন্ম পড়া শেষ না করিয়া পাঠকেরা তাঁহার উপন্যাস হস্তচ্যুত করিতে রাজী হইতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দিয়াছেন কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেন নাই, কারণ গেঁয়ো যোগী ভিক পায় না। শরৎচন্দ্রের নামের 'চন্দ্র' শব্দে আমি আপত্তি প্রকাশ করি, কারণ চন্দ্রের আলো ধার করা কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে বিলক্ষণ মৌলিকতা ছিল। তিনি স্বপ্রকাশ। অপরে যে পথে চলেন নাই তিনি সেইপথে চলিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি দেখাইয়াছেন—আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনে গভীর ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে। যাহাকে আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও সামান্য মনে করি সেই তুচ্ছ দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে। তাহার ভিতর কত বিচিত্ররূপে কত ছদ্মবেশে প্রেম দেখা দিয়াছে, তাহা নানারকমে রূপান্তরিত হইয়াছে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সনাতন ভালবাসার রূপ তিনি দেখাইয়াছেন—যাহা বাংলাসাহিত্যে স্থান পায় নাই তাহাকে তিনি স্থান দিয়াছেন; ইহার significance সম্বন্ধে আজ বলিতে পারি না। মোট কথা আমাদের উপন্যাসসাহিত্য মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বিষয় নির্বাচন বা রসসৃষ্টির দিক হইতে তাহার কোন অবসর ছিল না, মুমূর্ষুকে

তিনি জীবনদান করিয়াছেন, অবরুদ্ধ ধারাকে স্রোতস্বিনী করিয়াছেন। আমাদের সম্পদকে অনুভব করিবার শক্তি দিয়াছেন। যাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কতখানি ভাবসম্পদ আছে প্রকৃত কবির অন্তর্দৃষ্টির সহিত তিনি তাহা দেখাইয়াছেন।

## কুমুদরঞ্জন মল্লিক

### অন্নদা দিদি

১

স্বামীর লাগিয়া প্রাণ দেছে বহু সতী
তাঁদেব চরণে বারবার করি নতি।
পিতার মুখেতে স্বামীর নিন্দা শুনে,
দেবী আমাদের পুড়েছেন হোমাগুনে।
শুনি সাবিত্রী দময়ন্তীর কথা
ধন্য তাঁহারা ধন্য পতিব্রতা।
তব সতীত্ব অতি অপূর্ব নিধি
তুলনা তোমার নাহি অন্নদা দিদি।

২

চিতায় পোড়াতে বেশী কথা কিছু নয়
গ্রামে গ্রামে তার পাওয়া যায় পরিচয়!
স্বামীর লাগিয়া দেখায়ে অসতী সাজা
জগতের মাঝে অতি নিদারুণ সাজা।
অরুন্ধতী এ বসতি স্বামীর সনে,
বরণ করিয়া কলঙ্ক-আবরণে।
লোহা হলে, নিজে হইয়া পরশমণি
কমল হইয়া হলে দীন ভিখারিণী।

৩

অপ কলঙ্কে কঠিন দুর্গ গড়ি,
স্বামীরে রাখিলে তুমি নিরাপদ করি।
মরণ অধিক যাতনা সহেছ সতী—
ভুবনেশ্বরী হ'য়ে হলে ধূমাবতী।
তব অপবাদ কৈলাস গিরিচূড়ে
ভাঙর ভোলারে লইয়া রহিলে দূরে।
তোমারে দেখিয়া অবাক হয়েছে বিধি
তুলনা তোমার নাহি অন্নদা দিদি।

## কালিদাস রায়

এই তব মাতৃভূমি। এর সারা অঙ্কটি ব্যাপিয়া
ছিলে তুমি এতদিন। মনঃপ্রাণ নিঃশেষে সঁপিয়া
ইহারে বাসিলে ভালো। প্রীতিভরা এর প্রতিদান
এর প্রতি লতাতরু, এর প্রতি পাখীটির গান
এর প্রতি ধূলিকণা, বারিবিন্দু, প্রতি তৃণাঙ্কুর
লাগিল তোমার কাছে অপরূপ। চন্দন-মধুর
এর প্রতি স্পর্শখানি তব তপ্ত হৃদয় জুড়ালো,
প্রতি প্রাণীটিরে এর প্রাণ দিয়ে বেসেছিলে ভালো।
প্রতিদানে অবিরল প্রীতিধারা যা পেয়েছ তুমি
কোথায় মিলিবে তাহা? দিয়াছে যা তোমা মাতৃভূমি
পাবে না পাবে না, বন্ধু, কোন স্বর্গে কোন পরলোকে।
তারে ছেড়ে যেতে অশ্রু হে দরদী ঝরেনি কি চোখে?
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা শত পাকে, সহস্র বন্ধনে
নিসর্গে, সংসারে, ভক্ত বন্ধুসঙ্ঘে জাতীয় জীবনে
ছিলে তুমি, একে একে যে বাঁধন ছেদিবারে, আহা
কি যে ব্যথা পেলে তুমি, ভিষকেরা জানিল কি তাহা?[১]

১। শরৎচন্দ্রের শোকসভায় পঠিত।

## কাজী নজরুল ইসলাম

সেদিন দেখেছি আকাশের শোভা
শরৎ-চন্দ্র তিলকে।
শূন্য গগন বিষাদ মগন
সে তিলক মুছি দিল কে॥
অবমাননার অতল গহ্বরে যে মানুষ ছিল লুকায়ে,
শরৎ-চাঁদের জ্যোৎস্না তাদের দিল রাজপথ দেখায়ে,
জগতে আজিকে চলে অভিযান তাদেরই তীব্র আলোকে॥
ভীরু গুণ্ঠনতলে যে নারীর প্রাণ-শিখা ছিল নিভিয়া
স্তিমিত সে প্রাণ উঠিল জলিয়া সে চাঁদের জ্যোতিঃ লভিয়া
সে চাঁদ কোথায়, কোটি আঁখিদীপ খুঁজিয়া ফিরিছে ত্রিলোকে॥
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে, আলো তাব প্রতি ভবনে
তেজপ্রদীপ্ত তেমনি জলিছে, নিভিবে না তাহা পবনে।
ঝরিবে তাহার রসধারা চির-অমরাবতীর শ্রীলোকে॥

## প্রেমেন্দ্র মিত্র

জলে আঁকা ছবির মতন
আমরাও মুছে যাব
আমাদের সাথে
মুছে যাবে আমাদের এদিনের শোক,
যে গেল চলিয়া আর যারা কাঁদে পিছে
সবার পায়ের দাগ ঢেকে দেবে বিস্মৃতিব ধূলি
তারপরে কি রহিবে বাকি!
জীবনের স্মৃতি তব! পুণ্যশ্লোক নাম?
হায় তার দাম কতটুকু!
বিবর্ণ সে মনে রাখা হৃদয়ের নয়:—
নাম, সে ত' অক্ষরের শুষ্ক শবাধার!
নাম নয়, নয় স্মৃতি নহে পরিচয়—
বাকি যা রহিবে তাহা অমূল্য বিস্মৃতি।
রেখে গেলে বীর্যবন্ত কল্পনার বীজ,
তারা কভু হবে না বিফল।

মহারণ্য সম্ভাবনা
যুগান্তরে সঙ্গোপনে করিতে বহন
ধরণী শ্যামলতব করিবার লাগি।
দুঃসাহসী স্বপ্ন আর আশা
অনাগত ভবিষ্যেরে দিবে নব ভাষা।
বিস্মৃতির দেওয়া সেই মহান গৌরব
—নামহীন অমরত্ব তব
দেবতা ঈর্ষিত।

## নরেন্দ্র দেব

গেয়েছ তাদেরি বন্ধু বেদনার গান
যারা হেসে ভালোবেসে
আপনারে নিঃশেষে
প্রেমাস্পদ প্রীতি আশে করেছিল দান।
মানে নাই কোনো বাধা
সমাজের অমর্যাদা
শিরে বহি সহিয়াছে তীব্র অপমান!
গেয়েছ তাদেরি বন্ধু বেদনার গান।…

## বিমলচন্দ্র ঘোষ

জ্যোৎস্নারিক্ত ইরাবতী তটে একদা অন্ধকারে
ক্ষুব্ধ নগর-জীবনে শার্ত্ত ক্লান্ত পান্থ তুমি
সুদূর ব্রহ্মদেশের বক্ষে আর্ত্ত অশ্রুধারে
বেদনার ছবি এঁকেছিলে কবি স্বর্ণতুলিকা চুমি
শ্রমিকের শ্রমরক্ত শুষিয়া যন্ত্রের মহাধূমে
আকাশ সেদিন দৈত্যদলের দূষিত নিশ্বাস সম,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িত, মানুষ ঘুমাত মরণঘুমে
সে অশুভ রাতে ঘুমহারা তুমি একা ছিলে প্রিয়তম।

তোমারে দেখেছি, তোমার পরশ লভিয়াছি এ-জীবনে,
কৃতকৃতার্থ অন্তর মম লভিয়া আশীর্বাণী :
গভীর রাত্রি, ডুবে গেছে চাঁদ বিরহ বিভল মনে—
রেখেছি ধ্যানের মণিকোঠা মাঝে অভয় মন্ত্রখানি ।

## সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

·· নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী, কীর্তি চিরন্তনী
সবার উর্ধ্বে রচিল সিংহাসন,
দ্যুতি-প্রদীপ্ত মুকুটে তাহার জ্বলিছে মধ্যমণি
দেবতা পাঠাল প্রণয় সম্ভাষণ ।
আকাশপ্রদীপে আলো জ্বালি মোরা দেবতারে ঘরে ডাকি
আকাশে বাতাসে তাহারি চঞ্চলতা,
শরতের চাঁদে শীতকুহেলিকা ঢাকিয়া রাখিবে নাকি,
মর্ত্যে রহিবে চিরবিরহের ব্যথা ?

## মৃত্যুর পরবর্তী রচনা—'শুভদা' ও 'শেষের পরিচয়'

'শুভদা' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (৫ই জুন, ১৯৩৮) প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসটি সম্পর্কে নিজে বলিয়াছিলেন, 'প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।'[১] শরৎসাহিত্য-সংগ্রহের গ্রন্থ-পরিচয়ে লেখা হইয়াছে, 'শুভদার রচনাকাল ১৮৯৮ খ্রীঃর ২০শে জুন হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং রচনাকালের মোট সময় ৩৩ দিন। এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ২২ বৎসর মাত্র। পরবর্তীকালে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করিয়া প্রকাশ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রথম দুই তিন পৃষ্ঠায় সামান্য দুই-একটি কথা বদলান ব্যতীত আর কিছুই তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই।' সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'শুভদা বলিয়া আর একখানি অসমাপ্ত বইও এই সময়ে লেখা হয়। এগুলি ইংরেজি ১৮৯৪ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে লেখা।' সুরেন্দ্রনাথের কথা হইতে জানিতে পারা যায় যে, 'শুভদা' সমাপ্ত হয় নাই। ছাপা বইখানা পড়িয়াও মনে হয় যে, সুরেন্দ্রনাথের কথাই সত্য। কারণ বইয়ের কাহিনী হঠাৎ যেন শেষ হইয়া গেল, শুভদা এবং বিশেষ করিয়া তাহার কন্যা ললনার শেষ পরিণতি যেন দেখান হইল না।

শরৎচন্দ্র নিজে বলিয়াছিলেন যে, 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে পাণ্ডুলিপি আবার পাওয়া গেল কি করিয়া? কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ভাগ্যক্রমে মৃত্যুর পরে হঠাৎ পাণ্ডুলিপিটি আবার পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল পাণ্ডুলিপিটির রহস্য সম্বন্ধে ভিন্ন বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বইখানি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় (কালো রঙের বাঁধান এক্সারসাইজ বুক) চিরদিনই তাঁর একটা আলমারিতে ছিল, এক সময়ে ওটি তিনি তাঁর বড়দিদি অনিলাদেবীর জায়ের পুত্র হোঁদলকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশও দিয়েছিলেন কিন্তু সে তাঁকে পুড়িয়ে ফেলা হ'য়ে গেছে বলে মিথ্যা কথা বলে

১। বাল্যস্মৃতি।

এবং একটা আলমারির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। পরে শরৎচন্দ্র এ-ব্যাপারটি যখন জানতে পারেন তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে যান কিন্তু আর নষ্ট করতে উৎসাহী হননি।'[১] শরৎচন্দ্র 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি কাহাকেও পড়িতে দিতে চাহেন নাই, অবিনাশচন্দ্রকে দেন নাই এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কেও দেন নাই। অবিনাশচন্দ্র বলিয়াছেন যে, হোঁদল একদিন শরৎচন্দ্রকে বইখানি প্রকাশ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ওরে, এ-বই বেরুলে একজন মস্ত বড় লেখিকার ক্ষতি হয়ে যেত?'[২] আমাদের মনে হয়, এ-বই প্রকাশ করিবার অনিচ্ছার মূলে ছিল, শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের গল্প-উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে নিদারুণ অবজ্ঞা। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে থাকাকালে যৌবনে লিখিত যে বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির প্রকাশ সম্বন্ধেও তাহার ঘোর আপত্তি ছিল।

'শুভদা'র মধ্যে কাঁচা হাতের ছাপ অনেক জায়গায় স্পষ্ট বটে, কিন্তু তবুও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ইহাতে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব পারিবারিক জীবনের অনেকখানি আভাসও ফুটিয়া উঠিয়াছে। হারাণ মুখুজ্যের দুঃখ-দারিদ্র্যজর্জরিত পরিবারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অভাবঅনটনক্লিষ্ট পরিবারের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ভবঘুরে, উদাসীন এবং সংসার পালনে অক্ষম হারাণ মুখুজ্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের কিছুটা মিল আছে, অবশ্য হারাণের দুষ্প্রবৃত্তি ও নীচাশয়তা মতিলালের মধ্যে ছিল না। তবে শুভদাকে শরৎচন্দ্র যে নিজের মাতা ভুবনমোহিনীর আদর্শে অঙ্কন করিয়াছেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভুবনমোহিনীর মতই শুভদা সর্বংসহা ধরিত্রীর মতই সব আঘাত সহ্য করিয়া স্নেহ-মাধুর্যের অনাবিল উৎসটি উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। শুভদার চরিত্রচিত্রণের সময় শরৎচন্দ্রের মনে তাঁহার মাতৃমূর্তিটি হয়তো দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত ছিল, সেজন্য কাহিনীর মধ্যে তাঁহার সক্রিয় গুরুত্ব না থাকিলেও তাঁহার নাম অনুসারেই উপন্যাসের নামকরণ করিয়াছেন।

'শুভদা' উপন্যাসটি দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের নায়িকা শুভদা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের নায়িকা ললনা। প্রথম অধ্যায়ে হারাণ মুখুজ্যের পারিবারিক জীবনের কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে। এই কাহিনী একটানা

১। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী, পৃঃ ১২১।
২। নিরুপমা দেবী কি?

দুঃখভোগের করুণরসপ্লাবিত কাহিনী। এই দুঃখভোগের মধ্যে সুখ ও সান্ত্বনার প্রসন্ন ও উজ্জ্বল একটি রেখাও নাই। আশা করিবার, ভরসা করিবার ক্ষীণতম পথও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ-যেন তিল তিল করিয়া একটি পরিবারের সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাওয়া। অথচ মৃত্যু আসিয়াও আসে না, কিন্তু তাহার দূতগুলির নিত্যকার ভয়াবহ নির্যাতন আর থামিতে চাহে না। এই দূতগুলির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই বোধ হয় ললনা ও তাহার ছোটভাই মাধব খোদ মৃত্যুর কাছে যাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। মাধবকে মৃত্যুর জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইল, কিন্তু ললনা মৃত্যুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তবে মৃত্যুর হাতে সে আর ধরা দিতে পারিল না, নূতন জীবনের কূলে গিয়া পৌঁছিল। এই নূতন জীবনের কাহিনীই দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুভদা ও তাহার সংসার গৌণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, দারিদ্র্যের সেই ভয়াবহ রূপও আর নাই। এই অধ্যায়ের নায়িকা ললনা, আর নায়ক সুরেন্দ্রনাথ। দুঃখদারিদ্র্যপিষ্ট সংসারের অন্ধকার পরিবেশ আর নাই, অনুরাগের রাগরঞ্জিত জীবনের মধু-উৎসব যেন শুরু হইয়াছে। ললনা আর দুর্গত পরিবারের ভাগ্যহীনা বিধবা কন্যা নহে, তাহার চতুর্দিকে সুখ-সৌভাগ্যের শতপ্রকার অভ্যর্থনা নিয়ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্র যখন 'শুভদা' রচনা করিয়াছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, সেজন্য এ-উপন্যাসের ঘটনা ও রচনারীতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য 'দেবদাসে'র মত শিল্পসার্থক উপন্যাসও তিনি 'শুভদা'র আগেই লিখিয়াছিলেন যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অন্তত রচনারীতির দিক দিয়া খুবই কম। 'শুভদা'র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতই ঘটনার রোমাঞ্চকরত্ব বড় বেশি দেখা যায়। এই রোমাঞ্চকর ঘটনার আতিশয্য দ্বিতীয় অধ্যায়েই বেশি পরিস্ফুট। ললনার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়া, আবার সুরেন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া বজরায় আশ্রয় পাওয়া, শেষকালে আবার সুরেন্দ্রনাথেরই রক্ষিতার মত তাহার বাগানবাড়িতে অশেষ ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে অবস্থান করা—সব কিছুই অতিশয়িত কল্পনাপ্রসূত রোমাঞ্চকর ঘটনা বলিয়া মনে হয়। জয়াবতীর হঠাৎ বজরা ডুবিয়া মৃত্যু খুবই কষ্টকল্পিত, সন্দেহ নাই। সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়গগনে দ্বিতীয় চন্দ্রের উদয় হওয়াতে বোধ হয় লেখক প্রথম

চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন। একটা জটিল সমস্যার যেন চট করিয়া সুলভ সমাধান ঘটিয়া গেল। উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদে জয়াবতীর মাকে টানিয়া আনিয়া তাহার উন্মাদ আচরণের বর্ণনা দেওয়াও খুবই অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় হইয়াছে।

রচনারীতির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব মাঝে মাঝে খুবই সুস্পষ্ট। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—'শুক্লা একাদশী রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথী তীরের অর্দ্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য পথ চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছে।' ভারী সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার ও বাক্যপ্রয়োগরীতির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। মালতীর ঐশ্বর্যসম্ভারপূর্ণ গৃহের বর্ণনা যেখানে লেখক করিয়াছেন সেখানে কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রসাদপুরের কুঠির কথাই মনে হয়, যথা, 'আশেপাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে. তাহাদের বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া লাল নীল সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্তত ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্মর-প্রস্তরের মেজ এবং শ্বেতপ্রস্তরের ঝরণা তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে, চতুর্দিকে শ্বেতকৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য-প্রতিকৃতি সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণ প্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে।' অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির কিছু কিছু প্রভাব থাকিলেও শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রচনারীতির বহুপ্রশংসিত বৈশিষ্ট্যগুলিও এই উপন্যাসে অনেক পরিমাণে আছে। তাহার রচনার মাধুর্য ও প্রসাদগুণ এখানেও যথেষ্ট রহিয়াছে। নাটকীয় রীতিতে বর্ণনার পরিবর্তে দীর্ঘবিস্তৃত সংলাপের অবতারণার মধ্য দিয়া এই উপন্যাসেও তিনি ঘটনার মধ্যে চমকপ্রদ সজীবতা আনিয়াছেন।

শুভদা চরিত্রটি আদর্শ বাঙালী গৃহবধূরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। এ-ধরণের চরিত্র আগেকার নাটক উপন্যাসে খুব বেশি দেখা যাইত। ইহাদের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্লেশভোগ, আত্মত্যাগ প্রভৃতি দেখিয়া আমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু যে-সমাজে অন্যায়-অবিচারের ফলে ইহারা কেবল নিঃশেষে নিজেদের বলি দিয়া গিয়াছে, বিনিময়ে কিছুই পায় নাই সেই সমাজের বিরুদ্ধে আমরা কোন নালিশ জানাই নাই। শুভদার নীরব দুঃখভোগের একঘেয়ে

বর্ণনা পড়িতে পড়িতে আমাদের সমবেদনা প্রায় বিরক্তির পর্যায়ে আসিয়া পড়ে। নীচাশয় নরাধম স্বামীর অশেষ দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে একদিনও মুখ ফুটিয়া সে নালিশ করে নাই, বরং নিজে না খাইয়া ভাত লইয়া তাহার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিয়াছে এবং নিজের বুভুক্ষু ছেলেমেয়েদের জন্য রক্ষিত অতি সামান্য পুঁজি হইতে আবার স্বামীর নেশার পয়সা জোগাইয়াছে। উপন্যাসের সমাপ্তি অংশে যে চুণকালি-মাখা ব্যক্তিটি তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া পঞ্চাশটি টাকা লইয়া চম্পট দিল সে যে তাহার অশেষ গুণধর স্বামীদেবতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই লোকটিকে ভালোবাসা ও ভক্তি ঢালিয়া দিয়া শুভদা সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইল বটে, কিন্তু কোন আত্মমর্যাদার পরিচয় দিল না। নিত্যকার নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে শুভদার নিরুপায় সংগ্রাম এবং তাহার অবিচল স্বামীভক্তির দিক দিয়া 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের বিরাজের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বিরাজের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত স্বামীর প্রতি সাময়িক অভিমান দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শুভদার বিন্দুমাত্র অভিমান ও নালিশ কখনও দেখা যায় নাই। স্বামীর অমানুষিক উদাসীনতা ও কর্তব্যহীনতার ফলে সংসারের সকল ক্লেশকর ভারই তাহার কাঁধে চাপিয়াছে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাইবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করিয়াও সে বাঁচাইতে পারিল না। ললনা গৃহত্যাগ করিল, মাধব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, সে শুধু একাকী শূন্যজীবনের দুঃসহ বেদনা ভোগ করিবার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া রহিল, অথচ কাহারও বিরুদ্ধে সে একটি কথা বলিল না, ভাগ্যের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানাইল না। শুভদাকে মানবীর মাঝে দেবীপ্রতিমা বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সে যেন পাষাণী দেবী প্রতিমা—নীরব, নিস্পন্দ অথচ চির-অম্লান ও পবিত্র।

হারাণ মুখুজ্যেকে 'বিরাজ-বৌ'-এর নীলাম্বরের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়—তেমনি নেশাখোর, উদাসীন ও অক্ষম। কিন্তু নীলাম্বরের উদারতা ও পরার্থপরতা তাহার নাই। সে ঘোর নীচাশয় ও স্বার্থপর এবং সকলপ্রকার দুষ্কর্মে তাহার অবাধ আসক্তি। স্ত্রী তাহাকে জেলে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল, কিন্তু তাহাতে তাহার লজ্জা ও আত্মধিক্কার আসিল না। বরং শুভদার সহিষ্ণুতা ও পাতিব্রত্যের সুযোগ লইয়া সে নিশ্চিন্ত মনে সংসারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নেশার আড্ডা জমাইয়াছে। তাহার শেষ আচরণটিই তাহার চরিত্রের

খাঁটি ক্ল্যাইম্যাক্স হইয়াছে। তবুও মনে হয়, চুনকালি মাখিয়া আসিয়া তাহার অমন স্ত্রীকে মারিবার ভয় দেখান তাহার মত চরিত্রের পক্ষেও যেন বাড়াবাড়ি হইয়াছে। অন্তত তাহার এরূপ নারকীয় নৃশংসতার পরিচয় আগে পাওয়া যায় নাই। চুনকালিমাখা লোকটিই যে সে আমাদের তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না বটে, কিন্তু লেখক তাহা খুলিয়া না বলিয়া শেষ ঘটনার মধ্যে একটু রহস্য জমাইয়া রাখিয়াছেন। উপন্যাসটি অসমাপ্ত রহিয়া গেল, তাহা না হইলে এই কীর্তিমান পুরুষটির আরও অনেক কীর্তিকাহিনী আমরা জানিতে পারিতাম।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বহু বিধবাচরিত্রের মধ্যে ললনা অন্যতম বটে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য বিধবা চরিত্রের সঙ্গে ললনার পার্থক্য রহিয়াছে। ললনা শারদাচরণকে ভালোবাসিয়াছিল, আবার সদানন্দের উদাসীন মনে অজ্ঞাত স্তরে ললনার জন্য গোপন দুর্বলতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু লেখক ললনার সঙ্গে শারদাচরণ অথবা সদানন্দের সম্পর্ক দ্বন্দ্ববেদনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলেন নাই। ললনার সঙ্গে তৃতীয় আব একজন পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্কই চিত্রিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথকে যখন ললনা তাহার দেহ ও মন সমর্পণ করিয়া দিয়া বসিয়াছে তখন শারদাচরণ ও সদানন্দের স্মৃতি তাহার মনে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ললনাব আচরণে অনেক জায়গায় অসঙ্গতি চোখে পড়ে। তাহার মত মেয়ের পক্ষে উপার্জনের জন্য কলিকাতার দিকে রওনা হওয়া অবিশ্বাস্য মনে হয়। নৌকার হাল ধরিয়া কলিকাতায় যাওয়ার যে অভিনব উপায় সে অবলম্বন করিল তাহাও অস্বাভাবিক ও হাস্যকর হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে আসিয়া সে তাহার বাগানবাড়িতে রক্ষিতার মত বাস করিতে লাগিল, সুরেন্দ্রনাথকে দেহ মন সব দিয়া বসিল অথচ কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইল না, ইহাও যেন খুবই অসঙ্গত বোধ হয়। ললনা বিধবা বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অন্যান্য বিধবা চরিত্রে ভালোবাসার সঙ্গে সংস্কারের যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, ললনা চরিত্রে তাহা অনুপস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্রে প্রবৃত্তির যে প্রবলতা দেখা যায় ললনা চরিত্রেও তাহা পরিস্ফুট। তাহার ভালোবাসা কামনার আগুনে দগ্ধ হইয়া তপ্ত ও উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে।

'শুভদা' উপন্যাসের একটি সু-অঙ্কিত প্রীতিপদ চরিত্র হইল সদানন্দ। সদানন্দ সত্যই সার্থকনামা পুরুষ, সে তাহার আনন্দের শতদলটি সবসময়ে

পূর্ণপ্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়াছে। সংসারের কাহারও সঙ্গে তাহার কোন শত্রুতা নাই, কাহারও সঙ্গে কোন বিশেষ বন্ধনও নাই। সে মুক্ত, আত্মভোলা পুরুষ আপন মনে গান গাহিয়া সে দিন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু এই উদাসীন, বিমুক্ত মানুষটির মধ্যেও হয়তো গোপনে গোপনে ভালোবাসার স্পর্শ লাগিয়াছিল। তবে ললনার প্রতি তাহার দুর্বলতা কখনও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায় নাই, প্রচ্ছন্ন প্রেম শুধু কেবল মহৎ ও সর্বাত্মক উপকারের মধ্যেই নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিল। এই আনন্দময় লোকটিকে শুধু কেবল এক জায়গায় বিচলিত হইতে দেখিয়াছি। যখন সে জানিতে পারিল, ললনা বাঁচিয়া আছে এবং সুরেন্দ্রনাথের আশ্রয়েই রহিয়াছে তখন সে তাহার প্রসন্ন ভাবজগৎ হইতে হঠাৎ যেন কঠিন মাটির উপরে আছাড় খাইয়া পড়িল। বোধ হয় সেদিন সদানন্দ দুঃখের সত্যকাব আঘাত পাইল।

'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি 'ভাবতবর্ষে' ১৩৩৯ সালেব আষাঢ়-আশ্বিন অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক ও ফাল্গুন এবং ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী বাকী অংশটুকু লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালে (৭ই জুন, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে)।

রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মূল প্রেরণা, জীবনদৃষ্টি এবং রচনারীতি গভীরভাবে অনুধাবন করিয়াছিলেন। সেজন্য শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্র লিখিত ১৫টি পরিচ্ছেদের পর উপন্যাসটি ২৬ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেজন্য কাহিনীর জটিলতাসৃষ্টিতে এবং চরিত্রবিকাশে তাঁহাকে নিজের কল্পনাশক্তি ও চরিত্রাঙ্কণ ক্ষমতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করিতে হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার স্বপক্ষে এ কথা বলা যায় যে, এ-উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রপরিণতি শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শবিরোধী হয় নাই। তবে দুই একটি জায়গায় যে প্রশ্ন জাগে না তাহা নহে। লেখিকা বিমলবাবুর সঙ্গে সবিতার সম্পর্কের দিকটির উপরে একটু বেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং উভয়ের মধ্যে প্রৌঢ় বয়সের গোধূলি রাগরঞ্জিত দেহাতীত প্রেমের সম্বন্ধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লিখিত

পরিচ্ছেদগুলির মধ্যেই বিমলবাবুর চরিত্রের পরিবর্তন দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু বিমলবাবুর সঙ্গে সবিতার জীবনকে অতখানি ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধিয়া দেওয়া তাঁহার অভিলষিত ছিল কিনা তাহা লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে। বিমলবাবু ও সবিতার সম্পর্কের উপরে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে ব্রজবাবুর সঙ্গে সবিতার সম্পর্ক শেষ দিকে প্রায় উপেক্ষিত হইয়াছে, সবিতার চিত্তদ্বন্দ্ব এবং নিরুপায় বেদনার দিকও সেজন্য শেষ দিকে পরিস্ফুট হয় নাই। চরিত্রপরিণতিব ত্রুটি ঘটিয়াছে প্রধানত রাখাল ও রেণু চরিত্র দুইটি সম্পর্কে। রাখালকে লইয়া উপন্যাসের আরম্ভ এবং বেচারা নিঃস্বার্থভাবে সকলের উপকার করিয়া সকলের কাছ হইতে প্রায় শূন্য হাতেই ফিরিয়াছে। তাহার চরিত্রও শেষকালে বিমলবাবু ও সবিতার ঘটনাপ্রাধান্যে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আর যে ছোট মেয়েটি মায়ের প্রতি নীরব প্রতিবাদে দুঃস্থ ও নিরুপায় পিতার পাশে থাকিয়া সকল দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছে, কঠিন আত্মমর্যাদার মহার্ঘ ভূষণে যে তাহার উপেক্ষামলিন দারিদ্র্যজীর্ণ সত্তাটিকে ভূষিত কবিয়াছে সে লেখিকার কাছেও কোন স্বীকৃতি পাইল না। আকস্মিক কলেরার আক্রমণে মরিয়া সে নিজে যেমন সকল জ্বালাযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিল তেমনি সব সমস্যারও সমাধান ঘটাইয়া গেল। লেখিকা রাখাল ও রেণুর প্রতি সুবিচার করেন নাই, ইহা না বলিয়া উপায় নাই। চরিত্রদুইটির পরিণতি শরৎচন্দ্র হয়তো অন্যভাবে দিতেন, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না।

'শেষের পরিচয়' উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপন্যাসের কাহিনীর মিল দেখা যায় না। সবিতার মত কোন নারীচরিত্রও শরৎচন্দ্র ইতিপূর্বে কোন উপন্যাসে দেখান নাই। কুলত্যাগ করিয়া আসিয়া অপর পুরুষের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে থাকিয়াও পূর্বতন স্বামী ও কন্যার জন্য অস্থির আকর্ষণ বোধ করা এবং তাহাদের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক ও নিঃসঙ্কোচ সম্বন্ধ বজায় রাখা, এ ধরণের নারীচরিত্র শরৎসাহিত্যেও অভিনব বটে। সবিতার সমস্যাটি যেন আধুনিককালের বিবাহব্যবচ্ছিন্না নারীর মতই—বিবাহ ব্যবচ্ছেদের ফলে যেমন স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিক মায়া-মমতা মন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় নাই। সবিতাকে বারবার মহীয়সী নারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাজে ও আচরণে মহিমার প্রকাশ যে কোথায় হইয়াছে তাহা বুঝা মুস্কিল। ব্রজবাবুর মত শান্ত, নির্বিরোধ, ক্ষমাশীল ও ধর্মপরায়ণ স্বামীর প্রেম ও নির্ভরতার কোন মূল্য

না দিয়া সে রমণীবাবুর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইল। প্রণয়ীর হাত ধরিয়া স্বামী ও কন্যাকে ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহার যে খুব একটা কষ্ট হইয়াছিল তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। স্বামীকে ছাড়িয়া আসিয়া রমণীবাবুর আশ্রয়ে সুখৈশ্বর্যের মধ্যে সে বেশ ভালোই ছিল বলিয়া মনে হয়। নূতন অবস্থার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাওয়াইয়া নিতে এবং বৈষয়িক বুদ্ধি খাটাইয়া নিজের বিষয় সম্পদ বুঝিয়া লইতেও তাহার বিশেষ পটুতা দেখি। স্বামীকে ছাড়িয়া আসিলে কি হয়, তাহার কাছ হইতে নিজের গহনা এবং বাহান্ন হাজার টাকার চেক হস্তগত করিতেও তাহার আগ্রহ কম নহে। স্বামী সর্বস্বান্ত হইয়া ভাড়াবাড়িতে ভাত রাঁধিতেছেন, কন্যা অসুখে শয্যাশায়ী, অথচ সবিতা তখন গীত-মুখরিত, আলোকোজ্জ্বল উৎসবের রাণী হইয়া বসিয়াছে। রাখাল তাহারই কন্যার চিকিৎসার জন্য কয়েকটি টাকা চাহিল, কিন্তু সেই সামান্য কয়েকটি টাকা দেওয়াও তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। এই নারীটির জন্যই শরৎচন্দ্র সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়াছেন! স্বামী ও কন্যার চরম দুর্দশা দেখিয়া তাহার যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল তাহাও খুব ক্ষণস্থায়ী ও অগভীর মনে হয়। কারণ ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার হৃদয়-রঙ্গমঞ্চে রমণীবাবুর বিদায় ও বিমলবাবুর প্রবেশ ঘটিল। বারো বছর এক সঙ্গে বাস করিবার পর সবিতা হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে, রমণীবাবুকে কোনদিন সে ভালোবাসে নাই। অতএব তাহার শূন্য হৃদয়ে বিমলবাবুর প্রবেশের আর কোন বাধা নাই। সবিতার হৃদয় যে খুবই উদার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সেখানে ব্রজবাবু, রমণীবাবু ও বিমলবাবু সকলেরই ঠাঁই হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, সবিতার চিত্তে পরিত্যক্ত ও ভূতপূর্ব স্বামীর জন্য যদি সত্যই কোন অনুতাপবিদ্ধ প্রেম জাগিয়া থাকে তাহা হইলে বিমলবাবুর দিকে আবার সে আকৃষ্ট হইল কি ভাবে? সবিতা সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয় যে, সে বুঝি কোনদিন কাহাকেও যথার্থ ভালোবাসিতে পারে নাই, অথবা ভালোবাসা তাহার কাছে একটা ক্ষণস্থায়ী বিলাস মাত্রই ছিল। কন্যার প্রতি স্নেহই যদি তাহার হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা বড় আবেগ হইয়া থাকিত তবে তাহার চিন্তায়, কাজে ও আচরণে তাহার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাইত। কিন্তু সেই আবেগও প্রবল ও স্থায়ীভাবে তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। রেণু তাহার প্রতি স্বাভাবিক কারণেই প্রবল অভিমান করিয়াছে, কিন্তু সেই অভিমান ভাঙাইয়া উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহে

কন্যাকে কাছে টানিয়া আনিবার কোন আগ্রহ তাহার মধ্যে দেখি নাই। সবিতা শেষ পর্যন্ত কন্যাশোকাতুর নিরালম্ব স্বামীর কাছে রহিল কিনা স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ, বিমলবাবুর শেষ চিঠিতে জানা গেল, তাঁহার কূলের নোঙর হইয়া রহিল সবিতা। সেই নোঙরের টানে আবার তাঁহার অকূলে ভাসা জাহাজ কূলে আসিয়া লাগিল কিনা তাহা অবশ্য গ্রন্থ মধ্যে লেখা নাই।

সবিতা অপেক্ষা ব্রজবাবুর চরিত্র অনেক বেশি উদার ও মহৎ। প্রকৃত পক্ষে এরূপ একটি ভদ্র, বিনীত, ক্ষমাশীল সাধু চরিত্র শরৎসাহিত্যেও খুব বেশি নাই। তাঁহার বিশ্বাস ও ভালোবাসা রূঢ়ভাবে বিপর্যস্ত করিয়া সবিতা কূলত্যাগ করিল। তিনি এই আঘাত সামলাইতে না পারিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলেন বটে, কিন্তু ক্রুদ্ধ হৃদয়ের কোন তিরস্কারবাণী তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সবিতার দেওয়া এই নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিয়া শিশুকন্যাটিকে স্নেহযত্ন দিয়া মানুষ করিয়া তুলিলেন। অপরাধিনী স্ত্রীর প্রতি কোন আক্রোশ ও বিদ্বেষের কালো ছায়া তাঁহার স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হৃদয়কে কখনও মলিন করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দীর্ঘকাল পরে সবিতার সঙ্গে যখন তাঁহার দেখা হইল তখনও বিন্দুমাত্র অভিযোগও তাঁহার মন হইতে প্রকাশ পাইল না। যে স্বেচ্ছায় সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে তাহারই সহিত সাগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক আলোচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সবিতার গহনা ও তাহার নামে জমানো টাকাও তিনি তাহাকে ফেরত দিয়াছেন। সবিতার কথায় কন্যার স্থিরীকৃত বিবাহ পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সবিতার গহনা ও টাকা ফেরত দিবার পরে ব্রজবাবুর দুঃসময় আরম্ভ হইল। এ-দুঃসময় অপরের পক্ষে অবর্ণনীয় কষ্টের হইত, কিন্তু সুখ ও দুঃখ তাঁহার কাছে সমান সামগ্রী ছিল বলিয়াই সবকিছু যেন প্রশান্ত ও প্রসন্নচিত্তেই তিনি মানিয়া লইলেন। প্রথমা স্ত্রী তাঁহাকে অনেক আগেই ত্যাগ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়া স্ত্রীও দুরবস্থার সূচনাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিল। এখানে উপন্যাসের ঘটনা একটু অস্পষ্ট ও অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজবাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রী ফস করিয়া স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গেল, স্বামীকে ছাড়িয়া সে ভাইয়ের ঘরে এমন কি সুখশান্তি পাইল। দীর্ঘকালের মধ্যে সে স্বামীর কাছে আর ফিরিয়া আসিল না, এমন কি বৃন্দাবনে শোককাতর স্বামীকে চরম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে একা ফেলিয়া

রাখিয়া চলিয়া গেল। ইহা যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। দেশে গিয়াও ব্রজবাবু নিজের বাড়িতে থাকিতে পারিলেন না, সেজন্য অবশেষে তাঁহাকে অনাশ্রয়ের শেষ আশ্রয় বৃন্দাবন যাইতে হইল। ব্রজবাবু ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষের দেওয়া সকল অপরাধ তিনি নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন। ভগবানের চরণে তাঁহার এই নীরব ভক্তিরসার্দ্র আত্মসমর্পণের ভাবটি রাধারাণী দেবীর লেখনীতে বিকৃত ধর্মাতিশয্যে পরিণত হইয়াছে। চরিত্রটিকে লইয়া লেখিকা যেন শেষ দিকে একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন। তাঁহার সংযত ধর্মপরায়ণতা ও ভগবদ্‌নির্ভরতার ভাবটুকু বজায় রাখিলেই বোধহয় চরিত্রটি সুসঙ্গত হইত।

ব্রজবাবুর মতই আর একটি প্রীতিকর চরিত্র হইল রাখাল। ব্রজবাবু যেমন পরের অপকার সর্বক্ষণ মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, রাখালও তেমনি পরের উপকারে অনুক্ষণ মাথা দিয়া রাখিয়াছিল। নতুন-মার কাছে সে আশ্রয় পাইয়াছিল, সে-উপকারের ঋণ সে সারা জীবন শোধ করিয়া চলিয়াছিল। নতুন-মা তাহার বয়সের মর্যাদা না রাখিয়া নিত্য নূতন প্রেমের স্রোতে তাহার জীবনতরণী ভাসাইয়াছে, কিন্তু রাখালের শ্রদ্ধা কখনও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। নতুন-মার দুর্ব্যবহারেও একটি কটু কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। ব্রজবাবু ও রেণুর সহায়হীন নিরালম্ব জীবনে একমাত্র সেই সাহায্য ও সান্ত্বনার চিরনির্ভরযোগ্য দৃঢ় আশ্রয়রূপে বর্তমান ছিল। সারদার মত একটি আশ্রয়হীনা ভূলুণ্ঠিতা লতা সংসারের নির্মম চাকার পেষণে পিষ্ট হইয়া মরিতে চলিয়াছিল, সেই এই লতাটিকে সযত্নে বাঁচাইয়া তুলিয়া স্নেহরসে ইহাকে মুকুলিত করিয়া তুলিল। তাহার বন্ধু তারক যখন সকলের আদর ও প্রশ্রয়ে নিজের ভবিষ্যৎ বেশ গুছাইয়া লইতেছিল তখন সে একবার ব্রজবাবু ও রেণু আর একবার সারদাকে প্রতিকূল শক্তির তাড়না হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করিয়া চলিতেছিল। সারদার হৃদয় গোপনে গোপনে তাহারই জন্য সযত্ন অর্ঘ্য রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার সময় রাখালের কোথায়? সবিতার মত স্বাচ্ছন্দ্যলালিত পরিবেশে আলস্যমদির চিত্তে দুঃখ লইয়া বিলাস করিবার সময় তাহার ছিল না। অক্লান্ত কর্মোদ্যম লইয়া দুর্বারশক্তির সঙ্গে তাহাকে প্রবল সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। জীবনের মধু-উৎসবে যোগ দিবার সময় তাহার কোথায়? উপন্যাসের শেষ অংশে লেখিকা বিমলবাবু ও সবিতার 'নিকষিত হেম' সদৃশ প্রেমের বর্ণনাতে

এত বেশি মনোযোগ দিয়াছেন যে, রাখাল ও সারদার সম্পর্ক আরও বিকাশ করিয়া দেখাইবার সুযোগ পান নাই।

উপন্যাসের আর একটি উপেক্ষিত চরিত্র হইল রেণু। রাখালের মত রেণুরও উৎসর্গীকৃত জীবন। তাহার সর্বপরিত্যক্ত পিতার পাশে থাকিয়া সে স্নেহ-পরিচর্যার অমৃতধারায় পিতার ক্ষতবিক্ষত জীবনটি জুড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। নারীজীবনের কোন আশা ও কামনা তাহার হৃদয়ে মঞ্জরিত হইতে পারিল না। মায়ের প্রতি এক দুর্নিবার অভিমান তাহাকে বোধহয় এরূপ নীরব, বিবর্ণ ও অন্তর্মুখীন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, কোন অভিযোগও নাই। লেখিকা তাহাকে লইয়া কি করিবেন ভাবিতে না পারিয়াই বোধহয় তাহাকে হঠাৎ মারিয়া ফেলিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। রেণুর মত একটি অবিকশিত পুষ্প অকালে ঝরিয়া পড়িলে সংসারের কি বা ক্ষতি।

# পরিশিষ্ট

## শরৎসাহিত্যের মূল্যায়ন

সাহিত্য-মূল্যায়নের শেষ কথাটি কি তাহা আজ পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় নাই। জনপ্রিয়তা সাহিত্যবিচারের একটি মাপকাটি ধরা হয়, কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার কোন স্থায়ী ও অপরিবর্তিত রূপ নাই। অনেক বই জনপ্রিয়তার একেবারে শিখরে উন্নীত হয়, কিন্তু সমঝদার সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহা শিল্প ও রসের দিক দিয়া হয়তো নিকৃষ্ট বিবেচিত হয়। আবার কোনো কোনো লেখক হয়তো অসাধারণ জনপ্রিয়তার অবিচ্ছিন্ন উত্তাপে লালিত হন, কিন্তু সমসাময়িকতার সীমানা অতিক্রম করিলেই তাঁহারা বিস্মৃতির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হন। আবার বিপরীত দিকটাও ঘটে। অনেক লেখক সমসাময়িককালে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইলেও ভবিষ্যতে হয়তো দুর্লভ যশো-মুকুটের অধিকারী হইয়া থাকেন। ভবভূতির মত অনেক লেখকই ভবিষ্যতের সমানধর্মা পাঠকের দিকে তাকাইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্‌সপীয়রের কথাই ধরা যাক। শেক্‌সপীয়রকে কত সময়ে কত যে পরস্পরবিরোধী সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রশংসার পুষ্পস্তবক যেমন অজস্রভাবে তাঁহার শিরে বর্ষিত হইয়াছে, তেমনি নিন্দার কণ্টকঘাতে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছে। সমসাময়িক লোকেদের কাছে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাইতে সব লেখকই ইচ্ছা করেন, কিন্তু অনেক বড় লেখকই তো জীবিতকালে সেই স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করিতে পারেন না। কীটসকে প্রতিকূল সমালোচকদের কাছে কম নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই। ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের এতই অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে মরিবার পর তাঁহাকে কবর দিবার লোকের অভাব হইয়াছিল। ইবসেন নিজের দেশে স্থান পাইলেন না, দুঃখে ক্ষোভে তিনি তাহার প্রতিশোধ নিলেন 'An Enemy of the People' নাটক লিখিয়া। বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে সমসাময়িককালে কত যে বিরূপ সমালোচনার আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা তো আমরা সকলেই জানি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বে প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই অনেক বেশি পাইয়াছিলেন।

সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড কি? নিশ্চয়ই সর্বসম্মত মানদণ্ড আজও পর্যন্ত সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সাহিত্যের আদি ইতিহাস হইতেই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। গ্রীক নাট্যকার এস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের মধ্যে সমসাময়িককালে ইউরিপিডিসের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে কম, কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করিয়া ল্যাটিন ও এলিজাবেথীয় নাটকে ইউরিপিডিসের নাট্যবস্তু ও নাট্যরীতি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এ-প্রসঙ্গে অ্যারিস্টোফ্যানিসের Frogs নামক একটি নাটকের কথা বলা যাইতে পারে। নাটকটিতে এস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের একটি কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বিচারক ছিলেন স্বয়ং ডায়োনিসাস। এস্কাইলাস আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বলিলেন—

**But a poet should seek to avoid the depiction**
**Of evil—should hide it, not drag into view**
**its ugly and odious features,**
**For children have tutors to guide them aright, young**
**manhood has poets for teachers.**
**And so we must write of the fair and the good.**

ইউরিপিডিস কিন্তু বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিশ্বাসী ছিলেন, প্রাত্যহিক বাস্তবতা হইতেই তিনি তাঁহার চরিত্রগুলিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন— **By choosing themes that were concerned with every day reality.'** সেজন্য সমাজের সকল রকম চরিত্রই তাঁহার নাটকে স্থান পাইয়াছে—

**'The prince, the pauper, young or old—no one could dilly dally;**
**Servants and masters, women, men, were equally**
**loquacious.**

অ্যারিস্টোফ্যানিস সমসাময়িক গ্রীক দৃষ্টিকোণ দিয়া বিচার করিয়া এস্কাইলাসকেই বিজয়ীর সম্মান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আধুনিক মনের কাছে ইউরিপিডিসের সাহিত্যরীতিই যে অধিকতর গ্রাহ্য সে-সম্বন্ধে বোধহয় কোন সন্দেহ নাই। সেজন্য সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্পর্কে শেষ কথাটি বলিবার ক্ষমতা ও অধিকার বোধহয় কাহারও নাই। টি. এস. এলিয়ট তাঁহার

The Sacred Wood নামক গ্রন্থে এ-সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—'It is part of his business to preserve tradition—when a good tradition exists. It is part of his business to see literature steadily and to see it whole; and this is eminently to see it not consecrated by time, but to see it beyond time.'

সাহিত্যবিচারে সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রকারদের তো মতের কোন মিল নাই—'নাসৌ যস্য মতং ন ভিন্নম্।' সেজন্য দেখা যায়, উপন্যাসের বিচারে কেহ আদর্শবাদী দৃষ্টি অনুসরণ করিয়াছেন, কেহ বা বাস্তববাদী দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ জীবনবাদী সাহিত্যে বিশ্বাসী, আবার কেহ বা কলা-কৈবল্যবাদই দৃঢ়তার সঙ্গে ধরিয়া রাখিয়াছেন। কেহ সাহিত্যের বক্তব্য অনুযায়ী সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করেন, এবং কেহ বা রসোত্তীর্ণতার দিক দিয়া তাহার দর যাচাই করেন। কেহ ঘটনাসংস্থাপনার কৌশলের দিকে গুরুত্ব দেন, আবার কেহ বা চরিত্রসৃষ্টিকেই উপন্যাসের মুখ্য দিক মনে করেন। এমনিভাবে আমরা একই সাহিত্যকে আমাদের নিজস্ব রুচি, প্রবৃত্তি, মতবাদ ও রসবোধ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করিয়া থাকি। এ-সম্পর্কে ফরাসী ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রান্স একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন কেহ বলেন, 'আমি রেসিন কিংবা শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে আলোচনা করছি', তখন তিনি আসলে ভুল কথা বলেন। তাঁহার বলা উচিত, 'রেসিন অথবা শেক্সপীয়র সম্বন্ধে আমার নিজের কথাই আমি আলোচনা করছি।' অর্থাৎ, আনাতোল ফ্রান্স এখানে বলিতে চাহেন যে, প্রত্যেকেই নিজের মধ্য দিয়াই সাহিত্যিকদের বিচার করিয়া থাকেন। আসলে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা শুধু কথার কথা। অনেকে নিরপেক্ষতার ভান করেন বটে, আসলে কিন্তু তাঁহারাও গোপনে গোপনে কোন না কোন মত ও বাসনার সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সেয়ানা সমালোচক হইতেছেন তাঁহারা যাঁহারা আচমকা সবজান্তার মত এক একটা মন্তব্য করিয়া বসেন। তাঁহারা নজীর দেখান না, যুক্তির অবতারণা করেন না, প্রমাণ দেন না, কিন্তু প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা সম্পর্কে উল্টা কথা বলিয়া রাতারাতি নাম কিনিয়া বসেন। নাম কিনিবার সহজতম পথ হইল বড়কে হেয় করিবার চেষ্টা করা। সরলচেতা, অল্পবুদ্ধি পাঠকরা ভাবেন ও পরস্পরে বলাবলি

করেন, 'লোকটি অনেক জানে শোনে, তা' না হ'লে এমন না-শোনা কথা বলিতে সাহস করিল কিরূপে?' সাহিত্যের অনেকপ্রকার বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু শেষ কথা বোধহয় ইহাই যে, যদি কোন সাহিত্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অটুট থাকে তবে তাহাকে নিকৃষ্ট বলিবার উপায় নাই। ফরস্টার Aspects of the Novel-এ যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বীকার্য—The final test of a novel will be our affection for it, as it is the test of your friends, and of anything else which we can not define.'

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যরচনার আরম্ভ কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাঁহার মূল্যায়ন কাহাদের কাছে কি ভাবে হইয়াছে তাহার একটা আনুপূর্বিক আলোচনা করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে সাহিত্যরচনা শুরু করিয়াছিলেন তখন সেখানে ছোট একটি সাহিত্যগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন গোষ্ঠীপতি, এবং সেই গোষ্ঠীতে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি। ইহারা সকলেই পরবর্তীকালে যে শরৎচন্দ্রকেই আদর্শ করিয়া গল্প-উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের একটি স্নেহানুগত্য বরাবর বজায় ছিল এবং প্রধানত ইহাদের চেষ্টাতেই পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের লেখাগুলি সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। ভাগলপুরে সাহিত্যরচনার সময়ে তাঁহার কোন লেখা প্রকাশিত হয় নাই, সেজন্য নিন্দাপ্রশংসার বিষামৃত পান করিবার সময় তখনও আসে নাই।

ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় 'বড়দিদি' প্রকাশিত হইলে তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়াইতে শুরু করিল। 'বড়দিদি' গল্পে বিধবার যে ভালোবাসার চিত্র রহিয়াছে সে-ধরণের চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পাঠকেরা ইতিপূর্বে পাইয়াছে। কিন্তু 'বড়দিদি' তাহাদের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রেক করিল কেন? তাহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার ভালোবাসার জন্য তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ অনেকটা অপক্ষপাতী ও নির্বিকার দৃষ্টি লইয়া এই ভালোবাসা বিচার করিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের সীমাহীন সহানুভূতি এই ভালোবাসার প্রতি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের বিধবাও সুখী হয় নাই, কিন্তু তাহার প্রতি লেখকের সমর্থন এত স্পষ্ট যে

হৃদয়বান, আবেগচালিত পাঠকসমাজের কাছে 'বড়দিদি' খুবই আকর্ষণীয় হইয়া উঠিল। বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের রচনার অন্তর্নিহিত স্নিগ্ধ মাধুর্য তাহাদের মনের উপরে এমন মোহজাল বিস্তার করিল যে, শরৎচন্দ্র তাহাদের হৃদয়-আসনে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলেন। ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় তিনি যখন সাহিত্যসাধনা শুরু করিলেন তখন তিনি এমন কতকগুলি গল্প-উপন্যাস লিখিলেন যেগুলি সকল শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচককে অশেষ তৃপ্তি দিয়াছিল, যথা, 'বামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'বিরাজ বৌ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'মেজদিদি' ইত্যাদি। এই গল্প-উপন্যাসগুলিতে তিনি বাঙালী পারিবারিক জীবনের স্নেহমাধুর্য অতিশয় স্নিগ্ধ-করুণ ভাষায় ফুটাইয়া তুলিলেন। এই সব লেখায় তিনি আমাদের চিরস্বীকৃত সমাজনীতিকে যেমন রক্ষা করিয়া চলিলেন তেমনি বাৎসল্যবসের এক অভিনব মাধুর্যসিক্ত-রূপ মুগ্ধ-পাঠক সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। অবশ্য এই পর্বে 'আঁধারে আলো', 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি কয়েকখানি এমন বইও লিখিলেন যেগুলিতে প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধতা তিনি করিলেন। কিন্তু সেই বিরুদ্ধতা তখনও পর্যন্ত শুধু কেবল নিরুপায় অশ্রুধারার মধ্যে প্রকাশিত, তাহার সতেজ, উদ্ধত ও বলিষ্ঠ রূপ তখনও দেখি নাই। অর্থাৎ সমাজসমস্যার রূপায়ণে ও ভাবাদর্শ পরিস্ফুটনে তখনও পযন্ত ভাগলপুর পর্ব হইতে বেশি দূর অগ্রসর হন নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্রেব সঙ্গে প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক মনের প্রকাশ্য সংঘাত শুরু হইল 'চরিত্রহীন' রচনার সময় হইতে। 'চরিত্রহীনে' একজন মেসের ঝিকে যখন নায়িকারূপে উপস্থাপন করা হইল তখন গতানুগতিক ভাবে লালিত সমাজ হঠাৎ চমকিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। 'ভারতবর্ষে' ইহা মুদ্রিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইল না এবং যমুনায় যখন ইহা আংশিকভাবে প্রকাশিত হইল তখন ক্রুদ্ধ পাঠকদের নিষ্ঠুর নিন্দায় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র মুখরিত হইয়া উঠিল। শরৎচন্দ্র যেন পাঠকদের এই নিন্দা ও তিরস্কারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং ইহার পর হইতে সচেতন ভাবে সমাজের পুঞ্জীভূত তামসিক শক্তির সঙ্গে তিনি সংঘাতে লিপ্ত হইলেন। যিনি এতদিন আবেগের বরুণবাণ শুধু প্রয়োগ করিয়াছেন, 'চরিত্রহীন' হইতে তিনি মননের অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে শুরু করিলেন। ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় তিনি যে শেষ উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' (১ম) রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেও ভাবের সঙ্গে ভাবনা যুক্ত হইল, হৃদয়বেদনা অশ্রুসিক্ত রূপ লাভ করিল বটে, কিন্তু সেই হৃদয়বেদনায় মূলে

যে নিষ্ঠুর সমাজশক্তি বিদ্যমান তাহার বিরুদ্ধে যে মত ব্যক্ত হইল তাহাতে বিদ্রোহের বহ্নিজ্বালা মিশিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশ হইতে হাওড়া-শিবপুরে আসিয়া যখন তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করিলেন তখন তাঁহার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পর্বের সূচনা হইল। এই পর্বকে বিদ্রোহপর্বও বলা যাইতে পারে। শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল।' কিন্তু এই মন্তব্য বোধ হয় সকল লেখকের সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ শক্তি তাঁহার চল্লিশ বৎসরের পরেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই পর্বে শরৎচন্দ্র হৃদয়ের রসে যেমন তাঁহার চরিত্রগুলিকে অভিষিক্ত করিলেন, তেমনি বিচার ও মননের তীব্র আলোকে সমাজের প্রচলিত ধারণা ও সংস্কারের মধ্যে নিহিত অন্যায় ও অবিচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলেন। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে যেমন শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছড়াইয়া পড়িল, তেমনি প্রাচীনপন্থী বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি এবং পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে তিনি বহু-নিন্দিত ব্যক্তি হইয়া রহিলেন। শরৎচন্দ্র সকলের হৃদয়ে এক ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখন লোকেদের ধারণা ছিল যে' শরৎচন্দ্রকে গোপনে ভালোবাসা যায় বটে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করা চলে না। তাঁহাকে হৃদয় হইতে সরাইবার উপায় নাই, কিন্তু বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে যেন গ্রহণ করা চলে না।

শরৎচন্দ্রের বিরোধী শক্তিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে তখন নানাপ্রকার আজগুবি ধারণা প্রচলিত ছিল। তিনি অশিক্ষিত, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত—তাঁহার সহিত মেশা যায় না, তাঁহাকে সম্মান করা তো দূরের কথা—এই ধারণাই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিদগ্ধ সমালোচকগণ এই মূর্খ ও বামাচারী সাহিত্যিকের লেখা অবজ্ঞার চোখেই দেখিতেন। শরৎচন্দ্র হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজকেই আঘাত করিয়াছিলেন, সেজন্য নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি ঘৃণার পাত্র ছিলেন। 'দত্তা,' 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এ-অভিযোগ অনেক ব্রাহ্মর মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু এ-অভিযোগ যে কত ভ্রান্ত তাহা পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা ও

ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি প্রশ্রয় পাইয়াছিল, কারণ শরৎচন্দ্র নিজে কখনও এগুলি সম্পর্কে প্রতিবাদ করিতেন না। নিজের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে তিনি একেবারেই নীরব ছিলেন, সেজন্য তাঁহার ব্যক্তিজীবন লইয়া এত সব সরস অথচ ঘৃণাব্যঞ্জক গল্প প্রচারিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের আর এক শ্রেণীর প্রতিকূল সমালোচক ছিলেন, তাঁহাদিগকে বলা যায় বঙ্কিমবাদী। বাংলাসাহিত্যে তখন বঙ্কিমবাদী ও শরৎবাদী এই দুই শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচক ছিলেন। প্রবীণ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন বঙ্কিমবাদী এবং নবীন ও সাধারণ লোকেরা ছিলেন শরৎবাদী। সাহিত্যক্ষেত্রে এই বঙ্কিমবাদ ও শরৎবাদের উৎপত্তির কারণ হইল, বাংলা সাহিত্যের এই দুইজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের লেখার বিষয়বস্তু অনেকস্থলে এক ছিল কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। পূর্বে এস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই পার্থক্যই ছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে। এই পার্থক্য আরও প্রকটিত হইল শরৎচন্দ্র কর্তৃক বঙ্কিমসাহিত্যের বহু স্থানে অসঙ্গতির উল্লেখের ফলে। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে জোরের সঙ্গে আক্রমণ করিলেন, এবং ততোধিক জোরের সঙ্গে বঙ্কিমবাদীরা শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি মনীষী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তখনকার প্রভাবশালী পত্রপত্রিকাগুলি অধিকাংশ ছিল শরৎচন্দ্রের প্রতি বিরূপ। 'প্রবাসী'র মালিক ছিলেন ব্রাহ্ম। সেজন্য 'প্রবাসী'তে শরৎচন্দ্র ছিলেন অপাংক্তেয়। তবে শরৎ-বিরোধিতার প্রধান মুখপত্র ছিল 'শনিবারের চিঠি'। 'শনিবারের চিঠি'তে অনেকবার শরৎচন্দ্রকে অন্যায় ও অশোভন ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং ক্ষমাহীন ব্যঙ্গবিদ্রূপের দ্বারা বারবার তাঁহার মানসিক শান্তি বিপর্যস্ত করা হইয়াছিল। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস অবশ্য তাঁহার 'আত্মস্মৃতি'র মধ্যে শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করিবার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ বোধ করিয়াছেন এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার প্রীতির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু কেবল প্রাচীনপন্থী প্রবীণ লোকেরাই যে শরৎচন্দ্রের বিরূপ সমালোচক ছিলেন তাহা নহে, প্রগতিবাদী নবীনদের মধ্যেও কেহ কেহ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজেদের গুরুত্ব জাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সব সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ভ্রান্ত, অজ্ঞতা প্রসূত ও ঈর্ষাপ্রণোদিত। নবীন লেখকদের অন্যতম শ্রীপ্রবোধ সান্যালের

অশোভন আক্রমণের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবোধবাবু অবশ্য শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'ভারতবর্ষে'র শরৎ-স্মৃতি-অংশ সম্পাদনা করিয়া তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহাই বলুন না কেন সাধারণ পাঠক সমাজে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। বাংলার কোন সাহিত্যিকই তাঁহার মত জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্রতী বিজ্ঞ ও মান্যজনের সকল সাবধানবাণী সত্ত্বেও আপামর জনসাধারণ উন্মত্ত আগ্রহে তাঁহার বইগুলি গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে, বিশেষভাবে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি দেবতাবও অধিক হইয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সকলের সম্মান পাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র পাইয়াছেন সকলের ভালোবাসা,—অফুরন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা। 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় জলধর সেন ছিলেন তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। 'বিচিত্রা' সম্পাদক ছিলেন তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুল ও সাহিত্যশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেজন্য 'বিচিত্রা' গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহার গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজী^নে 'যমুনা', 'ভারতী', 'ভারতবর্ষ' ও 'বিচিত্রা' এই চারটি সাময়িক পত্রের উৎসাহ ও প্রেরণা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তবে তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ভক্ত ছিলেন, 'বাতায়ন' পত্রগোষ্ঠী। 'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার সর্বশক্তি নিয়া শরৎসাহিত্যেব আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাতায়ন ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা, তাহার প্রচার ও প্রভাবও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু পত্রিকাটি শরৎ-অনুরাগী তরুণ সাহিত্যানুরাগী সমাজের মুখপত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র সর্বশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সমালোচকের কাছে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি পাইলেন বোধহয় মৃত্যুর পরে। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাংলাদেশের এমন কোন সাহিত্যিক ছিলেন না, যিনি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছু না কিছু প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। বাংলাদেশে এমন কোন পত্র-পত্রিকা ছিল না যাহা শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশ করে নাই। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে সংশয়ী ও বিরূপ ছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের সকল সংশয় ও বিরূপতা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রূপান্তরিত হইয়া সর্বব্যাপী জাতীয় অনুরাগের ধারায়

মিশিয়া গেল। প্রায় দশ বৎসর কাল শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তার স্বর্ণশিখরে প্রদীপ্ত গৌরবে বিরাজিত ছিলেন।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে ও মানসিক ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। শরৎচন্দ্র বাংলার যে মাটি হইতে জীবনরস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রসের উৎস শুকাইয়া আসিতে লাগিল, এবং তিনি যে সমাজজীবনের চিত্র তাঁহার সাহিত্যে অঙ্কন করিয়াছিলেন সেই জীবনেরও দ্রুত রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। বঙ্গবিভাগের ফলে দেশের বৃহত্তর অংশের লোকেরা পিতৃপিতামহের ভিটামাটির সম্পর্কচ্যুত হইয়া নিষ্ঠুর ঝটিকাতাড়িত পত্রবাজির ন্যায় নিরালম্ব শূন্যে ভাসিতে লাগিল। এক টুকরা মাটি তাহারা সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু মাটি যে তাহাদের কাছে পাথর হইয়া গিয়াছে! সেই পাথরের এক এক টুকরায় তাহারা আবার ঘর বাঁধিতে চেষ্টা করিল। মাটির সরস দাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবিকা-অর্জনের তাগিদে তাহারা লোহা ও ইস্পাতের কঠিন বেষ্টনীতে ধরা দিল। জীবনের প্রশান্তি, লাবণ্য ও মাধুর্য বিলুপ্ত হইয়া গেল, আরম্ভ হইল সংঘাত, বিক্ষোভ ও উত্তেজনার অশান্ত ঘূর্ণ্যাবর্ত। বর্ণবিভেদ লুপ্ত হইল, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও সংস্কারের ওলট-পালট ঘটিয়া গেল, গ্রামীন জীবনধারার ক্রমবিলুপ্তি ও দ্রুত শিল্পায়নের ফলে আমাদের ভিতরকার কতকগুলি মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। আমাদের সরকার এমন কতকগুলি আইন পাশ করিলেন যেগুলি আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর কঠিন আঘাত হানিল। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন-সম্মত হওয়াতে সতীত্বের চিরকালীন ধারণা বিপর্যস্ত হইয়া গেল। একান্নবর্তী বাঙালী জীবনের আদর্শ বিলুপ্ত হইতে চলিল, এবং তাহার ফলে পারিবারিক জীবনে সম্মান, ভক্তি ও কর্তব্যবোধের যে সব আদর্শ আমরা চিরকাল সাগ্রহে রক্ষা করিয়াছি সেগুলি ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। অর্থনৈতিক পেষণের ফলে নারী আর গৃহে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবিকা অর্জনের আশায় বাহির হইয়া পড়িল। বহির্জীবনে পুরুষ ও নারীর অবাধ মিশ্রণে এবং অনিবার্য সংঘাতে নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। নারী-পুরুষের সম্বন্ধ এক নূতন ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল।

সামাজিক জীবনের এই সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের ফলে যে পরিবেশে শরৎচন্দ্র সাহিত্যরচনা করিয়াছিলেন তাহা যেমন ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, তেমনি যে সব নরনারী তাঁহার সাহিত্যের আঙিনায় আনাগোনা করিয়াছিল

তাহারাও ক্রমে ক্রমে অপরিচয়ের অন্ধকারে অদৃশ্য হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র যে বিধবা নারীর অন্তর্বেদনার অশ্রুসিক্ত চিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহার সমস্যা আর এই নূতন সমাজদৃষ্টিতে সমস্যা বলিয়া বোধ হইল না। যে-সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত এবং নারীর পুনর্বিবাহে কোন চাঞ্চল্য ও প্রতিবাদ নাই সেখানে বিধবার সমস্যা আর কোন সমস্যাই নহে। বিধবা নারীকে যতদিন পরনির্ভরশীলা হইয়া থাকিতে হইত ততদিন তাহার সমস্যার গভীরতা ও দুঃখের তীব্রতা সকলের অন্তর স্পর্শ করিত, কিন্তু বিধবা নারীর সম্মুখে যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া গেল তখন আর তাহার সমস্যা ও দুঃখ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইল না। একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের ক্রমিক অবলুপ্তির ফলে শরৎচন্দ্র একান্নবর্তী পারিবারিক জীবন অবলম্বন করিয়া স্নেহপ্রীতি ও কর্তব্যবোধের যে সব চিত্র আঁকিয়াছেন সেগুলি দূরবর্তী চিত্র বলিয়া মনে হইল। পতিতাসমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া পতিতাদের প্রতি শুধু দরদ ও সহানুভূতি না দেখাইয়া অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মধ্য দিয়া তাহাদের মুক্তিবিধানের দিকেই বর্তমানকালের চিন্তাশীল সামাজিক মন জাগ্রত হইয়াছে। আধুনিক জীবনের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ভাগ্য হইল হৃদয়বৃত্তির মূল্যহ্রাস। স্নেহপ্রেম. মায়ামমতার কোমল ও করুণ আবেদন আজিকার দেহসর্বস্ব, বুদ্ধিবাদী মানুষের কাছে উপেক্ষিত ও উপহসিত। হৃদয়ের সরস-মধুর আবরণ ছিন্ন করিয়া মানুষ এখন বামাচারী কাপালিকের মতই দেহসাধনায় নিরত। জীবনের ব্যস্ততা ও বিক্ষোভ তাহার মনকে আজ করিয়াছে অসহিষ্ণু ও অসন্তুষ্ট, জীবনের অস্থির সংঘাত ও নিষ্ঠুর বঞ্চনা তাহাকে করিয়াছে আস্থাহীন, বীতশ্রদ্ধ ও পরবিদ্বেষী। শরৎচন্দ্র যে অশ্রুর অতখানি মূল্য দিয়াছেন আজ তাহা উত্তপ্ত চোখ হইতে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। শরৎসাহিত্যে স্নেহপ্রীতির লীলা দেখিয়া সেজন্য আজ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বিরক্ত হন এবং তাহাতে ভাবাবেগের প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া শরৎসাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক সাহিত্যিক তাঁহার সমসাময়িক সমাজকেই সাহিত্যে পরিস্ফুট করেন। তিনি সমাজ সম্বন্ধে যত বেশি বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিশ্লেষণশীল হইবেন ততই সাময়িকতার গণ্ডির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন। কারণ সমাজের বাহ্য সামগ্রিক রূপ তত দ্রুত পরিবর্তিত হয় না, যত দ্রুত তাহার আভ্যন্তরীণ, অদৃশ্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পরিবর্তিত হয়। শরৎচন্দ্র যে

সমাজের বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা স্বাভাবিক কারণে কিছুকালের মধ্যেই অনেকখানি রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সেজন্য শরৎচন্দ্র প্রদর্শিত সামাজিক সমস্যাও তাহার তীব্রতা অনেকখানি হারাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন বিচার করিতে হইবে যে, শরৎচন্দ্র যে সব চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সেগুলি শুধু মাত্র সামাজিক সমস্যার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ, অথবা সেই গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া চিরকালের মানুষের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্রে চলিবার যোগ্য। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমসাময়িককালের দাবী মেটান আবার চিরকালের আশাও পূর্ণ করেন। তিনি সমাজের অনুগত, আবার তিনি সমাজের অতিক্রমকারীও বটে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলি সমাজের গণ্ডি স্বীকার করে, আবার সেই গণ্ডি উল্লঙ্ঘনও করে। সেজন্য তিনি এতবড় শিল্পী। 'বামুনের মেয়ে'তে বর্ণিত কুলীনশাসিত সমাজ এখন নাই বটে, কিন্তু গোলোক চাটুয্যে এখনকার পাঠকের কাছেও অতি সত্য ও জীবন্ত চরিত্র। মাধবী, রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রের বৈধব্য-সমস্যা এখন সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের রস ও রহস্য আধুনিক মনকে এখনও সমানভাবে আকর্ষণ করে। একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনধারা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু 'বিন্দুর ছেলে', 'বৈকুণ্ঠের উইল' ও 'নিষ্কৃতি'তে একান্নবর্তী জীবনের যে রস পরিবেষিত হইয়াছে তাহা অতিক্রান্ত জীবনের এক অবিস্মরণীয় আনন্দে আমাদের মন পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। ভৈরবী জীবন হয়তো এখন আর আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু 'দেনাপাওনা'র ভৈরবী চরিত্র তো আমাদের কাছে এখনও সত্য হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর প্রবল জাতীয় আবেগ এখন আমাদের কাছে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সব্যসাচীর জলন্ত স্বদেশপ্রেম এখনও আমাদের শিরায় শিরায় আগুন জ্বালাইয়া তোলে, তাহার কারণ সব্যসাচী শুধু রাজনৈতিক চরিত্র নহে, সে যে শিল্পীর রসের তুলিকায় আঁকা চরিত্র। রাজনীতির মৃত্যু আছে কিন্তু রসের যে মৃত্যু নাই। শরৎচন্দ্র বর্ণিত সমাজ অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জীবন এখনও অমর, এবং আশা করা যায়, চিরকালই অমর হইয়া থাকিবে। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর আটত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার প্রতি লোকের আকর্ষণ তো এখনও কমিল না। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক কত সাহিত্যিক বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি এখনও অম্লান ও অপরাজেয়। তাঁহার পরবর্তীকালে কত দিক্‌পাল লেখকের

আবির্ভাব হইল, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কোন বই তো একবারের বেশি পড়িতে ইচ্ছা হয় না, অথচ তাঁহার মৃত্যুর আটত্রিশ বছর পরে এখনও তো তাঁহার বই বারবার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় না। এখানেই কি তাঁহার শাশ্বত মূল্য চিরতরে নির্ধারিত হইয়া যায় নাই ?

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসম্বন্ধে যাঁহারা হৃদয়াবেগের আতিশয্য ও চোখের জলের প্রাবল্য লইয়া অভিযোগ করেন তাঁহারা শরৎচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেন। ব্রহ্মদেশে লিখিত কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে আবেগ ও কারুণ্যের আতিশয্য আছে বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে আবেগ ও মননের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। 'দেনাপাওনা', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসে কোথাও তরল ভাবাবেগের প্রাবল্য ঘটে নাই। 'চরিত্রহীন' ও 'শেষপ্রশ্নে' যে তীক্ষ্ণ মননশীলতা রহিয়াছে তাহা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও সুলভ নহে। তবে হৃদয়াবেগের সামান্যতম প্রকাশে যাঁহারা ভীত হইয়া পড়েন তাঁহাদের পক্ষে গল্প-উপন্যাস না পড়াই ভালো। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।' শরৎচন্দ্র তাঁহার গল্প-উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্র হৃদয়রসে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই তাহা চিরকালের সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়াবেগের পূর্ণ প্রাবল্য দেখাইয়াও সাহিত্যকে কিরূপ উচ্চাঙ্গের শিল্পকলায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় ইংরেজী সাহিত্যে তাহার দৃষ্টান্ত হইলেন ডিকেন্স ও হার্ডি। ঐ দুইজন লেখকের হৃদয়রসাশ্রিত সাহিত্যের সঙ্গে শরৎসাহিত্যের অনেকখানি মিল দেখা যায়। শরৎসাহিত্যে হৃদয়াবেগের যে প্রকাশ রহিয়াছে তাহাতে সাধারণত দুর্দম প্রবৃত্তিলীলার উত্তেজনাজনক রূপ নাই, তাহাতে প্রধানত সূক্ষ্ম, শান্ত ও কোমল অনুভূতির স্নিগ্ধ করুণ রূপই রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য এখানে। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য জীবনের ক্ষুব্ধ প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতা ফুটাইয়া তুলিতেই উল্লাস বোধ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার সাহিত্যে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির তীব্রতা ও বলিষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র বাঙালীর হৃদয়রস মন্থন করিয়া তাঁহার সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার সাহিত্যে হৃদয়ের রুদ্র রূপ অপেক্ষা শান্তরূপই প্রাধান্য পাইয়াছে, দাহ অপেক্ষা দীপ্তিই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎসাহিত্যের হৃদয়লীলায় যিনি সংশয় প্রকাশ করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহার মধ্যে বাঙালীত্বের অভাব ঘটিয়াছে, বাঙালীর জীবনধারার সঙ্গে তিনি পরিচয়ও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শরৎসাহিত্যের নরনারী বড বেশি চোখের জল ফেলিয়াছে এ অভিযোগ যাঁহারা করেন, তাঁহারাও অশ্রুলেশহীন বর্তমান জগতের বিশুষ্ক ক্ষেত্র হইতেই ভ্রান্তভাবে সাহিত্যের বিচার করিয়া থাকেন। Crime and Punishment উপন্যাসে নায়ক যখন কাঁদে তখন আমরা আপত্তি করি না। ওথেলো যখন বলে, 'I must weep, but they are cruel tears' তখন উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিক মহিমা দেখিয়া আমরা অভিভূত হই, আর শরৎচন্দ্রের নায়িকারা চোখের জল ফেলিয়াই কি যত দোষ করিয়াছে ?

শরৎচন্দ্র যে-সময়ে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তখন ইউরোপীয় সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং সেই সাহিত্যের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগ কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে আমরা শরৎ-সাহিত্য আলোচনার সময় দেখাইয়াছি, কখন কোন্ সাহিত্যিকের প্রভাব তাঁহার উপরে পড়িয়াছিল। প্রথম যৌবনে ভাগলপুরে থাকিবার সময় তিনি হেনরী উড, মেরী করেলি, জেন অষ্টিন প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন। হেনরী উড ও জেন অষ্টিনের বইয়ের মধ্যে পারিবারিক জীবনের চিত্র এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে পারিবারিক জীবনচিত্র ও সামাজিক সমস্যার অবতারণার পিছনে ঐ-সব ইংরেজ ঔপন্যাসিকের প্রেরণা আছে তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ডিকেন্সের ভক্ত যে তিনি বরাবর ছিলেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় জোলা এবং অন্যান্য ফরাসী সাহিত্যিকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের প্রকৃতিবাদ (Naturalism) তিনি কোন সময়েই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মদেশে তিনি যখন ছিলেন তখন টলস্টয়ের সাহিত্যের সঙ্গে যে পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা পূর্বেই একাধিক বার উল্লেখ করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন তখনও কিছুটা সময় পর্যন্ত টলস্টয় জীবিত ছিলেন (মৃত্যু ১৯১০ খৃষ্টাব্দ)। Resurrection-এর প্রভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। টলস্টয়ের ভূমিসংস্কার ও কৃষকদের উন্নতিবিষয়ক চিন্তাও হয়তো শরৎচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। রুশ সাহিত্যের কথা শরৎচন্দ্র নিজেই সমর্থন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডস্টয়ভস্কি উনিশ শতকে মারা গেলেও (মৃত্যু ১৮৮১ খৃস্টাব্দ)

তাঁহার প্রভাব শরৎচন্দ্রের সময়ে খুব প্রবল ছিল। ডস্টয়ভস্কির সাহিত্যাদর্শ কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার The Brothers Karamazov উপন্যাসের একটি উক্তি হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে—'Only active love can bring out faith Love men and do not be afraid of their sins ; love man in his sin ; love all the creatures of God and pray God to make you cheerful.' শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ ইহা হইতে ভিন্ন ছিল না। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক ছিলেন গোর্কি ( ১৮৬৮-১৯৩৬ )। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গোর্কির প্রভাব ছিল যেমন অসামান্য, তেমনি প্রগতিবাদী ও মুক্তিকামী বাংলার লেখকদের কাছেও গোর্কি ছিলেন আদর্শ লেখক। গোর্কি সম্বন্ধে আধুনিক সোভিয়েট মতবাদ এরূপ—'Prior to Gorky nobody in world literature had been able thus to depict the wealth of the spiritual life of ordinary people ; nobody prior to Gorky had been able thus to describe sparks of the ideal in mundane surroundings, the invincible strength of those who carry the banner of ideals, the struggle between the old and the new, the inevitablity of the victory of the new over the old.' (Tamara Motyleva) শরৎচন্দ্রের পরিণত সাহিত্যপর্বে তিনি যে বিপ্লবাত্মক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহার উপরে গোর্কির প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক আর একজন লেখক হইলেন আলেকজাণ্ডার কুপরিন ( ১৮৭০-১৯৩৮ )। গণিকাজীবনের যে বাস্তব চিত্র সহানুভূতির সঙ্গে তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন Yama the Pit উপন্যাসে তাহার ফলে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমরতা অর্জন করিলেন। কুপরিনের দৃষ্টি ছিল শরৎচন্দ্রের মতই আবেগ-প্রবণ ও সমবেদনাপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যে সমসাময়িক কালে রুশসাহিত্যের ন্যায় ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জোলা, মোপাসাঁ ও ফ্লবের ফরাসী সমাজের কুৎসিত বাস্তবতা ও জঘন্য নোংরামি সাহিত্যে নির্বিকার চিত্তে তুলিয়া ধরিলেন। আর একজন শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখক হইলেন আনাতোল ফ্রান্স। ধর্মীয় অন্যায়, সামাজিক অবিচার ও রাজনৈতিক ভণ্ডামি তিনি নির্মমভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে উন্মোচন করিলেন। আর একজন ফরাসী লেখক বাংলা দেশে খুব জনপ্রিয়

ছিলেন। তিনি হইলেন ভারতীয় ভাবাপন্ন লেখক রোমা রোলাঁ। রোলাঁ শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারার উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবেন ইহা সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যায়। রোলাঁর মহৎ উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তোফ-এর মধ্যে রোলাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অনেকখানি প্রতিফলিত হইয়াছে। জাঁ ক্রিস্তোফ-এর সঙ্গে শ্রীকান্তের তুলনা করা চলে। রোমা রোলাঁ স্বয়ং শরৎসাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। শ্রীকান্তের ইতালীয় অনুবাদ পড়িয়া তিনি শরৎচন্দ্রকে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। দীনেশরঞ্জন দাশ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'বাতায়ন-শরৎস্মৃতি' সংখ্যায় (১৩৪৪) লিখিয়াছিলেন, 'কিছুকাল আগে ফরাসী মনীষী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রোমা রোলাঁ একখানি চিঠিতে লেখেন যে, আমরা যদি শরৎচন্দ্রের ভাল লেখাগুলিকে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করে ছাপাই তা' হলে ফরাসী ও বাংলার চিন্তাধারার একটা আত্মীয়তা ঘটবার সম্ভাবনা হয়। এটা আমরা করি না কেন?' শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে রোমা রোলাঁ কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন উপরের উদ্ধৃতি হইতে তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। ইংরেজী সাহিত্যের শ, গলসওয়ার্দি ও এচ. জি. ওয়েলস ছিলেন সমসাময়িক কালে বহুপঠিত ও বহুআলোচিত লেখক। ইহাদের মধ্যে আবার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন বার্নার্ড শ। বার্নাড শ-এর বৈপ্লবিক সমাজচিন্তা তখন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র যে অন্তত 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শ এর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে-সব ইউরোপীয় সাহিত্যিক সমসাময়িক সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিলেন তাঁহারা হইলেন বোয়ার ও হামসুন। বোয়ারের Great Hunger একখানি বহুপঠিত উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক হামসুনের সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাঁহার মিল ছিল। হামসুনের Hunger-এর মধ্যে তাঁহার দারিদ্র্য-পীড়িত ও বুভুক্ষিত জীবনকাহিনীই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের মতই হামসুন ছিলেন শ্রী ও ছন্দহীন, ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া। দুইজনের মানসভঙ্গির মধ্যেও ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

বাংলাসাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎসাহিত্যের স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে গেলে উপন্যাস-সাহিত্যের বিভিন্ন লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়া সেই লক্ষণগুলি শরৎসাহিত্যে কতখানি সার্থকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিচার করা দরকার। উপন্যাসের ছয়টি লক্ষণের কথা বলা হইয়া থাকে,

যথা বৃত্তগঠন (plot), চরিত্রসৃষ্টি (Character), সংলাপ (Dialogue), সময় ও স্থান (Time and Place), রচনারীতি (Style), জীবনদর্শন (Philosophy of Life)। সাহিত্যে কাহিনী বড, না চরিত্র বড় এ-বিতর্ক অ্যারিস্টটলের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। সেই বিতর্কের মধ্যে না যাইয়াও নাটকের ক্ষেত্রে যেমন উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে, কাহিনী ও চরিত্রের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য যেখানে সেখানেই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব। বর্তমান লেখকরা সাধারণত বাহিরের ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রের মনোজগতের দিকেই বেশি নজর দিয়াছেন। বর্তমানে Stream of Consciousness অথবা চৈতন্যপ্রবাহ কথাটি লইয়া বহু আলোচনা হইতেছে। মানুষের অন্তর্জগতের নানা অস্পষ্ট, ছায়াচ্ছন্ন ভাব, চিন্তা ও আবেগের প্রতিক্রিয়া কিভাবে তাহার বাহ্য ক্রিয়া ও আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, আধুনিক মনোবিশ্লেষণধর্মী ঔপন্যাসিকগণ তাহা দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের কাছে সুসংবদ্ধ কাহিনীর মূল্য কতটুকু? আধুনিক ঔপন্যাসিকদের এই প্রবণতার কথা স্বীকার করিয়াও বলিতে হয় যে, উপন্যাসে যদি একটা আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী না থাকে তাহা হইলে সেই উপন্যাস পাঠকদের মন কখনও আকর্ষণ করিতে পারে না। শরৎচন্দ্র বলিতেন যে উপন্যাস লেখার সময় তিনি ঘটনার কথা চিন্তা করিতেন না, শুধু কেবল কয়েকটি চরিত্রের কথাই তিনি ভাবিয়া লইতেন। শরৎচন্দ্রের এ-উক্তি সত্ত্বেও বলা চলে যে, ঘটনা সংস্থাপনায় তাঁহার কম কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার লেখাগুলির মধ্যে ঘনীভূত গল্পরসের এমন অনিবার্য আকর্ষণ আছে যে, তাঁহার কোন বই একবার আরম্ভ করিলে আর শেষ না করিয়া পারা যায় না। কাহিনীর বাঁধুনি শিথিল হইলেই যে উপন্যাস নিকৃষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে যেমন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। এই উপন্যাসের শিথিল গ্রন্থি আশ্রয় করিয়াই রস জমিয়া উঠিয়াছে। তবে গঠনভঙ্গির সংহতি ও ঐক্যবদ্ধতা দেখা যায় 'দত্তা', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাসে। ঘটনা-সংস্থাপনায় অনেক স্থানেই শরৎচন্দ্র নাটকীয় রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিপরীত পরিস্থিতির আকস্মিক আঘাতের মধ্য দিয়া তিনি কাহিনীর ধারা চমকপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক করিয়া তুলিয়াছেন।

চরিত্রসৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের কুশলতা সর্ববাদীসম্মত। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি আমাদের মনে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? ইহাদের কয়েকটি

কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, যথা (১) চরিত্রগুলি তাঁহার অভিজ্ঞতারসে পরিপুষ্ট হইয়াছে, (২) চরিত্রগুলির বাহ্য ক্রিয়া ও আচরণের মূলে তাহাদের অন্তর্জগতের যে সব সূক্ষ্ম ও অবদমিত বাসনাকামনার অন্তর্দ্বন্দ্ব রহিয়াছে তিনি সেগুলি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, (৩) চরিত্রগুলির আবেগ-অনুভূতির সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, (৪) অন্তরের সীমাহীন সহানুভূতির স্পর্শে তিনি চরিত্রগুলিকে স্নিগ্ধ-মধুর ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, (৫) প্রাণস্পর্শী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়া তিনি চরিত্রগুলিকে শিল্পরসোত্তীর্ণ করিয়াছেন। ফরস্টার তাঁহার 'Aspects of the Novel' গ্রন্থে দুই শ্রেণীর চরিত্রের কথা বলিয়াছেন, যথা, flat ও round। এই দুই শ্রেণীকে টাইপ ও জটিল চরিত্রও বলা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র উভয় শ্রেণীরচ রিত্রসৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার টাইপ চরিত্রগুলির মধ্যে মেজদা, নোতুনদা, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, বাঁড়ুজ্যে মশাই দীনু ভট্‌চাজ, টগর বোষ্টমী, কামিনী বাড়িউলী, পোড়াকাঠ, শশী কবি, রামদাস তলোয়ারকর প্রভৃতিকে কখনও ভোলা যায় না। আবার জটিল চরিত্রসৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁহার তুলনা আর বাংলা সাহিত্যে কোথায় আছে? বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু অনেকস্থানে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্বের ন্যায় স্থূল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ চবিত্রের সূক্ষ্মতম ও গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু দুই বিরুদ্ধ আবেগ ও প্রবৃত্তির স্পষ্ট ও প্রবল দ্বন্দ্ব তিনি দেখান নাই। মানুষের মনোজগতে যে পরস্পরবিরোধী সত্তা বিরাজ করিতেছে, তাহার সজ্ঞান মনের যে প্রতিবাদ রহিয়াছে নির্জ্ঞান মনে, এবং এই সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যখন তাহার কথায় ও আচরণে প্রকটিত হয় তখন যে নানা জটিলতা ও বৈপরীত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করিলেন। তাঁহার রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, যোড়শী, অচলা প্রভৃতি চরিত্রগুলি মানবজীবনের গহন অন্তর্জগতের জটিল রহস্য-আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। সকলের প্রতি এতখানি হৃদয়-উজাড়করা সহানুভূতিও বাংলা সাহিত্যের আর কোন লেখক দেখাইতে পারেন নাই। এ-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বহুশ্রুত কথাগুলি আবার উল্লেখ করি, 'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে

না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুই নেই,—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যসম্পদে ভরা বসন্ত জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী যূথী, আনে গন্ধব্যাকুল দক্ষিণা পবন, কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি ব'লে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। এমনি আর অনেক কিছুই—এজীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি, স্পর্ধিত অবিনয়ের মর্যাদায় তাদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।'

শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বর্ণনামূলক রীতি ও সংলাপাশ্রয়ী নাট্যরীতি উভয় রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাসে তিনি যে সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা পরিমিত, আবেগগর্ভ ও ইঙ্গিতধর্মী। তিনি নিজে একস্থানে বলিয়াছেন, 'Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ-প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষর বেশী বলেছে। এই হ'ল artistic form-এর ভিতরের রহস্য।' সংলাপের অনেক স্থলেই তিনি হৃদয়বৃত্তির পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহার সংলাপ ঘনীভূত নাট্যরসসৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক কালের কাহিনীই তাঁহার সাহিত্যে বর্ণনা করিয়াছেন। সেজন্য অতীতের দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে তাঁহাকে আলোকপাত করিতে হয় নাই, কিংবা কোথাও কল্পনার শরণাপন্ন হইতে হয় নাই। শরৎচন্দ্র হুগলী ( দেবানন্দপুর ), বিহার ( প্রধানত ভাগলপুর ও মজঃফরপুর ), ব্রহ্মদেশ ( প্রধানত রেঙ্গুন ও পেগু ), বাজে শিবপুর, সামতাবেড় ও কলিকাতা এই কয়েকটি জায়গায় জীবন কাটাইয়াছিলেন। বিহারের পটভূমি শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে এবং আংশিক ভাবে 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহে' আসিয়াছে। 'শ্রীকান্ত'

দ্বিতীয় পর্ব, 'চরিত্রহীন', 'ছবি', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসে ব্রহ্মদেশের পরিবেশ চিত্রিত হইয়াছে। অন্যান্য উপন্যাসে বাংলা দেশের পরিবেশেই কাহিনী উপস্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন উপন্যাসে কলিকাতার জীবনচিত্র রহিয়াছে, যথা 'পরিণীতা', 'আঁধারে আলো', 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহার বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসে বাংলার পল্লীসমাজেরই বর্ণনা রহিয়াছে। সাধারণ ভাবে বাংলার পল্লী রূপই তাঁহার সাহিত্যে পরিস্ফুট হইয়াছে ইহা মনে হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত হুগলী হাওড়ার পল্লীঅঞ্চলই তাঁহার সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। সেজন্য নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের হিংস্র জলের লীলা, চর-বিল-হাওর প্রভৃতি যেমন তাঁহার সাহিত্যে নাই, তেমনি উত্তরবঙ্গের রুক্ষ-কঠোর ভূমির রিক্ত অনুর্বরতা ও পাহাড়জঙ্গল প্রভৃতি সেখানে নাই। পল্লীর সহজস্নিগ্ধ রূপ—তাহাব আলোধোয়া আকাশ, ক্ষেতের সবুজ হাসি, পুষ্পগন্ধে ভরা বিতান, পাখীডাকা শ্যামল বৃক্ষরাজি এগুলিই তাঁহার সাহিত্যে বেশি করিয়া আসিয়াছে। শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তখনও জমিদারী প্রথা সমাজের মধ্যে বাঁচিয়া ছিল এবং জমিদারশক্তিই তখন সমাজকে পরিচালিত করিয়া চলিতেছিল। 'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' 'পল্লীসমাজ' 'দেনাপাওনা' 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি এই সমাজ হইতে গৃহীত হইয়াছে। জমিদারশ্রেণীর অন্যায় ও অত্যাচার তিনি দেখাইয়াছেন, 'বিরাজবৌ', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীগুলি তখনও বর্তমান ছিল বলিয়া সমাজের প্রাণকেন্দ্র নিহিত ছিল গ্রামে। সেজন্য গ্রামের সমাজশক্তি তখনও বিশেষ প্রবল ও প্রভাবশালী ছিল। হুগলী-হাওডা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের জেলায় বর্ণপ্রধান ব্রাহ্মণশ্রেণীই সমাজশক্তির চালক ছিল। তাহারা যাজক, তালুকদার কিংবা জমিদার হইয়া বর্ণপ্রাধান্যের দাবীতে সমাজের উপর নিরঙ্কুশ শাসন কায়েম রাখিতে চাহিয়াছিল। শিক্ষাদীক্ষা ছিল তাহাদের যৎসামান্য, জীর্ণ প্রথা ও আচার আঁকডাইয়া ধরিয়া তাহারা সমাজের অন্যান্য শ্রেণী, বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর উপর নানা শোষণ ও উৎপীডন চালাইয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ হইয়া শরৎচন্দ্র কি কঠোর আঘাত হানিলেন ব্রাহ্মণ সমাজের উপর! জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়াও সমাজের অনেক নিম্ন ও উপেক্ষিত শ্রেণীর পরিচয় তাঁহার অনেক উপন্যাসে পাওয়া যায়। অস্পৃশ্য শ্রেণীর লাঞ্ছনা ও

বেদনা সহানুভূতির সঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'বামুনের মেয়ে', 'পণ্ডিত মশাই' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে। মুসলমান সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 'পল্লী সমাজ', 'মহেশ' ও 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে। হাওড়া-শিবপুরে থাকিবার সময় তিনি যে পরিণত পর্বের উপন্যাসগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলিতে কৃষক ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমস্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক সংগ্রামের চিত্রও এই পর্বের উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে যে সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেগুলি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেই প্রথম মর্যাদা পাইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টির মত তাঁহার রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। তাঁহার রচনার মধ্যে তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিসত্তা প্রতিফলিত—যে ব্যক্তিসত্তা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, সমবেদনায় করুণ এবং মননশীলতায় দীপ্ত। প্রাণস্পর্শী ভাষা, রহস্যজটিল পরিবেশ এবং আপাতবিরুদ্ধ ভাব ও রসের ক্রিয়া বিক্রিয়ার দ্বারা তিনি সম্মোহিত পাঠককে এক অনিন্দ্য রসলোকে লইয়া যাইয়া অচ্ছেদ্য মায়াডোরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। অ্যারিস্টটল রচনাশৈলী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'It must be clear, but it must not be mean.' শরৎচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধেও আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, ইহা জলের ন্যায় স্বচ্ছ বটে, কিন্তু বদ্ধজলার ন্যায় দূষিত নহে। ইহা প্রভাত আলোকের ন্যায় স্নিগ্ধ, বৃষ্টিধারার ন্যায় করুণ ও নদীর কলতানের ন্যায় মধুর। তাঁহার ভাষা অতি পরিচিত শব্দসম্ভারে পূর্ণ হইয়াই অতি দুর্লভ সৌন্দর্যের আকর হইয়া উঠিয়াছে। কবিত্বের কোন সচেতন প্রয়াস তাঁহার ছিল না, কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা অনুপম কাব্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগ ও মেজাজের ভাষা সৃষ্টি করিতে তিনি অদ্বিতীয়। আবেগের নানাপ্রকার শারীর অভিব্যক্তি বর্ণনা করিয়া তিনি আবেগের তীব্রতা ও গভীরতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আবার চরিত্রের নানারকম মেজাজ প্রকাশ করিবার জন্য যথাযোগ্য চিত্র ও ধ্বনিময় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আকস্মিক আবেগ-অনুভূতির অতর্কিত প্রকাশ ঘটাইতে তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রকৃতিকে তিনি নানাভাবে কাজে লাগাইয়াছেন। নিছক প্রকৃতিসৌন্দর্য বর্ণনায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ নাই, কিন্তু মানুষের বিশেষ বিশেষ মানস-অবস্থার পটভূমিরূপে তিনি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির রঙ ও রসের সঙ্গে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির গূঢ় সম্পর্ক প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহার বর্ণনা সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ রচনায়

সংযম ও পরিমিতির বাঁধন কোথাও শিথিল হয় না। শরৎচন্দ্র একস্থানে বলিয়াছেন, 'এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেছি যে, কেবল লেখাই শক্ত নহে, না লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি।' শরৎচন্দ্রের রচনা প্রধানত করুণরসাত্মক হইলেও করুণরসের ধারার পাশে হাস্যরসের ধারাও প্রবাহিত করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার রচনার আকর্ষণীয়তা ও উপভোগ্যতা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রগত ও পরিস্থিতিগত হাস্যরসই তাঁহার রচনায় প্রাধান্য পাইয়াছে। নিছক হাস্যরসসৃষ্টির সচেতন প্রয়াস যেখানে পরিস্ফুট নহে, সেখানেও তিনি এমন সরস মন্তব্য, তির্যক উক্তি ও শ্লেষাত্মক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যে রচনায় সর্বত্র একটা কৌতুকদীপ্ত রমণীয় পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হাসির পরেই পাঠককে কাঁদাইয়াছেন, সেজন্য তাহার কান্না এত গভীর এবং কান্নার পরেই তাহাকে আবার হাসাইয়াছেন, সেজন্য সেই হাসি এত মধুর।

ঔপন্যাসিক কি কোন জীবনসত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন? প্রথমেই একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপন্যাস তো কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্র লইয়াই কারবার করে, সুতরাং উহাতে সত্যের প্রকাশ কিভাবে হইতে পারে? এ-প্রসঙ্গে প্লেটোর উক্তির কথা মনে পড়ে। প্লেটো সর্বপ্রকার কাল্পনিক রচনাকে অসত্য বলিয়াছিলেন, তাঁহার মতে হোমারও নানা মিথ্যা ভাষণে অপরাধী। প্লেটোর উত্তর দিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল বলিলেন, ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা কাব্যসত্য মহত্তর, কারণ ইতিহাস বিশেষকে লইয়া কারবার করে, কিন্তু কাব্য বিশ্বজনীন সত্যই প্রকাশ করে। এ-প্রসঙ্গে ইংরেজ লেখক ডি কুইন্সি সাহিত্যের যে দুইটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যথা, Literature of Knowledge ও Literature of Power—রবীন্দ্রনাথের মতে জ্ঞানের কথা ও ভাবের কথা। জ্ঞানের সাহিত্যের মধ্যে যে সত্য প্রকাশ পায় তাহা সাময়িক কিন্তু Literature of Power অথবা ভাবের সাহিত্যের মধ্যে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাহা চিরন্তন। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে সেই চিরন্তন সত্যই স্থান পায়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে কিভাবে সত্য প্রকাশ পাইতে পারে? যদি তিনি স্পষ্ট ও সোজাভাবে কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তবে তিনি শিল্পীর স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রচারকের ক্ষেত্রে পতিত হন। তিনি জীবনব্যাখ্যাতা—জীবনব্যাখ্যায়

মধ্যেই তাঁহার সত্য নিহিত রহিয়াছে, সেই সত্যের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। শেক্‌সপীয়রের নাটক হইতে আমরা কোন্ জীবন সত্য উপলব্ধি করিতে পারি? তিনি তো জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহা দেখান নাই, এমন কোন চরিত্র নাই যাহার প্রতি সহানুভূতি উজাড় করিয়া দেন নাই। বড শিল্পী ও সাহিত্যিকের শিল্প ও সাহিত্যে যে জীবনসত্য পরিস্ফুট হয় তাহা উদার, সর্বজনীন ও শাশ্বত, তাহা আমাদের সংকীর্ণ স্থান ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র নৈতিক ও সামাজিক ধারণা ও সংস্কারের সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নহে। শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন কি ছিল তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং জীবনকে নিবিড়ভাবে দেখিয়াছেন। জীবনকে সুন্দর রূপে দেখিয়াছেন এবং জীবনকে অসুন্দররূপেও দেখিয়াছেন। তাঁহার যাহা কিছু জীবনবোধ আসিয়াছে জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, কোন শেখা তত্ত্ব হইতে নহে, কিংবা কোন পূর্বগঠিত সংস্কার হইতেও নহে। শ্রীকান্ত বলিয়াছিল, 'কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে, আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই?' শরৎচন্দ্র শ্মশানের অন্ধকারে যে শুধু আলো দেখিয়াছিলেন, তাহা নহে, যে সব মানুষ জীবনের শ্মশানে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে তাহাদের মধ্যেও তিনি আলো দেখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, 'মানুষের অন্তর জিনিসটা অনন্ত।' সুতরাং আমরা আমাদের সংকীর্ণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত মানুষের অন্তরের বিচার করিতে যাইয়া কত না ভুল করিয়া বসি! মানুষ যতই জীবনের পথে চলিতে থাকে ততই সে বুঝিতে পারে যে, ভালমন্দ জিনিসটা আপেক্ষিক, সেজন্য মানুষ যখন একজনের ভ্রান্তি ও অপরাধের জন্য তাহার বিচার করিতে বসে তখন সে কতবড অন্যায়ই না করিয়া ফেলে। জীবনকে শরৎচন্দ্র ভালোবাসিয়াছেন, গভীরভাবে, সমগ্রভাবে ভালোবাসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভালোবাসায় কোন আসক্তি নাই। তিনি সকলকেই আত্মীয় ভাবেন, কিন্তু তবুও কোন বন্ধন তিনি স্বীকার করেন না। শ্রীকান্তের ন্যায় তিনি সারাজীবন শুধু পথেই চলিয়াছেন, কোথাও যেন থামিতে পারেন নাই। জয় তাঁহার জীবনে আসিয়াছে, কিন্তু সেই জয় সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। আঘাত তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু সেই আঘাত তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। তিনি জনতার জয়গান করিয়াছেন, কিন্তু জনতা হইতে তিনি সব সময়েই পলাতক। বাস্তব জীবনরসের তিনি কত বড় স্রষ্টা, কিন্তু জীবনরসের পাত্রকে ছুঁড়িয়া

ফেলিতে তাঁহার দ্বিধা নাই। সেজন্য জীবন তাঁহার কাছে যেমন সত্য, মৃত্যুও ঠিক তেমনি সত্য। জীবনকে তিনি বরণ করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুকেও পরিহার করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। 'শ্রীকান্তে'র ১ম ও ৪র্থ পর্বে মৃত্যুপ্রশস্তি সকলেরই মনে পড়িবে। শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনে আমরা এই বিপরীতের মিলন দেখিলাম—ভালোবাসার সঙ্গে নিরাসক্তির, সম্ভোগের সঙ্গে বৈরাগ্যের, আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিলাম এবং বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহার সাহিত্যের কালজয়ী শ্রেষ্ঠত্বের কথাও আলোচনা করিলাম। শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে বর্তমানে কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য সমালোচক যে সব অভিযোগ করিয়া থাকেন সেগুলি আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' লিখিয়াছিলেন, 'এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি।' শরৎচন্দ্র জীবিত কালে ঐ ধরণের সমালোচনা সহ্য করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পরেও সহ্য করিতেছেন। কিন্তু তিনি যে সমালোচিত হইতেছেন ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি পাঠকদের মধ্যে জীবিত, মৃত নহেন, কারণ 'Man wars not with the dead'—মানুষ মৃতের সঙ্গে কখনও সংগ্রাম করে না। রোমাঁ রোঁলা শরৎচন্দ্রকে যে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'মহেশ' গল্পটি পড়িয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন, 'A wonderful style and a great and perfect creative artist with a profound emotional power.' লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত হয় তাঁহার জনপ্রিয়তা অর্থাৎ পঠন পাঠনের দ্বারা, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতবর্ষের কোন লেখকেরই বই বোধ হয় এত বেশি সংখ্যায় অনূদিত হয় নাই। অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল তাঁহার শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের বইগুলির অনুবাদের যে তালিকা দিয়াছেন (এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে) তাহাতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষাতেই শরৎচন্দ্রের প্রায় সব বই অনূদিত হইয়াছে, হিন্দীতে অনুবাদের সংখ্যা ৮৪ এবং গুজরাটীতে সেই সংখ্যা হইল ১০৩। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতেও শরৎচন্দ্রের বইগুলি অনূদিত হইতেছে। রাশিয়ায় সম্প্রতি শরৎসাহিত্যের পঠনপাঠনের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখা

দিয়াছে। Institute of Asian peoples in Moscow-র পক্ষ হইতে তাঁহার কয়েকখানি বই অনূদিতও হইয়াছে। ঐ ইনষ্টিটিউটের একজন বিশিষ্ট সদস্যা Strizhevskaya শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'We have read and heard very much about the exceptional popularity of Saratchandra's works in India. We see the reason for this in the fact that his talent combines many merits: Knowledge of life and talented, realistic description of it, humanism and democratic manner expressed in the warm portrayal of life and feelings of those badly treated by fate; deep understanding of human psychology personified in convincing characters and finally, plain language full of inner harmony and beauty understandable to all.'

শরৎচন্দ্রের ন্যায় বাংলার সমাজজীবনকে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত করিয়া তুলিতে আর কোন সাহিত্যিক পারেন নাই, ইহা বোধ হয় অসঙ্কোচে বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া আমাদের মুক্তিচেতনাকে আলোকিত করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা, রূপক ও অলঙ্করণপ্রবণতা এবং সূক্ষ্ম ভাবপরিক্রমার ফলে তাঁহার সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রবলভাবে সমাজসত্তাকে আঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র সোজাভাবে, স্পষ্ট ভাষায় ও দুঃখ বেদনার কারুণ্যে সিক্ত করিয়া সমাজের সমস্যা তুলিয়া ধরিলেন এবং আমাদের প্রচলিত সংস্কার, নীতিবোধ ও ধর্মবোধের অন্যায় ও জবরদস্তি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহার ফলে আমাদের বদ্ধ অচলায়তনের দ্বার যেন হঠাৎ খুলিয়া গেল, এবং সেই মুক্ত দ্বার দিয়া যত আলো ও বাতাস আসিয়া মুক্তির আনন্দে আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নারীর সতীত্বের যে ধারণা এতদিন আমাদের মনে বদ্ধমূল ছিল তাহা বিচলিত হইল। উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত মানুষ সম্বন্ধে এক নূতন মূল্য ও মর্যাদাবোধ আমাদের মনে জাগ্রত হইল। দরিদ্র ও দুর্গত কৃষক ও শ্রমিক সমাজের মধ্যে তিনি বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়া দিলেন। শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে যে সমাজপ্রগতি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল তাহার মূলে যে শরৎসাহিত্যের প্রেরণা অনেকখানি ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শরৎচন্দ্রের পরে বাংলাসাহিত্য শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা অনাবৃত ও নিষিদ্ধ জীবনের বর্ণনা করিবার সাহস পাইয়াছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি যে সহানুভূতি বোধ করিয়াছেন তাহার দীক্ষা শরৎচন্দ্রের কাছেই লাভ করিয়াছিলেন। পল্লীজীবনের কোমল মাধুর্যের প্রতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রীতি তাহা শরৎসাহিত্যের দ্বারা হয়তো কিছুটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ-বিদ্রোহের যে প্রজ্বলিত শিখা দেখিতে পাই তাহা শরৎসাহিত্য হইতে অগ্নিস্পর্শ লাভ করিয়াছিল, বলা যায়। মনোজ বসুর গল্পে যে স্নিগ্ধ কমনীয়তা রহিয়াছে তাহাও বোধ হয় কিছুটা প্রেরণা পাইয়াছে শরৎসাহিত্য হইতে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি 'আমার সাহিত্য জীবনে' বলিয়াছেন, 'এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ।' শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারার মধ্যে বলিয়াছেন, 'এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন।' এ-উক্তি সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক কথাসাহিত্যের লেখকরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শরৎচন্দ্রের নির্দেশিত পথে চলিয়াই উপন্যাসের নব নব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন।

# সাহিত্যশিল্প

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যবিচারে তাঁহাব বাস্তব জীবনবোধ, সত্যোপলব্ধি, মানবিক সহানুভূতি সব কিছু আলোচনা করিয়াও তাঁহার সুনিপুণ শিল্পকর্মেব উপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। শরৎসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের আবেদন যতই গভীর হউক না কেন, তাহার স্থায়ী মূল্য নির্ধারণ করা যাইতে পারে শুধু শিল্পকর্মের বিচারের দ্বারা। কোন বড সাহিত্যিকই শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি বর্ণনা করিয়া চলেন না, তিনি একটি শিল্পাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে সেই আদর্শে রূপায়িত করিতে চাহেন। সেজন্য প্রত্যেক সাহিত্যিককেই একদিক দিয়া সচেতন শিল্পী বলা যায়। শিল্পেব উপাদানগুলির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া সেই উপাদানগুলি দিয়া একটি অখণ্ড শিল্পমূর্তি গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই শিল্পকর্ম-ক্ষমতা শিক্ষা ও অনুশীলনসাপেক্ষ। কোন সাহিত্যিকই সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বড শিল্পী হইতে পারেন না। বড শিল্পী হইতে গেলে অনেক সাধনা করিতে, অনেক অপেক্ষা করিতে হয়। শরৎচন্দ্র লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—‘তোমার খাতার লেখাগুলো ত মন দিয়েই পডলাম, সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই, ভাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না।’ শরৎচন্দ্রকেও শিল্পের পরিণত ফলটির জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া সাধনা করিতে হইয়াছিল।

শিল্প-আলোচনায় শুধুমাত্র সাহিত্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ গঠনরীতি ও প্রকাশভঙ্গির দিকে নজর রাখিলে চলে না। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের অন্বয় মিলনের মধ্যেই শিল্পের পূর্ণ পরিণতি। সাহিত্যের বিষয় শুধু কেবল তথ্য ও ঘটনা নহে। তথ্য ও ঘটনার শিল্পসম্মত পরিশোধিত রূপই সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে। শিল্পের দাবির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লেখককে দেখা দৃশ্যকে কাটছাঁট করিতে হয় এবং জানা ঘটনাকে কিছুটা আলোকিত ও কিছুটা বা প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—‘যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ও

লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট করে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।' কতটা লেখক বলিবেন এবং কতটা পাঠক কল্পনা দ্বারা পূরণ করিয়া লইবেন তাহা বহু শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা অর্জিত শিল্পজ্ঞানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শরৎচন্দ্রের কথায়—'কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষাসাপেক্ষ এবং বুদ্ধিসাপেক্ষও বটে।' সুগঠিত ও শিল্পরসসমৃদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রূপ ও বিষয় কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে তাহা উপন্যাসের শিল্পরীতির ব্যাখ্যাতা লুব্বোক সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'The well-made book is the book in which the subject and the form coincide and are indistinguishable —the book in which the matter is all used up in the form, in which the form expresses all the matter'[১] শরৎসাহিত্যে এই রূপ ও বিষয়ের কিরূপ সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিব যে, তাঁহার প্রথম পর্বের উপন্যাসে শুধু কেবল বিষয় অথবা ঘটনারই গুরুত্ব। সেখানে চরিত্রসৃষ্টির গভীরতা ও শিল্পকুশলতার পরিচয় বিশেষ নাই। ক্রমে ক্রমে ঘটনার প্রবলতা ও রোমাঞ্চকরতা কমিয়া আসিয়াছে এবং সচেতন শিল্পকর্মের দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রৌঢ় পর্বেই বিষয় ও শিল্পরূপের সুমিত মিলন দেখিতে পাই।

সংযমের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই শিল্পসৌন্দর্যের বিকাশ। শরৎসাহিত্যের মূলেও অটল সংযমের কঠিন ভূমিই সন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে। শরৎচন্দ্রের উক্তি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'কেবল লেখাই শক্ত নয়। না-লেখার শক্তিও কম নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।...বস্তুত, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়।' শরৎসাহিত্যে এই শিল্পসংযমের রূপ কিভাবে এবং কতখানি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে। যৌনসংযমের ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্রের বহুযত্নে আরব্ধ সংযমের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—'কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার

১। The Craft of Fiction by Percy Lubbock

বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নরনারীর মধ্যে ইহাও আছে জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠি না।'[১] শরৎসাহিত্যে যৌনসংযমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ-কারণে যে তিনি এমনভাবে কাহিনী বর্ণনা ও পরিস্থিতি রচনা করিয়াছেন যেখানে দেহসম্পর্কের সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠে, অথচ সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তে তিনি তাঁহার লেখনীকে এরূপ কঠোর সংযমে শাসিত করিয়া রাখেন যে, পূর্ণিমার বাঁধভাঙ্গা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ ও স্ফীত সমুদ্রের উৎক্ষিপ্ত জলরাশি যেন পরস্পরের অতি সন্নিকটে আসিয়াও ব্যবহিত হইয়া যায়। তিনি তাঁহার সাহিত্যে নরনারীর ভালোবাসা, বিশেষ করিয়া বহু ক্ষেত্রে সমাজনিষিদ্ধ ভালোবাসার চিত্রই আঁকিয়াছেন। সেই ভালোবাসা অদৃশ্য গুহা হইতে নির্গত পার্বত্য নদীর ন্যায় যত অগ্রসর হইয়াছে ততই অধিকতর বেগবতী হইয়া দেহসমুদ্রের পূর্ণতার মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিয়াছে। কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় সেই প্রমত্ত জলপ্রবাহের গতি যেন স্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন। হৃদয়লীলার খুঁটিনাটি রহস্য এবং তাহার বাহ্য অভিব্যক্তি সম্পর্কে তিনি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন যে, পাঠকের রসমগ্নচিত্ত ভালোবাসার শেষ অনিবার্য পরিণতির জন্য রোমাঞ্চিত প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে থাকে। অথচ শেষ মুহূর্তে লেখক ভালোবাসার সেই প্রচণ্ড বেগ অকস্মাৎ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। ইহার ফলে পাঠকের চিত্তে এক চির অতৃপ্তি জাগিয়া থাকে। এই অতৃপ্তিটুকু জাগাইয়া রাখাই হইল তাঁহার শিল্পের উদ্দেশ্য। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী এক সঙ্গে চারপর্ব ধরিয়া বাস করিয়াও এমন এক সূক্ষ্ম ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে যে তাহাদের পূর্ণ মিলন দেখিবার অতৃপ্ত আগ্রহ পাঠকমনে জাগিয়াই রহিল। পাঠক তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সেজন্য পাতার পর পাতা সে তাহাদের দিকে প্রত্যাশা লইয়া চাহিয়াই রহিল। তারকেশ্বরে রমার বাড়িতে নিরালা শয্যায় শুইয়া রমেশ শুধু কেবল সুখস্বপ্নেই বিভোর হইয়া রহিল, সেই শয্যার দূর প্রান্তেও রমাকে পাইল না। গুণেন্দ্রর বাড়িতে একাকিনী হেমনলিনী—উভয়ের হৃদয় ভালোবাসার আগুনে ধূপের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। ধূপের ন্যায়ই একটু মৃদু গন্ধ

১। সাহিত্যের রীতিনীতি

ছড়াইয়াছে বটে। কিন্তু একে অন্যের আগুনের স্পর্শ হইতে আশ্চর্যভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখিয়াছে। চন্দ্রমুখী ও বিজলীর দেহমদিরার লোভে দেবদাস ও সত্যেন্দ্র তাহাদের সান্নিধ্যে আসিয়াছে বটে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে বারবনিতার দেহমদিরা দেহাতীত অমৃত-নির্যাসে পরিণত হইয়াছে। শরৎসাহিত্যে প্রেমের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নামায়া দেখিয়াছি, কিন্তু কামনার দীপ্ত রৌদ্রজ্বালা বেশি দেখি নাই। দেহকামনার চিত্রণে তাঁহাকে সংযমী বলিলে বোধ হয় কম বলা হয়, বরং অতিরিক্ত শুচিতাগ্রস্ত বলিতেই ইচ্ছা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রগুলি উদ্দাম প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কিন্তু সেই ক্ষতবিক্ষত কামনার হাহাকার শরৎসাহিত্যে আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের মহেন্দ্র অথবা সন্দীপের ন্যায় প্রবৃত্তিময় পুরুষও শরৎসাহিত্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। শরৎসাহিত্যের একমাত্র দুর্দম প্রবৃত্তিময় পুরুষ বোধ হয় সুরেশ। সতীশের চরিত্রহীনতার সত্যকার নিদর্শন নাই বলিলেই হয় এবং জীবানন্দ প্রথমে নারীসম্ভোগী অত্যাচারী জমিদার রূপে উপস্থাপিত হইলেও ক্রমে ক্রমে সেও কামনার পঙ্ক ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিয়া দুর্লভ প্রেমের ধ্যানে যেন মগ্ন হইয়া রহিল। নারীচরিত্রগুলির মধ্যে কামনাতাড়িতা একমাত্র নারী বোধ হয় কিরণময়ী। কামনার দাহে সে শুধু অপরকে পোড়ায় নাই, নিজেও অসহায় পতঙ্গের মতো পুড়িয়া মরিয়াছে। কমল মুখে দেহ কামনার অনেক প্রশস্তি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জীবনে সেই দেহকামনার কোনো উগ্র, উদ্ধত প্রকাশ আমরা দেখিলাম না। সুতরাং, ইহা নিছক প্রচার, চরিত্রানুযায়ী নয়। অপর সকল নায়িকাই কামগন্ধহীন প্রেমের নিকষিত হেমের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শরৎসাহিত্যে প্রেমের দেহমিলনঘটিত 'ক্লাইম্যাক্স' নাই বলিয়া ইহার আকর্ষণীয়তা বোধ হয় আরও বাড়িয়াছে। দেহমিলনের মদির উত্তেজনামুহূর্তে প্রেমের সকল প্রচণ্ডতা বিস্ফোরিত হইয়াই যেন নিঃশেষ হইয়া যায়। ক্লান্ত, অবসন্ন প্রেম তাহার পরে চলিবার সকল শক্তি হারাইয়া ফেলে। সেই চরম উত্তেজনা-মুহূর্তটি তীব্র লাল আলোর মতোই সকল দৃষ্টি তাহার দিকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখে। তাহার আগে পিছনে শুধু কেবল-দুস্তর অন্ধকারই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরৎসাহিত্যের কোথাও এই লাল আলোর তীব্রতা নাই। তাহার সর্বত্র মৃদু জ্যোৎস্নার প্রবাহ। প্রেমের আবেগ উদ্রেক করিয়া তিনি কোথাও তাহার শেষ সীমানা নির্দেশ করিয়া দেন নাই,

শেষ সীমানা বুঝি অকূল সমুদ্রের পরপারে—পাঠকের কল্পনা নিত্য সেই সমুদ্র পাড়ি দিতে যাইয়া সুখকর অতৃপ্তির তরঙ্গাঘাতে আলোড়িত হইতে থাকে।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের বৈপরীত্য একদিকে লক্ষ্য করা যায়। যখন তিনি অসংযমের পঙ্ক সর্বাঙ্গে মাখিয়াছিলেন তখন তাঁহার সাহিত্যে অটুট সংযমের কৃচ্ছ্রতাই দেখিতে পাই, আবার যখন তিনি অসংযমের পঙ্ক ধুইয়া সুস্থিত জীবনযাত্রা শুরু করিলেন তখনই বহু অভ্যাসে আয়ত্ত সংযমের বিরুদ্ধে যেন প্রতিবাদ জানাইলেন। ভাগলপুরে উচ্ছৃঙ্খল ভোগের পথে যখন তিনি ছুটিয়া চলিতেছিলেন তখন তিনি লিখিলেন—'অনুপমার প্রেম', 'বড়দিদি' ও 'দেবদাস'। ঐ বইগুলিতে সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেই প্রেম গহন মানসভূমিতেই বিচরণ করিয়াছে, তাহার অগ্নিতপ্ত রূপ আমাদের চোখে দৃশ্যমান হইল না। ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় তিনি লিখিলেন—'পথনির্দেশ', 'পল্লীসমাজ', 'আঁধারে আলো', 'শ্রীকান্ত' (১ম) ইত্যাদি। তখন ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অসংযমের পঙ্কিল জলাশয়ে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ছিলেন। অথচ তাঁহার লেখা সাহিত্যের মধ্যে সেই অসংযমের বিন্দুমাত্র কালিমাস্পর্শ নাই। সেখানে তাঁহাকে প্রেমের মন্দিরে শুদ্ধাচারী ভক্ত রূপেই আমরা দেখিলাম। কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি হাওড়ায় বসবাস শুরু করেন তখন তাঁহার জীবনে প্রৌঢ়ত্বের ছায়া নামিয়াছে এবং ভদ্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তখনই তাঁহার লেখনী যৌনসম্পর্ক ও অনাবৃত প্রবৃত্তির ভোগচিত্রণে কিছুটা উদ্ধত ও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি কিরণময়ীর মধ্যে ক্ষুধিত কামনার অগ্নিময় কুণ্ড দেখাইলেন, দেহলালসায় জর্জর সুরেশের চরিত্র অঙ্কন করিলেন এবং বেপরোয়া ভোগপ্রবৃত্তির জয়গান করিলেন কমলের মুখ দিয়া। শরৎসাহিত্যের প্রথম দিকে প্রেমের আদর্শান্বিত রূপই দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পরিণত সাহিত্যে প্রেমের আদর্শ ও বাস্তবতার মিলন দেখি। সেখানে দেহ ও আত্মা উভয়ই সেই প্রেম আস্বাদ করিয়াছে, তবে পরিণত সাহিত্যপর্বেও—'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী', 'বিপ্রদাস', 'শেষের পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমের দেহাতীত লাবণ্য ও সৌরভই বড় হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে লিখিত উপন্যাসগুলি, অর্থাৎ 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব, 'বিপ্রদাস' ও 'শেষের

পরিচয়'-এর মধ্যে প্রেমের বাসনাকামনাহীন বেদনা ও বৈরাগ্যময় মূর্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শরৎসাহিত্যে যৌনসংযমের বিষয় লইয়া আলোচনা করিলাম। জীবনরস-সৃষ্টিতে তিনি শৈল্পিক সংযম কতখানি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহা এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের শিল্পরীতির আলোচনা করিতে যাইয়া The Craft of Fiction-এর মধ্যে লুবোক উপন্যাসের শিল্পরীতির যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতে হয়। লুবোক দুই প্রকার শিল্পরীতির কথা বলিয়াছেন, যথা, চিত্ররীতি (Pictorial method) ও নাট্যরীতি ( Dramatic method)। চিত্ররীতিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তিনি তাঁহাব ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি লেখার মধ্যে সঞ্চাব করিয়া দেন। কিন্তু নাট্যরীতিতে লেখক বিচ্ছিন্ন ও নৈর্ব্যক্তিক, তিনি কখনও লেখার মধ্যে প্রকাশমান নহেন। থ্যাকাবে চিত্ররীতিব লেখক, তিনি যেন পাঠকেব সঙ্গে গোপন আলাপচারী হইতেই ইচ্ছুক। কিন্তু মোপাসাঁ নাট্যরীতিই পছন্দ করেন, তিনি নিজেকে সব সময়ে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, শুধু কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্যই পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন কবিয়া চলেন, শরৎচন্দ্রেব মধ্যে এই দুই রীতিরই মিশ্রণ দেখিতে পাই। তাঁহার চিত্ররীতির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইল 'শ্রীকান্ত', আর নাট্যরীতির সেরা নিদর্শন হইল 'গৃহদাহ'। প্রথম দিককাব উপন্যাসে তিনি চিত্ররীতিই অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শেষ দিককার উপন্যাসে নাট্যরীতির প্রতি প্রবণতাই লক্ষ্য করা গিয়াছে। প্রথম পর্বে লেখা 'বড়দিদি', 'দেবদাস' ও 'শুভদা'র মধ্যে আমরা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চিত্রই যেন দেখিতে পাই। দ্বিতীয় পর্বে লেখা 'বিরাজ বৌ,' 'পল্লীসমাজ', 'পণ্ডিতমশাই', 'অরক্ষণীয়া' প্রভৃতির মধ্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতার স্পর্শ ও সহানুভূতির গাঢ় রঙ লাগিয়াছে। এগুলির মধ্যে তিনি তাঁহার নিজস্ব সমাজচিন্তা ও মতামত অনেকখানি ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতির মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রই নিজেদের প্রকাশ করিয়াছে। ঐ-সব উপন্যাসে অনেক সমস্যার অবতারণা হইয়াছে অনেক মতামত ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি অনিবার্য-ভাবে কাহিনী ও চরিত্র হইতে উৎসারিত হইয়াছে। 'পথের দাবী'তে বৈপ্লবিকতার উচ্ছ্বাসে কিছু আতিশয্য রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

ইহাতে চরিত্রের মধ্যে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ অনেকস্থানেই সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে। 'গৃহদাহ' 'চরিত্রহীন' 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে নিশ্চয়ই আমরা পাই, কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রে তিনি সতর্ক ও নিরপেক্ষ দূরত্বই বজায় রাখিয়াছেন। প্রথম দিককার চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের দ্বারাই আকর্ষিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু শেষ দিককার চরিত্রগুলি অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজস্ব প্রত্যয় লইয়া যেন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলি লেখকের স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শে এবং গাঢ় সহানুভূতির অনুরঞ্জনে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিল্পের বিচারে পরিণত পর্বের উপন্যাসগুলি কিছুটা তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়াও অনেক বেশি সার্থক হইতে পারিয়াছে। গোড়ার দিকের উপন্যাসগুলিতে যৌনসংযম বজায় রাখিলেও লেখক সহানুভূতির সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐসব উপন্যাসে তিনি সহানুভূতিকে চালনা করেন নাই, বরং সহানুভূতিই তাঁহাকে চালনা করিয়াছে। 'দেবদাস' উপন্যাসের শেষে লেখক মন্তব্য করিয়াছেন—'তোমরা যে-কেহ এ-কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মতো দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মতো এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও।' লেখকের এই প্রকাশ্য সহানুভূতি পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি প্রকাশের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। 'শুভদা' ও পরবর্তীকালে লিখিত 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে শুভদা ও বিরাজের প্রতি সহানুভূতির আতিশয্যের ফলেই ঐ উপন্যাস দুইটিতে দুঃখের অতিরঞ্জিত চিত্রই ফুটিয়াছে। 'পল্লীসমাজ' ও 'পণ্ডিতমশাই'-এর মধ্যে সমাজসম্পর্কে লেখকের চিন্তা ও মানসপ্রতিক্রিয়া অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে, কোথাও উষ্মা এবং কোথাও বা অনুকম্পা অতিশয়িত আকারেই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে লেখকের ব্যক্তিসত্তার স্পষ্টতম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে। সহানুভূতির আতিশয্য এবং টীকাটিপ্পনীর বহুলত্বের জন্য এ-উপন্যাস শ্রীকান্তের কাহিনী না হইয়া শরৎচন্দ্রের কাহিনী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলি পাঠকের কাছে অধিকতর জনপ্রিয়। লেখকের লেখার সঙ্গে আমরা যখন একাত্ম হইয়া পড়ি তখন লেখকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইতে ইচ্ছা হয়। চিত্রনীতির উপন্যাসে লেখকের বুদ্ধি ও আবেগমিশ্রিত সমগ্র ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠে। লেখা হইতে লেখকই তখন আমাদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়া উঠেন। শরৎচন্দ্র এ-উপন্যাসগুলিতে তাঁহার আবেগবান ব্যক্তিত্বই প্রধানত প্রতিফলিত করিয়াছেন এবং আবেগচালিত বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে তিনি সেজন্য সাগ্রহে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। যৌবন অতিক্রান্তির পর তিনি তাঁহার সহানুভূতিকে শিল্পের দাবি অনুযায়ী সংযত করিয়া আনিয়াছেন। নিজস্ব মন্তব্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া পাঠককেই স্বাধীন মত গঠনের সুযোগ দিয়াছেন। চরিত্রগুলি নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতিতে আচ্ছন্ন না করিয়া তাহাদের স্বাধীন বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনাময় পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাদের বৈচিত্র্য বাড়িল এবং ক্রিয়ার বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র প্রসারিত হইল এবং ইহার ফলে উপন্যাসের কলেবরও বিশাল হইয়া উঠিল। 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'পথের দাবী'—এক একখানি মহৎ উপন্যাসে ঝঞ্ঝামদরসমস্ত জীবনের বিপুল বিস্তার ও অপার রহস্যবেদনার চমৎকারী রূপই উদ্ঘাটিত হইল।

উপরে আলোচিত হইল যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে, বিশেষ করিয়া প্রথম দিকে লেখা উপন্যাসে নিজস্ব চিন্তা ও মন্তব্য অনেক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন। তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার চিন্তা ও মতবাদ অনুযায়ী উপন্যাসের পরিণতি দান করিতে চাহেন নাই। সেজন্য একমাত্র 'শেষ প্রশ্ন' ব্যতীত তাঁহার মতবাদ অনুযায়ী কাহিনী-পরিণতি ঘটে নাই। ঐ-উপন্যাসটি ব্যতীত তাঁহার আর কোনো উপন্যাস প্রচারধর্মী আখ্যাত হইতে পারে না। সাহিত্য তখনই প্রচারধর্মী হইয়া উঠে যখন সাহিত্য জটিল জীবনের একটি সুলভ সরলীকৃত রূপই দিতে চাহে। জীবনের সম্ভাবনা অনন্ত এবং তাহার রহস্যও অনধিগম্য। সেই জীবনকে লেখক যখন তাঁহার নিজস্ব ভাবনা ও ধারণা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিণতি দান করেন তখন তাহার আয়ু তিনি নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। পাঠকের উদ্বুদ্ধ মনে বিচিত্র সমাধানের পথ পাইবার জন্য যে জীবনসমস্যা উন্মুখ হইয়া আছে তিনি নিজেই তাহার সমাধান করিয়া পাঠকের সকল উৎসাহ ও আকর্ষণ নষ্ট করিয়া ফেলেন। শরৎচন্দ্র সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে একদিন বলিয়াছিলেন—'নভেলিস্ট শুধু সকলের সামনে ধরবেন —সমাজ বলো, ধর্মাচার বলো, নীতি বলো…এ সবের দোষত্রুটির জন্য মানুষ কতখানি ব্যথাবেদনা নিগ্রহ ভোগ করছে। তাই পড়ে যাঁরা সমাজ-

তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা চিন্তা করুন,…সে সব দোষত্রুটি কি ক'রে দূর ক'রে মানুষকে সুখী করা যায়। তার উপায় বা'লে দিন।'[১] তিনি আর এক জায়গায় বলিয়াছেন—'সমাজসংস্কারের কোনো দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক, তা ছাড়া আর কিছু নই।'[২]

উপরে শরৎচন্দ্র সমাজসমস্যা ও তাহার সমাধানের কথা স্পষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যেও সমস্যার উপস্থাপন আছে, কিন্তু সমাধান নাই। তিনি বিধবার সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বিধবার বিবাহ দিয়া সেই সমস্যার একটি সরল সমাধান দিতে চাহেন নাই। পতিতার সুগভীর বেদনা তিনি দেখাইলেন কিন্তু এই বেদনার প্রতিকার হইতে পারে কোন পথে তাহার কোনো ইঙ্গিত দেন নাই। বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু এই আসক্তির শাস্তি অথবা পুরস্কার কোনোটাই তিনি দিতে চাহেন নাই। সমাজের নিষ্ঠুর রূপ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজ সংশোধনের কোনো দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই। সেজন্য তাঁহার উপন্যাস শেষ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্যা সমস্যাই রহিয়া গেল। রমা ও রমেশ, সাবিত্রী ও সতীশ এবং রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসিয়া দেখিল দুস্তর লবণাক্ত সমুদ্র মাঝখান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। চন্দ্রমুখী ও বিজলী এই দুই বাসকসজ্জিকা নারী গলায় কলঙ্কের হার পরিয়া চির বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল। অচলা ও মহিম বোধ হয় ঘর ও বাহিরের প্রশ্ন শেষ মীমাংসা করিতে পারিল না। রমেশ ও বৃন্দাবন অন্ধকার পল্লী-সমাজে আলো জ্বালিবার বার বার চেষ্টা করিয়াও সফল হইতে পারিল না। এই দুইটি উপন্যাসে সংস্কারচেষ্টা অনেকটা বিড়ম্বিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সমাধানপ্রয়াসের ব্যর্থতা সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত। উভয়ের মধ্যেই পল্লীজীবনসমস্যা ব্যক্তিচরিত্রের উপর দুর্ভর ভার প্রক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাধানের পথটি দেখান নাই বলিয়াই পাঠকের বেদনার্ত চিত্ত নিরন্তর সেই সমাধানের কথা ভাবিয়াছে।

১। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃষ্ঠা ৯৯ ২। স্বদেশ ও সাহিত্য

দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্নে ঐ সমস্যা তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়াছে। উহা তাহাকে স্বস্তি দেয় নাই, শান্তি দেয় নাই। কখনও অশ্রুপ্লুত চোখে, কখনও বা রোষরক্তিম দৃষ্টিতে সমাজের দিকে তাকাইয়া পাঠক তাহার সমস্যা সমাধানের পথ সন্ধান করিয়াছে। সমস্যার দুর্বল সমাধান হইতে পারে দুইভাবে—আকস্মিক মিলন অথবা মৃত্যুর মধ্য দিয়া। আকস্মিক মিলন ঘটিয়াছে 'অনুপমার প্রেম' ও 'কাশীনাথে'। অন্তিমে মৃত্যুর কারুণ্যময় চমক সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'বিরাজ বৌ', 'শেষের পরিচয়' প্রভৃতি উপন্যাসে। মৃত্যুময় পরিণতি উপন্যাসে ঘটে এবং তাহাতে উপন্যাসের ট্র্যাজিক গুরুত্ব অনেক ক্ষেত্রে বর্ধিত হয় তাহা সত্য। কিন্তু বহুস্থানে লেখক সমস্যা হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে এবং পাঠকের চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের আশায় শিল্পের দিক দিয়া অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু ঘটাইয়া থাকেন। 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ীকে শেষ কালে পাগল করিয়া ফেলা ঐ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের একমাত্র কলঙ্ক বলা যাইতে পারে। 'শ্রীকান্ত', 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লী সমাজ', 'গৃহদাহ' 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসের পরিণতি অপূর্ব শিল্পকৌশলের পরিচায়ক। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের শেষে বিদায়ের দৃশ্য। অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা বহন কবিয়া প্রথম ও তৃতীয় পর্বে শ্রীকান্ত এবং চতুর্থ পর্বে কমললতা অজানা পথের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে। ভালোবাসার পরিণতি তো ইহাই! কেবল শূন্য হাতে বিদায় লওয়া। দীর্ঘ, অজানা পথে এই শূন্যতাই তো মানুষের একমাত্র সঙ্গী! 'পল্লীসমাজে'ও এই বিদায়ের দৃশ্য। রমা ও রমেশের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি, অনেক মান অভিমান, অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদায়ের কান্নাভেজা মুহূর্তে বুঝি উভয়ের মনে হইতেছে ওসব মিথ্যা, সত্য শুধু প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাদের অন্তরের গভীরে। তাহা শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইতে চায়, কিন্তু বাধা যে অনেক! কোনো কথাই তাই শেষ পর্যন্ত বলা হইল না। 'বামুনের মেয়ে'র শেষে মনে হয়, ক্রুদ্ধ ঝড় বুঝি একটি শান্ত নীড় ভাঙিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছে, নীড়হারা নিরীহ পাখিগুলি সেই ঝড়ের নিষ্ঠুর চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়া নিরুদ্দেশের পথে উড়িতে শুরু করিয়াছে। 'পথের দাবী'র পরিণতিতে সেই চিরনির্ভীক বিপ্লবী বীর উন্মত্ত দুর্যোগের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া অজানা সমুদ্রতীরের উদ্দেশ্যে চলা শুরু করিয়াছে। প্রেয়সী দ্বারে দাঁড়াইয়া চোখ মুদ্রিত করিয়াছে, ঝড়ের গর্জনে বিচ্ছেদের হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে,

কিন্তু শিল্পের যাত্রালগ্ন তো ইহারই মধ্যে ঘনাইয়া আসিয়াছে। 'পথের দাবী' উপন্যাসের মূল ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই ইহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। উপন্যাসের শেষে চমকপ্রদ পরিণতি না ঘটিলে মনে হইতে পারে যে, এই ধরনের পরিণতি উপন্যাসের আবেদন নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে। কিন্তু আসলে এই পরিণতি শিল্পের দিক দিয়া খুবই সার্থক। নাটকের ন্যায় উপন্যাসের পরিণতিও দুই রকম হইতে পারে। কোনো কোনো উপন্যাসে চরিত্রের যে বাহ্য ও মানস অবস্থায় কাহিনীর আরম্ভ হয় পরিণতিতে হয়তো তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। এই শ্রেণীর উপন্যাস হইল 'বিরাজ-বৌ' (আরম্ভ বিরাজ ও নীলাম্বরের গভীর ভালোবাসায় কিন্তু শেষ উভয়ের বিচ্ছেদ ও বিরাজের মৃত্যুতে), 'দেবদাস' (দেবদাস ও পার্বতীর মধুর অনুরাগে আরম্ভ কিন্তু পরিণতিতে উভয়ের বিষাদান্তক চিরবিচ্ছেদ), 'দেনাপাওনা' (জীবানন্দ ও ষোড়শীর সংঘাতে কাহিনীর সূচনা কিন্তু সমাপ্তিতে উভয়ের মিলন)। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে ফেলা যায় 'চন্দ্রনাথ' (আদি ও অন্তে চন্দ্রনাথ ও সরযূ মিলিত), 'বিন্দুর ছেলে' (গোড়ায় ও শেষে বিন্দুর কোলেই অমূল্য স্থান পাইয়াছে) 'রামের সুমতি' (বৌদির স্নেহাঞ্চল রামলালকে শুরু ও সমাপ্তিতে একই ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে), 'পল্লী সমাজ' (বিরহের অথৈ জলে রমা ও রমেশ শুধু সাঁতার কাটিয়াছে, পার পায় নাই), 'শ্রীকান্ত' (দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া')। মনে হইতে পারে, এই উপন্যাসগুলির মধ্যে বুঝি কোনো জটিলতা ও গতি নাই। কিন্তু আসলে তাহা নহে। নাটকের মতো উপন্যাসের মধ্যেও সংঘাত, উত্তেজনা ও অবস্থাবৈচিত্র্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসগুলিতে কাহিনীর মধ্যভাগে দাহ ও বিস্ফোরণ ঘটিয়া যায় এবং শেষে পুনরায় শান্ত অবস্থায় পরিণতি হয়। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের গতি সরল রেখায় ক্রমোচ্চ স্তরে—শান্ত অবস্থা থেকে অশান্ততম অবস্থায়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের গতি শান্ত হইতে অশান্ত অবস্থায় উঠিয়া শান্ত অবস্থায় অবতরণ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পরিণতি লইয়া আমরা আলোচনা করিলাম, এবার উপন্যাসের আরম্ভ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, —'আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর

করে।'[১] বড় শিল্পীর মুন্সীয়ানা প্রকাশ পায় এই আরম্ভের মধ্যে। শেকসপীয়ারের বৃত্তসূচনা সম্পর্কে ব্র্যাডলে বলিয়াছেন—Shakespeare's expositions are masterpieces' শরৎচন্দ্রের কাহিনী আরম্ভের রীতিও বিশেষ প্রশংসনীয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য শরৎচন্দ্র সোজা ও সরল ভাবে কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। যাহাদের লইয়া কাহিনী তাহাদের অবস্থা প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ণনা করিয়া তিনি ধীর লয়ে শুরু করিয়াছেন। 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসে নীলাম্বর, পীতাম্বর, বিরাজ প্রভৃতির পরিচয় দিয়া কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। 'দত্তা' উপন্যাসের শুরু করিয়াছেন একেবারে গোড়া হইতে। অর্থাৎ, জগদীশ, বনমালী ও রাসবিহারীর কিশোর অবস্থায় বন্ধুত্বের কথা বর্ণনা করিয়া লেখক অনেকগুলি বছর বাদ দিয়া আবার কাহিনীসূত্র ধরিয়া চলিয়াছেন। পঠভূমি ও সেই পটভূমির নায়কের বর্ণনায় 'দেনাপাওনা'র আরম্ভ। চণ্ডীগড় গ্রাম ও চণ্ডীমন্দিরের পরিচয় দিবার পর জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই উপন্যাসেও কাহিনী ধীর লয়ে আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটকীয় চমক লাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে কাহিনী শুরু হইয়াছে চলন্ত ঘটনার মধ্যভাগ হইতে। অর্থাৎ ঘটনা চলিতেছে, কথা চলিতেছে হঠাৎ লেখক যেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কাহাদের ব্যাপার ঘটিতেছে, কেন ও কোথায় ঘটিতেছে সেসব আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারি। এ ধরনের আরম্ভ নাটকীয় ও চমকপ্রদ। 'পল্লীসমাজ' এর আরম্ভ হইয়াছে এই কথাগুলিতে—'বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন—'এই যে মাসী, রমা, কইগা'।' কোনো ভূমিকা নাই, পরিচিতি নাই। লেখক দ্রুত গতিশীল কাহিনীর মধ্যে যেন হঠাৎ গিয়া পড়িয়াছেন। 'অরক্ষণীয়া'র শুরু হইয়াছে সংলাপে 'মেজমাসিমা, মা মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন—ধরো'। 'অরক্ষণীয়া'র কাহিনী বিলম্বিত লয়ে বলা একটানা দুঃখের কাহিনী। কিন্তু তাহার আরম্ভ নাটকীয় গতিশীলতায়। আরম্ভ ও মধ্যবর্তী অংশে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায় বিপ্রদাসেও। ঐ-উপন্যাসেও আরম্ভ সংঘাত ও উত্তেজনায়, কিন্তু তারপর কাহিনী চলিয়াছে শান্ত মন্থর গতিতে। কোন কোন উপন্যাসের আরম্ভ

১। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত ১৩২৬ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখের পত্র।

হইয়াছে লেখকের কোন সরস মন্তব্যে। হইাতে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকের মন লেখার মধ্যে আসক্ত হইয়া যায়। 'বড়দিদি'র আরম্ভ হইয়াছে এভাবে—'এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুন। দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে। আবার খপ কবিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে।' 'পরিণীতা'র আরম্ভও হইয়াছে লেখকের কৌতুককর মন্তব্যে—'শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যুষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌছিল, গৃহিণী এইবার নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।' কন্যা হওয়ার আনন্দ-সংবাদে গুরুচরণের করুণ প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া লেখক এমন অসঙ্গতি-জনিত কৌতুক রস সৃষ্টি করিলেন যে এক মুহূর্তেই গুরুচরণের চিত্রটি পাঠকেব মনে গাঁথিয়া গেল।

শরৎচন্দ্র তাঁহার ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন—'প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই। তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে, মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই, আসল জিনিস, কতকগুলি চরিত্র—তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়। সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।' শরৎচন্দ্রের কথাগুলি বিচার করিতে গেলেই প্লট ও চরিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়। শরৎচন্দ্রের কথা হইতেই মনে হয়, তিনি বুঝি চরিত্রের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আধুনিক কালে চরিত্রের মানসজটিলতা ও দ্বন্দ্বময়তার জন্য স্বভাবতই উপন্যাসে চরিত্রের গুরুত্ব আসিয়া গিয়াছে। এখনকার উপন্যাসে সুগঠিত বাহ্যঘটনা খুবই কমিয়া আসিয়াছে। জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ প্রভৃতির উপন্যাসে ঘটনার স্থান খুবই কম, ঐ সব উপন্যাসে অবচেতন মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরবিশ্লেষণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ কাহিনীরূপের প্রতি বর্তমান নাটক ও উপন্যাসে একটি প্রতিবাদ যেন ব্যাপক আকারে দেখা গিয়াছে। সুবিন্যস্ত কাহিনীর মধ্যে জীবনের একটা অর্থপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপই প্রকাশ পায়। কিন্তু জীবনের অর্থ ও সামঞ্জস্যের বিরুদ্ধেই তো আধুনিক অনেক লেখকের

বিদ্রোহ। নাটকের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ 'অ্যাবসার্ড' নাটকের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এই বিদ্রোহ স্পষ্ট। সেজন্য প্লটের ধরাবাঁধা নিয়মকানুন বর্তমান সাহিত্যে খুবই শিথিল হইয়া গিয়াছে।

সুগঠিত প্লটের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যের এই বিদ্রোহ সত্ত্বেও শিল্পরসোত্তীর্ণ সাহিত্যে প্লটের গুরুত্ব কখনও অস্বীকার করা চলে না। প্লটের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থনকারী হইলেন স্বয়ং অ্যারিস্টটল। তিনি স্পষ্টই বলিলেন—'So that it is the action in it, i.e. its fable or Plot, that is the end and purpose of the tragedy, and the end is everywhere the chief thing.' তাঁহার মতে চরিত্র ছাড়া নাটক হওয়া সম্ভব, কিন্তু প্লট ছাড়া নাটক হইতে পারে না। অ্যারিস্টটলের উক্তি লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু নাটক ও উপন্যাসের শিল্পকৃতিত্বে প্লটের মূল্য কখনও অস্বীকার করা চলে না। শরৎচন্দ্র যে বলিয়াছেন—'তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে'—তাহা ঠিক মানা যায় না। প্লট কখনও আপনি আসিয়া পড়ে না, ইহা লেখকের সুস্পষ্ট চিন্তা, পরিকল্পনা এবং বিন্যাসকুশলতা হইতেই উদ্ভূত হয়। প্লট তো শুধুমাত্র কাহিনী নয়, কাহিনীবিন্যাসের একটি বিশেষ শিল্পসম্মত কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যেই চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও একটি বিশেষ শিল্প-পরিণতির দিকে সকলের সম্মিলিত গতি বোঝায়। চরিত্র যতই সু-অঙ্কিত হউক না কেন, স্বতন্ত্রভাবে তাহার কোনো মূল্যই নাই। চরিত্রগুলি যখন পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং একটি বিবর্তনশীল ঘটনাকে আশ্রয় করে তখনই তাহাদের বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইতে পারে। ঘটনা ও অন্য চরিত্রের সংঘাতেই চরিত্রের বাহ্য ও আন্তর বৃত্তি ও বাসনাগুলি সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই ঘটনা ও অন্য চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার কৌশলই প্রকাশ পায় প্লট অথবা বৃত্তগঠনের মধ্যে। লেখক কখনও অনুকূল অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতি রচনা করেন। কখনও সরূপ অথবা বিরূপ চরিত্র উপস্থাপন করেন; কখনও বর্ণনা এবং কখনও বা সংলাপ প্রয়োগ—এইগুলি লইয়া বৃত্তগঠনকৌশল গড়িয়া উঠে। এই কৌশলের মধ্যেই দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখা হয়—ঐক্য ও গতি। ঐক্যবদ্ধ ও গতিশীল ঘটনাশ্রিত চরিত্রই পাঠকচিত্তে আবেদন জাগাইতে পারে। অ্যারিস্টটল এই ঐক্য ও গতি লইয়াই সম্ভবত সেকালেও এত বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্লটের আরম্ভ

বিকাশ ও পরিণতির কথা বলার অর্থই হইল ঘটনার গতি ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া। সুগঠিত প্লটের ফলে উপন্যাস কিরকম শিল্পরসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইল Madame Bovary উপন্যাস। অবশ্য প্লটগঠনের ত্রুটি থাকিলেও বড় উপন্যাস হইতে পারে, যেমন টলস্টয়ের War and Peace। তবে টলস্টয়ের প্রতিভাই এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমন্বিত উপন্যাসকে একটি মহৎ উপন্যাসে পরিণত করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র কতকগুলি চরিত্রাশ্রয়ী উপন্যাস লিখিয়াছেন, সেগুলিতে বৃত্তগঠন অপেক্ষা চরিত্রসৃষ্টি প্রাধান্য পাইয়াছে, যথা—'বড়দিদি', 'বিরাজ-বৌ' 'পণ্ডিত মশাই', 'চন্দ্রনাথ', 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'বিপ্রদাস' ও বিশেষভাবে 'শ্রীকান্ত'। এডউইন মুইর The Structure of the Novel নামক সমালোচনা-গ্রন্থে এই ধরনের উপন্যাসকে বলিয়াছেন 'Novel of character'। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিলেও অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সেই প্রধান চরিত্রের সংঘাত এবং বিভিন্ন ঘটনা পরিবেশে তাহার বিকাশ দেখানো হইয়াছে, সেজন্য গঠনকৌশলের নিপুণতা এই সব উপন্যাসেও লক্ষণীয়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিতে ঘটনার বিক্ষিপ্ততা এবং শিথিল বিন্যাস সর্বাপেক্ষা বেশি দৃষ্টিগোচর হইবে, কিন্তু ইহার কাহিনী মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে এলোমেলো ঘটনারাশির মধ্যেও লেখকের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং সেই পরিকল্পনার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ঐক্য রহিয়াছে। 'পরিণীতা', 'পল্লীসমাজ', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন,' 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাসে বৃত্তগঠনের কুশলতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 'পরিণীতা', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা' প্রভৃতি মধুরাত্মক উপন্যাসের উপভোগ্যতা আসিয়াছে বৃত্তগঠনের চতুর ও চারু কৌশল হইতে। 'চরিত্রহীন' 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাসে গভীর ও জটিল চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে গঠনভঙ্গির সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত রূপের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

উপন্যাসের মধ্যে বর্ণনার সঙ্গে সংলাপের যোগ সাধন করিতে হয়। Aspects of the Novel-এ ফরস্টার বলিয়াছেন—'The speciality of the novel is that the writer can talk about his characters as well as through them or can arrange for us to listen when they talk to themselves,' শরৎচন্দ্রও বর্ণনা ও সংলাপের সমান গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

একখানি পত্রে বলিয়াছেন—'গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চৌদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না সেই খানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয় না।' বর্ণনা-অংশকে বলা যায় পরোক্ষ রচনারীতি এবং সংলাপ-অংশকে বলা যায় প্রত্যক্ষ রচনারীতি। প্রত্যক্ষ রচনারীতিতে কাহিনী অনেক বেশি বাস্তব, জীবন্ত ও নিকটবর্তী মনে হয়। পাঠক লেখক অপেক্ষা লেখকের বর্ণিত জগতের প্রতিই অধিকতর আগ্রহশীল। সংলাপের মধ্যে চরিত্রগুলি নিজস্ব কথার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কথা তো শুধুমাত্র কথা নহে, কথার মধ্য দিয়া একটি চরিত্রের চিন্তা ও অনুভূতি ব্যক্ত হইয়া পড়ে। নাটক শুধুমাত্র সংলাপনির্ভর বলিয়া নাটকের আবেদন এত প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক। কিন্তু নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের বেশি সুবিধা এইখানে যে, উপন্যাসে স্থান-কাল-পরিবেশের সঙ্গে লেখক পাঠকের পরিচয় ঘটাইয়া দিতে পারেন। আধুনিক নাটকে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশের মধ্য দিয়া এই ঔপন্যাসিক রীতি পালন করা হয়, অভিনয়ে দৃশ্যপট ও আলোকসম্পাত প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। উপন্যাসের আর একটি সুবিধা এই যে, কথোপকথনের মধ্যে মাঝে মাঝে লেখক বক্তার মানসিক অবস্থা ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করিবার সুযোগ পান। ইহার ফলে উপন্যাসে চরিত্রের পূর্ণতর ও ব্যাপকতর পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়।

শরৎচন্দ্র বর্ণনা অপেক্ষা সংলাপের উপর জোর দিয়াছেন বেশি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তাঁহার আত্মভাষণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া এই উপন্যাসে সংলাপ-অংশ অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অন্যান্য গল্প- উপন্যাসে সংলাপেরই প্রাধান্য। সাধারণত তিনি পরিচ্ছেদের গোড়ার ঘটনা পরিবেশ এবং চরিত্রের আকৃতি প্রকৃতি ও বিশেষ 'মেজাজ বুঝাইবার জন্যই কিছুটা বর্ণনা দেন, কিন্তু তারপরেই চরিত্রগুলি নিজস্ব কথার মধ্য দিয়াই তাহাদের চরিত্র উদ্ঘাটন করে। মাঝে মাঝে লেখক নিজের টীকা-টিপ্পনী ও সরস মন্তব্য করিয়া ঔপন্যাসিক রীতি বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থানেই নাটকীয় রীতিতে নিছক উক্তিপ্রত্যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। নাটকীয় সংলাপ রচনায় শরৎচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্ব অনেক জায়গাতেই পরিস্ফুট। শুধু কেবল শাণিত ও আবেগগর্ভ সংলাপ নহে, নাটকীয় বেগ ও উত্তেজনাজনক পরিস্থিতি

রচনাতেও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। 'চরিত্রহীন' হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—

'সতীশ কিন্তু থামিতে পারিল না, বলিল, শিকারী বঁড়শীতে মাছ গেঁথে খেলিয়ে যেমন ক'রে আমোদ করে, এতদিন আমাকে নিয়ে বোধ করি তুমি সেই তামাসাই করছিলে,—না?

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না। তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বঁড়শীতে গেঁথে তোমাকে টেনেই তোলা যায়—খেলিয়ে তোলবার মতো বড় মাছ তুমি নও।

সতীশ নির্মমভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—নই আমি?

সাবিত্রী কহিল—না নও তুমি। তাহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সতীশের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল—অসচ্চরিত্র! আমার মতো একটা স্ত্রীলোককে ভালোবেসে ভালোবাসার বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? যাও তুমি—আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যে অপমান কোরো না।

এই অপমানে সতীশ আরো নির্দয় হইয়া উঠিল। এবার অমার্জনীয় কুৎসিত বিদ্রূপ করিয়া বলিল—আমি অসচ্চরিত্র কিন্তু সে যাই হোক সাবিত্রী, তোমার নামটা কিন্তু তোমার বাপ মা সার্থক দিয়েছিলেন।

সাবিত্রী সরিয়া গিয়া চৌকাঠ ধরিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল—যাও! তাহার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সতীশ অপমান ও ক্রোধের অসহ্য জ্বালায় সেদিক ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া বলিল—কিন্তু যাবার আগে আর একবার আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে না। কিংবা আর কোন খেলা—আর কিছু—হঠাৎ দু'জনের চোখাচোখি হইল। সাবিত্রী এক পা কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—তুমি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর,—তুমি যাও! তুমি যাও! তোমার পায়ে পড়ি তুমি যাও। না যাও ত মাথা খুঁড়ে মরব—তুমি যাও।'

উপরের অংশে নাট্য-উত্তেজনা বাড়িতে বাড়িতে একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে ফাটিয়া পড়িয়াছে। শ্লেষাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তি অসহ্য ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। 'তুমি যাও'—দুই দুইটি কথায় বার বার ব্যবহারের মধ্যে সাবিত্রীর অপমানিত অন্তরের অদম্য অভিমান অস্বাভাবিক তীব্রতা লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ঘটনা ও চরিত্রের আকস্মিক বৈপরীত্য ঘটাইয়া চমকপ্রদ

নাট্যরস- সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র বিশেষ নিপুণ। উপরের অংশে সতীশ ও সাবিত্রীর তীব্র সংঘাতের পূর্বেই উভয়েই অন্তরঙ্গ কথাবার্তার মধ্য দিয়া পরস্পরের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ নিষ্ঠুর আঘাতে লেখক যেন উভয়ের স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া দিলেন। দেবদাস পার্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্বতীকে বলিল—'আমি এসেছি'। তখন কিন্তু দুর্জয় অভিমানবশত পার্বতী তাহার প্রতি বাহ্য বিরূপতা দেখাইয়া তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। পার্বতীর শ্লেষাত্মক বাক্যবাণে ক্ষিপ্ত হইয়া দেবদাস তাহাকে ছিপের বাঁট দিয়া সজোরে আঘাত করিল। পার্বতীর সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল। কিন্তু ইহার ফলে তাহাদের অদ্ভুত মানসপ্রতিক্রিয়া দেখা দিল—কাঠিন্যের কৃত্রিম আবরণ সরিয়া গেল এবং প্রেমের ভোগবতীধারা ফোয়ারার শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—

পার্বতী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, দেবদাদা গো—

দেবদাস ফিরিয়া আসিল। চোখের কোণে এক ফোঁটা জল।

বড় স্নেহজড়িত কণ্ঠে কহিল—কেন রে পারু?

কাউকে যেন বোলো না!

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর প্রতি তীব্র ঘৃণা অন্তরে জাগাইয়া রাখিয়া ষোড়শী তাহার কাছারীবাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে নরপশু জমিদারটির পরিবেশ ও ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিত হইয়াছে। কিন্তু মরণাহত লোকটির কাতর অসহায়তা ষোড়শীর চিত্তে অনুকম্পা উদ্রেক করিয়াছে এবং তারপর কথোপকথন স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়া এই হৃদয়হীন ভয়ঙ্কর লোকটির প্রতি অনুকম্পারও বেশি এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির স্পর্শ বোধ করিয়াছে যে সে অম্লান বদনে বলিল—নিজের ইচ্ছায় সে আসিয়াছে। ষোড়শীর হৃদয়ে এক রাত্রের মধ্যেই ঘৃণা, অনুকম্পা ও আকর্ষণ পর পর আসিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে মানসপরিস্থিতি ছিল, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া গেল। মানুষের বিপরীতধর্মী বাসনা ও প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয়রঙ্গমঞ্চে নিয়ত যে নাট্যলীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে শরৎচন্দ্র তাহা তাঁহার সাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেখানে পিয়ারী বাইজী ও বঙ্কুর মা রাজলক্ষ্মীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, রমা যাহার সঙ্গে চরম শত্রুতা করিয়াছে তাহার ধ্যানমূর্তি হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া নিত্য অশ্রুজল দিয়া অভিষেক করিয়াছে,

ষোড়শী যাহার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে অলকা তাঁহারই জন্ম স্বপ্নবাসর রচনা করিয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কিরণময়ী প্রেমের অমৃত আস্বাদ করিয়াছে, তাহাকেই বিষাক্ত দংশনে জর্জরিত করিয়াছে, অচলা যাহাকে ভালোবাসিতে চাহিয়াছে, তাহার সঙ্গে ঘর করিতে পারে নাই এবং যাহার সহিত ঘর করিতে চাহে নাই তাহাকেই ভালোবাসিয়াছে। এই নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও নিরতিশয় দুঃখের নাটকই শরৎসাহিত্যে দেখিতে পাই।

শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে রচিত প্রাথমিক সাহিত্যপর্বকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম ভাগের লেখাগুলি ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় ভাগের লেখাগুলির রচনাকাল ১৯০০—১৯০১ খৃস্টাব্দ। 'বোঝা', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম'- প্রভৃতি গল্প প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত গল্প-উপন্যাসগুলি হইল 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' ও 'শুভদা' (অসমাপ্ত) প্রভৃতি। প্রাথমিক গল্পগুলি রচনার সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল খুবই অপরিণত (২০—২৪) এবং তখন মৌলিক উদ্ভাবনীশক্তি ও নিজস্ব রচনারীতি কিছুই তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। অনুকরণের পথেই তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেই অনুকরণ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসই তাঁহার আদর্শ ছিল, দীর্ঘ ও জটিল উপন্যাস রচনার শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। গল্পের আয়তনের মধ্যে উপন্যাসের কাহিনী অবতারণার ফলে, সেই কাহিনীর যথাযোগ্য বিশ্লেষণ হয় নাই এবং কোন চরিত্রই সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই। প্রাথমিক পর্বের দ্বিতীয় ভাগের রচনাগুলির মধ্যেও কাহিনী বিন্যাসের অনেক দুর্বলতা রহিয়াছে। রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ ঘটনা, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্রের অভাব প্রভৃতি ত্রুটি এই রচনাগুলির মধ্যেও দেখা যায়। তবে ইহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মৌলিক উদ্ভাবনী-প্রতিভা, তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। এই রচনাগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হইল 'দেবদাস'। 'দেবদাসে'র মধ্যে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির আতিশয্য ও ভাবাবেগের প্রাবল্য রহিয়াছে বটে; কিন্তু গঠনভঙ্গি নাট্যরীতিপ্রয়োগ ও চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া এই উপন্যাসটি তাঁহার পরবর্তী পরিণত উপন্যাসগুলির সঙ্গে তুলনীয়। 'শুভদা' 'দেবদাসে'র পরবর্তী উপন্যাস, কিন্তু রচনাশিল্পের বিচারে অনেক নিকৃষ্টতর রচনা।

'বোঝা' গল্পটি মাত্র নয়টি ছোট ছোট পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অথচ এই

নয়টি পরিচ্ছেদের মধ্যে লেখক বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন এবং চরিত্রের নানা পরিবর্তনও দেখান হইয়াছে। ফলে ঘটনাগুলি অবিশ্বাস্য এবং চরিত্রের পরিবর্তন অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সত্যেন্দ্রর সঙ্গে সরলার বিবাহ, আবার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই সরলার মৃত্যু। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সরলার জন্য শোকোচ্ছ্বাস এবং পুনরায় বিবাহের আয়োজন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে নলিনীর সঙ্গে পুনর্বিবাহ এবং সপ্তম পরিচ্ছেদের মধ্যেই বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি। অষ্টম পরিচ্ছেদে সত্যেন্দ্রর তৃতীয় বিবাহ এবং নবম পরিচ্ছেদে নলিনীর মৃত্যু। এতগুলি বিবাহ ও মৃত্যু ঘটিবার ফলে বিবাহের আনন্দ ও মৃত্যুর বেদনা মনে সাড়া জাগায় না। শুধু কাহিনী পরিকল্পনায় যে বঙ্কিম-প্রভাব রহিয়াছে তাহা নহে, রচনারীতির মধ্যে এই প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের ন্যায় এই গল্পটির প্রত্যেক পরিচ্ছেদের নামকরণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তাঁহার লেখার মধ্যে আরোপ করিয়া কোথাও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন আবার কোথাও বা পাঠকের সঙ্গে আলাপচারী হইয়াছেন। এই দুই রীতিই আলোচ্য গল্পে দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া লেখক তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথ। তুমি একা নও। অনেকের কপাল তোমারই মত অল্পবয়সে পুড়িয়া যায়। সকলেই কি তোমার মত পাগল হয়? সাবধান সত্য। সকলেরই একটা সীমা আছে।' আবার কল্পিত পাঠকসমাজকে সম্বোধন করিয়া একজায়গায় বলিয়াছেন, 'তোমরা যুবা, সমস্ত সংসারটাই তোমাদের সুখের নিকেতন', কিন্তু বল দেখি, তোমাদের কাহারও কি এমন একটা সময় আসে নাই— যখন প্রাণটা বাস্তবিকই ভারবোধ হইয়াছে? যখন জীবনের প্রত্যেক গ্রন্থিগুলি শ্লথ হইয়া ক্লান্তভাবে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে? না করিয়া থাকে একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দেখ।'

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শরৎচন্দ্রও তাঁহার প্রথম দিককার লেখাগুলি মোটেই পছন্দ করিতেন না। 'কাশীনাথ' যখন 'সাহিত্য' পত্রিকায়-প্রকাশিত হইয়াছিল তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ও-গল্প কখোনো যদি বইয়ের আকারে বেরোয়, নিশ্চয় পরিবর্তন করতে হবে।'[১] সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও লিখিয়াছেন,

১। ভারতবর্ষ, ১৩৪৪, চৈত্র

'কাশীনাথ যখন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত গল্পের খোল- নলচে সব তিনি বদলিযে দিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে ( ১৯১৭, ১লা সেপ্টেম্বর ) কাশীনাথ যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল তখন কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিল বটে, তবে খুব গুরুতর পরিবর্তন কিছু ঘটিল না। 'সাহিত্যে' মুদ্রিত রচনার সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মোটামুটি মিল রহিয়াছে, পরিবর্তন যাহা কিছু ঘটিয়াছে শেষ অথবা দশম পরিচ্ছেদে। 'সাহিত্যে' কাশীনাথ খুন হইয়াছিল এবং কমলা করিয়াছিল আত্মহত্যা। সেখানে কমলা তাহার সকল সম্পত্তি বিন্দুর স্বামী যোগেশের নামে দান করিল এবং বিন্দুর নামে একখানি চিঠি লিখিয়া আত্মহত্যা করিল। চিঠিতে লেখা ছিল, 'বিন্দু শুনিয়াছি, আত্মহত্যা করিলে নরকে যায়, তাই আত্মহত্যা করিয়া দেখিতেছি, যদি নরকে যাই।' অল্প বয়সে রোমাঞ্চকর ও চমৎকারী ঘটনার দিকে একটা প্রবণতা থাকে, সেইজন্যই সম্ভবত শরৎচন্দ্র প্রথম রচনার সময় কাশীনাথ ও কমলার মৃত্যু পর পর ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর পরে তাঁহার পরিণত শিল্পমনের কাছে এই ধরনের স্থূল ও সস্তা উত্তেজনাজনক ঘটনা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল বলিয়াই এগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

প্রথম যৌবনে রচিত বইয়ের মধ্যে তরল ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্য যেখানে যেখানে দেখা গিয়াছিল প্রকাশিত গ্রন্থে সে-সব অংশও কিছু কিছু বর্জিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 'সাহিত্যে' মুদ্রিত গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—'যাইবার সময় আশীর্বাদ করিয়া যাইতেছি। চাহিয়া চাহিয়া কাশীনাথ কমলার ম্লান অধর চুম্বন করিল, নিদ্রিতা কমলা সে চুম্বনে শিহরিয়া উঠিল।'

এই হাস্যকর তরল আবেগোচ্ছ্বাস প্রকাশিত গ্রন্থে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সেখানে নিম্নলিখিত রচনাংশ স্থান পাইয়াছে—

'কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া কাশীনাথ আবার ডাকিল, কমলা! কোন উত্তর নাই। যাবার সময় আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।'

এডউইন মুইর যাহাকে বলিয়াছেন 'Novel of character' কাশীনাথ

১। শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য, পৃঃ ১২০

সেরূপ চরিত্রাশ্রয়ী উপন্যাস। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রধান চরিত্র কাশীনাথের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা। জানা গেল সে ধর্মনিষ্ঠ, অধ্যয়নশীল ও বন্ধনমুক্ত উদাসীন প্রকৃতির যুবক। এই বন্ধনমুক্ত উদাসীন স্বভাবের জন্য শ্বশুরবাড়িতে সংঘাত ও জটিলতার সৃষ্টি হইল। তাহার পলায়নপ্রত্যাশী মন শ্বশুর বাড়ির বিলাস ও আরামেব কারাগারে হাঁফাইয়া উঠিল। এই বাঁধনের মধ্যে থাকিবার ফলেই বোধ হয় সে কমলাকে ভালোবাসিতে পারিল না। তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে বিন্দুর প্রতি তাহার যে স্নেহের অভিব্যক্তি দেখা গেল তাহা কিছুটা আকস্মিক মনে হইলেও উপন্যাসের মধ্যে তাহা আরও জটিলতা সৃষ্টি করিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে কাশীনাথ ও কমলার মধ্যে যে ব্যবধান দেখা গিয়াছিল পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাহা যেন দুরীভূত হইয়া গেল, দুইজন দুইজনের গলা জডাইযা ধরিযা অনেক সুখাশ্রুপাত কবিল। মনে হইল বুঝি সব সমাধান হইয়া গেল। কিন্তু ষষ্ঠপরিচ্ছেদ হইতে আবার নতুন জটিলতার সূচনা। কমলা তাহার পিতার সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখাইয়া লইল। কমলা এই সম্পত্তিলিপ্সার কৈফিয়ত দিয়া বলিয়াছে, সম্পত্তি তাহার হইলে স্বামী তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে। কিন্তু সম্পত্তিলাভের পর স্বামী অপেক্ষা সম্পত্তিই তাহার প্রিয়তর হইয়া উঠিল। ইহাও কমলাচরিত্রের এক নতুন ও আকস্মিক পরিণতি। স্ত্রীর অন্নপালিত কাশীনাথ স্ত্রীর সম্পত্তির আয় হইতে বার বার টাকা লইয়া ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সাহায্যে ব্যয় করিল ইহাও কাশীনাথের মত উদাসীন ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় লোকের পক্ষে বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক। নিরীহ ও ক্ষমাশীল কাশীনাথের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনাও অকারণ ও রোমাঞ্চকর। কাশীনাথ ও কমলার পুনর্মিলনও এই গল্পের সস্তা ভাবাবেগপূর্ণ সুখদায়ক পরিণতি ঘটাইয়াছে। চরিত্রের স্বাভাবিক বিবর্তন ও পরিণতি ঘটনার সুশৃঙ্খল পারম্পর্য এবং অন্তর্জীবনের রহস্য-উদ্‌ঘাটন কিছুই এই গল্পে পাওয়া যায় না। তবে শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বহু উপন্যাসে যে নাটকীয় সংলাপপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তাহার সূচনা এই গল্পে পরিস্ফুট। সেদিক দিয়া তাঁহার নিজস্ব রচনারীতির কিছু বৈশিষ্ট্য এই গল্পে পাওয়া যায়।

'অনুপমার প্রেমে'র মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। মাত্র ছয়টি পরিচ্ছেদের মধ্যে একটি উপন্যাসের কাহিনী আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে নানা চমকপ্রদ ঘটনা সূত্রাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং চরিত্রগুলিকে

পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয় নাই। বঙ্কিমরীতিতে এখানেও পরিচ্ছেদের নামকরণ দেখা গিয়াছে। তবে এই গল্পে শরৎচন্দ্রের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম পরিচয় যে পাওয়া গেল শুধু তাহা নহে, চরিত্রায়ণ ও রচনারীতির মধ্যেও তাঁহার নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। প্রথম দিককার রচনায় শরৎচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে অনেকস্থলেই আত্মজীবন প্রতিফলিত করিয়াছেন। এই গল্পটির মধ্যেও মদ্যপায়ী, উচ্ছৃঙ্খল ও বিধবা নারীর প্রতি আসক্তচিত্ত ললিতমোহনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের আত্মরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব ভাষার সহজ মাধুর্য এই গল্পটিতেই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহার পরবর্তী পরিণত রচনায় কারুণ্যের সঙ্গে কৌতুকের যেরূপ স্নিগ্ধ মিলন দেখা যায় তাহার আভাসও এই গল্পটিতে পরিস্ফুট।

প্রথম পর্বের দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হইল 'বড়দিদি' গল্পটির মধ্য দিয়া। শরৎচন্দ্রের রচনারীতি ও চরিত্রসৃষ্টির সার্থক নিদর্শন ইহাতেই প্রথম লক্ষিত হইল। ভাষার স্নিগ্ধ, সংযত ও করুণ মাধুর্য যাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে 'অনুপমার প্রেমে' তাহারই পরিণত রূপ পাইলাম এই গল্পটিতে। সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র সংলাপের মধ্য দিয়া নাট্যরস সৃষ্টির সক্ষম চেষ্টাও এখানে পরিলক্ষিত। মাধবী শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট নারীচরিত্রগুলির প্রথম প্রতিনিধি। অন্তর্মুখীনতা, সচেতন সমাজবোধের সঙ্গে অবচেতন হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ পাইল। কিন্তু অপরিণত লেখায় চরিত্র-সৃষ্টির ত্রুটিও রহিয়াছে। মাধবীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের ঘনীভূত সম্পর্ক লেখক দেখান নাই। সেজন্য মাধবীর জন্য তাহার শেষকালে অতখানি প্রচণ্ড ব্যগ্রতা কিছুটা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হইয়াছে। মাধবীর প্রতি তাহার হৃদয়ভাবও ঠিক যেন প্রণয়ীর অনুরাগ নহে, তাহা যেন স্নেহশীলা জননী অথবা ভগিনীর প্রতি অসহায় বালকের ব্যাকুল নির্ভরতা। বোধ হয় প্রাথমিক ভীরুতার জন্যই শরৎচন্দ্র বিধবা নারীর সঙ্গে অপর একজন পুরুষের নিঃসঙ্কোচ প্রণয়চিত্র অঙ্কন করিতে পারেন নাই। মাধবীর মানস বিশ্লেষণের জন্য লেখককে মনোরমা চরিত্রটির অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহার গোপন হৃদয়ের নিভৃতচারী ভাব মনোরমার কাছে লিখিত পত্রগুলির মধ্য দিয়াই কিছুটা আভাসিত হইয়াছে। এই গল্পটি লিখিবার সময়েও শরৎচন্দ্র রোমাঞ্চকর ঘটনা সৃষ্টির মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সেজন্য

সুরেন্দ্রনাথ গাড়ি চাপা পড়িয়াছে, এলোকেশী-বৃত্তান্ত হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। রোমান্সের নায়কের ন্যায় এই গল্পের নায়কও বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে এবং শেষকালে চমকপ্রদ মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

চমকপ্রদ ঘটনার আতিশয্য পরবর্তী বড়গল্প 'চন্দ্রনাথে'র মধ্যে কমিয়াছে। কিন্তু এখানেও কাহিনীর স্তরগুলি সুসঙ্গত ও যুক্তিসম্মত হয় নাই। মণিশঙ্করের চিত্তপরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষিত হয় নাই। চন্দ্রনাথ নিরপরাধা সরযুকে ত্যাগ করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু শেষকালে পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিল কেন? তাহার সংস্কারবর্জনের কোন ঘটনাই তো গল্পটির মধ্যে ঘটে নাই। গল্পটির মধ্যে কোন অনিবার্য সমস্যা ও সঙ্কট লেখক সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তবে লেখক পরবর্তী বহু গল্প-উপন্যাসে দূরসম্পর্কীয়া কোন প্রতিকূল আত্মীয়ার দ্বারা যেমন কাহিনীর মধ্যে বাধা ও জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছেন এই গল্পে সেই ধরনের বাধা ও জটিলতার সূচনা হইয়াছে মাতুলানী হরকালী চরিত্রের দ্বারা। চন্দ্রনাথ ও সরযুর মধ্যে বিভেদ ঘটিল প্রধানত তাহারই বিষাক্ত ষড়যন্ত্রে। তবে এই ধরনের শক্তি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। হরকালীরও পরাজয় ঘটিয়াছিল। চরিত্রসৃষ্টিতে, বিশেষত টাইপ চরিত্রসৃষ্টিতেও শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্য এই গল্প হইতে দেখা যায়। সংসারবন্ধনমুক্ত, স্নেহশীল ও মনুষ্যত্বের আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠ কৈলাসের কারুণ্যসিক্ত চরিত্রটি শরৎসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় চরিত্র।

ভাগলপুর পর্বে লিখিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দেবদাস'। এই উপন্যাসেই বিষয় নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা-উপস্থাপনা কৌশল ও রচনারীতির দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের স্বাধীন ও নিজস্ব শক্তির পূর্ণপ্রকাশ ঘটিল। দেবদাস চরিত্র কেন্দ্রিক উপন্যাস এবং পূর্বে লিখিত 'কাশীনাথ' ও 'চন্দ্রনাথের' নায়ক চরিত্র অপেক্ষা এই উপন্যাসের নায়কচরিত্র অনেক বেশি পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং ক্রিয়াও আবেগের সজীব স্পর্শে উজ্জ্বল। প্রথম হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত দেবদাসের কৈশোর ও যৌবনের চপল ও অনুরাগরঙীন জীবন বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশে দেবদাস ও পার্বতীর জীবন একবৃন্তে বিকশিত দুইটি পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইয়াছে। উহাদের কৈশোরলীলা যেমন ছেলেমানুষী ক্রিয়াকলাপে কৌতুকোচ্ছল, তেমনি বিচ্ছেদের মুহূর্তে উহাদের উদ্ধত যৌবন দুর্দম আবেগের উষ্ণ উত্তেজনায় বিবেচনাহীন ও বেপরোয়া। পার্বতীর বিবাহ

পর্যন্ত দেবদাস দুর্দান্ত হইলেও দুর্বিবেচক নহে। স্বাভাবিক জীবনধারা হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। পার্বতী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেলে দেবদাসের কাছে পার্বতী আর রহিল না। রহিল তাহার জ্বালাময় স্মৃতি। সেই স্মৃতির দাহে দেবদাসের পতন ও অবক্ষয় শুরু হইল নবম পরিচ্ছেদ হইতে। সুস্থ ও স্বাভাবিক দেবদাসের জীবনে পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোর মতন বিদ্যমান ছিল পার্বতী আর পতিত ও অবক্ষয়িত দেবদাসের জীবনে দূর নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তির ন্যায় আসিল চন্দ্রমুখী। তখনও দেবদাস পার্বতীর স্মৃতির প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রাখিবার জন্য চন্দ্রমুখীকে ঘৃণা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় চন্দ্রমুখীর কাছেই সে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া বসে। ধীরে ধীরে দেবদাসের চিত্তে চন্দ্রমুখীর প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসা জন্মিতে থাকে এবং দেবদাসকে ভালোবাসিয়া বারবিলাসিনী চন্দ্রমুখীও একনিষ্ঠ প্রেমের পুণ্যজ্যোতিস্পর্শে মহীয়সী হইয়া উঠিল। উভয়ের চরিত্রের এই পরিবর্তন সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। পার্বতীর বিবাহের পর একমাত্র দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবদাস পার্বতীর সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্গলবদ্ধ গৃহে এক বিবাহিতা নারী ও এক মদ্যপায়ী, উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের মাঝে সমাজ সংসারের সকল প্রকার ব্যবধান তিরোহিত হইয়া গেল এবং উভয়ের অন্তঃশায়ী আবেগ বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতই প্রমত্ত বেগে বহিতে লাগিল। আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে এবং অবরুদ্ধ বেদনার বুকফাটা-হাহাকারে দৃশ্যটি ঘনীভূত নাট্যরসাত্মক চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দেবদাস পার্বতীর কাছ হইতে বিদায় লইল এবং পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে চন্দ্রমুখী তাহাকে বিদায় জানাইল। ইহার পর দেবদাসের অনিবার্য মৃত্যুর পথে নিশ্চিন্ত মুক্তি। ষোড়শ পরিচ্ছেদে ঘটনার ঠাসাঠাসি একটু অনাবশ্যকভাবে বেশি এবং দেবদাসের মৃত্যুর দৃশ্যও মাত্রাতিরিক্তভাবে করুণ। দেবদাস চরিত্র এমনভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে মনে হয়, দেবদাস শরৎচন্দ্রের তৎকালীন আত্মজীবনী ছাড়া আর কিছুই নহে। দেবদাস লেখকের বর্ণিত চরিত্র নহে, এ-যেন তাঁহারই নিজের হওয়া চরিত্র।

দীর্ঘ তের চৌদ্দ বছর পরে ব্রহ্মদেশে বহুদিন অজ্ঞাত বাসের পর শরৎচন্দ্র পুনরায় লেখনী ধারণ করিলেন এবং পর পর কয়েকটি গল্প লিখিলেন, যথা 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে'। ভাগলপুরে লিখিত অনেক-গুলি গল্পই ছিল আকৃতিতে গল্প কিন্তু প্রকৃতিতে উপন্যাস। কিন্তু আলোচ্য

গল্পগুলি আকৃতি ও প্রকৃতিতে গল্পই বটে। ইহাদের মধ্যে ঘটনার অতি-বিস্তৃতি নাই, রোমাঞ্চকরত্ব নাই বলিলেই চলে এবং চরিত্রসংখ্যা খুব কম। স্নেহপ্রেমের একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়া গল্পগুলি রচিত। সেই সম্পর্কের সাময়িক সঙ্কট ও সেই সঙ্কট উত্তরণের জন্ম যতখানি প্রয়োজন মাত্র ততখানি ঘটনা বিস্তারের মধ্যে গল্পগুলি সীমাবদ্ধ। নারায়ণী ও রামের স্নেহ সম্পর্ক-জাত রসই হইল 'রামের স্থমতি' গল্পটির উপজীব্য। অন্যান্য বহু গল্পের মত এখানে সেই স্নেহসম্পর্কে সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে দিগম্বরী। কিন্তু শেষপর্যন্ত দিগম্বরীর অপকারী শক্তি পরাজিত হইল এবং সাময়িক ব্যবধানের পর নারায়ণীর স্নেহব্যাকুল কোলে রাম পুনরায় স্থান পাইল, উভয়ের স্নেহবন্ধন আরও নিবিড় মাধুর্য লাভ করিল। এই অন্তিম মিলনের অব্যবহিত পূর্বে রামের অসহায় অপটু রন্ধন-প্রচেষ্টা ও নির্বাক নারায়ণীর অন্তর্বেদনার কারুণ্য সৃষ্টির ফলে সেই মিলন বর্ষণসিক্ত যুঁই ফুলের মতই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

'বিন্দুর ছেলে' বড়গল্পের পর্যায়ে পড়ে। কারণ গল্পটির মধ্যে ঘটনার বিস্তৃতি ও চরিত্রের জটিলতা রহিয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গল্পটির প্রথম স্তর। এই স্তরে অমূল্য কিভাবে বিন্দুর ছেলে হইয়া উঠিল তাহার পরিচয় এবং স্নেহ ও শাসনের মধ্য দিয়া বিন্দুর বাৎসল্যরসাত্মক চরিত্রের উদ্‌ঘাটন। এলোকেশী ও নরেনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে দ্বিতীয় স্তরের সূচনা। এই স্তরে পারিবারিক বিরোধের সূচনা এবং সেই বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি যষ্ঠ পরিচ্ছেদে—অন্নপূর্ণা ও বিন্দুর উত্তেজিত কলহ ও তাহার অপ্রীতিকর পরিণামে। সপ্তম পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনীর তৃতীয় স্তরের সূচনা। এই স্তরে বিচ্ছেদবেদনাতুরা বিন্দুর অন্তর্দাহ ও নীরব আত্মহনন পর্বই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে অভিমান ও ক্রোধের আগুনে সে অপরকে দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তৃতীয় স্তরে সে নিজেই সেই আগুনে আত্মাহুতি দিয়াছে। অবশ্য পুড়িয়া সম্পূর্ণ শেষ হইবার আগেই সে রক্ষা পাইয়াছে। লেখক শেষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে বাঞ্ছিত মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন। ভুল বোঝাবুঝি ও সাময়িক বিচ্ছেদের পর এই পারিবারিক পুনর্মিলন পরম উপভোগ্য মাধুর্য লাভ করিয়াছে। পারিবারিক সম্পর্করসসিক্ত চরিত্র সৃষ্টিতে এই গল্পে তিনি সর্বপ্রথম অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কিশোর চরিত্রের মনস্তত্ত্বও এই প্রথম তিনি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নরেন ও অমূল্যের কিশোরবয়সসুলভ নানা প্রকার সখ ও খেয়ালের

সরল বর্ণনার মধ্যে গল্পটির কৌতুকরসের উপাদান রহিয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যে শরৎচন্দ্রের করুণরস সৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্যই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বিন্দুর অভিমানক্ষুব্ধ মাতৃত্বের অশান্ত বেদনা, বৃদ্ধবয়সে নিরুপায় যাদবের একান্ত ক্লেশকর চাকরী গ্রহণ, বিন্দুর স্নেহলালায়িত অমূল্যের নীরব কাতরতা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক করুণরসের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় তিনটি গল্প রচনার পর শরৎচন্দ্র উপন্যাস লেখায় হাত দিলেন। ঐ সময়ে লেখা তাঁহার প্রথম উপন্যাস হইল 'বিরাজ-বৌ'। কিন্তু উপন্যাস রচনায় তখনও তাঁহার পরিণত শিল্পবোধ দেখা যায় নাই। 'বিরাজ-বৌ' শিল্পের দিক দিয়া তাঁহার প্রথম পর্বে রচিত 'দেবদাস' অপেক্ষা নিকৃষ্টতর রচনা। বিরাজের সতীত্ব ও তাহার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনেই উপন্যাসটি রচিত। বক্তব্য, বিষয়বস্তু ও রচনারীতি কোন দিক দিয়াই উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচায়ক নহে। 'রামের সুমতি' 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুরছেলের' মধ্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, কিন্তু এই উপন্যাসে পুনরায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে চালিত হইয়াছেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে—শিবপুর ইনষ্টিটিউটের সাহিত্যসভায় তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর পরিণতি সম্পর্কে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বলিয়া ছিলেন, 'তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে পিস্তলের গুলিতে। এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি না হইলে কানা খোড়া করিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই কাশীর পথে 'একটি পয়সা দাও' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। তার চেয়ে এ ভালই হইয়াছে। সে মরিয়াছে।' অথচ দশ বছর আগে লিখিত উপন্যাসে তিনি নিজেই বিরাজকে কানা ও মুলো করিয়া তারকেশ্বরের পথে পথে ঘুরাইয়াছেন। 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই Propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে ত তার কুৎসা করা চলে না' 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে অন্তত শরৎচন্দ্র নবীন সাহিত্যিকের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহাতে সতীত্বের মহিমা প্রচারই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের প্রথম দুই পরিচ্ছেদে বিরাজের আত্যন্তিক স্বামীভক্তি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কিভাবে বিরাজের স্বামীভক্তির দৃঢ়

ইমারতটির মধ্যে দারিদ্র্যের কঠিন আঘাতে ফাটল ধরিল এবং কিভাবে সেই ফাটলের মধ্য দিয়া দুষ্ট রাহুর মত রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে। উপন্যাসের এই অংশটি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দুর্বিষহ দারিদ্র্য মানুষের স্নেহপ্রেম দিয়া গড়া সাজান সংসার যে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে তাহারই অতিশয় বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রহিয়াছে এই অংশে। রাজেন্দ্রর প্রলোভন ও স্বামীর দায়িত্বহীন ঔদাসীন্য বিরাজের প্রেম ও ভক্তিনিষিক্ত অন্তরের প্রসন্ন মাধুর্য দূর করিয়া দিয়া ক্ষোভ ও তিক্ততার প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিল। তাহার মানসিক সঙ্কট ও আদর্শচ্যুতির চিত্র নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বিরাজের গৃহত্যাগের পর উপন্যাসের শেষ অংশ শুরু হইয়াছে। ইহাই উপন্যাসের দুর্বলতম অংশ। বিশ্লেষণধর্মী বাস্তব উপন্যাস এই অংশে নীতিমূলক রোমান্সে পরিণত হইয়াছে। গৃহত্যাগের জন্য শরৎচন্দ্র বিরাজের যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী কিংবা অন্য কোন নায়িকাকে বোধ হয় অতখানি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নাই। কত পথ প্রান্তর ও তীর্থস্থানের মধ্য দিয়া যে এই হতভাগী নারীকে লেখক ঘুরাইয়াছেন তাহার আর অন্ত নাই। শেষ পর্যন্ত আবার ঠিক নীলাম্বরের সঙ্গেই তাহার দেখা হইয়া গেল। ঐদিকে পীতাম্বরও আবার সাপের কামড়ে মরিল। এরূপ বহু আকস্মিক ও চমকপ্রদ ঘটনায় উপন্যাসের শেষ অংশ ঠাসা। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সংলাপ অপেক্ষা বর্ণনার প্রাধান্য দিয়াছেন। দীর্ঘ বিশ্লেষণমূলক বর্ণনার মধ্য দিয়া চরিত্রের মানসজগৎ উদ্‌ঘাটনের যে রীতি এখানে তিনি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে বঙ্কিমরীতির অনুসারী। অলঙ্কারপ্রয়োগের দিকে একটি সচেতন প্রচেষ্টাও এই উপন্যাসে লক্ষিত হয়। তবে অলঙ্কারগুলি অনেক স্থলেই দীর্ঘায়িত উপমা, সেগুলি উপন্যাসের শ্লথ গতি কিছুটা সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে, কিন্তু রচনার মধ্যে চমক ও দীপ্তি আনিতে পারে নাই, যথা, 'দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অব্যক্ত মন্দ যাতনায় সর্বদেহটা যেরকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল' (৬); 'শূলবিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যেভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে (৯)', 'ভাঁটার টানে জল যেমন প্রতিমুহূর্ত ক্ষয়চিহ্ন তটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূর হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল, (১১)।

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে একটানা দুঃখের অশ্রুপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরবর্তী উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত রসের আনন্দোজ্জ্বল রূপ বিকশিত করিয়া তুলিলেন। 'পরিণীতা' শরৎচন্দ্রের প্রথম হাস্যমধুর রোমান্টিক উপন্যাস। ইহাতে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত লেখকের একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টি বজায় রহিয়াছে। ইহার কৌতুকরস বাহ্য ও প্রবল নহে, অনুচ্চ ও অন্তর্গূঢ়, ছদ্ম গাম্ভীর্যে মণ্ডিত ও আপাত-করুণ পরিস্থিতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত। ভুল বোঝাবুঝি ও মান-অভিমানেব ক্ষণস্থায়ী কুয়াশাজাল বিস্তার করিয়া লেখক শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন মিলনের আলো ছড়াইয়া দিয়াছেন। সাময়িক সঙ্কট সৃষ্টি দ্বারা আমাদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা জাগাইয়া পরে আবার সেই সঙ্কট অপসারিত করিয়া মধুর স্বস্তির তৃপ্তিদায়ক আনন্দে আমাদের চিত্ত ভরাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় ভাবে পরিস্থিতির বৈপরীত্য ঘটাইয়া তিনি বারে বারে আমাদের ধারণা ও প্রত্যাশা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। ঘটনাসংস্থাপনাকৌশলেব মধ্যে তাঁহার পরিণত শিল্পচাতুয কৌতুকলীলাচঞ্চল রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শেখর ও ললিতার চরিত্র পরিচিতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ দিকে গিরীনকে কেন্দ্র করিয়া উভয়ের মান অভিমানের পালার সূচনা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ত্রিকোণাকার প্রেমের সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। গিরীনের ভাগ্য উর্ধ্বগামী এবং শেখরের নিম্নগামী। কিন্তু সপ্তম পবিচ্ছেদে শেখব মরিয়া হইয়া ললিতাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। ললিতা এখানেই শেখরের পরিণীতা হইল। মালা বদলের পরিণয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। কিন্তু শেখরের তেমন প্রত্যয় ছিল না। সেজন্য মিথ্যা সন্দেহ ও ভিত্তিহীন ঈর্ষায় সে জর্জরিত হইয়াছে। এই সন্দেহ ও ঈর্ষার খেলা দেখাইয়াই লেখক যেন বেশ আমোদ পাইয়াছেন। শেখরের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইল একেবারে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, তারপর ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মধুমিলনেব শাঁখ বাজিতে আর দেরি হইল না। নাটকীয় ভাবে শেখবের পাত্রী বদল হইয়া গেল, মেঘের ছায়া অপসারিত হইল এবং পূর্ণিমার চাঁদ হাসিয়া উঠিল।

'পণ্ডিতমশাই' হইতে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সচেতনতা একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ লইয়া তাঁহার লেখায় আত্মপ্রকাশ করিল। এই সমাজ সচেতনতা 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে এতখানি প্রাধান্য পাইল যে, এখানে জীবনের রসরূপ বার বার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যাহত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ-উপন্যাসে রমা-রমেশের অনুরাগ-মিশ্রিত প্রেমের কাহিনী অপেক্ষা পল্লীসমাজের

বহু জটিল সমস্যা-সংক্ষুব্ধ স্বতন্ত্র সত্তাটিই যেন মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্যই বোধ হয় লেখক ইহার নাম দিয়াছেন 'পল্লীসমাজ'। শরৎচন্দ্রের আবেগচালিত শিল্পীসত্তা এখানে বিচার ও বিতর্কপ্রিয় সামাজিক সত্তার কাছে যেন নতিস্বীকার করিয়াছে।

'পল্লীসমাজে'র প্রথম পরিচ্ছেদে রমা ও রমেশের প্রথম সাক্ষাতের পরিণতি ঘটিল অবাঞ্ছিত তিক্ততায়। কিন্তু লেখক আভাসে-ইঙ্গিতে উভয়ের গোপন হৃদয়ে অনুরাগরঞ্জিত তন্ত্রীর সন্ধান দিলেন। ব্যক্ত ক্রিয়া ও প্রচ্ছন্ন মানসিকতার যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য এই উপন্যাসে দেখিলাম তাহার সূচনা প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখা গেল। দুই হইতে চার পরিচ্ছেদ পর্যন্ত রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে টুকরা টুকরা ঘটনা অবলম্বনে পল্লীসমাজের চিত্র উদ্‌ঘাটন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে পল্লী-সমাজের কূপমণ্ডূকতা ও শিক্ষাসমস্যা লইয়া আলোচনা। এই কয় পরিচ্ছেদে সমাজের বাস্তব রূপ তুলিয়া ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মাছধরার ঘটনা লইয়া রমা ও রমেশের সংঘাতের সূচনা। সপ্তম পরিচ্ছেদে রমার বাহ্য আচরণ রমেশের প্রতিকূল কিন্তু রমেশের স্মৃতি ও কল্পনায় তাহার অন্তরে সপ্তস্বরার মধুঝঙ্কার। জ্যাঠাইমার সঙ্গে রমেশের কথোপকথনের দৃশ্যেই নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্রের সমাজচিন্তা প্রকাশ পাইয়াছে। নবম পরিচ্ছেদের দ্বারিক চক্রবর্তীর ছেলের ঘটনাও সমাজচিত্র-উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে লিখিত। উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই। দশম পরিচ্ছেদে তারকেশ্বরে রমার বাড়িতে রমেশের সঙ্গে খাওয়ার দৃশ্যটি উপন্যাসের মধুরতম দৃশ্য, সন্দেহ নাই। রমা ও রমেশের কুণ্ঠিত ও বিস্মিত সম্পর্কটি এখানে মেঘাবরণমুক্ত সূর্যালোকের ন্যায় প্রসন্ন দীপ্তিতে যেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু পরের পরিচ্ছেদেই বাঁধ কাটার ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া রমা ও রমেশের সংঘাত একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পরিচ্ছেদেই পরাজিত রমা রমেশের অক্ষত জয়ের সংবাদে শুধুমাত্র স্বস্তিবোধ করে নাই, গোপন গৌরবের অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। রমার বাহ্য আচরণ ও আন্তর অনুভূতির বৈপরীত্য দেখাইয়া লেখক জটিল মনস্তত্ত্বের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রমেশের সমাজসংস্কার সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা কিন্তু শেষের দিকে রমেশের বাড়িতে রমার আগমন এবং রমেশের সীমাহীন ভালোবাসার প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি; 'পল্লীসমাজে'র মধ্যে লেখক একই পরিচ্ছেদের মধ্যে স্থান-ঐক্য ও ঘটনা-ঐক্য বজায় রাখেন নাই। সেজন্য অন্যান্য অনেক পরিচ্ছেদের ন্যায় এই পরিচ্ছেদের প্রথম ও শেষ অংশের স্থান, ঘটনা ও

ভাবের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখা গেল জমিদারীর স্বার্থে রমা তাহার অন্তরের দাবী উপেক্ষা করিয়া বেণীর সঙ্গেই পরামর্শে নিরত, কিন্তু রমেশের প্রতি বিরুদ্ধতার তীব্রতা নাই। অনেকটা যেন বাধ্য হইয়াই তাহাকে বেণীর সঙ্গে যুক্ত থাকিতে হইয়াছে। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে লেখক পুনরায় সমাজ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন এবং সমাজের শঠতা ও কৃতঘ্নতার ঘৃণ্যতম রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনীর একটি মোড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভৈরবকে রমেশের রুদ্ররোষ হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া রমা তাহার সঙ্গে রমেশের সম্পর্ক সকলের চোখের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিল এবং তখন হইতে সমাজশক্তির সঙ্গে তাহার ক্লেশকর সংগ্রাম শুরু হইল। এই পরিচ্ছেদের মধ্যে নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে শেষ দিকে রমেশকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার জন্য রমার অনুরোধ, কিন্তু রমেশের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদের মধ্যে সময়গত ও ঘটনাগত ব্যবধান অনেকখানি। রমা এমন ভাবে আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছে যে রমেশকে জেলে যাইতে হইয়াছে এবং রমেশ জেলে গেলে রমেশের অনুগামী প্রজারা জমিদারসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। সাক্ষ্য দিবার পর হইতেই রমার তিল তিল করিয়া আত্মহনন শুরু হইয়াছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য সে নিজেকে ক্ষমা করে নাই এবং দেহে ও মনে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়া সে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যে সংযম ও প্রতিরোধশক্তি তাহার মধ্যে পূর্বে অটুট ছিল এখন সে-সব শিথিল হইবার ফলে তাহার গোপন হৃদয়ের বিক্ষত অনুভূতি সকলের কাছেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রমেশের জেল হইতে ফিরিবার পরে তাহার সমাজসেবী রূপটিই বিশেষ করিয়া দেখিলাম, তাহার অনুভূতিময় অন্তরের তেমন সন্ধান পাইলাম না। কেবল শেষ পরিচ্ছেদে রমা ও রমেশের শেষবারের মত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। কিন্তু শেষ সাক্ষাতের দৃশ্যে মাত্র কয়েকটি সাধারণ কথা ও কয়েক বিন্দু চোখের জলের মধ্যে কিছুই প্রকাশ পাইল না। উভয়ের হৃদয়ে যে ঘনীভূত মেঘ ও প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল তাহা অপ্রকাশিতই রহিয়া গেল। এমনি ভাবে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ের উপরে শান্ত ও কোমল আবরণ পাতিয়া দিয়াছেন।

প্রচ্ছন্ন ও অবদমিত অনুভূতির গূঢ় ও বিচিত্র লীলাই আলোচ্য উপন্যাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্তর্নিহিত সেই অনুভূতির বাহ্য দৈহিক প্রতিক্রিয়া শরৎচন্দ্র চমৎকার আবেগরসাশ্রিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কারুণ্যের

অভিব্যক্তিই প্রধান তবে অন্যান্য ভাবের অভিব্যক্তিও কিছু কিছু আছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, যথা, 'সেখানে নির্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, (১০); 'রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল, (১১); 'তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এমনি শাদা হইয়া গিয়াছিল যেন কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই (৭); 'রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুৎবেগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল' (১৫)।

আলোচ্য উপন্যাসের অলঙ্কারপ্রয়োগে শরৎচন্দ্রের পরিণত শিল্পসৌন্দর্যচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে শ্লথ ও দীর্ঘায়িত উপমা প্রয়োগের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই উপন্যাসে অলঙ্কারগুলি সংহত, চমকপ্রদ ও ক্ষিপ্রবেগসম্পন্ন। পূর্ণোপমার দীর্ঘবিস্তার অপেক্ষা উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের গূঢ়-অর্থদ্যোতনাময় ও প্রখর দ্যুতিবিশিষ্ট সৌন্দর্যের দিকেই এখানে ঝোঁক বেশি। কয়েকটি উদাহরণ—'সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বরা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙিয়া ঝরিয়া পড়িল (১২); 'এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালো মেঘের গায়ে দিগন্তলুপ্ত অতি ঈষৎ বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্ষণে ক্ষণে যেন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল (১৫); 'ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমঝম শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল' (৭)।

'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসটিকে উপন্যাস না বলিয়া বড় গল্প বলিলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। কারণ এই বইখানিতে উপন্যাসের জটিলতা ও বিস্তৃতি অপেক্ষা গল্পের ঐক্য ও সংহতিই বড় হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়া ইহাকে নিখুঁত ও সার্থক সৃষ্টি বলা চলে। ইহাতে শিথিল অংশ নাই বলিলেই চলে, অবান্তর কোন ঘটনা ও চরিত্র ইহার ঋজু ও দৃঢ়সংবদ্ধ গতিকে কোথাও ব্যাহত করিতে পারে নাই। উপন্যাসের নাম হইতেই লেখকের প্রতিপাদ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও দুঃখের চিত্র দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। প্রথম পরিচ্ছেদেই জ্ঞানদার বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন এবং জ্ঞানদা ও অতুলের পারস্পরিক অনুরাগের সলজ্জমধুর চিত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতেই জ্ঞানদার দুঃসহ অপমান ও লাঞ্ছনার

সূচনা। মা ছাড়া এই দুর্ভাগিনী কন্যাটির আর কেহ ছিল না। সেজন্ত স্বাভাবিকভাবেই মা ও মেয়ের স্নেহ, বেদনা, অভিমান ও তিরস্কারমিশ্রিত সম্পর্ক উপন্যাসের মধ্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। মূর্তিমতী পিশাচী স্বর্ণমঞ্জরী, পাষণ্ড মাতুল শম্ভুনাথ এবং নিষ্ঠুর প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীবৃন্দ জ্ঞানদার দুঃখপাত্র পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়াছে। মানুষের নীচতা, শঠতা ও নির্দয়তা যখন সমাজকে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মতই ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে তখন পোড়াকাঠের মত দুই একটি চরিত্রই শুধু ইহাকে মানুষের বাসযোগ্য স্থানরূপে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ছোট ছোট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নিপুণভাবে সাজাইয়া এবং হৃদয়হীন মানুষের বিষমাখা ছুরির ন্যায় তীক্ষ্ণ ও বাঁকা মন্তব্যগুলি সন্নিবেশ করিয়া লেখক সামাজিক সমস্যাটির বেদনাদায়ক তীব্রতা যেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তেমনি গাঢ় করুণ রসে জ্ঞানদা ও দুর্গার চরিত্র দুইটিকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। দাশু পিয়নের কাছ হইতে চিঠি পাইবার জন্য দুর্গামণির দুঃসহ ব্যগ্রতা, বহুধিকৃত চেহারাখানি লইয়া অতুলকে নুন দিতে যাইয়া জ্ঞানদার তিরস্কৃত হওয়া, অতিবৃদ্ধ বরের মনোরঞ্জনের জন্য জ্ঞানদার বিকৃত প্রসাধন প্রভৃতি বহু ছোট ছোট ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়া লেখক যেন একটির পর একটি ছুরিকা দিয়া আমাদের অন্তর ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। অবিমিশ্র এবং অবিচ্ছিন্ন করুণরসের ঘনীভূত বেগ যেমন এই উপন্যাসে দেখিয়াছি তেমন আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই করুণরসে ক্লান্তিকর একঘেয়েমি নাই, কারণ ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে হাস্যরসের রঙীন আবর্ত রচিত হইয়াছে। তবে সেই হাস্যরস করুণরসকে আরও তীব্র ও গভীর করিয়াছে মাত্র। স্বর্ণমঞ্জরী অনেক রসিকতা করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই রসিকতার বীভৎসতায় আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। জ্ঞানদার কালো কুৎসিত রূপের বর্ণনা দিয়া লেখক মাঝে মাঝে আমাদিগকে হাসাইবার ছলে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদাইয়াছেন। কিন্তু পোড়াকাঠকে লইয়া লেখক যে হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে প্রাণ খুলিয়া নাড়া দিয়া যেন আমরা ক্ষণিক স্বস্তি অনুভব করি। পোড়াকাঠের হাসি যতই বিকট হউক না কেন, সেই হাসি নির্মল আনন্দে আমাদের অন্তর ভরিয়া রাখে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চিত্ররীতি ( Pictorial method ) গ্রহণ

করিয়াছেন।[১] চিত্ররীতিতে কথা অপেক্ষা কথকই বড় হইয়া উঠে। এই রীতিতে লেখক পাঠকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাকে কখনও দৃশ্যমান জগতের ঘটনাবহুল পথে নিয়া যান, আবার কখনও বা অদৃশ্য অন্তর্জগতের অন্ধকারে আহ্বান করেন। এখানে কাহিনীর নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য নাই। কথকের মন ও মেজাজই আসল বস্তু। লেখক যদি কাহিনীর গতি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার মনের একটির পর একটি আবরণ উন্মোচন করিতে থাকেন তাহা হইলেও কাহারও কিছু বলিবার নাই। চিত্ররীতিতে সাধারণত উত্তম পুরুষের মুখে কাহিনী বর্ণিত হয়। লেখক যাহা দেখেন, যাহা অনুভব করেন, যাহা ভাবেন তাহাই বর্ণনা করিয়া চলেন। এখানে লেখকের অবাধ স্বাধীনতা রহিয়াছে বলিয়া তিনি কখনও অতীতের স্মৃতি চারণ করেন, কখনও পার্শ্ববর্তী চলমান ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কখনও নিজস্ব কোন মানসপ্রতিক্রিয়ার বর্ণনাতে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন আবার কখনও বা এক প্রসঙ্গ হইতে অকস্মাৎ অন্য প্রসঙ্গে যাইয়া মাত্রাতিরিক্ত সময়ক্ষেপ করেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সব দেখা যায়। এই উপন্যাসের ঘটনাগুলি বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন. বেশীর ভাগ চরিত্রই নদীস্রোতে ভাসমান শৈবালের মতই ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টিপথে আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছে। কাহিনীর এই শিথিলতা ও ঐক্যহীনতার মধ্যেও একটি ঐক্যধারা রহিয়াছে, সেই ঐক্যধারা আসিয়াছে শ্রীকান্তের মানসিকতা হইতে। যত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও চরিত্র হউক না কেন তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে একটি অখণ্ড মানসিকতা হইতে।[২] সেই মানসিকতার মধ্যে বহু স্মৃতি-আনন্দ-বেদনা-চিন্তাভাবনা থাকিলেও তাহারা একটি বিশেষ সত্তার চেতনায় অনুস্যূত।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের রীতি অনেকটা কথকতা রীতির অনুরূপ। অর্থাৎ কথক কথা শুনাইবার সময় যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুকূল

---

১। লুব্বোক তাঁহার The Craft of Fiction-এর মধ্যে চিত্ররীতি ও নাট্যরীতির পার্থক্য এভাবে নির্দেশ করিয়াছেন.—'It is a question, I said, of the reader's relation to the writer ; in one case the reader faces towards the story teller and listens to him ; in the other he turns towards the story and watches it.

২। উত্তম পুরুষের মুখে বর্ণিত উপন্যাসে লেখকসত্তার অখণ্ড ব্যক্তিত্ব কিভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে আন্তর ঐক্য সম্পাদন করে তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লুব্বোক বলিয়াছেন। 'His career may not seem to hang together logically, artistically ; but every part of it is at least united with every part by the coincidence of its all belonging to one man'.—The Craft of Fiction, P. 131.

করিয়া তোলেন, এক প্রসঙ্গ হইতে বিনা দ্বিধায় প্রসঙ্গান্তরে গমন করেন, নানা টীকা টিপ্পনী ও সরস মন্তব্য দ্বারা তাঁহার বক্তব্যবস্তু হৃদয়গ্রাহী করিয়া থাকেন, শ্রীকান্তও ঠিক সেই সব রীতি অবলম্বন করিয়াছে। শ্রীকান্ত নিজেদের কিশোর বয়সের কথা বলিতে যাইয়া বৃন্দাবনের সেই চির কিশোর-কিশোরীর লীলারসে মসগুল হইয়া পড়িল। বর্ণনামাধুর্য অনুপম, কিন্তু মূল প্রসঙ্গ বহুক্ষণ হারাইয়া গেল ( ও পরি )। ঐ পরিচ্ছেদেই ইন্দ্রনাথের মুখে মড়ার আবার জাত কি ?— এই কথা শুনিয়া জাতিভেদ লইয়া পর্যালোচনা করিতে করিতে শ্রীকান্ত স্মৃতিচারণ করিয়া এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর সৎকারের সমস্যার কাহিনী আনিয়া ফেলিল। মূল কাহিনী বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্মশানে যাত্রা করিবার মুখে শ্রীকান্তের হঠাৎ নিরুদিদির মৃত্যুরাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। বৃত্তান্তটির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গভীর আবেদন আছে. কিন্তু যাত্রার মুহূর্তে এই দীর্ঘ বৃত্তান্তের বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীকান্তের যাত্রা যে বহু-বিলম্বিত হইয়া গেল, লেখকের সেদিকে খেয়াল নাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সকাল বেলাতেই যে রাজলক্ষ্মীর কথা সকলের আগে শ্রীকান্তের মনে আসিল নিজস্ব এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া সে খামোকা সাহিত্য-সমালোচকদের লইয়া পড়িল। সমালোচকদের সম্বন্ধে যে-সব বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য সে করিয়াছে তাহা হয়তো ঠিক, কিন্তু শ্রীকান্তের তখনকার মানসিক অবস্থায় তাহাদিগকে যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে।

শ্রীকান্তের মানসিকতা বিশ্লেষণ করিয়া আমরা তাহাকে গভীর অনুভূতিশীল, সুতীক্ষ্ণ জীবন সমালোচক, প্রগাঢ় দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও উদার সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তি বলিয়াই মনে করি। ইন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহ, অন্নদাদিদির প্রতি ভক্তি, রাজলক্ষ্মীর প্রতি ভালোবাসা এবং অন্যান্য সকল মানুষের প্রতি তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতির মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়বত্তার পরিচয় পরিস্ফুট। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিবিড় উপলব্ধি এবং মননশীল চিন্তা দ্বারা সে কতকগুলি জীবনসত্য সন্ধান করিয়া পাইয়াছে যেগুলি বর্ণনা ও বিবরণের মধ্যে প্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছে, যথা, 'একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়' (৪) 'আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না' ( ঐ ); 'সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়', ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়' (৬) ; 'স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ

বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে' (৮); 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে' (১২)। বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যগুলি জীবনের এক একটি গূঢ় সত্যকে বিদ্যুৎ আলোকে যেন ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীকান্তের দুইটি রাত্রির শ্মশান অভিজ্ঞতার মধ্যে শরৎচন্দ্রের গভীর দার্শনিকতার পরিচয় পরিস্ফুট। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত জগতের রহস্যসম্পর্ক, অন্ধকারের নিগূঢ় তত্ত্ব, জীবন-মৃত্যুর চিরন্তন দুর্জ্ঞেয় লীলা প্রভৃতি লইয়া শরৎচন্দ্র গভীর দার্শনিকতার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সেই দার্শনিক সত্যগুলি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব অনুভূতির রসে এমনি অভিষিক্ত হইয়াছে যে সেগুলি দার্শনিকতার নীরস সীমা অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক রসবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই উপন্যাসে তাঁহার শুধু প্রজ্ঞাদৃষ্টি নহে, রসদৃষ্টির সন্ধানও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাইলাম। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির শোভা, অপরূপ লাবণ্যবতী নারীর দেহসৌন্দর্য এবং মধুকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধার রস শ্রীকান্ত আস্বাদ করিয়াছে, কিন্তু তাহার রসদৃষ্টি ঐখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। দুরন্ত ও দুর্জয় প্রকৃতির রস, ভয়ঙ্কর ও বীভৎস দৃশ্যের রস, কালো অন্ধকারের রস সব কিছু সে পরম আগ্রহে আস্বাদ করিয়াছে। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অধিকাংশ ঘটনা ঘটিয়াছে রাত্রিতে। রাত্রির ভয়াল ও মধুর উভয় দিকই এই উপন্যাসে সমান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসের প্রথম স্তর সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে শ্রীকান্তের কিশোরলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। এই স্তরের মুখ্য চরিত্র দুইটি হইল ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি। সপ্তম পরিচ্ছেদের নতুনদাদা প্রসঙ্গ কিছুটা খাপছাড়া ও অবাস্তব এবং এই পরিচ্ছেদেই ইন্দ্রনাথ চরিত্রের সমাপ্তি ঘটাইয়া লেখক চরিত্রটির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। দুঃসাহসিক ও বেপরোয়া ইন্দ্রনাথের পরিণতি ঘটিল অমন শান্ত, নিস্তেজ ও পরানুগতরূপে ইহা ভাবাই যায় না। দ্বিতীয় স্তর শুরু হইয়াছে অনেক বৎসর পরে, শ্রীকান্তের যৌবনে। এই স্তর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়, কারণ এখানেই রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীকান্তের সাক্ষাৎ, এবং তখন হইতে উভয়ের জীবনের দ্বিবেণী যেন একবেণী হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রথম সাক্ষাতেই রাজলক্ষ্মী তাহার পূর্ণ প্রেমের মধুবাসরে শ্রীকান্তকে আহ্বান জানাইল এবং শ্রীকান্তও প্রাথমিক দ্বিধা ও প্রতিরোধের পরে সেই আহ্বানে সাড়া দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই যখন উভয়ের ছাড়াছাড়ি হইল, তখন অদৃষ্ট বিধাতা দুইজনের ভাগ্যচক্র একই সূত্রে গাঁথিয়া দিলেন। এগার বৎ

পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনীর তৃতীয় স্তরের আরম্ভ। এই স্তরে শ্রীকান্ত সত্যই ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া। সে এক সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া বিহারের পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়াছে। লোকের সেবা করিতে যাইয়া গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হইয়া পথপার্শ্বে আশ্রয় লইয়াছে। এই স্তরে রাজলক্ষ্মী যখন অসুস্থ শ্রীকান্তের ভার গ্রহণ করিতে আসিল তখন হইতে তাহাব আর একটি রূপ দেখিলাম। আগে তাহার রঙ্গরসোচ্ছল পিয়ারী বাইজীরূপ দেখিয়াছি, এখন সে স্নেহময়ী ও সংযমশাসিতা বঙ্কর ম। রূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

'শ্রীকান্ত' ( ১ম পর্ব ) উপন্যাসের আকর্ষণীয়তার কারণ হইল যে, ইহাতে পরিচিত জগতের সহজ বাস্তবতা যেমন রহিয়াছে তেমনি অপবিচিত জগতের রহস্য ও উত্তেজনাও যেন রাস্তার বাঁকে বাঁকে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। এখানে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী শ্রীকান্তর চোখে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, বিপদের কটাক্ষঘাতে তাহার চিত্ত চঞ্চল, ভয়ের অজগরের মাথার মণি লাভ কবিবাব তাহার দুরন্ত বাসনা। এই উপন্যাসের আকর্ষণীয়তার আর কারণ হইল, ইহার পরিস্থিতি ও রসের দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা। প্রথম পরিচ্ছেদে মেজদার অসাধারণ অধ্যয়ননিষ্ঠা ও 'রয়েল বেঙ্গল টাইগাবে'র বৃত্তান্তের পরেই মাছ ধরার বিপদ ও উত্তেজনাপূর্ণ অভিযানের বর্ণনা। নিমেষের মধ্যেই কৌতুকতরল পরিবেশ শ্বাসরোধকারী উত্তেজনার পরিবেশে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয়েব বর্ণনা দিবার সময় লেখক আমাদিগকে প্রবল হাস্যরসের আঘাতে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন কিন্তু অব্যবহিত পরেই তিনি অন্নদাদিদির করুণ রসাত্মক পরিণতি বর্ণনা করিয়া আমাদের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। কুমার সাহেবের তাঁবুতে থাকিবার সময় শ্রীকান্ত পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। একদিকে নৃত্যগীত মুখরিত লালসামত্ত পরিবেশ, অন্যদিকে শ্মশানের অন্ধকার নৈঃশব্দ্য ও অপ্রাকৃত রহস্যলীলা। একদিকে জীবনের আলোকোজ্জ্বল সম্ভোগ-আসর অন্যদিকে মৃত্যুর তমসাবৃত বৈরাগ্য-আশ্রম। একাদশ পরিচ্ছেদে সন্ন্যাস-জীবনের সরস বর্ণনার পরেই কৃতঘ্ন রামবাবুর বিরস বৃত্তান্ত আসিয়াছে। এমনিভাবে রৌদ্রালোক ও মেঘের ছায়ার মত এই উপন্যাসের পরিস্থিতির চমকপ্রদ পরিবর্তন দেখা গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের রচনারীতির চরমোৎকর্ষ দেখা গিয়াছে এই উপন্যাসে। রচনার মধ্যে একদিকে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ জগতের অনায়াসলব্ধ সৌন্দর্য, অন্যদিকে

রহিয়াছে অপ্রত্যক্ষ জগতে কল্পনাশ্রিত দুর্লভ সৌন্দর্য। ভাবানুসারী শব্দপ্রয়োগ, বিশেষণপদের বহুল ও বিশিষ্ট প্রয়োগ, বর্ণনাশক্তি ও চিত্ররসসৃষ্টিতে অসামান্য কুশলতা প্রভৃতি এই উপন্যাসের রচনাকে শিল্পসৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। অন্ধকার রাত্রির খরস্রোতা গঙ্গার রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া শরৎচন্দ্র লিখিলেন, —'নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ভূলোকও আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে।' হাল্কাভঙ্গিতে চাঁদের গতি বুঝাইলেন এভাবে—'হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুব-সাঁতার দিয়া একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন' (৬)। মৃত্যুর দার্শনিক চিন্তার কবিত্বময় অভিব্যক্তি—'এই জীবনব্যাপী ভালমন্দ, সুখদুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজীর বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে।' (৯)। কল্পনার গভীরতায় ও বর্ণনার মনোহারিত্বে গদ্য কিরূপে গীতিকবিতা হইয়া উঠে তাহার উদাহরণ, 'হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি। হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্তসুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি।' (১০)। বহুল বিশেষণপদের প্রয়োগে বাক্যের এক একটি চিত্র হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই দীপ্ত হইয়া উঠে, যেমন, 'বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।' (২)। 'তাহার শুষ্ক, স্নাত, প্রফুল্ল হাসিমুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল বেলাতেই ম্লান করিয়া দিলাম···।' (১২)।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের দুই বৎসর পরে 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশ ছাড়ার পরই ব্রহ্মদেশের পরিবেশ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আসিতে লাগিল। দ্বিতীয় পর্বের একটি বড় অংশ জুড়িয়া ব্রহ্মদেশের পটভূমি রহিয়াছে। স্মৃতির সঙ্গে সংযোগ না থাকিলে বোধ হয় কোন বস্তু সাহিত্যে স্থান পায় না। ১৯১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ছিল প্রত্যক্ষ। সেজন্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তাহা তখন পর্যন্ত স্থান পায় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের পর ব্রহ্মদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন হইল। রহিল শুধু কেবল স্মৃতি ও ভাবনাশ্রয়ী মানস-

সম্পর্ক। ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়া হাওড়া-শিবপুরে তিনি যে সাহিত্য সাধনা শুরু করিলেন তাহাতে গভীর হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে তীক্ষ্ণ মননশীলতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। সেই মননশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রহিয়াছে দ্বিতীয় পর্বে। অবশ্য সমাজ-সমস্যাসচেতনতা ও তাত্ত্বিকতা আমরা 'পণ্ডিত মশাই', 'পল্লীসমাজ,' 'শ্রীকান্ত', প্রথম পর্ব প্রভৃতি উপন্যাসে দেখিয়াছি। কিন্তু বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ, প্রখর যুক্তিজাল বিস্তার, অভ্যস্ত ধারণা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে জাগ্রত বিচারবোধের উদ্ধত বিদ্রোহ প্রভৃতি যেমন এই দ্বিতীয় পর্বে দেখিয়াছি তেমন পূর্বে দেখি নাই। সমসাময়িক কালে লিখিত 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে মননশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রতিফলিত। হাওড়া-শিবপুর পর্বে লিখিত উপন্যাসে মননশীলতার সঙ্গে শাণিত সমাজবিদ্রোহ যুক্ত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে, কিরণময়ী ও অভয়া একই সময়ের মানসিকতা হইতে উদ্ভূত। ইহার পূর্বে নারীর হৃদয়বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার বহ্নিময়ী বিদ্রোহিণী রূপ দেখি নাই। রাজলক্ষ্মীও দ্বিতীয় পর্বে অনেকখানি নিঃসঙ্কোচ ও অকুণ্ঠিত। সে এখন আর বঙ্কুর মা হইয়া থাকিবার মিথ্যা মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করিতে চায় না। এখন সে সত্যকার মা হইবার বাসনা অসঙ্কোচে প্রকাশ করে। শ্রীকান্তের সঙ্গে প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতাতেও এখন আর দ্বিধা নাই। শ্রীকান্তের উপর তাহার নিঃসপত্ন অধিকারের দাবীতেই সে তাহার গ্রামের বাড়িতে যাইয়া তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছে। এতদিন সে তাহার কুণ্ঠিত বাইজীজীবন লইয়া সমাজের বাহিরেই ছিল। এখন সে সমাজের ভিতরে আসিয়া নিজের স্থানটুকুর জন্য দৃপ্ত দাবী ঘোষণা করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' ১ম পর্বে শরৎচন্দ্র রহস্য-রোমাঞ্চের জগতে ঘন ঘন গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অপরিচিত জীবনের অনাস্বাদিত রসের মাদকতা সেখানে বারে বারে অনুভব করা গিয়াছে, ঘনীভূত কৌতূহল ও উত্তেজনায় চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত ও চমৎকৃত হইয়াছে। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' 'দ্বিতীয় পর্বের ঘটনা ঘটিয়াছে প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতে। সেজন্য প্রথম পর্বের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা কিছুই এই পর্বে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির ভয়াল-সুন্দর রূপের সান্নিধ্যে আসিয়া শ্রীকান্তের দার্শনিক ও কবিমনের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল প্রথম পর্বে দ্বিতীয় পর্বে তাহা দেখা যায় নাই। একমাত্র সমুদ্র বর্ণনা ছাড়া কোথাও বর্ণনার কবিত্বময় চমৎকারিত্ব দ্বিতীয় পর্বে আমরা লক্ষ্য করি নাই। প্রথম পর্বে শ্রীকান্তকে আমরা অনেকখানি পাইয়াছি কিন্তু 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বে তাহাকে আমরা পাই নাই বলিলে হয়।

অভয়ার বৃত্তান্তে শ্রীকান্ত শুধু কেবল দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা, ঐ বৃত্তান্তের মধ্যে তাহার অন্তর্জীবনের কোন পরিচয় পরিস্ফুট হয় নাই। গ্রন্থের শেষ অংশ তাহার সম্ভ্রম ও মর্যাদাবোধের আভাস পাওয়া গেল বলে বটে (রাজলক্ষ্মীর কাছে অর্থ সাহায্য এবং সেবা-পরিচর্যা নিতে অবশ্য শ্রীকান্তের মর্যাদায় বাধে নাই) কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল, আনন্দ-বেদনাজড়িত অন্তরের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। সেজন্য নিবিড় অনুভূতির রসে অভিষিক্ত যে রচনার নিদর্শন আমরা প্রথম পর্বে পাই, দ্বিতীয় পর্বে তাহা পাই নাই।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের ন্যায় দ্বিতীয় পর্বেও কয়েকটি স্বল্পস্থায়ী টাইপ চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্রের কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা, মায়ের গঙ্গাজল সখী, নন্দ মিস্ত্রী এবং তাহার কুড়ি বছরের ঘরণী টগর বোষ্টমী, অভয়ার পাষণ্ড স্বামী, কদলী প্রদর্শনকারী চতুর শিরোমণি বাঙালী যুবক, অতিহিসাবী মনোহর চক্রবর্তী, বর্ধমানগামী দরিদ্র কেরানী ইত্যাদি। কিন্তু এই চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র দরিদ্র কেরানী চরিত্রটি বাদে আর সব চরিত্রই কৌতুকরসসৃষ্টির প্রয়োজনে আসিয়াছে। গঙ্গাজল সখীর চরিত্র পরিহাসের ভঙ্গিতে চিত্রিত হইয়াছে, নন্দ ও টগরের দাম্পত্যজীবন প্রবল কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াছে, অভয়ার স্বামী ও স্ত্রীত্যাগী যুবক চরিত্রদুইটি ক্ষমাহীন বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ হইয়াছে, মনোহর চক্রবর্তীর চরিত্র শ্লেষাত্মক রীতিতে রূপায়িত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ, অন্নদা দিদি ও গৌরী তেওয়ারীর মেয়ের মত কোন গাঢ়রসে সমুজ্জ্বল চরিত্র দ্বিতীয় পর্বে পাই নাই। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে সমাজচিত্র অবলম্বনে গভীর জীবনসত্য উদ্‌ঘাটনেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে সমাজচিত্রের পর পর বিন্যাস ও সমাজবিতর্কের দিকেই তিনি মনোযোগী। প্রথম পর্বে তিনি রসিক ও দার্শনিক, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে তিনি তার্কিক ও সমালোচক।

নিছক প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করার প্রবণতা এক-মাত্র সমুদ্রঝটিকার বর্ণনা ছাড়া দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় না। কিন্তু পরিবেশ রচনা ও চরিত্রের বিশেষ ভাব ও আবেগ সৃষ্টিতে লেখক এখানে প্রকৃতিচিত্রের সহায়তা নিয়াছেন। সেই চিত্রগুলি নির্মাণে লেখকের সুদক্ষ শিল্পকুশলতার পরিচয় পরিস্ফুট আবার সেগুলির সার্থক প্রয়োগে চরিত্রের অন্তর্লোকের রস ও রহস্য সুপরিব্যক্ত। 'একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে'।—সমাসোক্তি অলঙ্কারের চমৎকার দৃষ্টান্ত,

রাত্রি ও পিয়ারী বাইজীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক দেখান হইয়াছে। 'তখন অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল দুটিতে নানা বর্ণের দ্যুতি ঝিকমিক করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল'।—এখানে প্রকৃতি যেন রাজলক্ষ্মীর অঙ্গপ্রসাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। 'সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যকররঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভায় সৌন্দর্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাবঅভিযোগ, হিংসাদ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নাই'।—অস্তরাগরঞ্জিত আকাশ শ্রীকান্তের মনে বিশ্বসৌন্দর্যবোধ ও বিশ্বপ্রীতি উদ্রেক করিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্ব ১৯২৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ ১৯২০ ও ১৯২১ খৃস্টাব্দের 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯২০ খৃস্টাব্দ হইতে শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেজন্য 'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্বে শরৎচন্দ্রের দেশচেতনা ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ভাবনা কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে। বজ্রানন্দের মধ্য দিয়া দেশসেবার আদর্শই রূপায়িত হইয়াছে। শ্রীকান্ত তাহার সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছে, 'সে ভগবানের সন্ধানে বার না হ'লেও মনে হয়' যার জন্যে পথে বেরিয়েছে সে তারই কাছাকাছি, অর্থাৎ আপনার দেশ। তাই তার ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসাটা ঠিক সংসার ছেড়ে আসা নয়—সাধুজী কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটি সংসার ছেড়ে বড় সংসারের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।' রোগার্ত কুলিদের শুশ্রূষা করিতে যাইয়া শ্রীকান্তের মনের মধ্যে বিদেশী শাসন-তন্ত্রের নির্মম শোষণের ভাবনাই জাগিয়াছে, যথা, 'বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল— তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে—এ সত্য ত কাহারও চক্ষু হইতেই গোপন রাখিবার যো নাই।'

'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্বে রাজলক্ষ্মীর বাইজী জীবন একেবারে বিলুপ্ত, সে যে শুধু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে, জমিদার হইয়া সমাজের উপরেই কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে। বঙ্কুর মা আর নাই, প্রোষিতভর্তৃকার বিরহসাধনাও শেষ হইয়াছে। সেজন্য তাহার মধ্যে আর একটি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে

জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইল ধর্মাচরণের দ্বারা পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা। ১ম পর্বে বন্ধুর মা শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, ২য় পর্বে শ্রীকান্তের সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদাবোধ উভয়ের মিলনে বাধা দিয়াছে, ৩য় পর্বে রাজলক্ষ্মীর ধর্মাচরণ উভয়কে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। এমনি ভাবে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী—পরস্পরকে কাছে পাইয়াও পাইতেছে না, বারে বারে একটি অনতিক্রম্য প্রাচীর আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিতেছে। ৩য় পর্বে গোড়াতেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে বলিয়াছে, 'আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভাল মন্দর ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার।' শ্রীকান্ত নিজেকে এভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই তাহাকে আর রাজলক্ষ্মীর জয় করিবার আগ্রহ নাই। একসঙ্গে বাস করিয়াছে বলিয়াই ঘরের সঙ্গীটির প্রতি সে উপেক্ষা দেখাইয়াছে। ২য় পর্বে শ্রীকান্তকে দেখিয়াছি উদ্যমী কর্মীরূপে প্রয়োজন ও কর্তব্যের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতে। সেজন্য তাহার বাহিরের রূপ দেখিয়াছি ভিতরের রূপ দেখি নাই। কিন্তু ৩য় পর্বে নৈষ্কর্ম্য ও আলস্যের মধ্যে তাহার সচল কর্মশক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষিত, নিঃসঙ্গ জীবনের গভীর অন্তঃস্থল হইতে নির্বাক বেদনা ও মর্মরিত দীর্ঘনিশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে উদ্গীত হইয়াছে। অপরাহ্ণ বেলার ক্লান্ত দিগন্তের ছায়া যেন এই উপন্যাসটির মধ্যে সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। নিঃসঙ্গ ঘুঘুপাখীর দূরাগত কাতর আকুতির ন্যায় শ্রীকান্তের অবসন্ন জীবন হইতে উৎসারিত একটি করুণ মূর্ছনা যেন ইহাতে সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। রাজলক্ষ্মীকে কাছে পাইয়াও তাহাকে সম্পূর্ণ পাইতেছে না, রাজলক্ষ্মীর দেওয়া সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাহার শূন্য ও রিক্ত হৃদয়কে ভরিয়া তুলিতে পারিতেছে না। এই হৃদয়ের করুণ বিলাপই সমস্ত উপন্যাসটিকে অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছে।

আলোচ্য উপন্যাসের দুইটি প্রধান পার্শ্বচরিত্রের সহিত শ্রীকান্তের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই। চরিত্র দুইটি হইল বজ্রানন্দ ও সুনন্দা। ইহাদের যোগ প্রধানত রাজলক্ষ্মীর সহিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের স্বল্পস্থায়ী চরিত্রগুলি শ্রীকান্তের ভাবনা ও অনুভূতির উপরে যেমন আলো-ছায়া বিস্তার করিয়াছে, ইহারা তেমন করিতে পারে নাই। একটি চরিত্র শ্রীকান্তের নিঃসঙ্গ জীবনের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়াছে এবং সেজন্যই তাহার সজীব ও সরস ব্যক্তিত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সে হইল রতন। রতনের প্রখর মর্যদাবোধ, তথাকথিত ছোটলোকদের উপর তাহার অখণ্ড প্রতাপ, রাজলক্ষ্মীর স্নেহধন্য ও

টাকা পয়সা অপাত্রে বর্ষিত হইতেছে দেখিয়া তাহার ক্রমবর্ধমান বিরক্তি, তাহার অতিবিজ্ঞজনোচিত কথাবার্তা; নিঃসঙ্গ শ্রীকান্তের প্রতি তাহার সহানুভূতি সব লইয়া চরিত্রটি খুবই উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

'শ্রীকান্ত' ৩য় পর্বের রচনা স্নিগ্ধ ও করুণ হৃদয়স্পর্শে মধুর এবং মাঝে মাঝে কৌতুকের প্রসন্ন আলোকে উজ্জ্বল। যেসব জায়গায় শ্রীকান্তের নিভৃতচারী হৃদয়ের গহন অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে সেখানে সেখানে তাহার ভাষা বিচিত্র অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সে-সব স্থানে বাহ্য প্রকৃতির রঙ ও রস শ্রীকান্তসত্তার সঙ্গে একাত্ম হইয়া পড়িয়াছে। 'অপরাহ্ণ সূর্য অসময়েই একখণ্ড কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ায় আমার সামনের আকাশটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই গোলাপী ছায়া সম্মুখের কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্নবর্তী এক ঝাড় বাঁশ ও গোটা দুই তেঁতুলগাছে যেন সোনা মাখাইয়া দিয়াছিল।'—এই সোনালী আলোয় রাজলক্ষ্মীর মুখের দীপ্তি এবং শ্রীকান্তের মন রাঙিয়া উঠিয়াছিল। 'অদূরবর্তী কয়েকটা খর্বাকৃতি বাবলা-গাছে বসিয়া ঘুঘু ডাকিত, এবং তাহারি সঙ্গে মিলিয়া মাঠের তপ্ত বাতাসে কাছাকাছি ডোমেদের কোন্ একটা বাঁশ ঝাড় এমনি একটা একটানা ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করিতে থাকিত যে, মাঝে মাঝে ভুল হইত, সে বুঝি বা আমার নিজের বুকের ভিতর হইতেই উঠিতেছে'।—এখানে বাহিরের ছবি ও শ্রীকান্তের বেদনাময় অনুভূতি মিলিয়া একটি অখণ্ড চিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনের অপরাহ্ণবেলাকার গোধূলি লগ্নে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকান্তের বয়স বত্রিশ বটে, কিন্তু তাহার স্রষ্টার বয়স ছাপান্ন। সেজন্য বত্রিশ বছরের ভাবনা ও অনুভূতির মধ্যে ছাপান্ন বছর বয়সের ভাবনা ও অনুভূতি মিশিয়াছে। আগ্নেয়গিরির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া অগ্নিময় শিলা ও ধাতব পদার্থ সঞ্চিত হইতে হইতে অবশেষে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে, গলিত লাভা অগ্নিমুখে নির্গত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। 'শেষপ্রশ্নে'র মধ্যে এই অগ্ন্যুদ্গীরণই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু অগ্ন্যুদ্গীরণের পরে আবার সেই আগ্নেয়গিরি শান্ত হইয়া আসে, শ্যামল বনরাজিতে তাহার গাত্র শোভা পায়। আগ্নেয়গিরির সেই শান্ত, স্নিগ্ধ শ্যামল রূপই আমরা 'শেষপ্রশ্নে'র পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে যথা 'শ্রীকান্ত' (৪র্থপর্ব ,, 'বিপ্রদাস', 'শেষের পরিচয়ে'র মধ্যে পাই। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের মধ্যে প্রৌঢ় বয়সের সরস, মমতাকরুণ, স্মৃতি-রসসিক্ত হৃদয়ের স্পর্শই সর্বত্র পাওয়া যায়।

১ম পর্বে শ্রীকান্ত রসিক ও দার্শনিক, ২য় পর্বে তার্কিক ও সমালোচক, ৩য় পর্বে নিঃসঙ্গ দেশপ্রেমিক, কিন্তু ৪র্থ পর্বে সে কবি। প্রথম পর্বের পটভূমি বিহার, দ্বিতীয় পর্বের ব্রহ্মদেশ, তৃতীয় পর্বের পটভূমিতে বীরভূম জেলার রাঙ্গামাটি গ্রাম রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেই গ্রামের সমাজই বড় হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতি নহে। কিন্তু চতুর্থ পর্বের পটভূমি পল্লীপ্রকৃতি, সেই প্রকৃতির সরস স্নিগ্ধ ও করুণ রূপই এই উপন্যাসে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর ঘনিষ্ঠ-মধুর সম্পর্ক আমরা রাজলক্ষ্মীর কলিকাতার বাড়িতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এ উপন্যাসের রসকেন্দ্র হইল শ্রীকান্তের নিজস্ব প্রিয় পল্লীপ্রকৃতি এবং সেই রসকেন্দ্রের নায়িকা কমললতা। রাজলক্ষ্মী এই পর্বে সৌন্দর্যে মাধুর্যে, প্রেমে দাক্ষিণ্যে অতুলনীয়া কিন্তু সে সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। সে আর অধরা উর্বশী নহে, সে কল্যাণময়ী লক্ষ্মী। কিন্তু কমললতা অপরিস্ফুট, অজানা,—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি, সেজন্য পাঠকের অতৃপ্ত কৌতূহল তাহারই সন্ধানে ঘুরিতে থাকে। রাজলক্ষ্মী তাহার অসংখ্য অনুগৃহীত ও অনুরক্ত ব্যক্তিমণ্ডলীর মধ্যে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে বিরাজ করিতেছে, আর কমললতা প্রায়ান্ধকার প্রত্যূষে পুষ্পবনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়া চলিয়াছে। সেখানে শুধু কেবল শুষ্ক পত্রের মর্মর ধ্বনি, ভোরের পাখীর কলকাকলী আর সুরভিত বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। রাজলক্ষ্মী সব পাইয়াছে, আর কমললতা সব হারাইয়াছে। পাঠকের বেদনাতুর মন সেজন্য এই চিরবিরহিণীর অজানা যাত্রাপথে নিরন্তর সঙ্গী হইতে চায়।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের মধ্যেও প্রকৃতির চমকপ্রদ বর্ণনা রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ পর্বে প্রকৃতির ভয়াল-সুন্দর, রহস্যরোমাঞ্চিত রূপই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ পর্বে প্রকৃতির সহজ-স্নিগ্ধ ও মধুর রূপই চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম পর্বের মধ্যে অপরিচিত প্রকৃতির অনাস্বাদিতপূর্ব রস আমরা ক্ষণে ক্ষণে আস্বাদ করিয়াছি, কিন্তু চতুর্থ পর্বে পরিচিত প্রকৃতির বহু-আস্বাদিত রস আবার নূতন করিয়া আস্বাদ করিয়াছি। প্রথম পর্বে প্রকৃতির সৌন্দর্য তত্ত্বময় রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ পর্বে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিছক রসরূপে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুচিন্তা দুই পর্বেই আছে, কিন্তু প্রথম পর্বে মৃত্যুর দার্শনিক ভাবনা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু চতুর্থ পর্বে পাইলাম মৃত্যুর কাব্যময় রসাস্বাদনা। শুধু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য নহে, নারী সৌন্দর্যচিত্রণেও এখানে শরৎচন্দ্রের রসদৃষ্টি যেন মুগ্ধ উল্লাস বোধ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর বর্ণনা দিতে যাইয়া একজায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, 'পূবের জানালা

দিয়া এক টুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের এক ধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা হাসি তাহার ঠোঁটের কোনে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূভুটির নীচে চঞ্চল চোখের দৃষ্টি উচ্ছল আবেগে ঝল্ ঝল্ করিতেছে—চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।'

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্তের দৃষ্টি প্রীতিপ্রসন্ন ও রসমধুর, সেজন্য সহজ ও সরস আলাপনের রীতি তিনি এখানে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম পর্বে তাহার দার্শনিক ভাবনা দীর্ঘ বর্ণনা আশ্রয় করিয়াছে, তৃতীয় পর্বে তাহার নিঃসঙ্গ চিত্তের বেদনা করুণ উচ্ছ্বাসের বিলম্বিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় পর্বের সংলাপ বিতর্কের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে উত্তপ্ত, মাঝে মাঝে আবার দীর্ঘবিস্তারী তাত্ত্বিক আলোচনা। কিন্তু চতুর্থ পর্বের সংলাপ যেন জ্যোৎস্নালোকিত নদীর শান্ত ধারা। আলোকোজ্জ্বল তরঙ্গগুলি নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে, সুমিষ্ট কলতান মৃদু বীণার ঝঙ্কারের মতই কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে দুই একটি আবর্তের মধ্যে কৌতুকের উচ্ছ্বাস ফেনিল রূপ ধারণ করিতেছে।

'চরিত্রহীন' নানা দিক দিয়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নূতন ধারার প্রবর্তন করিল। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিছুটা অংশ লিখিত হইয়াছিল ব্রহ্মদেশে এবং পরবর্তী বৃহত্তর অংশ লেখা হইয়াছিল হাওড়া-শিবপুরে বাস করিবার সময়। প্রথম অংশে করুণ হৃদয়ানুভূতির আর্দ্র উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় অংশে তীক্ষ্ণ মননশীলতার খরদীপ্তির প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম অংশের বাস্তবতা ভাবানুরঞ্জিত ও আদর্শান্বিত কিন্তু দ্বিতীয় অংশের বাস্তবতা নগ্ন, রুক্ষ ও নির্মম। ব্রহ্মদেশীয় সাহিত্যচেতনার নায়িকা সাবিত্রী, কিন্তু হাওড়া-শিবপুর পর্বে নব বৈপ্লবিক চেতনালব্ধ নায়িকা কিরণময়ী। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসেই শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ একটি অকুণ্ঠিত, অনাবৃত এবং সামগ্রিক রূপ লাভ করিল। ইহাতে জৈবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বাস্তবতার তীব্র ও তীক্ত উপাদান মিশিয়া রহিয়াছে। 'চরিত্রহীন' হইতে শরৎচন্দ্রের বৃহৎ উপন্যাস পর্বের সূচনা হইল। ইহার পূর্বে তিনি শুধু লিখিয়াছেন বড় গল্প ও ছোট উপন্যাস। সেগুলি উত্তম সৃষ্টি বটে, কিন্তু মহৎ সৃষ্টি নহে। তাঁহার প্রথম মহৎ সৃষ্টি 'চরিত্রহীন', যেখানে আয়তনের বিশালতা, পটভূমির বিস্তৃতি এবং ঘটনার বৈচিত্র্য নিপুণ শিল্প কুশলতার ফলে একটি অখণ্ড ও মহৎ শিল্পসৃষ্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসকে শিথিলবৃত্ত উপন্যাস ( Novel of loose plot ) বলা যাইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ( ২৪৪ পৃঃ ) সাবিত্রী, কিরণময়ী,

সুরবালা ও সরোজিনীকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসের চারিটি শাখা গড়িয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসের ঘটনাস্থল প্রধানত কলিকাতা হইলেও পশ্চিমের একটি শহর ( ভাগলপুর ? ), সতীশের গ্রাম, দেওঘর, পুরী, আরাকান প্রভৃতি স্থানেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে কাহিনীর ধারা লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কাহিনীর বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যোগ রাখিবার জন্য লেখক বিভিন্ন পরিচ্ছেদের স্বতন্ত্র স্তরগুলি পর পর বিন্যস্ত করিয়াছেন। কাহিনীর যথার্থ আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে। প্রথম পরিচ্ছেদটিকে প্রক্ষিপ্ত ও অবান্তর মনে হয়। ইহাতে সতীশের যে তার্কিক ও নাস্তিক পরিচয় ফুটিয়াছে, গ্রন্থ মধ্যে বর্ণিত সতীশের চরিত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র মিল নাই। যে তার্কিক যুবকদিগকে এখানে দেখা গিয়াছে তাহারাও আর কোন পরিচ্ছেদে পুনঃপ্রবেশ করে নাই। দ্বিতীয় হইতে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া কখনও কলিকাতায় সতীশের মেসে এবং কখনও বা উপেন্দ্রর বাড়িতে ঘটিয়াছে। সতীশ-সাবিত্রীর ঘটনাধারাই এখানে প্রধান। সুতীব্র হৃদয়বৃত্তির ঘর্ষণ-প্রতিঘর্ষণে কোথাও অমৃত আবার কোথাও বা জ্বালাময় বিষ উত্থিত হইয়াছে। এই উত্তেজনাজনক ঘটনাধারার পরিণতি ঘটিয়াছে সাবিত্রীর অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপনে। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কে এখানেই সাময়িক ছেদ। এই মূল আখ্যানধারার পাশে উপেন্দ্র-দিবাকরের বৃত্তান্ত অনুত্তেজক ও অনাকর্ষণীয় মনে হইয়াছে। উপেন্দ্রর চারিত্রিক মহত্ত্ব ও সুরবালার অসাধারণ পতিভক্তি এই অংশে তেমন ফুটে নাই। দিবাকরের বিবাহের আয়োজনই এই অংশের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু। দিবাকরের বি. এ. ফেল করাও এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ ফেল না করিলে কিরণময়ীর বাসায় থাকিয়া আবার বি. এ. পড়ার প্রয়োজন হইত না। বার পরিচ্ছেদে কিরণময়ীর আবির্ভাব এবং ঐ পরিচ্ছেদ হইতে শেষ পর্যন্ত কিরণময়ীই 'চরিত্রহীনে'র নায়িকা। তাহার প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত রূপ, খাপখোলা তলোয়ারের মত বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের ঝলক এবং দুর্জয় নদীবেগের মতই তাহার হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ড গতি পাঠকের চমৎকৃত চিত্তকে যেন সম্মোহিত করিয়া রাখে। বার হইতে সাতাশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনী অংশের মধ্যে নায়ক উপেন্দ্র, নায়িকা কিরণময়ী। এই অংশের শেষ হইয়াছে উপেন্দ্রর প্রতি কিরণময়ীর অকুণ্ঠ প্রেমনিবেদনে। ভগ্নহৃদয় সতীশ এই অংশে পার্শ্ব চরিত্র, সে কিরণময়ীর ছোটভাই। এই অংশে সাবিত্রীকে দেখা গিয়াছে কুড়ি ও একুশ পরিচ্ছেদে। একুশ পরিচ্ছেদে সতীশ ও সাবিত্রীর প্রেম দুর্বার আকর্ষণ এবং নিষ্ঠুর আঘাতে অতি তীব্রভাবে

আবর্তিত হইয়াছে। এই অংশে আর একটি উপবৃত্ত গড়িয়া উঠিয়াছে উপেন্দ্রর বন্ধু জ্যোতিষের বাড়িতে। সতীশ ও সরোজিনীর মধুর পূর্বরাগের আভাস পাওয়া যায় এখানে। কাহিনীর পরবর্তী অংশে কিরণময়ী-দিবাকর বৃত্তান্তই প্রাধান্য পাইয়াছে। কিরণময়ী তাহার অতিপ্রবল ব্যক্তিত্বের দ্বারা কাহিনীর গতি পরিচালিত করিয়াছে, দিবাকর শুধু উপলক্ষ মাত্র। তবে কিরণময়ীর কামনাদীপ্ত, বিদ্রূপকুটিল, ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাময় রূপ দেখিয়াছি আরাকান পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত! আরাকান পৌঁছিবার পর বোধ হয় বীভৎস বাস্তবের মুখোমুখি আসিবার ফলে তাহার দেহ ও মনের সর্বপ্রকার অসামান্যতা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে এবং সে একজন অতি সাধারণ নারীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার এরূপ পরিণতি আকস্মিক ও অবিশ্বাসজনক মনে হয়। নায়ক সতীশ উপেন্দ্র ও কিরণময়ী হইতে বিচ্ছিন্ন। দেওঘরে সরোজিনীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা বাড়িযাছে, কিন্তু দেওঘর বাসেরও সমাপ্তি ঘটিয়াছে উভয়ের সম্পর্কেব বিচ্ছেদে। ইহার পর সতীশ একেবারেই নিঃসম্পর্ক একা, দেশের বাড়িতে ইচ্ছা করিয়াই সে নিজেকে সর্বনাশের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতে আসিল সাবিত্রী। বহু ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমানের পর অবশেষে সাবিত্রীর সঙ্গে সতীশের মিলন ঘটিল, কিন্তু সেই মিলনের পরেই আবার চিরবিচ্ছেদ। উপেন্দ্র সুরবালাকে হারাইয়াছে এবং সাবিত্রী হারাইল সতীশকে, কাহিনীর শেষ অংশে উপেন্দ্র ও সাবিত্রীর মধুর স্নেহসম্বন্ধই বর্ণিত হইয়াছে। কিরণময়ী কলিকাতায় ফিরিয়াই একেবারে রাস্তার পাগলী হইয়া গেল, কিরণময়ী চরিত্রের এই পরিণতি আকস্মিক, অবিশ্বাস্য এবং শিল্পের দিক দিয়া একেবারেই অসঙ্গত। কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে উপেন্দ্রর মৃত্যু চরিত্রহীন সতীশের উপরেই সকল চরিত্রের দায়িত্ব চাপাইয়া দিল।

'চরিত্রহীনে' লেখক অনেক স্থলে নাটকীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং চমকপ্রদ নাটকীয়তায় কাহিনীর বহু অংশই গতিশীল ও উত্তেজনাজনক করিয়া তুলিয়াছেন। পরিস্থিতির নাটকীয় আকস্মিকতা ও ঘনীভূত রহস্যময়তা দেখা গিয়াছে চতুর্দিকের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তীব্র জ্যোতির শিখারূপিণী কিরণময়ীর প্রথমআবির্ভাব-দৃশ্যে—সতীশ কর্তৃক বিপন্না সরোজিনীর উদ্ধার ঘটনায়, মূঢ়, বিহ্বল দিবাকরকে লইয়া প্রতিহিংসাময়ী কিরণময়ীর পলায়নদৃশ্যে, কিরণময়ীর চরম সঙ্কটমুহূর্তে আরাকানে সতীশের অপ্রত্যাশিত আগমনক্ষণটিতে। বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন দেখা গিয়াছে অনেক স্থলে। অষ্টম

পরিচ্ছেদে সতীশ-সাবিত্রীর সুগভীর প্রেমের মধুর আদানপ্রদানের আকস্মিক পরিণতি ঘটিল উভয়ের তীক্ষ্ণ কটূক্তি ও ক্রুদ্ধ কলহে। একুশ পরিচ্ছেদে সতীশ-সাবিত্রীর জীবনের আর একটি নাট্যদৃশ্য ঘটিয়াছে। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা এবং নিষ্ফল অভিমানের বিষে সতীশ ম্রিয়মাণ, অথচ সাবিত্রীর শান্ত, নিরুত্তাপ ও নির্বিকার চিত্ত সতীশের প্রতি বিমুখ হইয়াই রহিল। সতীশের হৃদয়োচ্ছ্বাস উদ্বেলিত তরঙ্গরাশির মত এই পাষাণপ্রতিমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল বটে, কিন্তু তাহাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারিল না। কিরণময়ীর অন্ধকার প্রেতপুরীর মত বাড়িখানিতে অনেক উত্তেজনাপূর্ণ নাটকের দৃশ্য ঘটিয়া গিয়াছে। অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে কিরণময়ীর অবৈধ প্রেমের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে সতের পরিচ্ছেদে। উভয়ের সংঘাতের পরিণতিতে কিরণময়ী বিজয়িনী এবং মঞ্চ হইতে অনঙ্গ-ডাক্তারের চিরবিদায়গ্রহণ। সাতাশ পরিচ্ছেদে উপেন্দ্র কিরণময়ীর জীবনের একটি তীব্র বেগবান অঙ্কের অভিনয় হইয়াছে। নির্জন নিশীথরাত্রে এক প্রেমোন্মাদিনী নারী তাহার হৃদয়ের অবরুদ্ধ গৈরিক স্রাব উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহার বাক্যগুলি যেন কামনার শত শত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত অন্ধকার রাত্রির সর্বাঙ্গ দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তেত্রিশ পরিচ্ছেদে উপেন্দ্র-কিরণময়ীর সম্পর্কের ট্র্যাজিক পরিণতি। উপেন্দ্র কিরণময়ীকে নিদারুণ ঘৃণায় অপমান করিয়া গেল বটে, কিন্তু ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসার অগ্নিজ্বালায় কিরণময়ী জ্বলিতে লাগিল। জাহাজের মধ্যে কিরণময়ী দিবাকরকে উপলক্ষ করিয়া তাহার প্রেমাস্পদ প্রতিপক্ষের সঙ্গেই তাহার ক্রুদ্ধ সংগ্রাম চালাইয়াছে। দিবাকরকে চুম্বন করিয়া সে তাহার বিষাক্ত চুম্বন যেন অদৃশ্য উপেন্দ্রর প্রতিই নিক্ষেপ করিয়াছে। উপেন্দ্রর স্নেহাস্পদ অবোধ ভাইটিকে তাহার দৃঢ়বাহুর নাগপাশে বাঁধিয়া উপেন্দ্রর স্নেহ ও নির্ভরতাকে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় আঘাত করিয়াছে। নাটক জমিয়া ওঠে তীব্র আবেগময় ক্রিয়া, বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত এবং পরিস্থিতির দ্রুত গতি ও আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া। সেই সব নাট্যবৈশিষ্ট্য 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে যথেষ্টই আছে। সেজন্য উপন্যাসের কাহিনী মুহুর্মুহু নাট্যবেগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য ও প্রীতিপ্রদ উপন্যাস হইল দত্তা। রোমান্টিক কমেডির শিল্প সার্থকভাবে আলোচ্য উপন্যাসে প্রয়োগ করা হইয়াছে। রোমান্টিক কমেডিতে রোমান্সের মধুর ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হাস্যরসের মৃদু ও স্নিগ্ধ ধারা যুক্ত হয়। 'দত্তা' উপন্যাসে বিজয়া-নরেনের প্রণয়বাসর যেন কৌতুকের শত আলোকমালায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাময়িক সঙ্কট, ভুল,

বোঝাবুঝি, সংশয় ও স্বল্পকালীন বেদনা প্রভৃতি যে সব লক্ষণ কমেডিতে দেখা যায় সেগুলি সবই এই উপন্যাসে রহিয়াছে। ত্রিকোণাকার সমস্যার উদ্ভাবন (এ-উপন্যাসে চতুষ্কোণাকার), পরিস্থিতিগত জটিলতা ও বৈপরীত্য, ঘনীভূত সাসপেন্সসৃষ্টি, শ্লেষাত্মক ও পরিহাসোজ্জ্বল বর্ণনা প্রভৃতি যে সব শিল্পরীতির আশ্রয়ে কমেডির রস জমিয়া থাকে সেগুলির কুশলী প্রয়োগ এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

'দত্তা'র মূল কাহিনীব শুরু হইয়াছে তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত অংশকে কাহিনীব পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। ঐ অংশে জগদীশ, বনমালী ও রাসবিহারীর বন্ধুত্ব এবং বিজয়ার বাগ্‌দত্তা হইবার আভাস পাওয়া যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিজয়া-বিলাসের অন্তরঙ্গ কথাবার্তায় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প এবং ঘৃণার সঙ্গে নরেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন। কিন্তু চতুর্থ পবিচ্ছেদেই পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের বৈপরীত্য। ব্রাহ্ম বিজয়ার হিন্দুপূজায় সম্মতিদান এবং পূর্বঘৃণিত নরেন সম্পর্কেই তাহার মনে গোপন পূর্বরাগ ধীরে ধীরে গাঢ় অনুরাগে পরিণত হইয়াছে। ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া এই অনুরাগের লাজরক্তিম, প্রকাশকুণ্ঠিত ও বেদনামধুর রূপ লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নরেনের প্রকৃত পরিচয় কিছুটা অংশ পর্যন্ত গোপন রাখিবার ফলে কমেডির রহস্যরস ঘনীভূত হইয়াছে। অন্যমনস্কতা কৌতুকরসের একটি উপাদান, অন্যমনস্ক নরেন চরিত্রও এই উপন্যাসে যথেষ্ট কৌতুকরস উদ্রেক করিয়াছে। ভালোবাসা বিজয়ার মনে আশানিরাশার কত দোলা, কত মধুর শিহরণ ও গোপন বেদনার অনুভূতি উদ্রেক করিয়াছে। অথচ আপনভোলা, দৃষ্টিহীন বৈজ্ঞানিকটির চোখে কিছুই ধরা পড়িতেছে না। উভয়ের চরিত্রের এই বৈপরীত্য কৌতুকজনক। আবার বৈপরীত্য রহিয়াছে নরেন ও বিলাসের চরিত্রের মধ্যেও। একজন অচঞ্চল ও অনুত্তেজিত কিন্তু অপরজন উগ্র উত্তেজনায় সদা উন্মত্ত। একজন না চাহিয়াও সব পাইয়াছে, কিন্তু আর একজন জোর করিয়া ছিনাইয়া নিতে বার বার ব্যর্থ হইয়াছে। উপন্যাসের মূল সংঘাত বাধিয়াছে বিজয়া ও রাসবিহারীর মধ্যে, অথচ দুইজনের মধ্যে একটা আপাত স্নেহবন্ধনের ফলে সংঘাতের উত্তাপ ও তিক্ততা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। বিজয়ার নারীসুলভ লজ্জা, সঙ্কোচ ও শালীনতাবোধের পূর্ণ সুযোগ লইয়া রাসবিহারী তাঁহার কপট স্নেহের অভিনয় যেমন নিরঙ্কুশভাবে চালাইয়াছেন, তেমনি বার বার বিজয়া ও বিলাসের আসন্ন বিবাহের কথা ঘোষণা করিয়া

সকলের মনে ঐ বিবাহের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছেন। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে উভয়ের বিরোধ যখন আত্যন্তিক রূঢ়তায় অনাবৃত হইয়া পড়িল তখন হইতেই রাসবিহারীর পরাজয় সূচিত হইল। কিন্তু ঐ ঘটনার পরেও বিজয়া বিলাসকে বিবাহ করিতে সম্মতি দিল, তাহার কারণ নরেন ও নলিনীর সম্পর্কে সে একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া দুর্জয় অভিমান বশত বিবাহের সম্মতিপত্র রূপ মৃত্যুর পরোয়ানাতেই সহি দিয়া দিল। নরেনের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে তাহার ভ্রান্তি দূর হইল বটে, তবে বিবাহ রোধ করা হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু পাঠকের উদ্বিগ্ন চিত্ত মধুর স্বস্তিতে পূর্ণ করিয়া আকস্মিকভাবে সঙ্কট উত্তরণ এবং কমেডির প্রত্যাশিত মিলন ঘটিল। এই মিলনের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত বাধা বজায় রাখিয়া মিলনের মুহূর্তটিকে লেখক উদ্বেগমুক্ত আনন্দে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসার্থক উপন্যাস। ইহাতে বৃত্তগঠন-কৌশলের সঙ্গে চরিত্রসৃষ্টির নিখুঁত সমন্বয় ঘটিয়াছে। বিস্তার ও বৈচিত্র্য নহে ঐক্য ও সংহতির দিকেই এ উপন্যাসের স্থির লক্ষ্য। পরিবেশচিত্রণ, পটভূমির বর্ণনা, বহুবিচিত্র মানুষের পরিচয়, কিছুই এখানে নাই, কিন্তু এসবের পরিবর্তে আছে মানুষের গোপন হৃদয়ের অন্ধকার স্তরে অবতরণ, সেখানকার পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তির দুর্জয় ক্রিয়া-কলাপের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। এ-উপন্যাসের গতি ঘটনার ক্রমিকতায় নহে, শুধু কেবল নূতন নূতন ক্ষেত্র পরিক্রমায় নহে, ধরিত্রীর অভ্যন্তরে দাহ্যবস্তুর আলোড়ন ও বিস্ফোরণে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্পন ঘটে, আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীতে সেই কম্পনই অনুভব করা গিয়াছে। এখানে তর্কবিতর্কের উত্তাপ নাই, তাত্ত্বিকতার ভার নাই, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি লইয়া সুরাসুরের নিরবচ্ছিন্ন মন্থন রহিয়াছে। সামাজিক সমস্যা নহে, জৈব সমস্যাই এখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য ইহার আবেদন কোন দিনই পুরাতন হইবার নহে। ঘটনার অন্তর্মুখীনতা ও চরিত্রের স্বল্পতার জন্যই উপন্যাসটির কাহিনী এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

'গৃহদাহ' প্রধানত সুরেশ ও অচলারই কাহিনী। মহিম ও মৃণাল এখানে পার্শ্বচরিত্র মাত্র। অচলার সঙ্গে মহিমের রোমান্স গ্রন্থমধ্যে অবর্ণিত, মহিম অচলার দাম্পত্য জীবনরূপও অপ্রদর্শিত। কাহিনীর প্রকৃত আরম্ভ হইয়াছে অচলার বাড়িতে সুরেশের আগমনের সময় হইতে। তখন হইতে সুরেশ-চরিত্র পর পর কতকগুলি স্তর অবলম্বনে বিকশিত হইয়া পরিণতি লাভ

করিয়াছে, যথা, মহিমের প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়—মোহের কাছে নীতিবোধের পরাজয় এবং অচলার বিবাহিত জীবনে অনুপ্রবেশ—ক্রমবর্ধমান মোহের কাছে আত্মসমর্পণ এবং জোর করিয়া অচলার দেহ লাভ করিয়া ও মন জয় করিতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে ট্র্যাজিক মনস্তাপ ও জীবন-বৈরাগ্য—আর্ত মানুষের সেবায় মৃত্যু বরণ। একটি মহৎসম্ভাবনাময় জীবনের শোকাবহ পরিণতি ঘটিল এক মারাত্মক ট্র্যাজিক ভ্রান্তির ফলে—দুর্দমনীয় কামপ্রবৃত্তির অনিবার্য দুঃখময় পরিণতিতে। সুরেশ তাহার শিক্ষিত মনের সংযম, নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি দ্বারা এই প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরাজিত হইয়াছে, এবং এই পরাজয়ই তাহার চরিত্রকে ট্র্যাজিক দুঃখের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। শেষ দিকে অচলাকে পাইয়াও যে না পাইবার হাহাকার সুরেশের বিদীর্ণ হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছে, হৃদয়হীন দেহ-সম্ভোগের জ্বালা অহরহ তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে তাহার মর্মস্পর্শী ট্র্যাজিক রূপ শরৎচন্দ্র অসামান্য কুশলতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অচলাব ট্র্যাজেডি বোধহয় আরও গভীর, আরও দুঃখময়। সে গৃহ চাহিয়াছে, কিন্তু তাহার গৃহ বার বার দগ্ধ হইয়াছে, সে সুখ চাহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের ভরাপাত্রই কেবল তাহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে। স্বামী তাহার প্রতি নিরুত্তাপ ও উদাসীন, মৃণাল সেবাযত্নের দায়িত্ব কাড়িয়া লইয়া সকলের স্নেহ ও প্রশংসা কুড়াইয়াছে. সুরেশ দুষ্টগ্রহের মত তাহাকে অনিবার্য সর্বনাশের পথে টানিয়া আনিয়াছে। সচেতন মনের শুভবুদ্ধি পতিপরায়ণতার সঙ্গে অবচেতন মনের নিষিদ্ধ কামনা ও সুখসম্ভোগের অতৃপ্ত নেশার নিষ্ঠুর হৃদয়ঘাতী সংগ্রামে অচলার চরিত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া এক মহাশূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুরেশ ও অচলার চরিত্র রূপায়ণে মহৎ ট্র্যাজেডির শিল্পাদর্শ নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে। সুরেশ ও অচলা শরৎচন্দ্রের সার্থকতম ট্র্যাজিক নায়ক নায়িকা। মহিম চরিত্র সংযত, স্বল্পভাষী, আত্মকেন্দ্রিক, নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। প্রথমে তাহাকে যেভাবে দেখিয়াছি শেষেও সেইভাবে দেখিলাম, কোনো বিকাশ ও পরিবর্তন নাই। মৃণালও সেবা-পরিচর্যা, স্নেহযত্নের প্রতিমূর্তি, কিন্তু আগাগোড়া একই রকমের। মহিম ও মৃণাল ভালো চরিত্র বটে, কিন্তু উপন্যাসে তাহারা শুধু গৌণ ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে।

কাহিনীর প্রথম অংশের ঘটনাস্থল কেদারবাবুর বাড়ি। অচলার জন্য দুই বন্ধু প্রতিদ্বন্দ্বী—ত্রিকোণাকার সমস্যা, মহিমের জয়। দ্বিতীয় অংশ ঘটিয়াছে মহিমের গ্রামের বাড়িতে (কিছুটা কলিকাতায় সুরেশের বাড়িতে) চতুষ্কোণাকার

সমস্যা—সুরেশ-অচলা-মহিম—মৃণাল এই চারজন অন্ধভাবে হাতড়াইয়াছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও পায় নাই। কাহিনীর তৃতীয় অংশের ঘটনাকেন্দ্র হইল ডিহরী। এই অংশের পাত্রপাত্রী দুইজন—সুরেশ ও অচলা। উভয়ের সম্পর্কের একটি বিপরীত আবর্তন শুরু হইল। এতদিন সুরেশই অচলাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছে, এখন অচলা সব হারাইয়া সুরেশকেই নিরুপায়ের অবলম্বনরূপে আশ্রয় করিতে চাহিল। এমন কি মহিমের সঙ্গে দেখা হইবার পরেও সে সুরেশকে ত্যাগ করিতে চাহে নাই, এবং তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। নির্মম বাস্তবতা ও ট্র্যাজিক ভাবানুভূতি সৃষ্টির দিক দিয়া এই অংশ কাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শুধুমাত্র মহিমের গৃহশিক্ষক রূপে আকস্মিক আগমন একটু কষ্টকল্পিত। আলোচ্য উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছিল সুরেশ ও মহিমকে লইয়া, ইহার পরিণতিতেও আবার দুই বন্ধু নানা বিপর্যয়ের পরে মিলিত হইয়াছে। মহিমের প্রতি সুরেশের অকপট ভালোবাসায় কাহিনীর আরম্ভ এবং সেই মহিমের প্রতি তাহার আত্যন্তিক নির্ভরতায়' কাহিনীর সমাপ্তি। প্রথম পরিচ্ছেদে সুরেশ নিজেকে মহিমের কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিল এবং শেষ পরিচ্ছেদে মহিমই সুরেশের অন্তিম কাজের ভার গ্রহণ করিল।

'গৃহদাহে'র সঙ্গে পরবর্তী বৃহৎ উপন্যাস 'দেনা-পাওনা'র গঠনকৌশলগত পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। 'গৃহদাহে'র কাহিনীবিন্যাসে ঐক্য ও সংহতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু 'দেনাপাওনা'র কাহিনীগঠনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে বিস্তার ও শিথিলতায়। 'গৃহদাহে'র জটিল ও অন্তর্মুখীন কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে কয়েকটি মূল চরিত্রের অন্তর্গূঢ় প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া, কিন্তু 'দেনাপাওনা'র বহিঃপ্রধান কাহিনীতে ছোট বড় বহু চরিত্র আসিয়া ভিড় করিয়াছে। তাহাদের হাঁকডাক ও দাপাদাপিতে মূল চরিত্রগুলির নিভৃত অন্তরের দিকে মনোযোগ দিতে আমরা খুব কম সময় পাইয়াছি। 'গৃহদাহে'র মধ্যে পটভূমি অপেক্ষা চরিত্রগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যই বড় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু 'দেনাপাওনা'র মধ্যে চণ্ডীগড়ের সামাজিক পটভূমিটি একটি মুখ্য ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর চণ্ডীগড়ে আগমন হইতেই কাহিনীর সূচনা। কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদে ঠিক কাহিনীর আরম্ভ হয় নাই, জীবানন্দ ও ষোড়শীর চরিত্র-পরিচিতিই রহিয়াছে এই পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কাহিনীর আরম্ভ এবং এই আরম্ভ হইল জীবানন্দ-ষোড়শীর সংঘাতে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত জীবানন্দের আতঙ্ককণ্টকিত শান্তিকুঞ্জে একটি তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ, দ্রুতগতিশীল নাটক যেন অভিনীত হইয়া গিয়াছে। অপরের প্রাণের মূল্য যাহার কাছে বিন্দুমাত্র নাই, সেই হিংস্র ও দুর্দান্ত লোকটি নিজেই মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছে। যে নারীর নারীত্ব সে বিধ্বস্ত করিতে চাহিয়াছে, তাহারই কাছে সে একবিন্দু স্নেহ ও করুণার জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে। অপরদিকে ষোড়শী যাহাকে ঘৃণ্যতম নরপিশাচ মনে করিয়াছিল তাহারই মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া সযত্ন সেবায় তাহাকে সারাইয়া তুলিয়াছে, কলঙ্কের ডালা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়া সে এই ঘোর অপকারী পাষণ্ড লোকটিকেই ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। এই কয়েকটি পরিচ্ছেদে নাটকীয় ভাবে দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং চরিত্রের আকস্মিক বৈপরীত্য ঘটিয়াছে বলিয়া এই অংশের কাহিনী ঘনীভূত আবেগ ও উত্তেজনায় পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে। কিন্তু কাহিনীর এই আবেগমথিত রূপ আর সপ্তম পরিচ্ছেদ হইতে থাকে না। ঐ পরিচ্ছেদ হইতে শান্তিকুঞ্জের ঘটনারই সামাজিক প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আট হইতে এগার পরিচ্ছেদ পর্যন্ত নির্মম-হৈম-ষোড়শী বৃত্তান্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই বৃত্তান্ত নীরস ও অনাকর্ষক এবং অহেতুক অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। বার পরিচ্ছেদ হইতে ষোড়শীর আর একটি রূপ দেখিলাম, সে তাহার ভূমিজ প্রজাদের সংগ্রামশীলা নেত্রী, জীবানন্দ ও জনার্দনচালিত প্রজাপীড়ক সমাজশক্তির বিরুদ্ধে সে দণ্ডায়মানা। এই অংশে কাহিনী দুই শ্রেণীর বাহ্য উত্তেজনাজনক সংগ্রামের বর্ণনায় পর্যবসিত, ব্যক্তিচরিত্রের কোন সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ এখানে নাই। সতের, আঠার ও উনিশ পরিচ্ছেদে ষোড়শীর কুটিরে দুই বাহ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর গোপন আন্তর আকর্ষণের চিত্রই ফুটিয়াছে। কিন্তু এই আকর্ষণ জীবানন্দের দিক দিয়া যত স্পষ্ট, ষোড়শীর দিক দিয়া তত স্পষ্ট নহে। কুড়ি, একুশ ও বাইশ পরিচ্ছেদে পুনরায় আমরা ব্যারিস্টার সায়েবকে দেখিয়াছি, পরোপকারের নীচে তাহার বিকৃত মোহ যেমন এই অংশে ধরা পড়িয়াছে, তেমনি তাহার কৌতুকজনক মোহমুক্তি ও রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায়গ্রহণের দৃশ্যও এখানে দেখান হইয়াছে। বাইশ পরিচ্ছেদে ষোড়শী মন্দিরের সিন্দুকের চাবী জীবানন্দের হাতে যখন তুলিয়া দিল তখন হইতে জীবানন্দ চরিত্রের শেষ পরিবর্তন সূচিত হইল। ষোড়শীর অতখানি বিশ্বাসের পাত্র হইয়া হিংস্র, প্রজাপীড়ক জমিদার সমাজকল্যাণকামী, প্রজাপালক মহাপ্রাণ মানুষে রূপান্তরিত হইল। ষোড়শীর সযত্ন সেবা পাইবার পূর্বে জীবানন্দ ছিল

হৃদয়হীন পাষণ্ড, ষোড়শীর সেবা পাইবার পরে তাহার মধ্যে নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক ও জীবনরসতিয়াসী এই দ্বিসত্তার অস্তিত্ব দেখিতে পাই এবং ষোড়শীর পরিপূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইবার ফলে তাহার মধ্যে প্রজাপীড়ক সত্তার বিলুপ্তি ঘটিল এবং তখন হইতে শুরু হইল দুঃখব্রতী প্রেমের বেদীতে নীরব আত্মোৎসর্গ। তেইশ পরিচ্ছেদ হইতে জীবানন্দের চরিত্র একটু বেশী আদর্শায়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ঘোর বস্তুবাদী, বিপরীতভাষী, ব্যঙ্গবিদ্রূপপ্রয়োগকুশলী সত্তা যেন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে এবং এক শান্ত, সহিষ্ণু, সমাজসেবী সত্তার কর্মময় রূপই যেন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি! বার হইতে বাইশ পর্যন্ত শ্রেণীসংঘাতের বিক্ষোভ ও উত্তেজনায় কাহিনীর ধারা আলোড়িত কিন্তু তেইশ হইতে সাতাশ পর্যন্ত শ্রেণীসামঞ্জস্য ও মিলনের প্রচেষ্টার ফলে কাহিনী উত্তেজনারহিত ও ধীরগতি। শেষ পরিচ্ছেদে কাহিনীর পরিণতি একটু দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে যেন ঘটিয়াছে। ষোড়শী চণ্ডীগড় হইতে চলিয়া যাওয়ার পরে কাহিনীর কৌতূহল ও আকর্ষণজনকতা একেবারে কমিয়া গিয়াছে ভাবিয়াই হয়তো লেখক হঠাৎ ইহার উপসংহার ঘটাইয়া দিলেন। ষোড়শীর অলকাসত্তায় সম্পূর্ণ রূপান্তর কিভাবে ঘটিল তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। প্রজাবিদ্রোহের নায়িকা জনার্দন রায়কে বাঁচাইবার জন্য প্রজাদের মামলা প্রত্যাহার করাইয়া লইতেছে, ইহা যেন বিশ্বাস করা যায় না। জীবানন্দকে যে সমাজকল্যাণকর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সে জীবানন্দকে লইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া নিশ্চিন্ত সুখ ও শান্তির নিভৃত নিকেতন সন্ধান করিতেছে। ইহাতে ষোড়শী ও জীবানন্দের সমস্ত ধর্ম ও আদর্শ যেন ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

বৈপ্লবিক রাজনৈতিক জীবনচিত্রণের উদ্দেশ্য লইয়া পরবর্তী বৃহৎ উপন্যাস 'পথের দাবী' রচিত। 'দেনাপাওনা'য় যেমন শ্রেণীবৈষম্যমূলক সামাজিক পটভূমি উপস্থাপিত হইয়াছে, 'পথের দাবীতে'ও তেমনি অগ্নিগর্ভ পটভূমি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিল্পরসসৃষ্টি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ তত্ত্বপ্রচারই যে ক্রমে ক্রমে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই তত্ত্বপ্রচারের প্রবণতার ফলেই চরিত্রের হৃদয়গত দিক অপেক্ষা বুদ্ধিগত দিক প্রাধান্য পাইতেছে এবং আনন্দ-বেদনার রসরূপ অপেক্ষা শুষ্ক বিচারবিতর্ক বড় হইয়া উঠিতেছে। 'পথের দাবী'র একটি বড় অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে সব্যসাচী-ভারতীর বিতর্কমূলক আলোচনা। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা রাজনৈতিক উপন্যাস, ইহাতে রাজনৈতিক আলোচনা প্রত্যাশিত। 'পথের দাবী' নামক যে বৈপ্লবিক

সঙ্ঘটির নাম অনুযায়ী এই উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে তাহার ক্রিয়ারূপ অপেক্ষা তত্ত্বরূপটিই উপন্যাসের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। শরৎচন্দ্রের নিজস্ব মতবাদ সব্যসাচীর কথার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, তবে সহিংস বিপ্লবের বিপরীত দিকটিও তিনি ভারতীর মুখ দিয়া শুনাইয়াছেন। ভারতীর কথাগুলিও বেশ যুক্তিসহ ও জোরালো এবং সেজন্য সব্যসাচীর প্রখর ও শাণিত কথাগুলি পাঠকচিত্তকে চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া রাখিলেও বিপরীত যুক্তি ও আদর্শও তাহার চিন্তা ও বিচারবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। লেখক বিতর্কমূলক তত্ত্বপ্রচারে তাঁহার শৈল্পিক সমতা অনেকখানি বজায় রাখিয়াছেন বলিয়া পাঠক আলোচনার কণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্লান্ত ও অসন্তুষ্ট হয় না।

পথের দাবীতে নায়ক কে? রাজনৈতিক অংশের নায়ক সব্যসাচী এবং ঔপন্যাসিক অংশের নায়ক অপূর্ব। অবশ্য এই দুইজন নায়কের মধ্যে এক-দিক দিয়া আকাশপাতাল ব্যবধান। সব্যসাচী শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠতম নায়ক এবং অপূর্ব দুর্বলতম নায়ক। অপূর্বকে লইয়াই কাহিনীর সূচনা। প্রথম পরিচ্ছেদে ঠিক কাহিনী নহে, কাহিনীর পূর্বভাষই পাইয়াছি। ইহাতে অপূর্বর ব্যক্তিচরিত্র ও তাহার পারিবারিক পরিচয়ই রহিয়াছে। অপূর্বকে রক্ষণশীল ও আচারনিষ্ঠ হিন্দুরূপে বর্ণনার মধ্যে বোধ হয় লেখকের শ্লেষ নিহিত রহিয়াছে। কারণ ঘটনাক্রমে এই অপূর্বই এক খৃস্টান মেয়েকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনীর প্রকৃত আরম্ভ এবং ইহার ঘটনাস্থল রেঙ্গুন। শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসের মত এখানেও নায়ক নায়িকার পরিচয় ঘটিল সংঘাতের মধ্য দিয়া এবং সেই সংঘাতের রূপান্তর ঘটিল প্রবল ভালোবাসায়। কিন্তু প্রথম দিকে অপূর্ব ও ভারতীর যে চরিত্ররূপ দেখিলাম পরে তাহা রক্ষিত হয় নাই। যে অপূর্ব লাঠি হাতে লইয়া খৃস্টান সাহেবের উদ্ধত অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া প্রশংসনীয় সাহস ও নির্ভীক স্বাজাত্যবোধের পরিচয় দিয়াছিল, স্টেশনে ফিরিঙ্গী যুবকদের বর্বর আচরণের সমুচিত জবাব দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাকে আমরা আর পরে পাই নাই। তাহার পরিবর্তে পাইয়াছি এক ভীরু, অকৃতজ্ঞ, মেরুদণ্ডহীন যুবককে। যে ভারতী খৃস্টান পরিবারে বিজাতীয় আচারব্যবহারের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, তাহাকে আমরা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে আর পাই নাই। ঐ পরিচ্ছেদে অপূর্বর ঘরে চুরি হওয়ার পরে যখন সে অপূর্বর কাছে আসিয়া

উপস্থিত হইল তখন তাহাকে অতিপরিচিত হাস্যপরিহাসপ্রিয়, কোমলচিত্ত বাঙালী নারীরূপেই দেখিলাম। তখন হইতে ভারতীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্য নায়িকার আর পার্থক্য রহিল না। অফুরন্ত সেবাযত্ন, স্নেহভালোবাসা দিয়া সে তখন হইতে দুর্বল ও অক্ষম অপূর্বর ভার গ্রহণ করিল। ভারতীর পূর্ব পরিবেশের সঙ্গে তাহার এই চরিত্ররূপের সামঞ্জস্য আছে কিনা সে সংশয় আমাদের মনে উদিত হয়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সব্যসাচী চরিত্রের অবতারণা এবং তখন হইতে এই অসামান্য ব্যক্তিটি প্রদীপ্ত ভাস্করের মত তাহার ব্যক্তিত্বের রশ্মিজাল সকলের উপর বিকীর্ণ করিয়া অপ্রতিহত গৌরবে কাহিনীমধ্যে বিরাজ করিয়াছে। ইহার চমকপ্রদ, সন্ত্রাসজনক ক্রিয়াকলাপ অবলম্বনে লেখক জায়গায় জায়গায় লোমহর্ষণ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই রকম একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, যেখানে গিরীশ মহাপাত্ররূপে সব্যসাচীর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। এগার পরিচ্ছেদের আগে অপূর্ব-ভারতীর কাহিনীই মুখ্য। পথের দাবীর সভ্যদের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত আমাদের কোন পরিচয় হয় নাই। কিন্তু এগার পরিচ্ছেদ হইতে কাহিনী ব্যক্তিহৃদয়ের আকর্ষণ-অভিমানজনিত শান্তমধুর পরিবেশ হইতে এক অগ্নিবিপ্লবের প্রজ্বলিত চুল্লীর মধ্যে গিয়া পড়িল। ঐ পরিচ্ছেদ হইতেই পথের দাবীর বৈপ্লবিক কর্মধারা কাহিনীর মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। সব্যসাচীর মত ও পথ, তাহার চমকপ্রদ অতীত ও বর্তমান জীবনের রূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু সভানেত্রী সুমিত্রার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা তোলা হইলেও তাহার চরিত্র গ্রন্থমধ্যে বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয় নাই। সব্যসাচী-ভারতীর সম্পর্ক এত বেশি প্রাধান্য পাইয়াছে যে সব্যসাচী-সুমিত্রার সম্পর্ক কোথাও বর্ণনা অথবা সংলাপের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইল না। লেখক সুমিত্রা চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে। কাহিনীর একটি চূড়ান্ত সঙ্কটমুহূর্ত দেখা গিয়াছে উনিশ পরিচ্ছেদে, অর্থাৎ অপূর্বর বিচারদৃশ্যে। ঐ দৃশ্যে এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার আতঙ্কে প্রতিটি মুহূর্ত যেন অবরুদ্ধ নিশ্বাসে কাটাইতে হয়। অপূর্ব নিষ্কৃতি পাইল বটে, কিন্তু বেশ কিছুকালের জন্য সে ঘটনাস্থল হইতে অন্তর্হিত হইল এবং এই ঘটনার পর হইতে পথের দাবীর সভ্যদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সূচনা হইল। অন্তর্বিরোধের একটি সঙ্কটময় পরিণতি পঁচিশ পরিচ্ছেদে, যেখানে সব্যসাচী ও ব্রজেন্দ্র দুই হিংস্র বাঘের মত পরস্পরকে হনন করিতে উদ্যত। অপূর্ব চলিয়া যাওয়ার পর সব্যসাচী ও ভারতীকেই প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে। এই অংশই

তর্কবিতর্ক ও তাত্ত্বিকতায় একটু ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তবে এই অংশে প্রবন্ধিত শশীকবির বেদনাকরুণ পার্শ্ব কাহিনীটি আমাদের চিত্ত ব্যথায় ও সহানুভূতিতে ভারাতুর করিয়া তোলে। 'পথের দাবী'র শেষ পরিচ্ছেদের মত জোরালো ও নাটকীয় উপসংহার-দৃশ্য শরৎচন্দ্রের খুব কম বইতেই পাওয়া যায়। দুর্যোগের ঘনান্ধকারে ঝটিকালালিত দুর্জয় সন্তানের বিদায় গ্রহণদৃশ্যে এক বাঁধভাঙ্গা ক্রন্দনের আবেগে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইতে থাকে।

শরৎচন্দ্রের শেষ দিককার উপন্যাসগুলিতে বুদ্ধিবৃত্তির যে ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য দেখা গিয়াছে তাহার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটিল 'শেষপ্রশ্নে'। 'পথের দাবী'তে বির্তক ও তাত্ত্বিকতা দেখিয়াছি, কিন্তু সেই বিতর্ক ও তাত্ত্বিকতা চরিত্রের আবেগ অনুভূতিময় রূপ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে' শুধু কেবল তর্কবিতর্ক ও আলোচনার মধ্যে চরিত্রগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। সেজন্য তাহাদের আনন্দবেদনাঘন অন্তর্জীবনের কোন রহস্য এই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। এই উপন্যাসের প্রায় সর্বাংশই কথোপকথনের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। শুধু কেবল কথা আর কথা, লেখকের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ নাই, প্রাকৃতিক চিত্র নাই, নিভৃত ভাবনা ও অনুভূতির কোন অন্তরঙ্গ পরিচয় নাই। অন্যান্য উপন্যাসে সংলাপের মধ্যে চিত্তবৃত্তির যে বিরোধিতা ও বৈপরীত্য এবং নাটকীয় রসঘন মুহূর্তগুলির সন্ধান পাই এ-উপন্যাসে সে-সব কিছুই নাই। কথার মধ্য দিয়া সব জায়গায় যে সুস্পষ্ট তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হইয়াছে তাহা নহে, অনেক স্থানেই অর্থহীন, অকারণ ও অত্যধিক কথার মধ্য দিয়া শুধু কেবল গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শৈল্পিক নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়া উগ্র প্রচারধর্মী সাহিত্যিক-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'পথের দাবী'র মধ্যে তিনি সব্যসাচী ও ভারতীর বিতর্কের মধ্যে নিজের নিরপেক্ষতা অনেকখানি বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু 'শেষপ্রশ্নে' তিনি সুস্পষ্টভাবে কমলের মধ্য দিয়া অনাবৃত রূঢ়তার সঙ্গে নিজের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেজন্য কমল ব্যক্তিরূপে বিশিষ্ট হইয়া উঠে নাই, লেখকের মতের বাহনরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদেই কমলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার কাছে প্রত্যেক চরিত্রই তর্কে নতি স্বীকার করিয়াছে। সব বিরোধিতাই দেখিতে দেখিতে যেন কমলের ঐন্দ্রজালিক মায়ায় বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কমলের প্রতি এই অসঙ্গত পক্ষপাতিত্বের জন্যই উপন্যাসের শিল্পগুণ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিরণময়ীর

জ্ঞান ও মনীষা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, কিন্তু সেই জ্ঞান ও মনীষা চরিত্রটির মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও বেমানান মনে হয় নাই, কিন্তু কমলের কাছে আগ্রার অধ্যাপক সমাজ ও আশুবাবুর পুনঃ পুনঃ পরাজয় দেখিয়া এই প্রশ্নই আমাদের অবিশ্বাসী মন হইতে উত্থিত হয়,—এত বিদ্যাবুদ্ধি কমলের মত মেয়ে পাইল কোথায়? লেখক তাঁহার মত প্রচারের জন্য যোগ্য পাত্রীটিকে নির্বাচন করেন নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কমল এবং উপন্যাসের আরও কোন কোন চরিত্রের কয়েকটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সব পরিস্থিতিতে দুঃখবেদনার ঘনীভূত রূপ না দেখাইয়া লেখক অসঙ্গত ও অস্বাভাবিকভাবে প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন তর্কবিতর্কের ধূম্রজাল বিস্তার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে; শিবনাথের বুকে কমল মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে, এই দৃশ্য দেখিবার পর অজিত, আশুবাবু প্রভৃতি চরিত্রের তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়াই হওয়া উচিত, কিন্তু লেখক সেই মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ না করিয়া সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে শুষ্ক তর্কবিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। চরিত্রগুলির তৎকালীন মানসিক অবস্থায় ঐ ধরণের তর্কবিতর্ক স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত নহে। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে শুনিয়া কমলের কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়া তো দূরের কথা, সে নারীমুক্তির দোহাই দিয়া মনোরমার পক্ষে সজোর ওকালতি করিয়াছে। এ-সব দেখিয়া মনে হয়, কমল শুধু কেবল বুদ্ধির শাণিত বিদ্যুৎ ঝলক, হৃদয়ের সামান্যতম বাষ্পও তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই।

কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছে আশুবাবু ও তাঁহার কন্যা মনোরমাকে লইয়া। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা শিবনাথকে পাইলাম। সে প্রিয়দর্শন শিল্পী, কিন্তু নারীর দেহলোলুপ, অকৃতজ্ঞ বন্ধুদ্রোহী, অমানুষ পাষণ্ড। ইংরেজ কবি বায়রণের মত সে যেমন ঘৃণিত তেমনি অভিলষিত। কিন্তু এই শিবনাথ চরিত্রের সূচনাতেই শেষ। অর্থাৎ, পরবর্তী পরিচ্ছেদে কমলের আবির্ভাবের পর শিবনাথ একেবারে নেপথ্যলোকেই চলিয়া গেল। শিবনাথ ও কমলের সম্বন্ধ দেখান হয় নাই এবং কিভাবে শিবনাথ কমলের মত অসামান্যা রূপবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া মনোরমার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং কিভাবে মনোরমা অজিতকে ছাড়িয়া ঘৃণিত শিবনাথের প্রতি আসক্ত হইল তাহাও বিশ্লেষিত হয় নাই। লেখক আকস্মিক-ভাবে পরিণতিগুলি দেখাইয়াছেন, কিন্তু মধ্যভাগের স্তরগুলি পর পর দেখান নাই। অজিত ও কমলের পারস্পরিক ভালোবাসাও অনাবশ্যক কথার চাপে

কোথাও রঙে রসে প্রকাশ পায় নাই। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে ঘটনার বিবর্তন নাই এবং হৃদয়বৃত্তির ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতির স্তরগুলিও পর পর বিশ্লেষিত হয় নাই, সেজন্য কাহিনী নিশ্চল ও গল্পরসহীন! আশুবাবু, কমল অথবা হরেন্দ্রর আশ্রমে নির্দিষ্ট কয়েকটি লোক বার বার মিলিত হইয়াছে এবং একই ধরণের প্রাণহীন তর্কবিতর্কে মাতিয়া উঠিয়াছে। তবে আশুবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা অতি উপাদেয় বলিয়া সেখানেই তর্কবিতর্ক ভালো জমিয়াছে। বলা বাহুল্য সকল তর্কবিতর্কের আসরেই একদিকে কমল একা এবং অপরদিকে বাঘা বাঘা সব অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কমলের অদ্ভুত রণকৌশল! তাহার তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলেই ধরাশায়ী হইয়াছেন। কমলকে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখক মনোরমাকে ষোল পরিচ্ছেদের পর কাহিনী হইতে একেবারে সরাইয়া লইয়াছেন, এবং নীলিমাকে কমলের শিষ্যারূপেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। মনোরমা চলিয়া যাওয়ার পর নীলিমা আশুবাবুর সেবাযত্নের ভার লইয়াছে। ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে আশুবাবুর কথায় জানা গেল, নীলিমা তাঁহাকে ভালোবাসিয়াছে। কিন্তু এই আশ্চর্য ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য ঘটনা ও চরিত্রের যেরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজন লেখক তাহা করেন নাই, সেজন্য ঘটনাটি অতর্কিত ও অবিশ্বাস্য হইয়াই রহিয়াছে।

'বিপ্রদাস' শরৎচন্দ্রের জীবিতকালের শেষ বৃহৎ উপন্যাস। উপন্যাসটি চরিত্রাশ্রয়ী, সেজন্য ইহার কাহিনী মূল চরিত্রটির অধীন। প্রথম পরিচ্ছেদেই বিপ্রদাসের আকৃতি ও গম্ভীর শ্রদ্ধাব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে বিপ্রদাসের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। দয়াময়ী, দ্বিজদাস, বন্দনা প্রভৃতি চরিত্র বিপ্রদাসের সম্পর্কেই আসিয়াছে, তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে আসে নাই। বিপ্রদাসের প্রতি স্নেহে দয়াময়ী চরিত্রের বিকাশ এবং বিপ্রদাসের প্রতি আকস্মিক নিষ্ঠুরতায় সেই চরিত্রের বিকৃতি। দ্বিজদাসকে প্রধানত বিপ্রদাসের স্নেহাসক্ত ভাই রূপেই দেখিলাম। বন্দনাচরিত্রের বিকাশও বিপ্রদাসের সংস্পর্শে। বিপ্রদাসের প্রভাবে তাহার বিদেশীয়ানার পরিবর্তন এবং তাহার প্রেমময় সত্তার বিকাশ। দ্বিজদাসকে সে বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু দ্বিজদাসের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক উপন্যাসে বিশ্লেষিত হয় নাই। বিপ্রদাসের চরিত্র অত্যধিক আদর্শের রঙে রঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া তাহার চতুর্দিকে এক কুহেলিময় ভাবলোকের সৃষ্টি হইয়াছে, প্রাত্যহিক জানা ও

চেনার জগতে যেন তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই। সে যেন নিজের মধ্যেই নিজে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে, স্বার্থ ও সংঘাতের ঘূর্ণায়মান আবর্তের মধ্যে তাহাকে কখনও পাওয়া যায় নাই। সেজন্য উপন্যাসের মধ্যে তাহার চরিত্র স্থির ও অপরিবর্তিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বন্দনার আবির্ভাব, কিন্তু বিপ্রদাস ও বন্দনার সম্পর্ক বিশ্লেষিত হইয়াছে নয় হইতে একুশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। উভয়ের ঘনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্যই বিপ্রদাসকে লেখক কলিকাতার বাসায় লইয়া আসিয়াছেন। বিপ্রদাসের আত্মীয়স্বজন সেখানে আসিয়াছে বটে, কিন্তু স্বল্পকালের জন্য। সেখানকার নিরালা পরিবেশের মধ্যে বিপ্রদাস ও বন্দনা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসিতে পারিয়াছে। বিপ্রদাস কর্তব্যের কঠিন বর্মের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বন্দনার হৃদয়াবেগ রৌদ্রবিগলিত তুষার-ধারার ন্যায় দুরন্ত বেগে বহিতে চাহিয়াছে। বাইশ ও তেইশ এই দুইটি পরিচ্ছেদে বিপ্রদাসকে দেখিতে পাইয়াছি বলরামপুরে। তেইশ পরিচ্ছেদে যে একটি চরম সঙ্কটদৃশ্য দেখানো হইয়াছে তাহা আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। সংযম ও সৌজন্যের মূর্ত প্রতীক বিপ্রদাস তাহার ভগ্নীপতির সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে কলহে লিপ্ত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। এ-ঘটনার বিন্দুমাত্র আভাসও আগে পাওয়া যায় নাই। আবার দয়াময়ীর স্নেহ একটি জীর্ণ আবরণের মত খসিয়া যাইবে এবং তাঁহার পক্ষপাতদুষ্ট নীচ অন্তর অমন নির্লজ্জ ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িবে ইহাও মানিয়া লওয়া কষ্টকর। বিপ্রদাস-দয়াময়ীর বিরোধের সমগ্র ঘটনাটিই কষ্টকল্পিত, যেন সস্তা চমক সৃষ্টির জন্যই ইহার অবতারণা করা হইয়াছে। তেইশ পরিচ্ছেদে বাড়ি হইতে বিদায় লওয়ার দৃশ্যে বিপ্রদাসের চরিত্র শেষ হইয়া গেল, বলা যাইতে পারে। পঁচিশ পরিচ্ছেদে বন্দনাকে লিখিত চিঠির মারফত সতীর মৃত্যু এবং বিপ্রদাসের সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্যোগ সম্বন্ধে জানা গেল। বিপ্রদাসকে প্রত্যক্ষভাবে না আনিয়া পরোক্ষ বিবৃতির মধ্য দিয়া তাহার সংবাদ লেখক জানাইলেন। শেষ দৃশ্যে সন্ন্যাসযাত্রার প্রাক্কালে বিপ্রদাসকে ক্ষণেকের জন্য দেখা গেল। তাহার বিদায় সূর্যের শেষ অস্তগমনের ন্যায়—চারদিকে বেদনাতুর রশ্মিজাল বিকিরণ করিয়া একটি অন্ধকার যবনিকা যেন কোলাহলমুখর কাহিনীর উপর টানিয়া দিল।

# শৈল্পিক মতবাদ

শরৎচন্দ্রের শৈল্পিক মতবাদ নির্ধারণ করিতে গেলে সাহিত্যসম্পর্কীয় তাঁহার বিভিন্ন উক্তিগুলি যেমন আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, তেমনি সেই উক্তিগুলির আলোকে তাঁহার নিজস্ব সাহিত্যও বিচার করিতে হইবে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হইল যে, তিনি বাস্তববাদী লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার তুলনা করিয়া আরও বলা হইয়া থাকে যে, বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই বাস্তবতার প্রবর্তক। শরৎচন্দ্র নিজেও এই বাস্তবতার পক্ষে অনেক জায়গায় মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একখানি পত্রে ( ১২ই মে, ১৯১৩ ) তিনি লিখিয়াছিলেন, 'শুধু সৌন্দর্যসৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস-লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে।' ১৯২৫ খৃস্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশসাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।'

বাস্তববাদ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতবাদ আলোচনা করিবার আগে বাস্তববাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা দরকার। বাস্তববাদ হইল এমন একটি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি যাহা জীবনকে যথাযথভাবে তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিবেশের মধ্যেই বিচার করিয়া থাকে। বাস্তববাদের প্রকাশ দেখা যায় দুই দিকে—বিষয়নির্বাচন এবং উপস্থাপনারীতিতে। অর্থাৎ, বাস্তববাদী সাহিত্যে একদিকে যেমন প্রাকৃত জীবনকে গ্রহণ করা হয়, তেমনি আবার অন্যদিকে সেই জীবনকে প্রকৃতিসম্মত সত্য ও সুসঙ্গত রীতিতেই উপস্থাপন করা হয়। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজিক চরিত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া একটি লক্ষণ বলিয়াছিলেন—'......to make them like the reality', অর্থাৎ তাহাদিগকে বাস্তবের অনুরূপ করিয়া তুলিতে হইবে। অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, কবি তিন উপায়ে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারেন, সেই তিনটি উপায়ের একটি হইল বাস্তববাদী উপায়,—'as they were or are', অর্থাৎ বস্তুসমূহ যেভাবে ছিল অথবা আছে সেভাবেই তাহাদিগকে উপস্থাপন করা। বাস্তববাদী সাহিত্যেরও আবার বিভিন্ন

শ্রেণী-বিভাগ আছে। দৈহিক বাস্তবতা, মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা, সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বাস্তবতা অবলম্বনে বাস্তববাদী সাহিত্য রচিত হইতে পারে। জোলা, ইবসেন ও ডস্টয়ভস্কি তিনজনেই বাস্তববাদী সাহিত্যিক, কিন্তু তিনজনের বাস্তবধর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।

বাস্তববাদী সাহিত্যের বিপরীত শ্রেণীতে রহিয়াছে আদর্শবাদী ও রোমান্টিক সাহিত্য। আদর্শবাদী সাহিত্যিক কতকগুলি সৎ ও উন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই সাহিত্য রচনা করেন। অ্যারিস্টটলের কথায় তিনি বস্তুসমূহকে দেখান—'as they ought to be'—যেরূপ হওয়া উচিত। অ্যারিস্টফ্যানিসের Frogs নাটকে ইস্কাইলাস ও ইউরিপিডিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী সাহিত্যের পার্থক্য বিশদভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইস্কাইলাসের কথায়—And so we must write of the fair and the good এবং ইউরিপিডিসের কথায়—'By choosing themes that were concerned with everyday reality.' ইস্কাইলাস ও ইউরিপিডিস আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী রচনারীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইস্কাইলাসের মতে—Sublimity speaks in the high style.

Then too it is right that a hero of drama should use words larger than ours

ইহাই আদর্শবাদী সাহিত্যের রচনারীতি। আবার ইউরিপিডিসের বাস্তববাদী রচনারীতি হইল—

To gauge a style with nicety and test its every angle.

Prove all things and suspect the worst.

ইস্কাইলাসের মত সফোক্লিসও ছিলেন আদর্শবাদী নাট্যকার। অ্যারিস্টটল সফোক্লিসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন। 'who said that he drew men as they ought to be and Eudipides as they were' রোমান্টিক সাহিত্যিকও বাস্তববাদী সাহিত্যের বিরোধী। বাস্তববাদী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা লইয়া বস্তুর যথাযথ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। কিন্তু রোমান্টিক সাহিত্যিক নিজের কল্পনা ও অনুভূতির রঙে বস্তুকে রঞ্জিত করেন, বস্তুর স্থূল ঘটনারূপ এখানে সূক্ষ্ম ভাবের মায়ারূপ লাভ করে। শরৎচন্দ্রকে যদি বাস্তববাদী সাহিত্যিক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন আদর্শবাদী সাহিত্যিক, কারণ তিনি বাস্তবসত্য

অপেক্ষা আদর্শকেই বড় বলিয়া মানিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে বলিতে হয় রোমান্টিকবাদী সাহিত্যিক, কারণ তাঁহার সাহিত্যে বস্তুর তথ্যরূপ তাঁহার নিজস্ব অনুভূতির রঙে রসে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে অনেকাংশে সমর্থিত হয়। তবে রোমান্টিকতা ও আদর্শবাদ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন তিনি শেষ দিকের পরিণত সাহিত্যে যখন তথ্যনিষ্ঠা, নির্ভীক ও নির্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও তীক্ষ্ণ মননশীলতা তাঁহার সাহিত্যে দেখা গিয়াছিল। পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাজচিত্র অঙ্কনের বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসে। ইউরিপিডিস বলিয়াছিলেন, I showed them logic on the stage'। এই যুক্তিতর্ক যদি বাস্তব সাহিত্যের লক্ষণ হয় তাহা হইলে 'চরিত্রহীন', 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসকে বাস্তববাদী উপন্যাস বলিতে হয়। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার রূপও পরিস্ফুট হইয়াছে। দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সেরা নিদর্শন পাই 'গৃহদাহ' উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তবতার কথা আলোচনা করিয়াও বলিতে হয় যে, তিনি পুরাপুরি বাস্তববাদী লেখক নহেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে—তা' কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photograpny হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে?' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে। কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড হয় ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।' শুধু শরৎচন্দ্র কেন বোধ হয় সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রণে তাঁহাদের সাহিত্য রচনা করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে গ্যেটে একটি সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন, 'The artist's work is real in so far as it is always true; ideal, in that it is never actual.' প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'অর্থহীন বস্তু, কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ, এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য।...পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট, কি বহির্জগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।' যে সুগভীর দরদ ও সহানুভূতি শরৎচন্দ্রকে

সাহিত্যরচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার ফলে খাঁটি বাস্তববাদী হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে পরিমাণে তিনি তাঁহার দরদ ও সহানুভূতিকে সংযত রাখিতে পারিয়াছেন সেই পরিমাণেই তিনি বাস্তববাদী রূপে সার্থক হইয়া উঠিয়াছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে বাস্তবতার পথ দেখাইয়াছেন। কারণ তাঁহার সাহিত্যেই উপেক্ষিত ও নিষিদ্ধ মানুষের জীবন সর্বপ্রথম প্রাধান্য পাইল। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে তাঁহার আদর্শবাদী ও রোমান্টিক ভাবানুভূতি অনেক স্থানেই অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।[১] চন্দ্রমুখী, বিজলী ও পিয়ারী বাইজী প্রভৃতি চরিত্রনির্বাচনে তিনি বাস্তববাদী কিন্তু উহাদের চরিত্ররূপায়ণে তিনি রোমান্টিক। জীবানন্দ চরিত্রের আরম্ভ বস্তুতান্ত্রিক রূঢ়তায়, কিন্তু চরিত্রটিকে শেষ পর্যন্ত তিনি আদর্শের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন। মেসের ঝি সাবিত্রীকে সাহিত্যে স্থান দিয়া তিনি বাস্তব সাহিত্যের মর্যাদা রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহানুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শে ঝি আর ঝি থাকে নাই, ব্যক্তিত্বে, চরিত্রবলে অসামান্যা নারী হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ, বৃন্দাবন, বিপ্রদাস প্রভৃতি চরিত্র আদর্শের রঙে রঞ্জিত। অন্নদাদিদি, বিরাজ প্রভৃতি চরিত্রচিত্রণেও তিনি আদর্শবাদী।

শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে বাস্তবতার সমর্থক হইলেও যে-বাস্তবতা জীবনের কুৎসিত ও কদর্য দিক উন্মোচন করিতে উল্লসিত হয়, দেহমিলনের নগ্ন বর্ণনাতে যাহার স্পর্ধিত আগ্রহ তাহাতে তাঁহার কোন উৎসাহ ছিল না। ফরাসীদেশের প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিক এবং কল্লোলযুগের কোন কোন উগ্রবাস্তববাদী সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁহার মৌলিক পার্থক্য ছিল। 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি।' চন্দননগরের আলাপ-সভায় ( ১৯৩০ খৃঃ ) তিনি বলিয়াছিলেন, 'আর একটা জিনিস বরাবর দেখেছি সাহিত্যরচনার গোটাকতক নিয়মকানুনও আছে। দেখতে হয়, রসবস্তু অশ্লীলতা পর্যায়ে না এসে পড়ে।' ঐ সভায় আধুনিক সাহিত্যের যৌন-প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যৌন সম্বন্ধ নিয়ে তারা এমন একটা গোলমাল করছে যে, তাদের

---

১। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মত এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'মানুষের এই সত্যকার পরিচয় গ্রন্থকারের কোন আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না—ইহাই শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য এবং এই হিসাবে তিনি বাস্তবপন্থী। কিন্তু 'সুগভীর' ও 'নিগূঢ়ের' অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি অবাস্তবিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।'

লেখা সাহিত্যপদবাচ্য কি-না সন্দেহ। এ-সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানি করা। নিজেদের অভিজ্ঞতা নেই—তাই পরের ধার-করা জিনিস চালাতে গিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ক'রে তুলছে।' শরৎচন্দ্রের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলি হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি বাস্তববাদী হইলেও শিল্পের সংযম, পরিমিতি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বাস্তবে যাহা ঘটে নির্বিচারে তাহাই সাহিত্যে স্থান দিতে নাই। শিল্পের আইনেই বাস্তবকে সংযতরূপে প্রকাশ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যবোধ' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, 'সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে।' শরৎচন্দ্রও সাহিত্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়াই বাস্তবকে সংযমের অধীন করিতে চাহিয়াছিলেন। যাঁহারা উলঙ্গ বাস্তবকে উন্মোচন করিতে আগ্রহী তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য পাঠকদের ইন্দ্রিয়কামনা উত্তেজিত করা, শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করা নয়। শরৎচন্দ্র যথার্থ শিল্পীর ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, বাস্তবকে কিছুটা ফুটাইতে এবং কিছুটা ঢাকিতে পারিলেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব।

শ্লীলতা ও অশ্লীলতার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে—শিল্পক্ষেত্রে নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন। শরৎচন্দ্র প্রচলিত নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন এ অভিযোগ তাঁহাকে চিরকাল শুনিতে হইয়াছে। তিনি নিজেও বহু স্থানে নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার সুস্পষ্ট মত ঘোষণা করিয়াছেন। 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে রোহিণীর মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।' 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ীর মুখে তিনি বলিয়াছেন, 'এ-কথা কোন দিন ভুলো না যে, কবি বিচারক নয়। নীতিশাস্ত্রের মতের সঙ্গে যদি তোমার মত বর্ণে বর্ণে না'ও মেলে, তাতে লজ্জা পেয়ো না।' শরৎ-সাহিত্যে বিধবা নারীর ভালোবাসা স্বীকৃত হইয়াছে, পতিতা নারীর চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে, বিবাহিতা নারীর পরপুরুষ আসক্তি সাগ্রহে বর্ণিত হইয়াছে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে সতীত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং ভবঘুরে, নীতিভ্রষ্ট চরিত্রহীন লোককে উপন্যাসের নায়ক করা হইয়াছে। সেজন্য সহজেই মনে হইতে পারে যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নীতির কোন মর্যাদা রাখিতে চাহেন নাই। বিষয়টি একটু গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। শরৎচন্দ্র অনেকস্থলেই প্রচলিত

নীতি রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে তিনি দুর্নীতি প্রচার করিয়াছেন? কখনই না। মানুষের জীবনকে তিনি সুনিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও মুক্তিই তিনি একান্তভাবে কামনা করিয়াছিলেন। যেখানে সামাজিক নীতি জীবনকে রুদ্ধ করে অথবা ঘৃণায় দূরে সরাইয়া রাখে সেখানেই তিনি সেই নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন। সমাজকে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে চালনা করিবার জন্য এবং সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সামাজিক নীতি গঠিত হয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বাহিরে ও ভিতরে নূতন নূতন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এই নীতি পুনর্বিচার ও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। চলিষ্ণু সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সামাজিক নীতি যদি চলিতে না পারে তবে সেই নীতি সমাজের উপরে শৃঙ্খলার পরিবর্তে শৃঙ্খলই চাপাইয়া দেয়। শরৎচন্দ্র জীবনের দিক দিয়া নীতির বিচার করিয়াছেন। জীবনের পক্ষে যেখানে নীতি অন্যায় বন্ধন ও নিষ্ঠুর পীড়ন বলিয়া মনে করিয়াছেন সেখানেই তিনি নীতি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন তিনি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, একটি বৃহত্তর মানবনীতিকে তুলিয়া ধরিবার জন্য। 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামক প্রবন্ধে তিনি আধুনিক সাহিত্যকে সমর্থন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে ও বলে; মন্দের ওকালতী করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।' শরৎচন্দ্রের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শিল্পকে নীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে রাখিতে চাহিয়াছেন। সব বড় সাহিত্যিকই বোধ হয় নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটি এ-ভাবে দেখেন, কোন মহত্তর নীতির জন্য ক্ষুদ্রতর নীতিকে আঘাত করেন। অ্যারিস্টটল কাব্যে নৈতিক ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'As for the question whether something said or done in a poem is morally right or not, in dealing with that one should consider not only the intrinsic quality of the actual word or deed but also the person who says or does it, the person to

whom he says or does it, the time, the means and the motive of the agent—whether he does it to attain a greater good, or to avoid a greater evil.' শরৎ-সাহিত্যের নৈতিকতা বিচারের সময়েও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া নীতিকে যে ভাবেই বিচার করুন না কেন, তাহা করিয়াছেন 'to attain a greater good'—একটি মহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য।

শরৎচন্দ্র 'Art for art's sake,' অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'আর্ট-এর জন্যই আর্ট, এ-কথা আমি পূর্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।' 'শেষপ্রশ্ন' সম্পর্কে কৈফিয়ত দিবার সময় তিনি একজন মহিলাকে লিখিয়াছিলেন, 'পশ্চিম থেকে বুলি আমদানী হয়েছে যে art for art's sake—এ-সব যেন ওদের নখাগ্রে। গল্পের গল্পত্বই মাটি, কারণ চিত্তরঞ্জন হোলো না যে। কার চিত্তরঞ্জন? না আমার! গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা।' দিলীপকুমার রায়কে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন (৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৮), 'কতকটা তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানিনে। যেমন art for art's sake, ধর্ম for ধর্মের sake, truth for truth's sake ইত্যাদি।' কলাকৈবল্যবাদীরা শিল্পের শৈল্পিক মূল্যকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান ছাড়া তাঁহারা শিল্পের অন্য কোন উদ্দেশ্য স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এর মধ্যে আনন্দটিই হচ্ছে সব-শেষের কথা, এর পর আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এ-প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা' (সাহিত্য—সাহিত্যের পথে)। ভিক্টর কুঁজা, বোদলেয়ার, ওয়াল্টার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড, ব্র্যাডলে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই মতবাদের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সাহিত্য মানবজীবন লইয়াই কারবার করে এবং মানবজীবন নৈতিক ও সামাজিক মূল্য বাদ দিতে পারে না। সেজন্য সাহিত্যও ঐ মূল্যগুলি অস্বীকার করিতে পারে না। আই. এ. রিচার্ডস তাঁহার Principles of Literary Criticism নামক গ্রন্থে কলাকৈবল্যবাদের প্রবক্তা ব্র্যাডলের Poetry for Poetry's sake প্রবন্ধের (Oxford Lectures on Poetry) সমালোচনা করিতে যাইয়া New Testament, Divine Comedy, Pilgrim's Progress

প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'in all these cases the consideration of ulterior ends has been certainly essential to the act of composing. That needs no arguing, but, equally, this consideration of the ulterior ends involved is inevitable to the reader'. শরৎচন্দ্র সামাজিক জীবনের সমস্যা এত গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দের জন্য সাহিত্যরচনা করা সম্ভব ছিল না। সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃত নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সামাজিক নীতি ও আদর্শ স্থাপনে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রও তেমনি অন্যদিকে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত মানুষদের দাবী জানাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তবে শেষ দিকে তাঁহার কলাকৈবল্যবাদ বিরোধিতা একটি অসহিষ্ণু তাত্ত্বিকতায় পরিণত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রভৃতি সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি স্পষ্টত সাহিত্যে আনন্দবাদ, চিরন্তনত্ব, হৃদয়ানুভূতির প্রাধান্য প্রভৃতি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধটি সমালোচনা করিয়া অতুলানন্দ রায়কে লিখিত একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।' তিনি বিশ্বাস করিতেন দেশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও বিচার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 'মানবচিত্তই তো একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে পার না! তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্যবিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুসী হ'য়ে দেয় আর এক যুগে তার অর্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।' সাহিত্যে অতিরিক্ত মননশীলতার নিন্দাকরিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'নভেলে কোনো একজন মানুষকে ইনটেলেকচুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইনটেলেকচুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম. এ. পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র করে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্তহস্তী।' শরৎচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিলেন (১৯৩৩) তখন মননশীলতা

ও তাত্ত্বিকতার দিকে তাঁহার স্পষ্ট প্রবণতা ছিল সেজন্য তিনি লিখিয়াছিলেন, 'গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিংবা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।'

Art for art's sake মতবাদের যাঁহারা বিরোধী তাঁহাদের মধ্যে চূড়ান্ত মতবাদীরা আবার উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী সাহিত্যে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। শিল্পমূল্য তাঁহাদের কাছে গৌণ, প্রচারমূল্যই সর্বস্ব। প্রচারবাদী সাহিত্যের একজন বড় প্রবক্তা হইলেন বার্ণার্ড শ, যিনি নিছক শিল্পের জন্য এক লাইনও লিখিতে রাজি ছিলেন না। তাঁহার গুরু ইবসেনওপ্রচারধর্মী নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রচারের সঙ্গে শিল্পের সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। শ-এর নাটকে শিল্প অপেক্ষা প্রচারই প্রাধান্য পাইয়াছে। শরৎচন্দ্র সাহিত্যজীবনের শেষ দিকে ইবসেন ও বার্ণার্ড শ-এর সাহিত্যিক মতবাদ অনেকখানি সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা সত্য। কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন' ও কিছুটা 'পথের দাবী' ছাড়া তাঁহার অন্য কোন উপন্যাস প্রচারধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। সাহিত্যিক যখন প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার আত্মবিশ্বাস নাই। ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার বক্তব্য পাঠকচিত্তে সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে তুলিয়া ধরিতে পারেন। যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করিতে ও শিক্ষা দিতে চান সেখানেই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র ও পাঠকের মধ্যে তিনি অনধিকার প্রবেশ করেন। সাহিত্যে নিশ্চয়ই বক্তব্য থাকিবে, কিন্তু সেই বক্তব্য উগ্র ও উলঙ্গ বক্তব্য নহে, তাহা শিল্পের আইনের অধীন এবং রসবস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন। 'শেষপ্রশ্নে'র আলোচনাতেই তিনি বলিয়াছেন, 'সমাজ-সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়তো আছে, কিন্তু সমাধান। ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক তা' ছাড়া আর কিছুই নই.।' ইহাই শরৎচন্দ্রেব যথার্থ মত। আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত দিবার সময় এবং 'শেষপ্রশ্ন' রচনার কালে তিনি যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার সাহিত্যে আবেগ অনুভূতির রসোত্তীর্ণ প্রকাশ বুদ্ধিগ্রাহ্য উদ্দেশ্য অপেক্ষা প্রাধান্য পাইয়াছে এবং একমাত্র 'শেষপ্রশ্ন' ছাড়া কোথাও প্রচারের ভাষা হৃদয়ের ভাষা হইতে জোরালো হয় নাই।

কলাকৈবল্যবাদীরা শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। অস্কার ওয়াইল্ড বলিয়াছেন, All art is quite useless. রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বলিয়াছেন, প্রয়োজনের বন্ধনমুক্ত হইলেই সাহিত্য নিত্যকালের

আনন্দের সামগ্রী হইয়া উঠে। কবির 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি এককালে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যে সাহিত্যক্ষেত্রে অপাংক্তেয় তাহা বুঝাইতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন, 'সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্র পাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল। বকফুল, বেগুনের ফুল, কুমড়ো ফুল এই সব রইল কাব্যের বাহির দরজায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে; রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে।' কবির কথাগুলির শ্লেষাত্মক সমালোচনা করিয়া শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' প্রবন্ধে লিখিলেন, 'কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপ-জাম ফুল ও না, যদিচ সে শিরীষ ফুলের সর্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে।······আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিম্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি বশতই এরূপ করে।' শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্যেব পক্ষ লইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার কথাগুলি আধুনিক সাহিত্যিকদের দ্বারা সমর্থিত হইবে। আধুনিক উপন্যাসে, এমন কি কাব্যেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বিষয় অবাধ স্থান লাভ করিয়াছে। অপরিচিত, দূরবর্তী ও সৌন্দর্যময় জগতের মধ্যে আর আধুনিক সাহিত্য সীমাবদ্ধ নহে তাহা সত্য। কিন্তু তবুও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বিষয়বস্তু যত বাস্তব ও প্রয়োজনীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন, সেই বিষয়বস্তুকে সুন্দর ও স্থায়ী করিতে হইলে তাহাতে কাল্পনিক ও দূরবর্তী বস্তু প্রয়োগ করিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় ও কাল্পনিক বস্তু থাকিলেই আমাদের চিত্ত সুদূরে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং এই ব্যাপ্তিতে আমরা আনন্দ অনুভব করি। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, 'হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না।' এই অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইতে গেলেই সাহিত্যকে বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্যবস্তু ও সৌন্দর্য প্রকাশের রীতি অবলম্বন করিতে হইবে। পরিচিত শব্দের সঙ্গে অপরিচিত

সৌন্দর্যময় শব্দ, এবং প্রয়োজনীয় বস্তুর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় ভাব মিশাইতে পারিলেই সাহিত্য সত্য হয়, আবার সুন্দরও হয়। এ-সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের নির্দেশ শিরোধার্য— 'A certain admixture, accordingly, of unfamiliar terms is necessary. These, the strange word, the metaphor, the ornamental equivalent, etc. will save the language from seeming mean and prosaic, while the ordinary words in it will secure the requisite clearness.'

# প্রবন্ধ-সাহিত্য

শরৎচন্দ্রের বিপুল রসসাহিত্যের তুলনায় তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্য নিতান্তই স্বল্প। তাঁহার হৃদয়ানুভূতি ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে রসসাহিত্যে এবং তাঁহার বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ শ্লেষ-বিদ্রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যে। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়, যথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, অভিভাষণ ও চিঠিপত্র। সামাজিক প্রবন্ধগুলি তিনি প্রধানত লেখেন ব্রহ্মপ্রবাসের সময়—অনিলাদেবী এই ছদ্মনামে। রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ রচনা করেন রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকিবার সময়। অভিভাষণগুলি প্রধানত পরিণত প্রতিষ্ঠার সময় বিভিন্ন সভাসমিতিতে পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। সাহিত্য-সমালোচনাগুলির অধিকাংশ ব্রহ্মপ্রবাসে অনিলাদেবীর ছদ্মনামে লেখা। চিঠিপত্রগুলি ব্রহ্মদেশে তাঁহার অজ্ঞাতবাসের পরের পর্ব হইতে অর্থাৎ ১৯১৩ হইতে মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত লিখিত। প্রবন্ধগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের এক ভিন্নরূপ আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার গল্প-উপন্যাসের সর্বত্র বেদনা ও সহানুভূতির ধারা প্রবাহিত, কিন্তু প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁহার আক্রমণাত্মক ভঙ্গি অতি স্পষ্ট। এই আক্রমণ প্রধানত শ্লেষ ও বিদ্রূপাত্মক ভাষা ও রচনারীতিতে প্রকটিত। বিপক্ষ মত ও দলের প্রতি বিরক্তিপূর্ণ অসহিষ্ণুতা ও নিজের মত প্রতিষ্ঠায় আপসহীন দৃঢ়তাই তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। বোধ হয় ছদ্মনামের আড়ালে ছিলেন বলিয়াই তিনি, তাঁহার স্বভাবধর্ম গোপন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী কঠিন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণগুলির মধ্যে তিনি তাঁহার অনুরাগী শ্রোতাদের মুখোমুখি আসিয়াছিলেন বলিয়াই সেসব স্থানে তিনি স্বস্থিত, অর্থাৎ সেগুলিতে তাঁহার আবেগ-অনুভূতির স্নিগ্ধ ও রম্য রূপই আমরা দেখিতে পাই। শরৎচন্দ্র যে প্রচুর পড়াশুনা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় তিনি গল্প-উপন্যাসে কোথাও প্রকাশ করেন নাই। 'চরিত্রহীন' ও 'শেষপ্রশ্ন' ছাড়া কোথাও বইপড়া তাত্ত্বিকতা আমাদের চোখে পড়ে নাই। কিন্তু প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি তাঁহার অধীত বিদ্যা গোপন রাখিতে পারেন নাই। ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন হইয়া,

থাকিতেন, সেইসব জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেক স্থানেই আনিয়াছেন। জায়গায় জায়গায় তাঁহার অর্জিত জ্ঞান তাঁহার স্বাধীন চিন্তার উপর যেন চাপিয়া রহিয়াছে এবং মূল আলোচ্য বিষয় বহু প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও উদ্ধৃতিতে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সুবিন্যস্তভাবে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি অবতারণা করিয়া অবশেষে স্পষ্ট ভাষায় নিজস্ব সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবার প্রণালী তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে বিপক্ষ মতের অবতারণা ও আলোচনা করেন নাই, নিজের বক্তব্যধারাই শুধু বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং টীকা টিপ্পনী, মন্তব্য এবং স্থানে স্থানে রসাল গল্প অথবা স্মৃতি-কথার অবতারণা করিয়া নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত অলঙ্কৃত ভাষা ও রমণীয় রচনারীতির আদর্শও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভাষা ঋজু, স্পষ্ট, ধারাল ও ক্ষিপ্র। সাময়িক পত্রের জন্য তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার ভাষায় বেগ, লঘুতা ও চমকসৃষ্টির প্রয়াস সুস্পষ্ট। বিতর্ক বিবাদে সাময়িক পত্র জমে ভালো। এই বিতর্ক ও বিবাদ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা অনেক প্রবন্ধেই ধরা যায়। তিনি ছদ্মনামের আড়ালে লুক্কায়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নিরাপদ ছিল, এবং সেই নিরাপদ স্থান হইতে সাহিত্যিক মৌচাকে ঢিল ছুঁড়িয়া তিনি যেন বেশ মজা উপভোগ করিতেন।

তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটিব। প্রবন্ধটিকে সামাজিক প্রবন্ধ না বলিয়া সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধই বলা উচিত, কারণ সমাজতত্ত্বের আলোচনাই এখানে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। নারীর মূল্য সমাজে কোন দিন স্বীকৃত হয় নাই, লেখক তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সভ্য সমাজ অপেক্ষা অসভ্য সমাজের আলোচনাই প্রবন্ধের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। নারীর অবস্থা বিচার অপেক্ষা নারীর ইতিহাস, বিশেষত অসভ্য-স্তরের ইতিহাসই এখানে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। সামাজিক আইন-গুলির যৌক্তিকতা এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার অনিবার্য পরিণাম প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ আলোচিত হয় নাই। প্রথম দিকে যেখানে লেখক আমাদের দেশের নারীসমাজের অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে সমস্যার রূঢ় বাস্তবতা এবং সত্যের নির্মম অকাট্য রূপ অতিশয়

নিপুণতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখানে লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতারসে তাঁহার রচনা অভিষিক্ত হইয়াছে এবং প্রতিবাদের খাপখোলা উলঙ্গ তলোয়ার তাঁহার ভাষায় ঝলসিয়া উঠিয়াছে। পুরুষের গড়া সমাজে নারীর সতীত্ব ও সহনশীলতার যে সব মূল্য আমরা খুব উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছি সেগুলির মধ্যে পুরুষের প্রবঞ্চনা ও নিজের স্বার্থরক্ষার নীচ চেষ্টা শরৎচন্দ্রের সন্ধানী ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। আমাদের সযত্নরক্ষিত বহু ধারণা তাঁহার প্রবল আঘাতে জীর্ণপাতার মতই যেন খসিয়া ধুলায় লুটাইয়াছে। কিন্তু শেষ দিকে যেখানে লেখক নানা পড়া বই হইতে উদাহরণ সহ অসভ্য সমাজে নারীর অবস্থার বর্ণনা দিয়াছেন সেখানে প্রবন্ধটি সমস্যার তীব্রতা ও আবেদনের তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, সেখানে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গাঢ় অনুভূতির স্পর্শ আর নাই, পরিবর্তে তাঁহার বহুব্যাপ্ত অধ্যয়নের পরিচয় রহিয়াছে মাত্র। নারীর যে অবস্থা সেখানে বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে মাত্র, তাহা আমাদিগকে ভাবিতে ও অনুভব করিতে সাহায্য করে না।

'সমাজধর্মের মূল্য' প্রবন্ধটি (১৯১৬) 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত ভববিভূতি ভট্টাচার্য লিখিত 'ঋগ্বেদে চাতুর্বর্ণ্য ও আচার' নামক প্রবন্ধটি সমালোচনার উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রসঙ্গক্রমে লেখক সামাজিক আচার ও অনুশাসনগুলি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জীবন্ত সমাজ প্রবাহ ও পরিবর্তন স্বীকার করে, সমাজের জীবনীশক্তি যত হ্রাস পাইতে থাকে ততই সে জীর্ণ ও মৃত বস্তুগুলি জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। বর্তমান সমাজ শুধু কেবল অতীতের দোহাই দিয়া মানুষের বিচারবোধ ও স্বাধীন চিন্তা রোধ করিতেই চেষ্টা করে। বেদের অপৌরুষেয়তার দোহাই দিয়া শাস্ত্রব্যবসায়ীরা সকল প্রকার সামাজিক বিধিনিষেধের সংস্কার ও পরিবর্তনের পথ বন্ধ করিতে চাহেন। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যায় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। প্রবন্ধটির মধ্যে অনেক শাস্ত্রালোচনা রহিয়াছে, লেখকের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এখানে সুস্পষ্ট। তবে এখানেও শ্লেষ ও বক্রোক্তির আতিশয্য রহিয়াছে। নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি বারে বারে প্রসঙ্গান্তরে যাইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কম গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর উপর অতিরিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং অতিরিক্ত বিস্তৃতিকরণের দিকে প্রবণতার ফলে লেখাটি একটু ভারগ্রস্ত ও বিসর্পিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র বাংলা দেশে আসিয়া দীর্ঘকাল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। সে-সময়ে তিনি যে-সব রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে পরাধীনতার বেদনা ও জ্বালা এবং ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহার অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদ ব্যক্ত হইয়াছিল। রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে তিনি লঘু রচনারীতির আশ্রয় নিতে পারেন নাই, কারণ বিরক্তি ও বিদ্রোহ এত তীব্র ছিল যে কোনরূপ হাল্কা কথা বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধটির ( ১৯২২ ) মধ্যে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরাধীন দেশের সত্য বলিবার অধিকার নাই। তাঁহার কথায়—'আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন।' প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশে তিনি বাংলা নাট্যশালার দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন, 'দেশের নাট্যকারগণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে, রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাই সত্যবঞ্চিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন।' লেখাটির বক্তব্য স্পষ্ট ও জোরালো এবং ভাষা ঋজু ও বলিষ্ঠ।

'স্মৃতিকথা' প্রবন্ধটিতে ( ১৯২৫ ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পর দেশবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক লইয়া স্মৃতিচারণ করা হইয়াছে। প্রবন্ধটির মধ্যে রাজনৈতিক দিক অপেক্ষা সাহিত্যিক দিকই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কারণ ইহাতে তত্ত্ব ও বিতর্ক নাই, বেদনার রাগিণীগুলি মধুর স্মৃতিরঙে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক টুকরা টুকরা কথা ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্য দিয়া এখানে দেশবন্ধুর একটি অখণ্ড রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশবন্ধু স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে-স্বপ্ন পূর্ণ হয় নাই। তিনি মহাঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদৈন্য বরণ করিতে তাঁহার বাধে নাই। দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের লোক সেই ত্যাগের প্রতিদান দেন নাই। নিভৃত অবসরে তিনি ছিলেন বড় ক্লান্ত ও একা। প্রবন্ধটির মধ্যে দেশবন্ধুর চরিত্রচিত্র যেমন অতি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর অনুরাগের স্মৃতিসিক্ত রূপও সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কথোপকথনের রীতি এই প্রবন্ধে বহুলাংশে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা যেন সহজেই দুই বন্ধুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারি।

সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকিবার সময় লিখিয়াছিলেন। বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বহু সাহিত্যিক সভায় ভাষণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সমালোচনা বিশেষ

লেখেন নাই। 'নারীর লেখা' প্রবন্ধটিতে (১৯১৩) আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমাদেবীর লেখা সমালোচনা করা হইয়াছে। আমোদিনী ঘোষজায়ার লেখায় রবীন্দ্রনাথের বিকৃত অনুকরণের চেষ্টা উপহসিত হইয়াছে, অনুরূপা দেবীর উপমাপ্রয়োগের বিসদৃশতা, ধর্মপ্রসঙ্গের কচকচি ও পাণ্ডিত্য জাহির করিবার প্রবণতা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ হইয়াছে। নিরুপমা দেবীর প্রতি লেখক অনেকখানি সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল এবং তাঁহার ভাষায় দুই একটি শব্দের অপপ্রয়োগ এবং না জানিয়া লেখার ফলে দুই একটি বিষয়ের অসঙ্গতি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার ছদ্মনামের মেঘের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া যথেচ্ছ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। বাণগুলির মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত তীক্ষ্ণতা ও জ্বালা মিশিয়া রহিয়াছে। সামগ্রিকভাবে লেখায় ভাব ও রস লইয়া আলোচনা না করিয়া তিনি শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ভাষায় শব্দ ও উপমা প্রয়োগ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অত্যধিক অবতারণা এবং তুচ্ছ বিষয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রবন্ধটির ঋজু ও প্রত্যক্ষ আবেদন ব্যাহত হইয়াছে।

'কানকাটা' প্রবন্ধটি (১৯১৩) সাহিত্য-সমালোচনা নহে, প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৯ সালের 'সাহিত্যে' লিখিয়াছিলেন যে, বাইবেলের কানানাইটের সঙ্গে উড়িষ্যার খোন্দজাতীয় লোকেদের সাদৃশ্য রহিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই মতের সমালোচনা করিয়াছেন এবং ঋতেন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি যুক্তি নানা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধের গোড়ার দিকে কিছু অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া একটু রসিকতা করা হইয়াছে কিন্তু মোটামুটি এই প্রবন্ধে সুবিন্যস্ত ভাবে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বিচারের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। দুরূহ ও স্বল্পজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আগ্রহ এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান সত্যই বিস্ময়জনক। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়া আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যের পক্ষ সমর্থন করিলেন তিনি 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক প্রবন্ধে।

শরৎচন্দ্রের অল্প কয়েকটি রসরচনা আমরা পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল 'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামক রচনাটি। রচনাটি শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর পর্বে রচিত (১৯০১)। কিন্তু ইহার মধ্যে পরিণত লেখনীর প্রৌঢ় রসজ্ঞানের নিদর্শন রহিয়াছে। হয়তো 'কমলাকান্তে'র প্রেরণাতেই তিনি নেশাখোর কিছু

সূক্ষ্মঅনুভূতিশীল বেদনাভারাক্রান্ত সদানন্দের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রচনাটির গৌরব কিছুমাত্র কম নহে। 'যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী'—পথচারীর মুখে গীত গানের এই পঙ্‌ক্তিটি ভাবের তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর চতুর্দিকপ্লাবী জ্যোৎস্না-ধারা, নীরব নিশীথে সঙ্গীতের অনুসরণ এবং বিরহের মর্মান্তিক আকুতি প্রভৃতি সব কিছু লইয়া রচনাটি গীতিকাব্যের সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। 'গুরুশিষ্য-সংবাদ' নামক ক্ষুদ্র রচনাটি বিদ্রূপরসাত্মক। রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত ভূমা, আনন্দ, ত্যাগ, অহং, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বগুলির প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গমূলক দৃষ্টিভঙ্গ লইয়া রচনাটি লিখিত। গুরুর কাছে শিষ্য ভূমানন্দ ও ত্যাগানন্দের স্বরূপ বুঝিয়া লইল তাহাই রচনাটির মধ্যে দেখান হইয়াছে। বলা বাহুল্য ভূমা, আনন্দ, ত্যাগ প্রভৃতি কথাগুলি বিকৃত ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের অভিভাষণগুলি মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ভাষণ। রাজনৈতিক ভাষণগুলির মধ্যে দেশের জন্য তাঁহার সুগভীর অনুরাগ ও দুর্গত জনগণের জন্য তাঁহার সীমাহীন দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে পঠিত 'শিক্ষার বিরোধ' ভাষণটি রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিত। রবীন্দ্রনাথ উদার দৃষ্টি লইয়া প্রাচ্য প্রতীচ্য আদর্শের মিলনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি লইয়া দুই আদর্শের বিরোধের উপরেই জোর দিয়াছেন, ইংরেজ শাসনের অন্যায় ও অধর্মের দিক তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে শিবপুর ইনষ্টিটিউটে শরৎচন্দ্র 'স্বরাজ সাধনায় নারী' নামে একটি ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই ভাষণে তিনি নারীসমাজের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। আ'রা মেয়ে মানুষকে যে শুধু মেয়ে করিয়াই রাখিয়াছি, মানুষ হইতে ি ই নাই তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। সতীত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব যে বড় ইহা পুনরায় তিনি জোরের সঙ্গে এখানে বলিয়াছেন। হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ কালে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা 'আমার কথা' (১৯২২) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। সভাপতির পদত্যাগ করিবার স্পষ্ট কারণ ঐ ভাষণের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যমহীনতা ও কর্ম-বিমুখতায় বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়াই তিনি সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন

ভাষণটির মধ্যে একদিকে কর্মীদের আদর্শভ্রষ্টতা ও স্বার্থমগ্নতার প্রতি ধিক্কার এবং অন্যদিকে কারারুদ্ধ, নির্যাতিত দেশসেবকদের জন্য অকপট শ্রদ্ধা ব্যক্ত হইয়াছে। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীতে তিনি যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। ভাষণটির মধ্যে কংগ্রেসের সংকীর্ণ, নরমপন্থী ও আপসমূলক মনোভাবের নিন্দা করা হইয়াছে এবং দেশের সর্বপ্রকার মুক্তি আনয়নে তরুণ শক্তিকে তিনি উদ্দীপ্ত আহ্বান জানাইয়াছেন। আলোচ্য ভাষণের ভাষাও বিশেষ আবেগদীপ্ত, তেজোগর্ভ ও ক্ষিপ্রবেগসম্পন্ন। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উপরে শরৎচন্দ্র দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। একটি টাউন হলে, অপরটি অ্যালবার্ট হলে। টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সভায় সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষে দ্বিধাহীন কণ্ঠে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। অ্যালবার্ট হলের সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি শুধু সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে নহে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষয় আনার বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিবার পর প্রতিষ্ঠার স্বর্ণশিখরে যখন তিনি আরোহণ করিলেন, তখন বহু সভাসমিতি হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। সভাসমিতিতে তিনি যে সব লিখিত ভাষণ দিয়াছিলেন সেগুলি পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষণগুলির অধিকাংশই চলিত ভাষায় লিখিত, সেগুলির মধ্যে লেখকের ব্যাক্তিত্বের ছাপ বড় স্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মতবাদ লেখাগুলির মধ্যে ফুটিয়াছে। তাহা ছাড়া সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সাহিত্য লইয়া নানা প্রকার মন্তব্যও এই সব লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। শিবপুর ইনস্টিটিউটের সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। আধুনিক সাহিত্য নীতি ও দুর্নীতি লইয়া মাথা ঘামায় না, মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়, ইহাই প্রবন্ধটির বক্তব্য। প্রসঙ্গক্রমে শরৎচন্দ্র বঙ্কিম-সাহিত্যে নৈতিকতার প্রাধান্য সমালোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি 'সাহিত্য ও নীতি' নামে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটিতে তিনি Art for art's sake, আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ, নীতি ও দুর্নীতি প্রভৃতি বিতর্কমূলক সাহিত্যিক সমস্যাগুলির অবতারণা করিয়া নিজের সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নামক ভাষণটির (১৯২৫) বক্তব্যও একই ধরণের। বিদ্রোহীভাব এখানে আরও স্পষ্ট, আরও জোরালো। বাস্তববাদী

সাহিত্যের পক্ষে এখানে তিনি বলিষ্ঠ প্রচার করিয়াছেন। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানগুলিতে সম্বর্ধনার উত্তর দিতে যাইয়া শরৎচন্দ্র নিজের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে অনেক স্থানেই আলোচনা করিয়াছেন। তিপ্পান্ন বছর বয়সে পদার্পণ করিয়া তিনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আয়োজিত সম্বর্ধনা-সভায় বলিয়াছিলেন যে, মানুষের জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেরও বিবর্তন হয়। সুতরাং তাঁহার সাহিত্য যদি পরবর্তীকালে স্থায়িত্ব লাভ না করে তাহা হইলে তাঁহার খেদ নাই। পঞ্চান্ন বছরের জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উত্তরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দমঠ' অপেক্ষা 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সাহিত্যিক মূল্য বেশি বলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তবে 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যদি শিক্ষক ও, প্রচারক বলিয়া অভিযুক্ত হন তবে শরৎচন্দ্রকেও 'পথের দাবী' ও 'শেষপ্রশ্নে' সেই অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে শরৎচন্দ্র যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আত্মকথাই প্রাধান্য পাইয়াছে। কিভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তাঁহার জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি কবির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রগুলি তাঁহার ব্যক্তিজীবনের বহু তথ্য এবং তাঁহার সাহিত্যিক চিন্তা ও আদর্শ জানার পক্ষে অসাধারণ মূল্যবান দলিল স্বরূপ। আমাদের আফশোসের বিষয় যে, ১৯১২ খৃস্টাব্দের আগে তাঁহার বিশেষ কোন চিঠিপত্র পাই নাই। সেজন্য ব্রহ্মদেশ-প্রবাসের নয় দশ বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকখানি অজ্ঞাত। তাঁহার ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গি এবং তাঁহার সরস রচনারীতি পত্রগুলিকে রমণীয় ও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। ১৯১২ হইতে ১৯১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্রগুলির গুরুত্ব খুবই বেশি. কারণ ঐ পত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের প্রকাশ্য ও নেপথ্যবর্তী বহু ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। নিজের বহু লেখা সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব মতামত পত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। রেঙ্গুন হইতে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত পত্রগুলির কথাও উল্লেখ করা যায়। রেঙ্গুন হইতে লিখিত পত্রগুলি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে খুবই আগ্রহী। সেজন্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার

উদ্যম ও উৎসাহের অন্ত নাই। নিজের সাহিত্যিক আদর্শ নানাভাবে তিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার সাহিত্যক্ষেত্রে যখন যাহা প্রকাশিত হইতেছে সবই তিনি অশেষ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিতেছেন, কখনও প্রশংসা আবার কখনও বা নিন্দা করিতেছেন। তখন সৃষ্টি করিবার, গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা খুবই প্রবল। রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যখন অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বিচার ও বিতর্কের ঝড়ে মাতিয়া উঠিবার উৎসাহ অনেকটা হারাইয়া ফেলিলেন। পরিণত বয়সের ক্লান্তি ও বৈরাগ্য তখন অনেক চিঠির মধ্যেই দেখা যায়। লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত অনেকগুলি চিঠির মধ্যে রচনারীতির আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান। দিলীপ কুমার রায়কে লেখা চিঠিগুলিতে তাঁহার সাহিত্যজীবনের অনেক মত ও আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে। রাধারানী দেবীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে তাঁহার নিভৃত, স্নেহশীল অন্তরের মধুর স্পর্শ পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বহু চিঠিপত্র এখনও সংগৃহীত ও সংকলিত হয় নাই। সেগুলি প্রকাশিত হইলে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের আরও অনেক অজ্ঞাত তথ্য জানা যাইবে।

---

# নির্দেশিকা

## ক

### সাধারণ

খ

## রচনাবলী